বিজ্ঞানের ইতিহাস

বিজ্ঞানের ইতিহাস

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন

প্রথম খণ্ড

প্রাগৈতিহাসিক কাল ঃ মিশর ঃ ব্যাবিলন ঃ বৈদিক ভারতবর্ষ ঃ
চীন ঃ গ্রীস ঃ আলেকজান্দ্রিয়া ঃ রোম

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স
যাদবপুর ঃ কলিকাতা—৩২

।ম. এস্‌. সি, রেজিষ্ট্রার,
.সোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অব সায়েন্স,
যাদবপুর, কলিকাতা—৩২

মূল্য ঃ সাড়ে দশ টাকা

প্রথম সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২ (ইং মে, ১৯৫৫)

পরিবেশক ঃ
এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মুদ্রক ঃ
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্‌ লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

পিতৃদেব

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন

শ্রীচরণেষু—

ঋণ-স্বীকার

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ৪নং পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত সরকার ও পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার এই গ্রন্থ প্রকাশনে অর্থসাহায্য করায় গ্রন্থের সুলভ মূল্য নির্ধারণ সম্ভবপর হইয়াছে। এই অর্থ-সাহায্যের জন্য ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স-এর কর্তৃপক্ষ ভারত সরকার ও পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকারের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

[The popular price of the book has been made possible through a subvention received from the Government of India and the State Government under scheme No. 4 of the Five-Year Plan. For this subvention, the authorities of the Indian Association for the Cultivation of Science express their sincere gratitude to the Government of India and the State Government.]

এই গ্রন্থে প্রকাশিত রেখাচিত্র ও হাফ্টোন চিত্রের মধ্যে অনেকগুলি বিভিন্ন প্রকাশকের সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে। এই সব চিত্র হুবহু অথবা ভাব অবলম্বনে প্রকাশের অনুমতি দানের জন্য ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স নিম্নলিখিত প্রকাশকদিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন ঃ—

Plate I: *Prehistoric Men* by Henry Field, Field Museum of Natural History, Chicago.

Plate II: *History of the World's Art* by Hermann Leicht, George Allen and Unwin Ltd., London.

Plate III, IV, V, VI: *Mohenjodaro and Indus Civilization* by Sir John Marshall, Arthur Probsthain, London. Copyright—Government of India.

Plate VII, VIII: *Science Awakening* by B. L. Van der Waerden, Erven P. Noordhoff Ltd., Groningen, Holland.

Fig. 8, 14, 16, 97: *Man and Metals* by T. A. Rickard, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York.

Fig. 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33: *The Alphabet* by David Diringer, Hutchinson and Co., London.

Plate IX, Fig 46, 48, 53, 55, 56: *History of Medicine* by Arturo Castiglioni, Alfred A. Knopf., Inc., New York. (Fig. 53 originally appeared in *The Gentleman's Magazine*, Calcutta.)

Fig. 74, 75, 76, 77, 78, 104 and 106: *A Short History of Biology* and *A Short History of Medicine* by Charles Singer, The Oxford University Press, London.

Fig. 91, 110, 113: *From Magic to Science* by Charles Singer, Ernest Benn Ltd. London.

Fig. 95, 96: *Science Past and Present* by F. Sherwood Taylor, William Heinemann Ltd., London.

Plate XII: Fig. 98: *A Short History of Chemistry* by J. R. Partington, Macmillan & Co. Ltd., London.

Plate XIII: *Biology and its Makers* by William A. Locy, Henry Holt and Company, New York.

ভূমিকা

সভ্য পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের জীবনে ও সমাজে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্বন্ধে আজ আর কোন সংশয় নেই। বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, সভ্যতার স্বরূপ গিয়েছে বদলে; দ্রুতগামী যানবাহন ও বিমানপোতের কল্যাণে দূরত্ব ঘুচে গিয়ে পৃথিবী যেন হঠাৎ সংকুচিত হয়েছে এবং তার ফলে জাতিতে জাতিতে স্থাপিত হয়েছে নূতন সম্পর্ক, উদ্ভব হয়েছে অভিনব আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ ও সমস্যার। প্রায় পাঁচ হাজার বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বহু রাষ্ট্রবিপ্লব, রাজ্য ও সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, ধর্ম ও দর্শনের নিবিড় প্রভাব মানুষের জীবনে ও সমাজে এবং তার চাইতেও বড় মানুষের জীবনাদর্শে, যে পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি, মাত্র তিন চার শ' বছরের মধ্যে বিজ্ঞান তা সম্ভবপর করেছে। আমরা অনেকে নিজেদের জীবিতকালের মধ্যেই এই পরিবর্তনের তীব্রতা ও দ্রুততা উপলব্ধি করেছি।

শুধু বাইরের পরিবর্তন-সাধনের মধ্যেই যদি বিজ্ঞানের প্রভাব নিবদ্ধ থাকত, তবে এর এতটা গুরুত্ব হোত কিনা সন্দেহ। বিজ্ঞান, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও আদর্শ, বর্তমান মানুষের চিন্তাধারা ও মননশীলতাকে এক সম্পূর্ণ নূতন পথে পরিচালিত করছে। বিজ্ঞানীর লক্ষ্য নূতন তথ্য ও সত্যের সন্ধান। কিন্তু এ সত্য-সন্ধান অধ্যাত্মবাদীর, ধর্মকামীর অথবা দার্শনিকের চরম সত্য-সন্ধান থেকে পৃথক। শুদ্ধবুদ্ধি ও প্রজ্ঞাবলে ব্যক্তিবিশেষ মাঝে মাঝে যেসব চরম সত্য উপলব্ধি করে থাকেন বলে প্রকাশ, তার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সত্যের বিশেষ সংস্রব নেই। বৈজ্ঞানিক সত্য দেশ-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ। যে কোন সময় যে কোন স্থানে যে কোন ব্যক্তির পক্ষে উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণের দ্বারা এই সত্য যাচাই করা যায়। এই পদ্ধতিটাই বড় কথা: এর মূলমন্ত্র পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ। এই পদ্ধতিবলে যেসব তথ্য, পদার্থ ও শক্তির যেসব বিচিত্র গুণ, ধর্ম ও ব্যবহার আবিষ্কৃত হয় সেগুলোই মুখ্য ও শাশ্বত। মতবাদ ও তত্ত্ব এখানে গৌণ ও অনিত্য। বিজ্ঞানে মত বদলালে কিছু এসে যায় না। কিন্তু মত পরিবর্তন ঘটলে ধর্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মবিদ্যা ও দর্শনের অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে।

বিজ্ঞানের এই পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গী মননশীলতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমশঃ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে। ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। রাজনীতিতেও এই পদ্ধতি প্রয়োগের সপক্ষে একটা ক্রমবর্ধমান সবল মতের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। পূর্বনির্ধারিত মত, মনগড়া কতকগুলো ধারণা, অন্ধবিশ্বাস ও সংস্কারের ভিত্তিতে অগ্রসর হবার বদলে পরীক্ষিত ও নির্ভুল তথ্যের ভিত্তিতে সমগ্র বিষয়টি যাচাই করবার একটা নূতন প্রেরণা এ যুগের ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি পর্যালোচনার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই শুভ পরিবর্তনটুকু বিজ্ঞানের কল্যাণেই সম্ভবপর হয়েছে।

মননশীলতার অধিকাংশ ক্ষেত্রই জাতীয় চরিত্র, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্যের উপর অল্প-বিস্তর নির্ভরশীল। বিজ্ঞানই মননশীলতার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত যা সুরু থেকেই সার্বজনীন ও আন্তর্জাতিক, বিশ্বমানবের সাধারণ সম্পদ। মানুষের মনের ঐক্য আর কিছুতেই এমন নিবিড়ভাবে প্রকাশ পায়নি। বিজ্ঞানের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক জর্জ সার্টন এক জায়গায় লিখেছেন:

> "—It is only from the point of view of its scientific activities that the comparison of mankind with a single man, growing steadily in experience, is legitimate, and this evidences once more emphatically than anything else the

unity of mankind." [*A Guide to the History of Science*, Waltham, Mass, 1952]

এই মন্তব্য আর একটু সম্প্রসারণ করে আমরা বলতে পারি, বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত ঐক্যই একদিন বর্তমানের সমস্ত বিরোধ ও বিসংবাদ কাটিয়ে স্থায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতির পথ বেঁধে দেবে।

এসব কারণেই বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনার একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। আমি যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের আদর্শের কথা বলেছি, তা একদিনে বা একজনের চেষ্টায় কিছু আর গড়ে ওঠেনি। এর পিছনে রয়েছে বহুশত বছরের ব্যর্থতার ইতিহাস। তারপর মননশীলতার একটি স্বতন্ত্র ও সুনির্দিষ্ট বিভাগ হিসাবে বিজ্ঞানকে আজ আমরা যেমন দেখি সুরু থেকেই এ অবস্থা তার ছিল না। যাদুকর, গণৎকার, নানা শ্রেণীর কারিগর, পুরোহিত ও দার্শনিক সম্প্রদায়ের অনিশ্চিত আশ্রয়ে দারুণ অবহেলা ও অনাদরের মধ্যে বহুদিন বিজ্ঞানের কাল কেটেছে। ধর্ম, দর্শন ও কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে ঘন ঘন তার তীব্র সংঘাত বেধেছে, তার স্বাধীনতা ব্যাহত হয়েছে, এমন কি প্রতিকূল বিরুদ্ধতায় বিজ্ঞানের অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ পাবার অবস্থা এসেছে বহুবার,—শুধু একদেশে নয়, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই।

বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার কাল এখন এসেছে এমন কথাও জোর করে বলা যায় না। নাৎসী জার্মানীতে ও ফাসিস্ত ইতালীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে বৈজ্ঞানিক গবেষণার স্বাধীনতা আমরা ক্ষুন্ন হতে দেখেছি। আণবিক গবেষণার ক্ষেত্রেও এই স্বাধীনতা-সংকোচনের ব্যাপক আয়োজন রীতিমত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আপন মর্যাদায় বিজ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠিত হবার ইতিহাস বেশী দিনের কথা নয়। এই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই আমরা দেখি বিজ্ঞানের সত্যকার অগ্রগতি। এই অগ্রগতিও জ্যামিতিক সরল রেখার মত ঘটেনি। বিজ্ঞানী বার বার ভুল করে তবে এগিয়েছে। তার এই প্রয়াসের বিচিত্র ইতিহাস না জানলে বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে জানা যাবে না, যে নূতন আদর্শ এ যুগেব মানুষের কাছে বিজ্ঞান তুলে ধরেছে তার তাৎপর্য পরিষ্কার হবে না। বিজ্ঞানের ছাত্রদের পক্ষে ত বটেই, এমন কি অন্য বিভাগের বিদ্যার্থীর পক্ষেও শিক্ষার সম্পূর্ণতার জন্য এরূপ ইতিহাস-পাঠ অপরিহার্য।

বর্তমান গ্রন্থে লেখক ব্যাপক পটভূমিকা থেকে বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিবর্তন ও বিজ্ঞানীদের কথা প্রধান আলোচ্য বিষয় হলেও, ধর্ম ও সমাজের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক, বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিকতা, বৈজ্ঞানিক গবেষণার আদর্শ প্রভৃতি অতি মৌলিক বিষয়ের উপর তিনি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। বাংলায় বিজ্ঞানের এই রকম পূর্ণ ইতিহাস প্রথম প্রকাশিত হোল। এরূপ প্রচুর বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক তথ্যের একত্র সমাবেশ ও তাদের নিপুণ বিশ্লেষণ ও সমালোচনা বিরল। গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য আমি কামনা করি।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
কলিকাতা, ১৮ই চৈত্র, ১৩৬১

লেখকের নিবেদন

সময়টা ঠিক মনে নাই, ১৯৪৫ কি '৪৬ সাল হইবে। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স-এর উদ্যোগে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাচ্যের অবদান আলোচনার উদ্দেশ্যে এসিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এসিয়ার বিজ্ঞান-সাধনা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইবার জন্য কাউন্সিলের কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক মেঘনাদ সাহাকে অনুরোধ করেন। এই প্রবন্ধ রচনায় যৎসামান্য অংশ গ্রহণের যে সুযোগ ঘটিয়াছিল বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রতি আমার অনুরাগ ও উৎসাহের তাহাই প্রথম সূচনা।

ইহার অনতিকাল পরে প্যারীর আন্তর্জাতিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থার (ইউনেস্কো) বিজ্ঞান বিভাগে কাজ করিবার সময় (জুলাই ১৯৪৭—জুন ১৯৪৯) এই বিষয়ের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিবার এবং এই সম্বন্ধে কিছু কিছু পুঁথিপত্র নাড়াচাড়া করিবার আশাতীত সুযোগ উপস্থিত হয়। বিজ্ঞান বিভাগের ডিরেক্টর প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক ডাঃ জোসেফ নীডহ্যাম তখন চীনদেশের বিজ্ঞান ও সভ্যতার উপর বিশ্বকোষ-সদৃশ এক বিরাট গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত। সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে (*Science and Civilisation in China*, Cambridge University Press, Vol. I, 1954)। ডাঃ নীডহ্যাম ছাড়া বিজ্ঞানের ইতিহাসের আরও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ তখন আমাদের বিভাগে ছিলেন। তন্মধ্যে পর্তুগীজ ডাঃ আর্মাণ্ডো কর্টেসাও ও বেলজিয়ান ডাঃ জাঁ পেল্‌সেনিয়ের-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

ইউনেস্কোর তত্ত্বাবধানে মানুষের সংস্কৃতির ইতিহাস রচনার এক পরিকল্পনা সেই সময় গৃহীত হইয়াছিল। ইহাতে বিভিন্ন জাতির বৈজ্ঞানিক তৎপরতা ও অবদানের ইতিহাস যাহাতে যথাযথ আলোচিত হয়, সে বিষয়ে এই বিশেষজ্ঞগণ সাহায্য করিতেছিলেন। সমাজে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সম্পর্ক ও প্রভাব সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনসাধারণকে ক্রমশঃ অধিকতর সচেতন করিয়া তুলিবার কার্যে ইউনেস্কো কিভাবে সাহায্য করিতে পারে সেই সংক্রান্ত এক কাজের ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। এইরূপ পরিবেশে একান্ত স্বাভাবিক কারণেই বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রতি আমার অনুরাগ ও উৎসাহ বহুগুণ বর্ধিত হয় এবং সাধারণ পাঠকের জন্য এ বিষয়ে কিছু লিখিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে।

বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনার দুরূহতা অনস্বীকার্য। যিনিই এই কার্যে ব্রতী হইবেন তাঁহাকে বিজ্ঞানও জানিতে হইবে ইতিহাসও জানিতে হইবে। তারপর বিজ্ঞানের শুধু এক বিভাগ নহে, সর্ব বিভাগ। তদুপরি প্রত্নতত্ত্ব, দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের সহিত অল্প-বিস্তর পরিচয় থাকাও আবশ্যক। আমার এই সামান্য প্রয়াসে সব দিক বজায় রাখিয়া বিভিন্ন বিদ্যার মধ্যে কতটুকু সামঞ্জস্য ও সংহতি রক্ষা করিতে পারিয়াছি তাহা পাঠকগণই বিচার করিবেন। আমার মূল উদ্দেশ্য বিভিন্ন বিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিবর্তনের অন্তর্নিহিত ঐক্য ও সমগ্রতা যতদূর সম্ভব ফুটাইয়া তোলা। যদি সেই কার্যে অন্ততঃ কিছুটা সফল হইয়া থাকি তবেই সকল শ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিজ্ঞানের ইতিহাস যাহাতে এক খণ্ডে সম্পূর্ণ হয় প্রথমে সেইরূপ পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। কিন্তু মুদ্রণ-কার্যে বিলম্বহেতু এবং গ্রন্থের কলেবরের কথা চিন্তা করিয়া ইহা দুই খণ্ডে প্রকাশ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতিটি খণ্ডই আলোচনার দিক হইতে যাহাতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

বিজ্ঞানের ইতিহাস বাংলায় আলোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তার উপর বোধ করি এখন আর জোর দিবার আবশ্যক নাই। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষিত জনসাধারণ ও ছাত্রসমাজ বিজ্ঞানের বিবর্তনের কথা যাহাতে জানিতে ও এ বিষয়ে অধিকতর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে তাহার পথ ক্রমশঃ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত হওয়া দরকার। আমাদের বিজ্ঞানের ভাষা এখনও দুর্বল। অচিরে ইহা যাহাতে পরিপুষ্ট ও সবল হইয়া ইউরোপীয় ভাষার সমকক্ষ হইতে পারে তজ্জন্য যে কোন প্রকার প্রয়াসের বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

এই গ্রন্থ রচনায় আমি যাঁহাদের নিকট বিশেষ সাহায্য ও উপকার লাভ করিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ মেঘনাদ সাহার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বিশ্বকোষের মত জ্ঞানের তুলনা অল্পই আছে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁহার ব্যুৎপত্তি অসামান্য। তিনি আমাকে তাঁহার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দিয়াছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে যেসব মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন তাহা পালন না করিলে গ্রন্থটি ত্রুটীপূর্ণ থাকিয়া যাইত। এই গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ আমাকে প্রথম হইতেই বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন। তিনি যে শুধু ভূমিকা লিখিয়া গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা নহে, সায়েন্স এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সভাপতিরূপে তাঁহার পরামর্শক্রমে এই গ্রন্থের প্রকাশন সম্ভবপর হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ শিশিরকুমার মিত্রের সাহায্য না পাইলে গ্রন্থটি এইরূপ পরিপাটী ও সুচারুরূপে প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত না। অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় রসায়নের ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনায় আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের *History of Hindu Chemistry* সম্প্রতি নূতন করিয়া সম্পাদনা করিয়াছেন এবং পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই আমাকে ইহা পাঠ করিবার সুযোগ দিয়াছেন। আমি ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আমার ঋণ অকপটে স্বীকার করিতেছি।

অন্য যাঁহাদের কাছ হইতে প্রতিনিয়ত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ পুলিনবিহারী সরকার, ডাঃ শান্তিরঞ্জন পালিত, শ্রীভূপতিনাথ চৌধুরী ও প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। আমার স্ত্রী শ্রীকণিকা দেবী পাণ্ডুলিপি সংশোধনের ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছেন এবং গ্রন্থের বিশদ নির্ঘণ্ট-প্রণয়নও তাঁহার সহায়তায় সম্ভবপর হইয়াছে।

এই গ্রন্থ প্রকাশনের ব্যাপারে ভারত সরকার ও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অর্থসাহায্য ও বদান্যতার কথা অন্যত্র কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের অধিকতর প্রচার যাহাতে সম্ভবপর হয় সে বিষয়ে সাম্প্রতিককালে সরকারের আগ্রহ ও উৎসাহ বিশেষ লক্ষণীয়। তাহাদের এইরূপ আগ্রহ, উৎসাহ ও সাহায্য ব্যতীত এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত কিনা সন্দেহ।

পরিশেষে এই গ্রন্থের প্রকাশ অনুমোদন করিবার জন্য ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্সের পরিচালকমণ্ডলীর (কাউন্সিল) নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা
১৪ই চৈত্র, ১৩৬১, ইং ২৮শে মার্চ, ১৯৫৫

লেখক

সূচী

প্রাগৈতিহাসিক কাল : ব্যাবিলন, মিশর, ভারতবর্ষ, মহাচীন প্রভৃতি সভ্যতার প্রাচীনতম কেন্দ্রে বিজ্ঞানের প্রথম বিকাশ

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রীক ও আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞান

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

রোমক ও গ্রেকো-রোমক বিজ্ঞান : প্রাচীন বিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি ও ইউরোপে অন্ধকার যুগের সূচনা

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

আর্ট প্লেট

[আর্টপ্লেট মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট]

প্রাগৈতিহাসিক কাল:
ব্যাবিলন, মিশর, ভারতবর্ষ, মহাচীন প্রভৃতি সভ্যতার প্রাচীনতম কেন্দ্রে বিজ্ঞানের প্রথম বিকাশ

প্রথম অধ্যায়

১·১। বিজ্ঞানের অর্থ—বিজ্ঞান ও সমাজ—বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিকতা

বর্তমান মানব সভ্যতা একান্তভাবেই বিজ্ঞান-নির্ভর। সভ্যতার বিবর্তনে বিজ্ঞানের অবদান ও অংশগ্রহণ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে এককালে যত বিতর্কই থাকুক না কেন, আজ আর সে বিতর্কের বড় একটা অবকাশ নাই। বিজ্ঞান যে এই সভ্যতার মূল ভিত্তি, ইহার অনুশীলন ও বর্তমান পরিণতি ব্যতীত সভ্যতার উদ্ভব যে কল্পনাতীত সে বিষয়ে সব পণ্ডিত ও সব পক্ষই এখন একমত। জড়বাদী সভ্যতার ভাল মন্দ সম্বন্ধে অবশ্যই প্রশ্ন আছে; মানব-সমাজের সম্মুখে ইহা যে সকল সমস্যার ও জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে উদ্বেগেরও অন্ত নাই। কিন্তু ভাল হউক মন্দ হউক, এই জড়বাদী সভ্যতা আজ মানব-সমাজের চরম সত্য, আর সেই সভ্যতার নিয়ামক বিজ্ঞান আজ মানুষের জীবনে অপরিহার্য।

মাত্র দেড়শত বৎসর পূর্বেও রুশ-বিপর্যয়ের পর ভিল্‌নার নিকট হইতে প্যারী প্রত্যাবর্তন করিতে নাপোলিয়োঁর ৩১২ ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল। ১,৪০০ মাইলের এই দূরত্ব রেল-পথে এখন প্রায় ৩০ ঘণ্টায় ও বিমান-পথে চার-পাঁচ ঘণ্টায় অতিক্রান্ত হইতেছে। এই সেদিনও উত্তর ভারতের নানা তীর্থ পর্যটন করিয়া দেশে ফিরিতে যে সময় অতিবাহিত হইত তাহা অপেক্ষা অনেক কম সময়ে রোম, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, স্যান্‌ফ্রান্সিস্‌কো, টোকিও, হংকং ও সিঙ্গাপুরের পথে লোকে এখন পৃথিবী-পরিক্রমা সম্পন্ন করিতেছে।

রোমক সাম্রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধির যুগেও মানুষের গড়পড়তা আয়ুষ্কাল ২৫ বৎসরের বেশী ছিল না। অগ্রসর ইউরোপ ও আমেরিকায় এই আয়ুষ্কাল এখন ৬৫ বৎসর এবং অচিরে শতায়ু হইবার আশাও সে দেশের লোকেরা পোষণ করিতেছে। আমেরিকার একজন সাধারণ নাগরিক যে দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে জীবন ধারণ করিয়া থাকে তাহা মিশরের ফেরোরাও কল্পনা করিতে পারিত না।

একদা এই পৃথিবীর অতীব মুষ্টিমেয় অধিবাসী আহারের অন্বেষণে বন্যপশুর পশ্চাতে সারা দুনিয়া ছুটিয়া হয়রান হইয়া সমষ্টিগতভাবে বহু অভুক্ত দিন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। আজ সেই পৃথিবী ২০০ কোটি মানুষের কলরবে ও কর্মব্যস্ততায় মুখর। স্থানে স্থানে খাদ্যাভাব আছে বটে, কিন্তু বহু লক্ষগুণ বর্ধিত লোকসংখ্যার চাপ ধরিত্রী ত সানন্দেই বহন করিয়া যাইতেছে।

বিশেষ কোন সামাজিক, রাষ্ট্রিক বা রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে মানুষের বাহ্যিক জীবনযাত্রার সুদূরপ্রসারী এই পরিবর্তনসকল সাধিত হয় নাই। বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও তাহার প্রয়োগ এই সব পরিবর্তনের প্রাথমিক ও মৌলিক কারণ। বরং এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে সংহতি ও সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়াছে। সভ্যতা এই সকল প্রকার পরিবর্তনের সম্মিলিত ফল। বিজ্ঞানের প্রয়োগ-জনিত পরিবর্তিত জীবনযাত্রার ও মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সামাজিক, রাষ্ট্রিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন-সাধন যখনই বিলম্বিত হইয়াছে বা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে তখনই সভ্যতার সংকট দেখা দিয়াছে। বর্তমান সভ্যতা এইরূপ এক সংকটের সম্মুখীন। বিজ্ঞানের অতি দ্রুতগতির সহিত সমাজ আজ আর পাল্লা দিতে সক্ষম নয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও তাহার সহিত ক্ষিপ্রতায় আর আঁটিয়া উঠিতেছে না। তাই খাদ্যের অভাব সত্ত্বেও শস্য পোড়াইয়া ফেলিতে হইতেছে; প্রাচুর্য সত্ত্বেও বেকার-সমস্যা উগ্ররূপ ধারণ করিতেছে; বহু কল্যাণকর তৎপরতায় বিজ্ঞানের প্রয়োগের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও রক্তক্ষয়ী ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত

পর্যন্ত আলোড়িত হইতেছে। আপাতদৃষ্টিতে এ সমস্তই বিজ্ঞান-নির্ভর যন্ত্রসভ্যতার অনিবার্য পরিণতি বলিয়া মনে হওয়া অসঙ্গত নহে। কেহ কেহ তাই রব তুলিয়াছেন, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর কিছুদিনের মত এইবার ছুটির প্রয়োজন. নতুবা সবকিছু গণ্ডগোল হইয়া যাইবে। ১৯২৭ সালে বৃটিশ এসোসিয়েশন ফর্ দি অ্যাড্ভান্সমেণ্ট্ অব সায়েন্সের অধিবেশনে বিশপ অব্ রিপণ এইরূপ মন্তব্য করেনঃ—

"....Dare I even suggest, at the risk of being lynched by some of my hearers, that the sum of human happiness outside scientific circles would not necessarily be reduced if for ten years every physical and chemical laboratory were closed and the patient and resourceful energy in them transferred to recovering the lost art of getting on together and finding the formula of making both ends meet in the scale of human life....."*

কিন্তু সত্যই কি বিজ্ঞানীর অবসর গ্রহণের সময় উপস্থিত? এই স্ফীত ও দ্রুত বর্ধমান লোকসংখ্যার খাদ্যসমস্যা সমাধানকল্পে কৃষির যে অধিকতর উন্নতির প্রয়োজন, বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা ব্যতীত তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? কয়লা, পেট্রোলিয়াম, স্বাভাবিক গ্যাস প্রভৃতি শক্তির আধার অমূল্য খনিজ সম্পদ্ ক্রমশঃ নিঃশেষের পথে; বিকল্প শক্তির উৎস আবিষ্কার করিয়া তাহাকে কাজে লাগাইতে না পারিলে যন্ত্র-সভ্যতার চাকা অদূর ভবিষ্যতে একেবারে অচল হইবার আশঙ্কা। হিমযুগে তুষার অগ্রগতির ফলে মানুষ ও প্রাণিজগৎ যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিল, শক্তির অভাবে যন্ত্রযুগের মানুষকে তাহা অপেক্ষাও ব্যাপকতর ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। এ জন্যই বৈজ্ঞানিক তৎপরতার ছেদ বা একটুকু সঙ্কোচন আজ অচিন্তনীয়। ইহাকে বর্তমান সভ্যতার প্রাণস্বরূপ স্বীকার করিতেই হইবে। বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ যে অমিত শক্তির অধিকারী হইয়াছে তাহার অপপ্রয়োগের জন্য যদি কোন সমস্যার উদ্ভব হইয়া থাকে, শান্তি যদি বিঘ্নিত বলিয়া বোধ হয়, তবে সেই অপপ্রয়োগ বন্ধেরই আয়োজন করা কর্তব্য। যে প্রকার মানসিক অবস্থা, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা শক্তির অপপ্রয়োগের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী, শুভবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহারই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। বিজ্ঞানের নবলব্ধ শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে নূতন সম্বন্ধ স্থাপনের মহা শুভক্ষণ আজ সমুপস্থিত।

বিজ্ঞানের সংজ্ঞা

এখন এই বিজ্ঞান বলিতে আমরা কি বুঝি? বিজ্ঞানের প্রকৃত সংজ্ঞা কি? এই প্রশ্নের সর্ববাদিসম্মত সন্তোষজনক উত্তর প্রদান খুবই কঠিন। বিজ্ঞানের সুদীর্ঘ ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ইহার বিভিন্ন অর্থ করা হইয়াছে। আজও বিজ্ঞানের যথার্থ তাৎপর্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তরের শেষ নাই। ওয়েবস্টার তাঁহার অভিধানে ইংরেজী 'Science' শব্দের কয়েকটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার প্রথম ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিজ্ঞান হইল 'তত্ত্ব বা তথ্যের জ্ঞান' (knowledge of principles or facts)। অনেকটা এই অর্থেই ল্যাটিন শব্দ 'Scientia'-র ব্যবহার মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় পণ্ডিতদের রচনায় দেখা যায়। এই অর্থে ধর্মতত্ত্বও বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত, অন্ততঃ সেণ্ট্ টমাস্ অ্যাকুইনাস্ প্রমুখ মধ্যযুগের দার্শনিকগণ তাহাই মনে করিতেন।†

---

* J. D. Bernal, *The Social Function of Science*, London, 1944, p. 2.

† "In the great medieval question : 'Is theology a Science?'....the word Science has this meaning, and is to be specially distinguished from

ওয়েবস্টারের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অনেক বেশী পরিষ্কার ও ইহার ক্ষেত্রও কতকটা সীমায়িত। এই অর্থে বিজ্ঞান হইল, 'সঞ্চিত ও সর্বজনগ্রাহ্য জ্ঞান যাহা সাধারণ সত্যের ও কার্যকরী সাধারণ নীতির আবিষ্কারের ভিত্তিতে সুসম্বদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে।' (Accumulated and accepted knowledge which has been systematized and formulated with reference to the discovery of general truths or the operation of general laws)। এইখানেও বিজ্ঞানের রীতিমত ব্যাপক অর্থ স্বীকার করা হইয়াছে। সুসম্বদ্ধ ও সুশৃঙ্খলিত সর্বজনগ্রাহ্য সকল প্রকার জ্ঞানই বিজ্ঞান; ইহাতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের যেমন স্থান আছে সেইরূপ দর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত। জার্মান 'Wissenschaft' কথাটি অনেকটা এই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অধুনা বিজ্ঞান শব্দটি অবশ্য আরও অনেক সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিজ্ঞান বলিতে এখন আমরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে ও তাহার বিভিন্ন বিভাগ পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, রসায়ন, ভূবিদ্যা, জীববিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, পূর্তবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, মনোবিদ্যা ইত্যাদি ও তাহাদের নানা শাখা-প্রশাখাকেই বুঝিয়া থাকি। *Encyclopaedia Britannica*-য় স্যার উইলিয়ম সেসিল ড্যাম্পিয়ার এই সীমাবদ্ধ অর্থেই বিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যায় বিজ্ঞান হইতেছে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান ('Ordered knowledge of natural phenomena and of their relations between them')। বিজ্ঞানের ইহা অতি সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা বটে, কিন্তু ইহারও মধ্যে একটু ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালীয় রেনেশাঁর অনুকূল আবহাওয়ায় ধীরে ধীরে আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হইয়াছিল এবং তাহার মূলে বিশেষভাবে বিদ্যমান লিওনার্দো, ভেসালিয়াস্, গ্যালিলিও, হার্ভি প্রমুখ রেনেশাঁীয় বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের আদর্শের প্রতি গভীর অনুরাগ। এই নূতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন ফ্রান্সিস্ বেকন; তিনি এই পদ্ধতির এক সুচিন্তিত বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। খাঁটী বেকনীয় পদ্ধতিতে পরবর্তী কালে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পাদিত না হইলেও পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় তিনি যে নূতন উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার প্রভাব অদ্যাপি বর্তমান। সুতরাং বিজ্ঞানকে শুধু 'শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান' বলিয়া অভিহিত করিবার পরিবর্তে বলা উচিত, ইহা প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও তাহাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ-লব্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান।

উপরিউক্ত সংজ্ঞার অপর্যাপ্ততা

এইভাবে দেখিতে গেলে অবশ্য যে বিজ্ঞানকে বুঝায় তাহার ইতিহাস চারিশত কি পাঁচশত বৎসরের অধিক নহে। ইতালীয় রেনেশাঁর সময় ইহার প্রথম লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায় এবং ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতেই ইহার সূত্রপাত। কিন্তু তাই বলিয়া ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে বিজ্ঞান বলিয়া কিছু ছিল না, এইরূপ মনে করিবার মত মারাত্মক ভুল আর কিছুতে হইবে না। বিজ্ঞানের মূল সুদূর অতীতে প্রসারিত। ইউরোপীয় রেনেশাঁর পূর্বে সমগ্র মধ্যযুগে ঐশ্লামিক সভ্যতার আওতায় পশ্চিমে স্পেন হইতে পূর্বে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিরাট ভূখণ্ডের বিভিন্ন জাতিরা আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক তৎপরতার পরিচয়

faith. Do we know that God exists, or do we only believe it? St. Thomas claims that we know this truth, and would know it even if there were no inspired book in which we believe."—Stewart C. Easton, *Roger Bacon and His Search for a Universal Science*, Oxford, 1952.

দিয়াছে। আরব্য বিজ্ঞানের পূর্বে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় হইতে অষ্টম কি নবম শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় সাতশত বৎসর সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র-বিধৌত ভারতবর্ষে ও চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে বিজ্ঞানের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। তাহারও পূর্বে গ্রীকজাতির বিজ্ঞানসাধনা মানব-প্রতিভার এক অতি উজ্জ্বল নিদর্শন। থালেস্ হইতে গ্যালেন পর্যন্ত আটশত বৎসর নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া এই বিজ্ঞান চর্চার গতি অপ্রতিহত ছিল। পিথাগোরাস্, অ্যারিস্টটল্, আর্কিমিডিস্, ইউক্লিড্, হিপার্কাস্, টলেমী, গ্যালেন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের হাতে গণিত, জ্যোতিষ, ভূগোল, চিকিৎসাবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের বিস্ময়কর উন্নতির কথা স্মরণ করিয়াই আলফ্রেড হোয়াইটহেড্ একবার মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে গণিত, বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে আর্কিমিডিস্ যাহা জানিতেন চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ ও পদার্থবিদ্‌গণ বিজ্ঞানের এই সব বিভাগে তাহা অপেক্ষা অনেক কম জানিতেন।*

আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত প্রাক্-রেনেশাঁস বিজ্ঞানের প্রধান প্রভেদ এই যে, আজ যেমন বিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা আছে, ইহার চর্চার যেমন এক বিশেষ পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট হইয়াছে, ইহার কথা উঠিলে যেমন এক বিশেষ ধরনের জ্ঞান ও মননশীলতা বুঝাইয়া থাকে, পূর্বে সেইরূপ কিছু ছিল না। বিজ্ঞান তখন ধর্মতত্ত্ব অথবা দর্শন অথবা এই উভয়ের সহিতই ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। মধ্যযুগে ঐশ্লামিক মধ্যপ্রাচ্যে ও ল্যাটিন ইউরোপে দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই বিজ্ঞানের জীবন স্পন্দিত হইতে দেখা যায়। গ্রীকদের আমলে বিজ্ঞান ছিল দর্শনেরই এক নামান্তর মাত্র। এরূপ অবস্থায় বিজ্ঞানের অর্থ ও লক্ষ্য যে ভিন্নরূপ হইবে তাহা বলা বাহুল্য। বিজ্ঞানকে কেবল তত্ত্ব ও তথ্যের জ্ঞান বলিয়া বুঝাইলেই তখন যথেষ্ট হইত।

বিজ্ঞানের প্রাচীনত্ব

এই কিছুদিন আগেও অধিকাংশ পণ্ডিতের ও প্রত্নতাত্ত্বিকের ধারণা ছিল, গ্রীকদের অভ্যুত্থানের পর অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর অনুরূপ সময় হইতেই প্রকৃত বিজ্ঞান-চর্চার সূত্রপাত। গ্রীকদের পূর্বে জ্ঞান হয়ত ছিল, কিন্তু বিজ্ঞান ছিল না। বিজ্ঞান বলিতে আজ আমরা মোটামুটিভাবে যাহা বুঝি গ্রীক দার্শনিকেরাই তাহার প্রথম সৃষ্টিকর্তা।† সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক ও অন্যাবিধ গবেষণার ফলে এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক প্রমাণিত হইয়াছে। গ্রীকদের অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর কি তাহারও পূর্বে তাইগ্রিস্-ইউফ্রেতিস্, নীলনদ ও সিন্ধুনদ-বিধৌত উর্বর উপত্যকায় যে জাতিরা প্রথম সভ্যতার বুনিয়াদ রচনা করিয়া গিয়াছিল তাহাদের বৈজ্ঞানিক অবদান অবহেলা করিলে ইতিহাসের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সত্যকেই অস্বীকার করা হইবে। যে জাতিদের সুদীর্ঘ পর্যবেক্ষণ ও মননশীলতার গুণে বৎসর, মাস, ঋতু, গ্রহ, রাশিচক্র, গ্রহণ ও গ্রহণের কাল-নির্ণয়, ক্রান্তিবিন্দু ও তাহার অয়নচলন প্রভৃতি দুরূহ জ্যোতিষীয় আবিষ্কার সম্ভবপর হইয়াছিল, যাহাদের তৎপরতায় প্রথম পাটীগণিত, জ্যামিতি ও বীজগণিতের উদ্ভব এবং যে বিদ্যার প্রয়োগ পিরামিডের মধ্য দিয়া আজও প্রতিফলিত, স্বর্ণ, তাম্র, পিত্তল, লৌহ, রৌপ্য, সীসক প্রভৃতি ধাতবদ্রব্য এবং নানাবিধ রং, কাচ, চীনামাটি প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত ও ব্যবহারের দ্বারা যাহারা আশ্চর্য রাসায়নিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছিল তাহাদের কালে বিজ্ঞান ছিল না

* A. N. Whitehead, *Science and Modern World*, Cambridge, 1927.

† "There was knowledge before the Greeks but no Science. Science as we know it was a Greek creation".—H. J. Randall, *The Creative Centuries*, London, 1945, p. 29-42.

এইরূপ উক্তি এখন একেবারেই ভিত্তিহীন। পক্ষান্তরে, প্রাচীন ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় বিজ্ঞানের উপর যে গ্রীক-বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত এই সত্য এখন ক্রমশঃই প্রকাশ পাইতেছে। শুধু তাহাই নহে, বিজ্ঞানের কোন কোন বিভাগে, জ্যোতিষ, পাটীগণিত, বীজগণিত ও রসায়ন শাস্ত্রে প্রাচীন ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয়দের জ্ঞান গ্রীকদের অপেক্ষা অনেক বেশী উন্নত ছিল।

ব্যাবিলন, মিশর ও মহেঞ্জোদড়োর পূর্বে নব্যপ্রস্তর ও প্রস্তর যুগে যে অসভ্য, অসহায় ও আশ্রয়হীন মানবগোষ্ঠী প্রকৃতির সহিত নানাভাবে সংগ্রাম করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছে এবং অগ্নি উৎপাদন, কৃষি, পশুপালন, মৃৎশিল্প, কুটির নির্মাণ প্রভৃতি বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ধীরে ধীরে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকগণ পৃথিবীর সেই আদিম অসভ্য অধিবাসীদের কর্মের মধ্যেও বৈজ্ঞানিক তৎপরতার গন্ধ পাইয়া থাকেন। তাহাদের এই তৎপরতার কোন লিখিত ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু তাহার বহু নিদর্শন, তাহাদের উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত বহু দ্রব্য-সামগ্রী, জীবনযাত্রার উপযোগী নানা উপকরণ ভূগর্ভের স্তরে স্তরে প্রোথিত থাকিয়া সুদূর প্রাগৈতিহাসিক মানুষের অনেক বিচিত্র কথা কালের করাল কবল হইতে আজও সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। এই সব দ্রব্য-সামগ্রী ও উপকরণ অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে পরীক্ষা করিয়া আদিম মানুষের মনের যে পরিচয় উদ্ঘাটিত হইয়াছে তাহাতে একপ্রকার বৈজ্ঞানিক তৎপরতার ছাপ সুপরিস্ফুট। প্রস্তর যুগের যে চিত্রকর গুহা-প্রাচীরে সুনিপুণ হাতে বাইসনের মূর্তি আঁকিয়াছে আর আধুনিককালে যে শিল্পী তুলির আঁচড়ে মোনালিসার হাসি ফুটাইয়া তুলিয়াছে—এই দুই শিল্পীর মধ্যে কোথায় যেন মনের এক আশ্চর্য মিল আছে, যাহা বহু সহস্র বৎসরের ব্যবধানেও অম্লান ও অপরিবর্তিত। আত্মরক্ষা ও জীবন ধারণের উদ্দেশ্যে মানুষ একদা কঠিন প্রস্তরকে নানারূপ অস্ত্র, কুঠার ও লাঙলে রূপায়িত করিয়া উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছিল; অর্ধ লক্ষ বৎসর পরে সেই মানুষের সুযোগ্য বংশধরেরা একই আত্মরক্ষা ও জীবন ধারণের দুর্বার প্রয়োজনে কৃষি, শিল্প, স্থাপত্য, পূর্ত, জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রভৃতি বহুবিধ ও বহুমুখী তৎপরতার মধ্যে সেই চিরন্তন অপরাজেয় মানব-মনীষা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতেছে। এই বিচিত্র, জটিল ও ব্যাপক তৎপরতার প্রধান অবলম্বন মানব-বুদ্ধি ও উদ্ভাবনী শক্তি-প্রসূত যে জ্ঞানকে সাজাইয়া গুছাইয়া নানা ছকে, নানা তালিকায়, নানা সংকেতে, নানা সূত্রে প্রকাশ করিয়া বিজ্ঞান নামে আজ আমরা অভিহিত করিয়া থাকি, সেইরূপ সাজানো গুছানো কোন লিপিবদ্ধ বিজ্ঞান প্রস্তরযুগের মানুষের কল্পনাতীত হইলেও মানসপটে সদা-জাগ্রত যে অলিখিত জ্ঞান তাহার সকল কর্মকে অনুপ্রাণিত ও সার্থক করিয়াছে তাহাও বিজ্ঞানের মর্যাদা দাবী করিতে পারে বৈ কি।

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে বিক্ষিপ্ত নানা দ্বীপে, আফ্রিকার জঙ্গলে এখনও নানা অসভ্য বর্বর জাতির বাস আছে। ইহারা কোনরূপ সভ্যতার সংস্পর্শে আসে নাই। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ এই সব আদিম অধিবাসীদের আচার-ব্যবহার পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, একপ্রকার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ইহাদের মধ্যেও বর্তমান। বর্বরদের মধ্যেও যে চিন্তানায়ক, দার্শনিক, ভবিষ্যৎবেত্তা ও আবিষ্কারক জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ড্রাইবের্গ তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। বর্বররা প্রকৃতির সহিত নিজেদের যে শুধু খাপ খাওয়াইয়াই চলিতে জানে তাহা নহে, প্রয়োজনমত অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের প্রকৃতিকেও কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়া লইতে দেখা গিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, ভূমির উর্বরতাবৃদ্ধি ও ভূমিক্ষয় প্রতিরোধের জন্য জলসেচ ও বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তাবোধ বর্বর জাতির মধ্যে ব্যাপক। বিশুদ্ধ পানীয় জলের উৎস খুঁজিয়া বাহির করিবার নানা কৌশল ইহাদের করায়ত্ত। বনের পশু-পাখীকে ইহারা একান্ত ন্যায়সঙ্গত কারণেই অতি মূল্যবান সম্পদ বলিয়া মনে করে এবং এই শিকার-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নানা তৎপরতা ও কৌশল অবলম্বন করিতে তাহাদের দেখা যায়। এই সব

আবিষ্কারের পশ্চাতে যে দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণ, চিন্তা ও মননশীলতা ও একপ্রকার বিজ্ঞানের ইতিহাস আছে তাহা অনস্বীকার্য। বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিক ম্যালিনওস্কি লিখিয়াছেন,—

"....a moment's reflection is sufficient to show that no art or craft however primitive could have been invented or maintained, no organized form of hunting, fishing, tilling, or search for food could be carried out without the careful observation of natural process and a firm belief in its regularity, without the power of reasoning and without confidence in the power of reason; that is, without the rudiments of Science." *

তাই বলিতেছিলাম, বিজ্ঞানের মূল সুদূর অতীতে প্রসারিত। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পর হইতেই এই বিজ্ঞানচর্চা সুরু হইয়াছে। ধাপে ধাপে তাহার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি পাইয়া আধুনিক বিজ্ঞানে সার্থক পরিণতি লাভ করিয়াছে। আদিম যুগে খাদ্যান্বেষণে বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় উদ্ভিদ্ ও প্রাণিজগতের সহিত প্রথম পরিচয়ের সূত্র ধরিয়াই কালক্রমে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, জীববিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যার উদ্ভব হইয়াছে। মাথার উপরে চন্দ্র-সূর্য-উদ্ভাসিত ও নক্ষত্রখচিত মহাকাশ আর পদতলে কঠিন নীরস ক্ষমাহীন পৃথিবীর সহিত প্রথম পরিচয়ের পর্ব হইতেই জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূবিদ্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সূত্রপাত। এই কারণে বিজ্ঞানের ইতিহাস বস্তুতপক্ষে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে অভিন্ন। ক্রমবিকাশের নিয়মে পশুর পর্যায় হইতে মানুষে উন্নীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার যে বিরাট মানসিক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, সেই পরিবর্তনবলে প্রকৃতির সহিত মানুষের এক সম্পূর্ণ নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। নূতনভাবে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সে প্রকৃতিকে বুঝিবার চেষ্টা করে। এই চেষ্টা হইতে যেমন ক্রমে সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল সেইরূপ বিজ্ঞানের জন্মও এই চেষ্টার মধ্যে।

বিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা

এই সত্যকে স্বীকার করিয়া এক কথায় বিজ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশ করিতে হইলে মিঃ ক্রাউথারের কথায় বলিতে হয়, বিজ্ঞান এমন এক ধরনের তৎপরতা যাহার সাহায্যে মানুষ প্রতিবেশের উপর আধিপত্য লাভ করিতে পারে।

"Science is the system of behaviour by which man acquires mastery of his environment. His evolution from an animal into a man was accomplished by a new attitude towards nature, in which he began to study the contents of his environment in order to use them to his advantage. His initiation of this activity brought science into existence...." †

বিজ্ঞানের ইহা অপেক্ষা অধিকতর সন্তোষজনক ও ব্যাপক সংজ্ঞা আর কি হইতে পারে? যে কোন কালের যে কোন যুগের বৈজ্ঞানিক তৎপরতা ইহার দ্বারা বুঝানো সম্ভবপর। প্রস্তরযুগ হইতে বর্তমান আণবিক যুগ পর্যন্ত বিজ্ঞানের যে ধারা অব্যাহত আছে তাহার ইতিহাস বুঝিতে হইলে এইভাবেই বিজ্ঞানের অর্থ করিতে হইবে। এবং এই অর্থগ্রহণ করিয়াই বর্তমান গ্রন্থের পরিকল্পনা।

বিজ্ঞান ও সমাজ

প্রতিবেশের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা হইতে বিজ্ঞানের উদ্ভব,

* Bronislaw Malinowski, *Magic, Science and Religion,* Beacon Press, Boston, Massachusetts, 1948.

† J. G. Crowther, *The Social Relations of Science*, Macmillan, 1941, p. 1.

এই কথা স্বীকার করিলে সমাজ বিবর্তনে বিজ্ঞানের ও বিজ্ঞানের বিবর্তনে সমাজের অনিবার্য প্রভাব আপনা হইতেই স্বীকৃত হয়। মানুষের প্রয়োজনেই বিজ্ঞান, সেই প্রয়োজন মিটাইবার মধ্যেই তাহার চরম সার্থকতা। আয়োনীয় ও তাহার কিছু পরে আণবিক মতবাদে বিশ্বাসী এপিকিউরীয় দার্শনিকেরা এই সত্য প্রথম উপলব্ধি করেন। বেকনীয় দর্শনের মূলমন্ত্র 'উপযোগিতা' ও 'প্রগতি' দুইই একসূত্রে গাঁথা। বেকন সম্বন্ধে রচিত সন্দর্ভে মেকলে একবার লিখিয়াছিলেন,—"বেকনীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য কি? তাঁহার নিজের জোরাল ভাষায় বলিতে গেলে, ইহা হইতেছে 'ফল'। মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি ও তাহার দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটানোই ইহার উদ্দেশ্য। ....মানুষকে নূতন পদ্ধতি, নূতন যন্ত্র ও নূতন পথের সন্ধান দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিজ্ঞানের নানা বিভাগে, প্রাকৃতিক দর্শনে, আইন প্রণয়নে, রাজনীতিতে মানুষের যত চিন্তা, যত ভাবনা...বেকনের কোন শিষ্যকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তাঁহার নূতন দর্শন মানুষের কোন উপকারে আসিয়াছে, সে তৎক্ষণাৎ জবাব দিবে,—ইহা আয়ুষ্কাল দীর্ঘতর করিয়াছে, বেদনা লাঘব করিয়াছে, রোগ জয় করিয়াছে, ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করিয়াছে, নাবিককে নূতন নিরাপত্তা দিয়াছে, যোদ্ধাকে দিয়াছে নূতন অস্ত্র, বড় বড় নদী ও মোহানার উপর সেতু নির্মাণ করিয়াছে, রাত্রিকে দিনের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছে;..... .নূতন দর্শনের ইহা আংশিক ও প্রাথমিক অবদান মাত্র। এই দর্শনের বিরাম নাই, পরিণতি নাই, সম্পূর্ণতা নাই। ইহার নিয়ম প্রগতি। কাল যাহা অদৃশ্য ছিল আজ তাহা লক্ষ্য এবং আগামীকাল তথা হইতেই যাত্রারম্ভ।"

সমাজের প্রয়োজনে বিজ্ঞান, একথা কিন্তু আর একদল লোক স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে বিজ্ঞান বিশুদ্ধ মননশীলতারই এক প্রকাশ মাত্র। কৌতূহল ইহার প্রধান অনুপ্রেরণা। যেমন আর্টের জন্য আর্ট, সেইরূপ বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞান। ইহা কোন উদ্দেশ্য বা সামাজিক স্বার্থ-প্রণোদিত নহে। ইহার প্রয়োগ হইতে মনুষ্যসমাজ যদি উপকৃত হইয়া থাকে তবে তাহা নিতান্তই গৌণ ঘটনা। এইরূপ উপকার না হইলেও বিজ্ঞানের সার্থকতা ক্ষুণ্ণ হয় না। ইহা নিজের দাবীতেই সুপ্রতিষ্ঠিত। সাহিত্য, শিল্প-কলা ও দর্শনের মত বিজ্ঞানও মানুষের উদ্ভাবনী মনের এক বিশেষ অভিব্যক্তি। প্লেটো এইরূপভাবে বিজ্ঞানকে দেখিয়াছিলেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই অভিমতেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান কালেও ইহার সমর্থকদের অভাব নাই। এডিংটন, হোয়াইটহেড্, ডীন ইন্‌জ্, বিশপ অব্ বার্মিংহাম্ প্রভৃতি বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ বিজ্ঞানকে বিশুদ্ধ মননশীলতার পর্যায়ে ফেলিয়া সমাজের সহিত ইহার সম্পর্কের প্রশ্নকে একেবারে অস্বীকার না করিলেও সম্পূর্ণ অবান্তর মনে করেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, জন্মমৃত্যুর রহস্য প্রভৃতি গূঢ় প্রশ্নের ও জটিল রহস্যের কিনারা করাই বিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সমাজের সহিত সম্পর্ক ঠিক বিজ্ঞানের নহে, এই সম্পর্ক ফলিত বিজ্ঞানের সহিত এবং ফলিত বিজ্ঞান বা কারিগরিবিদ্যা বা টেক্‌নলজি প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান-পদবাচ্য নহে।

অধ্যাপক জে. ডি. বার্নাল এই মতের সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, * ব্রহ্মাণ্ড, জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি-রহস্য প্রভৃতি দুর্জ্ঞেয় বিষয়ের গবেষণা যদি বিজ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য হইত, তবে বিজ্ঞান বলিয়া যে বস্তুকে আজ আমরা জানি তাহার কোনদিনই উদ্ভব হইত না। বিজ্ঞানের ইতিহাসের প্রতি সামান্য মনোযোগ দিলেই দেখা যাইবে যে, নিতান্ত পার্থিব যন্ত্রপাতির ব্যবহারের দ্বারা ও মানুষের পার্থিব প্রয়োজনের প্রেরণায় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ সম্ভবপর হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও উপরিউক্ত মতবাদের ব্যাপক ও দীর্ঘকাল যাবৎ সমর্থন লাভের প্রধান কারণ মানুষের কারিগরি তৎপরতা ও আবিষ্কারসমূহের ইতিহাসের প্রতি বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকদের ঔদাসীন্য। তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের ইতিহাস ও তাহার গুণাগুণ কীর্তনের ফলেই এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি ও স্থায়িত্বলাভ হইয়াছে।

* *The Social Function of Science*, p. 5-6.

বিজ্ঞানের স্বরূপ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই মতবৈষম্যই ক্রমশঃ এখন বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মতবৈষম্যে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপরিউক্ত দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই কিছু কিছু সত্য আছে। কিন্তু কোনটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। সমাজ ও বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অস্বীকার করা যেমন বাতুলতা, সেইরূপ বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মানুষের চিরন্তন কৌতূহল ও উদ্ভাবনী মননশীলতার অংশ অস্বীকার সত্যেরই অপলাপ।

বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিকতা

বিজ্ঞানের একটি অতি আশ্চর্য আন্তর্জাতিক ও সার্বজনীন রূপ আছে, যাহা জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। বিজ্ঞান সুরু হইতেই সার্বজনীন, সমগ্র মানবের সাধারণ সম্পদ। ইহার ধারা পৃথক পৃথক ভৌগোলিক ক্ষেত্র হইতে উৎসারিত হইয়া শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিজ্ঞানের মহাসমুদ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই ধারা কোথাও বড়, কোথাও ছোট, কখনও স্ফীত ও দুই কূলপ্লাবী, কখনও বা একেবারে শুষ্ক ও মৃত, প্রাচীন গৌরবের ক্ষীণ সাক্ষী মাত্র। কিন্তু বিশ্ববিজ্ঞানের মহাসমুদ্র-রচনায় প্রত্যেকটি ধারার একটি বিশিষ্ট অবদান আছে।

আধুনিক বিজ্ঞান ইউরোপীয়, বিশেষতঃ পশ্চিম ইউরোপীয় জাতিদের প্রধান কীর্তি, ইহা বহুলাংশে সত্য। এই সত্যের অতিরঞ্জনের ফলে একদল ঐতিহাসিকের বিবেচনায় কিছুদিন আগেও বিজ্ঞান বলিতে কেবল পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানকেই বুঝাইত। এই বিজ্ঞানের মূল প্রেরণা অবশ্য গ্রীক-বিজ্ঞান। গ্রীক-বিজ্ঞানের ঐশ্বর্যের কথা ল্যাটিন ইউরোপ প্রথম জানিতে পায় আরব্য বিজ্ঞানের মাধ্যমে। এজন্য অধিকাংশ ইউরোপীয় গ্রন্থকার কর্তৃক রচিত বিজ্ঞানের ইতিহাসে ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারার বিবর্তনের আলোচনায় আমরা দেখি গ্রীক বিজ্ঞানের এক দীর্ঘ ভূমিকা ও প্রসঙ্গক্রমে আরব্য বিজ্ঞানের সামান্য একটু উল্লেখ। ইহাতে ভারতীয় ও চৈনিক বিজ্ঞানের নামগন্ধও নাই। উইলিয়ম হেওয়েলের *L'Histoire des Sciences inductives* ও জে. বি ব্যরির *Idea of Progress* এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অথচ গ্রীকদের পূর্বে সুদীর্ঘ দুই হাজার বৎসরব্যাপী যে বৈজ্ঞানিক তৎপরতার কথা আমরা এখন জানি এবং যাহা হইতে গ্রীক বিজ্ঞান উদ্ভূত, সেই তৎপরতার লীলাক্ষেত্র ছিল প্রাচ্য দেশ, তাহার নায়করা ছিল অ-ইউরোপীয় জাতিদের বংশধর। গ্রীক ও রোমকদের পতনের পর এক হাজার বৎসর যাবৎ ইউরোপখণ্ডে (অবশ্য ঐশ্লামিক স্পেনকে বাদ দিয়া) জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার যখন কোন বালাই ছিল না, ইউরোপ যখন অজ্ঞতার নিবিড় অন্ধকারে নিমজ্জিত, প্রাচ্য তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত। ভারতবর্ষে, মহাচীনে ও ঐশ্লামিক মধ্যপ্রাচ্যে, অর্থাৎ সমগ্র এসিয়ায়, তখন এক অখণ্ড জ্ঞানরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত। বসুবন্ধু, ঈশ্বরকৃষ্ণ, দিঙ্‌নাগ, কুমারজীব, বুদ্ধঘোষ প্রমুখ বৌদ্ধ দার্শনিকগণ প্রাচ্যে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন প্রচারে তৎপর; আর্যভট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্‌গণ এই সময়ে ভারতীয় গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন; নাগার্জুন, বাগ্‌ভট, মাধবকর, বৃন্দ, চক্রপাণিদত্ত ও শার্ঙ্গধর চিকিৎসাবিদ্যা ও রসায়নের বহু উন্নতিসাধন করিতেছেন। মহাচীনে চিন্ লোচি, হো চেন তিয়েন, সু চুংচি, সিয়া-হু উং, চেন-লুয়ান, চ্যাং চিউ-চিয়েন প্রমুখ চৈনিক গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদগণ দুরূহ গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত; ফাহিয়ান, হুয়েন সাং, ওয়াং হুয়ান্-সে, ইৎ সিং প্রমুখ চৈনিক পর্যটক ও ভৌগোলিকগণ বিচিত্র প্রাচ্য দেশসমূহের বিভিন্ন জাতি, তাহাদের ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করিয়া অপূর্ব ভ্রমণ কাহিনী ও ভৌগোলিক গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। সেই দেশের কারিগর ও বিজ্ঞানীরা এই সময় উদ্ভাবন করিয়াছেন মুদ্রণ-প্রণালী ও মুদ্রণ-যন্ত্র, কাগজ, কম্পাস,

একটা প্রধান বাণিজ্য-সরক।* হেলেনীয় জগৎ ছাড়া রোম, সিংহল, চীন, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশের সঙ্গেও ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। নাগার্জুনিকোণ্ডা লিপি ও 'মিলিন্দা পান্‌হো' নামে মিনাণ্ডার সম্বন্ধে রচিত এক বৌদ্ধ গ্রন্থে ভারতের এই বহির্বাণিজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের সুযোগ গ্রহণ করিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ দার্শনিক ও চিকিৎসকগণ এই সময় মাঝে মাঝে যবনদের দেশে গিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন, চিকিৎসা ও অন্যান্য বিদ্যার কথা প্রচার করিতেন। এমন কি এথেন্সেও এই সময় ভারতীয় দার্শনিকদের উপস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে ভারতীয়রাও গ্রীকদের শিল্পকলা ও জ্যোতির্বিদ্যার উন্নতি সম্বন্ধে অবহিত হইয়া গ্রীকদের এই সব বিদ্যার প্রতি সম্ভ্রমশীল হইয়াছিল। গ্রীক শিল্পকলা ভারতীয় শিল্পকলার উপর যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল গান্ধার শিল্পকলা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হিন্দু জ্যোতিষের উপর গ্রীক জ্যোতিষের প্রভাব সুস্পষ্ট। তারপর গ্রীকদের উন্নততর মুদ্রা-প্রণয়ন-পদ্ধতিও ভারতীয় মুদ্রা-শিল্পকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সম্ভবতঃ কিছু কিছু যান্ত্রিক জ্ঞানও এই সময় ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে পৌঁছিয়া থাকিবে। এই সম্পর্কে এদেশে জলচাকার (water-mill) প্রবর্তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেট্রোডোরাস্ নামে জনৈক গ্রীক এই যন্ত্রটি এদেশে প্রথম প্রবর্তন করেন।†

কুষাণদের সময় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তার

খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে গ্রীক ও পার্থিয়ানরা যখন ভারতের দিকে আধিপত্য বিস্তারে ব্যস্ত, মধ্য-এসিয়ার বিভিন্ন যাযাবর ও অর্ধসভ্য জাতিদের মধ্যে তখন এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে যাহার প্রতিক্রিয়া শীঘ্রই ভারতবর্ষে অনুভূত হয়। নান শান পর্বতের সানুদেশে পশ্চিম কান্‌সু অঞ্চলে ইউ-চি নামে এক প্রাচীন জাতির বাস ছিল; ইহাদের ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৭৫ অব্দের কিছু পরে হূনদের আক্রমণে ইউ-চি জাতি তাহাদের আদি বাসভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া নূতন বাসভূমির অন্বেষণে অক্সাস উপত্যকার অভিমুখে অগ্রসর হয়। তখন অক্সাস উপত্যকায় শক জাতির আধিপত্য। ইউ-চিদের আক্রমণ রোধে অসমর্থ হইয়া শকরা অক্সাস-উপত্যকা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয় এবং ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সিন্ধু-উপত্যকার দক্ষিণভাগে বসতি স্থাপন করে। এদিকে ইউ-চিরা অক্সাস-উপত্যকায় অল্পকালের মধ্যে এক অতি শক্তিশালী রাজ্য গড়িয়া তোলে। ইউ-চিদের এক প্রবল শাখা কুষাণরা খ্রীষ্টাব্দ প্রথম শতকে উত্তর-পশ্চিম ভারতের দুর্বল গ্রীক, পার্থিয়ান ও শক অধিপতিদের একে একে পরাভূত করিয়া অক্সাস হইতে ভারতবর্ষ পর্যন্ত এক বিরাট ও শক্তিশালী কুষাণ সাম্রাজ্য স্থাপন করে। সর্বশ্রেষ্ঠ কুষাণ সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বকাল প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

ইউ-চিরা উন্নত বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিবার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহের পরিচয় দিয়াছে। চীনের প্রতিবেশী হিসাবে তাহারা প্রথম চৈনিক সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়; অক্সাস-উপত্যকায় বসতি স্থাপনের পর আমরা তাহাদের ইরাণীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিতে দেখি। ভারতবর্ষে আগমনের পর তাহারা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রস্রবণে পরিপূর্ণভাবে অবগাহন করে। কুষাণদের আমলে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটিয়াছিল। অশোক বৌদ্ধ ধর্মের বিতর্কমূলক বিষয় আলোচনার জন্য পাটলিপুত্রে

* George Macdonald, 'The Hellenic Kingdoms of Syria, Bactria and Parthia', *Cambridge History of India*, Vol. I, pp. 433-34.

† Joseph Needham, *Science and Civilisation in China*, Vol. I, Cambridge University Press, 1954, p. 177.

২

বৌদ্ধদের যেরূপ সভা আহ্বান করিয়াছিলেন কনিষ্কও সেইরূপ বসুমিত্রের পৌরহিত্যে কাশ্মীরের কুন্দলবন নামক স্থানে বৌদ্ধদের এক সভা আহ্বান করেন। এই সভায় বৌদ্ধ প্রধানগণ বৌদ্ধ-ধর্মের এক প্রামাণিক টীকা প্রণয়ন করেন।

ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্মের এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার কুষাণদের আর এক প্রধান তৎপরতা। গ্রীক ও পার্থিয়ানদের রাজনৈতিক প্রাধান্যের সময় বৌদ্ধধর্ম যেমন বক্ষুয়ানায় ও সোগ্দিয়ানায় প্রসারলাভ করিয়াছিল, কুষাণদের সময় বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি সেইরূপ মধ্য-এসিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের নানা অর্ধসভ্য জাতি ও উপজাতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক হইতে দলে দলে বহু ভারতীয় ভিক্ষু ও ধর্মপ্রচারকদের মধ্য-এসিয়ার খোটান, খাস্গার, ইয়ারকন্দ প্রভৃতি স্থানে আগমন ও সেই সব স্থানে তাহাদের ধর্মীয় তৎপরতার বহু বৃত্তান্ত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

এই প্রচার কার্যে ভারতীয়রা নিঃসঙ্গ ছিল না। মধ্য-এসিয়ার ইউ-চি ও কুচি রাজ্যের একাধিক বৌদ্ধ পণ্ডিত ভারতীয় প্রচারকদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ধর্মরক্ষ ও কুমারজীবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইউ-চি ধর্মরক্ষ (৩য় শতাব্দীর শেষ ও ৪র্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) চীন সীমান্তে অবস্থিত টুনহুয়াং নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ভারতীয় পণ্ডিতদের কাছে শিক্ষালাভ করেন। তিনি সংস্কৃত ও চৈনিক ভাষা সমেত ছত্রিশটি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। বৌদ্ধধর্মে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শুধু স্বদেশেই নহে, চীনদেশেও বৌদ্ধধর্ম প্রচারে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত হইতে চৈনিক ভাষায় বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ তিনি তর্জমা করেন।

মধ্য-এসিয়ার আর একজন বৌদ্ধ নেতা কুমারজীবের (৪র্থ শতাব্দীর শেষ ও ৫ম শতাব্দীর প্রথম ভাগ) পিতা ছিলেন ভারতীয় ও মাতা কুচি-রাজবংশীয়া। তিনি কাশ্মীরে বন্ধুদত্তর নিকট বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন শিক্ষা করেন। মধ্য-এসিয়ায় তাঁহার পাণ্ডিত্য-খ্যাতি এরূপ ব্যাপক ছিল যে, এই অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান হইতে, এমন কি সুদূর ভারতবর্ষ ও চীন হইতে পর্যন্ত পণ্ডিত, দার্শনিক ও বিদ্যার্থিগণ তাঁহার নিকট উপনীত হইতেন। কুচি ও চীনের রাজনৈতিক বিরোধের সময় কুমারজীব চীনাদের হাতে বন্দী হইয়া ৪০১ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে প্রেরিত হন এবং সেই দেশে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন প্রচারের সুযোগ পান। তিনি ১২ বৎসর চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারে ও বৌদ্ধ গ্রন্থাদি সংস্কৃত হইতে চৈনিক ভাষায় তর্জমা-কার্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং চীন-ভারত সাংস্কৃতিক মৈত্রীর এক প্রশস্ত পথ উন্মুক্ত করেন। ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগ্চী কুমারজীব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

> "Kumarjiva symbolises the spirit of cultural collaboration between Central Asia and India and the joint effort made by the Buddhist scholars of these countries for the dissemination of Indian culture in China."*

এইভাবে ক্যাস্পিয়ান সাগরের তীর হইতে চীনের প্রাচীর পর্যন্ত মধ্য-এসিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের বহু যাযাবর জাতি ও উপজাতির মধ্যে এই সময় বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র-বৃহৎ জনপদের অসংখ্য বৌদ্ধ স্তূপে ও বিহারে ভারতীয় ও মধ্য-এসীয় পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন-চর্চায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। এইসব অঞ্চলে বৃহৎ সংখ্যায় ভারতীয়দের উপনিবেশ স্থাপনেরও বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আজ অবশ্য এই অতীত তৎপরতার অতি অল্প নিদর্শনই বর্তমান আছে। পরবর্তীকালের ঘটনা-স্রোতের আবর্তে, বিশেষতঃ মধ্য-এসিয়ার অগ্রসরমান মরুভূমির কবলে পতিত হওয়ায় এই সব একদা বর্ধিষ্ণু জনপদের অধিকাংশই এখন নিশ্চিহ্ন। তবে মরুভূমি

* P. C. Bagchi, *India and China*, China Press Limited, 1944, pp. 36-38.

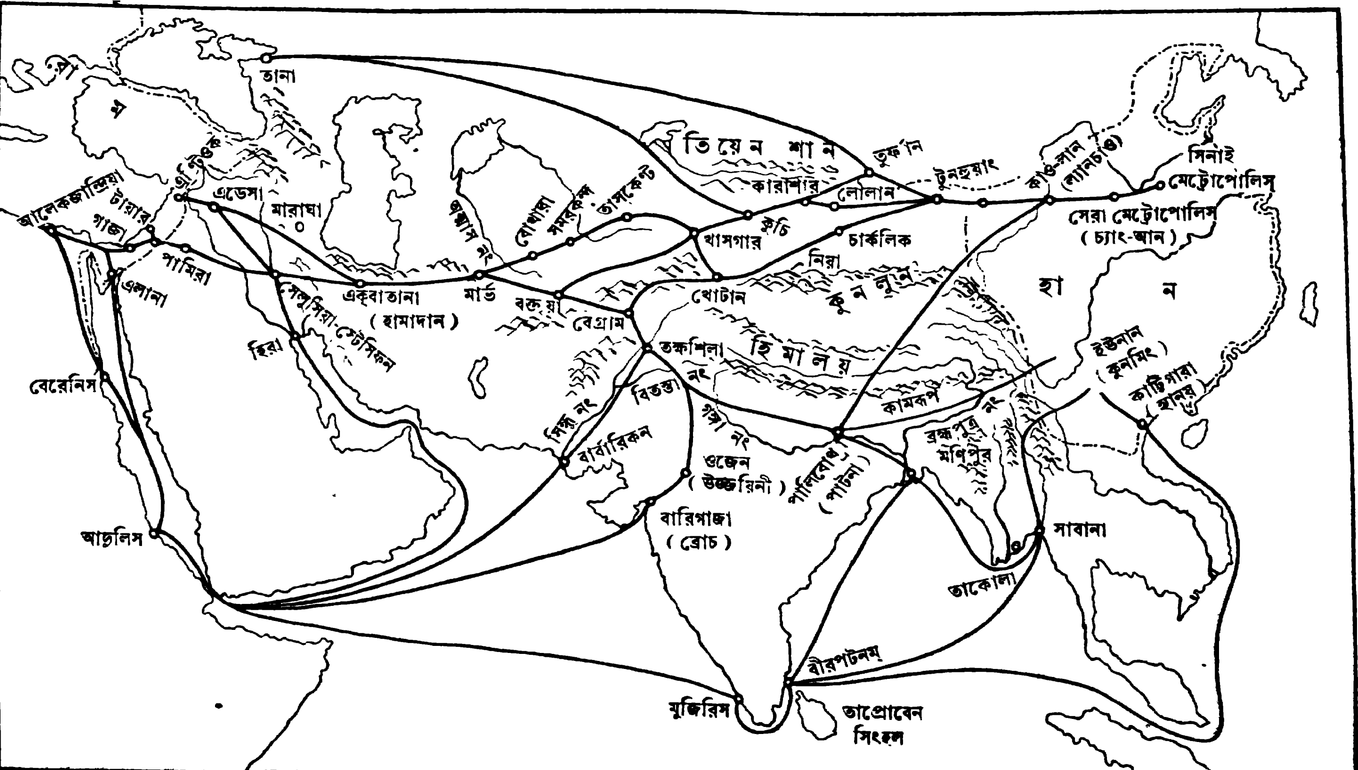
গ্রাস করিয়াও আবার প্রাচীন ঐতিহ্যের কিছু কিছু সাক্ষ্য সযত্নে রক্ষা করিয়াছে। স্যার অরেল্ ষ্টাইন্ লোলান, পূর্ব-তুর্কীস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রত্নতত্ত্বীয় খনন-কার্য পরিচালনা করিয়া বালুরাশির মধ্যে প্রোথিত বহু বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহারের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। এইসব ধ্বংসস্তূপ হইতে তিনি বুদ্ধের ও হিন্দু দেব-দেবীর কতকগুলি প্রতিমূর্তি এবং ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর খরোষ্ঠী ভাষায় রচিত কয়েকটি পাণ্ডুলিপির অংশ উদ্ধার করিয়াছেন। লেফ্‌টেন্যান্ট এ. বাওয়ের চৈনিক তুর্কীস্তানের একটি বৌদ্ধ স্তূপ হইতে সাতখানি প্রাচীন পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'নাবনীতক' নামক ভারতীয় চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পাণ্ডুলিপিটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার কথা পরে আলোচিত হইবে। উপরিউক্ত প্রত্নতত্ত্বীয় খনন-কার্যের অভিজ্ঞতা হইতে স্যার অরেল ষ্টাইন মন্তব্য করিয়াছেন, এই সব ধ্বংস-স্তূপ দেখিয়া মনে হয় যেন আমরা পাঞ্জাবের কোন অবলুপ্ত প্রাচীন সহরের সন্ধান পাইয়াছি। মধ্য-এসিয়ার অধিবাসীদের উপর এরূপ গভীরভাবেই একদিন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছাপ পড়িয়াছিল। এমন কি সপ্তম শতাব্দীতে এই পথে চীন হইতে ভারতবর্ষে আগমন ও প্রত্যাবর্তনের সময় হুয়েন সাং এই অঞ্চলে তখনও ভারতীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করেন। অনেকের ধারণা, ত্রয়োদশ শতাব্দীর মঙ্গোল দিগ্বিজয়ী চেঙ্গীস্-খানও সম্ভবতঃ এক ধরনের বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন।*

ভারত ও চীন

আমরা টুনহুয়াং অধিবাসী ইউ-চি ধর্মরক্ষর ও কুচিবংশীয় কুমারজীবের চীনে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন প্রচারের কথা উল্লেখ করিয়াছি। বস্তুতঃ মধ্য-এসিয়ার বৌদ্ধদের মাধ্যমেই চীনদেশ প্রথম ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা অবগত হয়। তারপর অবশ্য ভারতীয় পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ দলে দলে কাশ্মীর, মধ্যভারত ও নালন্দা হইতে মহাচীনে গিয়াছেন এবং চৈনিক পরিব্রাজকগণও দুর্গম গিরি কান্তার মরু ও দুস্তর সমুদ্র পার হইয়া বুদ্ধের দেশে আগমন করিয়াছেন। এই দুই মহাদেশের সাংস্কৃতিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত ভাব বিনিময়ের আলোচনার পূর্বে এই সময় স্থলপথে ও জলপথে চীন, ভারতবর্ষ ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে যাতায়াতের কিরূপ বন্দোবস্ত ছিল তাহার সহিত কিছু পরিচয় থাকা আবশ্যক। বিশেষতঃ যে সব পথে চৈনিক রেশম চালান দেওয়া হইত তাহার গুরুত্ব খুবই বেশী। রেশম-চালানোর পথে শুধু রেশম ও অন্যান্য বাণিজ্য-সম্ভারই যে শুধু যাতায়াত করিয়াছে তাহা নহে, এই পথে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারার আদান-প্রদানও ঘটিয়াছিল বিস্তর।

বক্ত্রিয়ানা, পারস্য ও সোগ্‌দিয়ান্যার পথে ভারতবর্ষের সহিত মধ্যপ্রাচ্যের ও ইউরোপের বাণিজ্যিক যোগাযোগের সুপ্রাচীনত্বের কথা একাধিকবার আলোচিত হইয়াছে। আরও পূর্বে মধ্য-এসিয়ার পথে সুদূর চীন পর্যন্ত এই যোগাযোগের বিস্তৃতি সম্ভবপর হয় আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে ইউ-চি ও কুষাণদের রাজনৈতিক প্রাধান্যের সময়। এই সম্পর্কে চ্যাংকি'য়েন নামে এক চৈনিক রাষ্ট্রদূতের মধ্য-এসিয়ায় এক রাজনৈতিক দৌত্য ও ভৌগোলিক অভিযান পরিচালনার বৃত্তান্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইউ-চি রাজ্যের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি খ্রীঃ ১৩৮ পূর্বাব্দে এই অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। নানা কারণে অভিযানের মূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলেও চ্যাংকি'য়েনের অভিযান শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় নাই। খ্রীঃ ১২৬ পূর্বাব্দে চীনে প্রত্যাবর্তন করিয়া সম্রাটের নিকট তাঁহার দৌত্যের বিবরণ প্রদান প্রসঙ্গে তিনি পার্থিয়া, বক্ত্রিয়া, ফার্‌ঘানা, সোগ্‌দিয়ানা, সেলুকিড মিডিয়া ও সিরিয়া এবং সম্ভবতঃ মিশর সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য জ্ঞাপন করেন। বক্ত্রিয়ায় অবস্থান-

* Majumdar, Raychaudhuri and Datta, *An Advanced History of India*, p. 213.



১। এসিয়ার মধ্য দিয়া রেশম ও বাণিজ্য চলাচলের প্রধান প্রধান পথ।

কালে সেখানকার স্থানীয় বাজারে তিনি চীনের সেচুয়ান প্রদেশে উৎপন্ন বাঁশের লাঠি ও সুতীবস্ত্র বিক্রয় হইতে দেখেন। অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, এইসব দ্রব্য চীন হইতে ভারতবর্ষের পথে বক্ষুয়ায় চালান দেওয়া হইত এবং পূর্ব-ভারত (আসাম) ও দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ বিদ্যমান। চ্যাংকি'য়েন লিখিয়াছেন :—

"When I was in Ta-Hsia (Bactria), I saw there a stick of bamboo from Chiung (Chiungchow in Szechuan), and some cloth from Shu (Szechuan). When I asked the inhabitants of Ta-Hsia how they had obtained possession of these, they replied, 'The people of our country buy them in Shen-Tu' (India)."*

চ্যাংকি'য়েনের বিবরণ-পাঠে সম্রাট মধ্য-এসিয়ার রাজ্যগুলির সহিত চীনদেশের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত হন। ইহার পর হইতে এইসব দেশে নিয়মিতভাবে রাষ্ট্রদূত প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। তারপর এই ঘটনার অল্পকালের মধ্যে চৈনিকেরা পশ্চিম সীমান্ত হইতে হূনদের হটাইয়া দিলে চীন ও মধ্য-এসিয়ার মধ্যে সহজ বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। স্থলপথে চীনের রেশম-রপ্তানী বাণিজ্যের সূত্রপাতও এই সময় হইতে (খ্রীঃ পূঃ ১০৬)। চ্যাংকি'য়েনের অভিযানের এই সুদূর-প্রসারী ফল লক্ষ্য করিয়াই জোসেফ নীডহ্যাম তাঁহাকে 'চৈনিক লিভিংস্টোন' আখ্যা দিয়াছেন।

এই ভাবে মধ্য-এসিয়ার পথে চীনের সহিত ভারতবর্ষ, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের যেসব বাণিজ্যিক সরক উন্মুক্ত হয়, তাহা মানচিত্রে দেখানো হইল। হাডসনের মানচিত্র অবলম্বনে ইহা রচিত হইয়াছে।† চীন হইতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে হইলে প্রথমেই পড়িবে চীনের সীমান্তবর্তী বিখ্যাত জনপদ টুনহুয়াং। ইউ-চি ধর্মরক্ষর জন্মস্থান হিসাবে টুনহুয়াং পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। চৈনিক ও বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদান-প্রদানের এক প্রধান কেন্দ্র হিসাবে টুনহুয়াং ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। এই স্থান হইতে তিনটি পথ গিয়াছে খাস্‌গার অভিমুখে : (১) উত্তরদিকে তুর্ফান, কারাশার ও কুচি হইয়া খাস্‌গার পর্যন্ত; (২) সরাসরি পশ্চিমে লো-লান ও কারাশার হইয়া খাস্‌গার; এবং (৩) দক্ষিণে চার্কলিক, নিয়া ও খোটান হইয়া খাস্‌গার পর্যন্ত। পশ্চিমে বক্ষুয়ানা ও সোগ্‌দিয়ানা এবং দক্ষিণে ভারতবর্ষ হইতে অনেকগুলি পথ আসিয়া মিলিত হইয়াছে খাস্‌গারে ও খোটানে। তন্মধ্যে একটি গিয়াছে তাস্‌কেন্ট, সমরকন্দ, বোখারা হইয়া মার্ভ পর্যন্ত এবং আর একটি গিয়াছে সিধা বক্ষুয়ার দিকে ও তথা হইতে আবার মার্ভ পর্যন্ত। তক্ষশিলার সহিত খোটান ও খাস্‌গারের সংযোগ রক্ষা করিয়াছে এইরূপ দুইটি প্রধান পথ মানচিত্রে দৃষ্ট হইবে। মার্ভ ও একবাতানার (হামাদান) পথে স্টেসিফন, এডেসা, এন্টিওক প্রভৃতি সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করিবার বহু পথ ছিল।

এ ছাড়া আসাম, ব্রহ্মদেশ ও তিব্বতের মধ্য দিয়া কয়েকটি পথ চীন ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপন করিয়াছিল। চ্যাংকি'য়েন বক্ষুয়ানায় চীনের প্রস্তুত যেসব কাপড় ও বাঁশের লাঠি দেখিয়াছিলেন তাহা দক্ষিণ-পশ্চিম চীন হইতে আসাম-ব্রহ্মদেশের পথে প্রথমে গাঙ্গেয় উপত্যকায় আসে এবং পরে সেই স্থান হইতে তক্ষশিলার পথে বক্ষুয়ায় চালান যায়। সম্ভবতঃ পাটলিপুত্র হইতে চম্পা (ভাগলপুর), কজঙ্গল (রাজমহল), পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তর বাংলা) হইয়া কামরূপ পর্যন্ত এই পথ বিস্তৃত ছিল। কামরূপ হইতে একটি পথ উত্তর-পূর্বে

* Joseph Needham, *Science and Civilisation in China,* Vol. 1, Cambridge, 1954, p. 174.

† G. F. Hudson, *Europe and China ; A Survey of their Relations from the Earliest Times to 1800,* Arnold, London, 1931.

অগ্রসর হইয়া পাতকৈ পর্বতের মধ্য দিয়া চীন পর্যন্ত পেঁৗছিয়াছিল; আর একটি পথ গিয়াছিল মণিপুর ও ভামো (ব্রহ্মদেশ) হইয়া চীনদেশের সীমান্ত পর্যন্ত।

তিব্বতের মধ্য দিয়াও এইরূপ এক বা একাধিক পথ চীন ও ভারতকে সংযুক্ত করিয়াছিল। তিব্বতী পথের বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ লাডাক বা সিকিমের মধ্য দিয়া এই পথ পাটলিপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দুই-একজন চৈনিক পরিব্রাজক খাস্‌গার অথবা খোটান হইতে তিব্বতে প্রবেশ করিয়া সিমলার নিকটবর্তী শিপ্‌কি গিরিবর্ত্ম-পথে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন, এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।*

চৈনিক রেশম, লৌহ ও অন্যান্য দ্রব্য-সম্ভার যে শুধু স্থলপথেই যাতায়াত করিত তাহা নহে, জলপথেও এই বাণিজ্যের একটা বড় অংশের গতিবিধি ছিল। রাজনৈতিক গোলযোগ ও সামরিক তৎপরতার সময় স্থলপথে বাণিজ্যের গতিবিধি নিরাপদ নয় এবং মধ্য-এসিয়ায়, সিরিয়ায় ও পারস্যে এইরূপ গোলযোগ ও অশান্তি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন প্রায় লাগিয়াই থাকিত। এজন্য ব্যবসায়ীরা অনেক সময় স্থলপথের অপেক্ষা জলপথকেই অধিকতর নিরাপদ মনে করিয়াছে। এই জলপথের বাণিজ্যেও ভারতবর্ষ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। চৈনিক রেশম ও লৌহ খাস্‌গার-খোটান-তক্ষশিলার পথে অথবা ব্রহ্মদেশ-আসামের পথে প্রথমে ভারতবর্ষে আনীত হইয়া পরে বর্বারিকন, বারিগাজা অথবা তাম্রলিপ্ত বন্দর হইতে সাগরপারের নানা দেশে রপ্তানী হইত।

বহু প্রাচীনকাল হইতে সমুদ্র-পথে পারস্য, সিরিয়া, মিশর এমন কি ইউরোপের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। রোমক সাম্রাজ্যের আমলে ভারতের এই সামুদ্রিক বাণিজ্য বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে (৭০) জনৈক অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিক কর্তৃক রচিত *Periplus Maris Erythraei* (*The Periplus of the Erythraean Sea*) গ্রন্থে এই বাণিজ্যের ও ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট বহু বন্দরের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।† এই গ্রন্থে বর্ণিত বন্দরগুলির মধ্যে বার্বারিকন (করাচীর নিকট), বারিগাজা (আধুনিক ব্রোচ), মুজিরিস্‌, নেলকুণ্ডা (মালাবার উপকূলে অবস্থিত), বাকারৈ, কোরকৈ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। *Periplus*-এর রচয়িতা অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিক লোহিত সাগরের এক বন্দর বেরেনিস্‌ হইতে যাত্রা করিয়া বাব্‌-এল্‌-মান্দব প্রণালী পার হইবার পর মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের সুযোগ গ্রহণ করিয়া মধ্য-সমুদ্র-পথে আরব সাগর অতিক্রম করেন এবং বার্বারিকন, বারিগাজা প্রভৃতি বন্দরে উপস্থিত হন।

Periplus- এর সময় বা তাহার কিছু পূর্ব হইতে মৌসুমী বায়ুর সুযোগ গ্রহণ করিয়া সরাসরি সমুদ্র পার হইবার সুবিধা আবিষ্কৃত হয়। ইহার পূর্বে আরব, পারস্য ও গেদ্রোসিয়ার (বেলুচিস্তান) উপকূল-পথে মিশরীয় বাণিজ্যপোত ভারতবর্ষের বন্দরগুলিতে যাতায়াত করিত। *Periplus*-এর বহু পূর্ব হইতে পূর্ব-আফ্রিকার বণিকদের সরাসরি আরব সাগর পার হইয়া ভারতবর্ষে পেঁৗছিবার কথা ম্যাক্‌ক্রিন্ডল্‌ উল্লেখ করিয়াছেন। রোমকরা পূর্ব-আফ্রিকার এই বণিকদের অভিজ্ঞতার কথা পরে অবগত হয় এবং *Periplus*-এর সময় হইতে সমুদ্র পারাপারের ব্যাপারে তাহারাও মৌসুমী বায়ুর সুযোগ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে।

এইসব পথে ভারতীয় বাণিজ্যপোতের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। মণি, মুক্তা ও মূল্যবান প্রস্তর, হাতীর দাঁত, মসলা, সুতার ও মসলিনের কাপড়, চাল, তিল তৈল, ঘৃত, চিনি প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য, নানাবিধ ভেষজ ও বনজদ্রব্য (ইহাদের মধ্যে 'নীল' উল্লেখযোগ্য) এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি প্রভৃতি বিবিধ ধাতু ও ধাতবদ্রব্য এই বাণিজ্যের প্রধান উপকরণ ছিল।

* Bagchi, *India and China*, p. 21.

† J. W. McCrindle, *The Commerce and Navigation of the Erythraean Sea*, being a translation of *Periplus Maris Erythraei* and of Arrian's Account of the Voyage of Nearkhos, Thacker, Spink and Co., 1879.

চৈনিক রেশম, লৌহ, চামড়া, তুলা, কাপড় প্রভৃতি দ্রব্য বার্বারিকন ও বারিগাজা হইতে পশ্চিমে চালান যাইত। পূর্ব-পশ্চিম সামুদ্রিক-বাণিজ্য কেবল ভারতের পশ্চিম-উপকূলবর্তী বন্দর-গুলিতেই নিবদ্ধ থাকে নাই। এইসব বাণিজ্য-তরী কুমারিকা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া বীরপটনম্ (পণ্ডিচেরীর নিকট), তাম্রলিপ্ত, তাকোলা (রেঙ্গুনের নিকট), সাবানা (মৌলমিনের নিকট) ও আরও দক্ষিণ-পূর্বে মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, কম্বোডিয়ার নানা বন্দরে বাণিজ্য করিয়া ফিরিত। হ্যানয়ের নিকট চৈনিক বন্দর কাত্তিগারা পর্যন্ত রোমক ও ভারতীয় বাণিজ্য-পোতের যাতায়াতের কথা জানা যায়।

এইভাবে স্থলপথে ও জলপথে ভারত-চীন বাণিজ্যিক যোগসূত্র স্থাপিত হইলে দুই দেশের মধ্যে প্রথিতযশা বৌদ্ধ দার্শনিকদের যাতায়াত আরম্ভ হয়। এই ব্যাপারে কাশ্মীরী দার্শনিকগণই অগ্রণী হইয়াছিলেন। কুষাণদের পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রীষ্টীয় প্রথম হইতে পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত কাশ্মীর ছিল বৌদ্ধ দর্শন ও সংস্কৃত-সাহিত্য অধ্যয়ন ও চর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। কাশ্মীরী বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মধ্যে যাঁহারা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচারের উদ্দেশ্যে চীনদেশে গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সঙ্ঘভূতি, সঙ্ঘদেব, পুণ্যত্রাত, ধর্মযশ ও বিমলাক্ষর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারা খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ ও পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে মধ্য-এসিয়ার দুর্গম স্থলপথে চীনদেশে গিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকেই বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করেন। সমুদ্র-পথেও কয়েকজন কাশ্মীরী পণ্ডিতের চীনদেশ যাত্রার বৃত্তান্ত জানা যায়। বুদ্ধজীব সমুদ্র-পথে নান্‌কিং পৌঁছেন ৪২৩ খ্রীষ্টাব্দে; ফাহিয়ান ভারতবর্ষ হইতে যেসব সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি তাহার কিছু কিছু চৈনিক ভাষায় তর্জমা করেন। গুণবর্মা চীনদেশে যান আনুমানিক ৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি প্রথমে সিংহল ও যবদ্বীপে বৌদ্ধ দর্শন চর্চা ও প্রচারের জন্য গিয়াছিলেন। বৌদ্ধ দর্শনে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা অবগত হইয়া চীন সম্রাট তাঁহাকে চীনে যাইবার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানান। গুণবর্মা সেখানে এক বৎসরের মধ্যে এগারটি সংস্কৃত গ্রন্থের চৈনিক তর্জমা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

কাশ্মীরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ চীনদেশে যাইতে আরম্ভ করেন খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে। মধ্য-ভারত হইতে ধর্মক্ষেম (৪৩৩) ও গুণভদ্র (৪৩৫), পশ্চিম-ভারত হইতে উপশূন্য ও পরমার্থ (৫৪৬), উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে বুদ্ধভদ্র, বিমোক্ষসেন, জিনগুপ্ত (৫৫৯) ও ধর্মগুপ্ত এবং পূর্বভারত হইতে জ্ঞানভদ্র, জিনযশ ও যশোগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা অধিকাংশই সমুদ্র-পথে নানকিং পৌঁছেন। সপ্তম শতাব্দী হইতে এইরূপ চীন-ভারত সাংস্কৃতিক সংযোগ রক্ষা ও বৃদ্ধির ব্যাপারে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং গুপ্ত সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় অল্পকালের মধ্যে ইহা ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন-চর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তনরূপে পরিগণিত হয়। কুষাণদের আমলে তক্ষশিলা যেরূপ প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল গুপ্ত সম্রাটদের বিদ্যোৎসাহিতার কল্যাণে নালন্দা সেইরূপ একটি জগদ্বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কাশ্মীরের মত নালন্দাও দলে দলে ভারতীয় বৌদ্ধ ও দার্শনিকদের চীনদেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া চীন-ভারত সাংস্কৃতিক মৈত্রী সুদৃঢ় করিয়া তুলে। প্রভাকরমিত্র (৬২৭), বোধিরুচি (৭০৬), শুভাকরসিংহ (মৃত্যু ৭৩৫), বজ্রবোধি (৭২০), অমোঘবজ্র (৭৪৬) প্রমুখ নালন্দার বিশিষ্ট বৌদ্ধ পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ এই সময় চীনদেশে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা প্রচার করেন এবং বহু সংস্কৃত গ্রন্থ চৈনিক ভাষায় তর্জমা করেন।

বৌদ্ধধর্ম-দর্শনের ও ভারতীয় সভ্যতার বার্তা যে কেবল ভারতীয়রাই চীনদেশে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাহা নহে, বহু বিশিষ্ট চৈনিক বৌদ্ধও বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়া বিভিন্ন বিদ্যাপীঠে বহু বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং পুঁথিপত্র সংগ্রহ করিয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। এইসব চৈনিক পরিব্রাজকদের মধ্যে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে

ফাহিয়ান (৩৯৯-৪১৪), ষষ্ঠ শতাব্দীতে হুই-সেং (৫১৮) ও সুং ইউন (৫২২), এবং সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েন সাং (৬২৯-৪৫) ও ইৎ সিং-এর (৬৭১-৯৫) ভারত-পরিক্রমা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। ভারত-পরিক্রমার মূল্যবান বিবরণ* প্রদান প্রসঙ্গে তাঁহারা এদেশের তৎকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চা সম্বন্ধে যেসব কথা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সুবিদিত।

ধর্ম ও দর্শনে চীন-ভারত সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রধানতঃ নিবদ্ধ থাকিলেও এই সম্পর্কের মারফত বৈজ্ঞানিক ভাবধারারও অল্প-বিস্তর আদান-প্রদান ঘটিয়াছিল। ট্যাং-দের রাজত্বকালে চীনে কয়েকজন ভারতীয় জ্যোতির্বিদের তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীতে চ্যাং-নানে গৌতম, কাশ্যপ ও কুমার এই তিন প্রকার জ্যোতিষীয় সিদ্ধান্তের আলোচনা ও চর্চা দেখা যায়।† এই তিনটি সিদ্ধান্তই ভারতীয়। ৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী উ-র নির্দেশে গৌতম-সিদ্ধান্তে সুপণ্ডিত জনৈক ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্ একটি পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। সি-তা বা সিদ্ধার্থ নামে আর একজন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্ অনুরূপ একটি পঞ্জিকা রচনা করেন ৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে; এই পঞ্জিকার নাম 'কিউ-চি-লি' (নবগ্রহ-সিদ্ধান্ত)। ট্যাং-আমলের পুঁথি-পত্রের তালিকায় ইহার উল্লেখ আছে।

সুই রাজবংশের বৃত্তান্তে নিম্নোক্ত ভারতীয় গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় গ্রন্থের চৈনিক অনুবাদের উল্লেখ পাওয়া যায় :

(১) পো-লো-মেন তি'য়েন-ওয়েন-চিং;
(২) পো-লো মেন কি-কি সিয়েন জেন তি'য়েন ওয়েন শুও—ব্রাহ্মণ ঋষি কি-কি-র জ্যোতিষীয় মতবাদ;
(৩) পো-লো-মেন তি'য়েন কিং;
(৪) মো-তেং-কি কিং হুয়াং তু—মাতঙ্গী-সূত্রে বর্ণিত আকাশের মানচিত্র;
(৫) পো-লো-মেন সুয়ান ফা—হিন্দু পাটীগণিতের নিয়মাবলী;
(৬) পো-লো-মেন সুয়ান কিং—প্রাচীন হিন্দু পাটীগণিত।

বহু পূর্বেই গ্রন্থগুলি নিখোঁজ হওয়ায় কি ধরনের জ্যোতিষীয় তথ্য ও মতবাদ গ্রন্থগুলিতে আলোচিত হইয়াছিল এবং সেই সব মতবাদ কতদূর চৈনিক জ্যোতিষীয় গবেষণাকে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে চীনদেশে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্‌দের অবস্থান, পঞ্জিকা-প্রণয়ন ব্যাপারে তাহাদের তৎপরতা এবং একাধিক হিন্দু জ্যোতিষীয় গ্রন্থের চৈনিক তর্জমা ইত্যাদি তথ্য হইতে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই সময়ে চৈনিক জ্যোতির্বিদেরা ভারতীয় জ্যোতিষে গভীর উৎসাহ ও কৌতূহল প্রকাশ করিয়াছিল এবং হিন্দু জ্যোতির্বিদ্‌দের বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখিত।

ভারতীয় গণিতের উপর চৈনিক গণিতের প্রভাব একাধিক ঐতিহাসিক প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'চিউ-চ্যাং সুয়ান-শু' বা 'নয় খণ্ডে পাটীগণিত' শীর্ষক চীনের প্রাচীনতম গাণিতিক গ্রন্থে যেসব প্রশ্নের আলোচনা আছে, ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর প্রমুখ পরবর্তীকালের ভারতীয় গণিতজ্ঞদের সেই ধরনের অনেক প্রশ্নের আলোচনা করিতে দেখা যায়। 'সান-ৎজু সুয়ান-চিং'-এ আলোচিত একটি সমস্যার সহিত ব্রহ্মগুপ্ত কর্তৃক আলোচিত অনুরূপ একটি প্রশ্নের বিশেষ মিল পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চম শতাব্দীর ভারতীয় আর্যভটর জ্যামিতির সহিত তৃতীয় শতাব্দীর চৈনিক গণিতজ্ঞ লিউ হুই-এর জ্যামিতির অনেক সাদৃশ্য আছে। তবে খ্রীষ্টীয় প্রথম হইতে তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে রচিত উপরিউক্ত গাণিতিক গ্রন্থের এবং ব্রহ্মগুপ্ত,

* ফাহিয়ান—'ফো কুও চি' (বৌদ্ধদেশের কথা); হুই-সেং—'হুই-সেং সিং চুয়ান' (হুই-সেং-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত); হুয়েন সাং—'টা থ্যাং সি ইউ চি' (থ্যাং-আমলে পশ্চিম দেশের বৃত্তান্ত); ইৎ সিং—'নান্ হাই চি কুই নেই ফা চুয়ান' (দক্ষিণ সমুদ্রাঞ্চলে প্রচলিত বৌদ্ধ ক্রিয়াকলাপের বৃত্তান্ত)।
† P. C. Bagchi, *India and China*, p. 180.

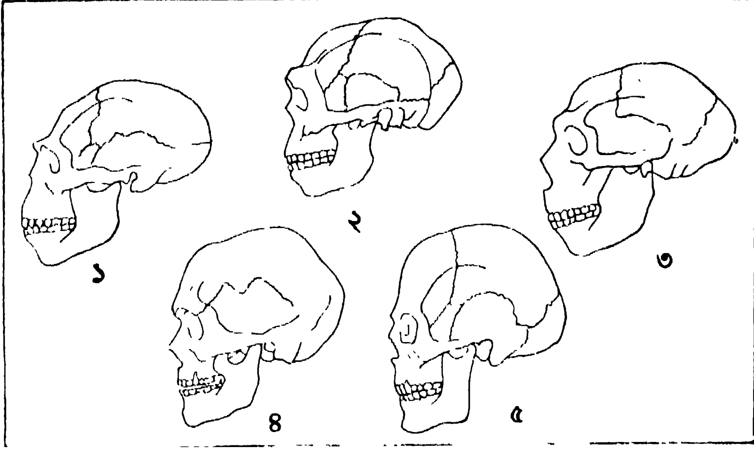
হিমযুগ

মানুষের এরূপ বিবর্তনের পালা যখন চলিতেছিল সে সময়ে পৃথিবীর পৃষ্ঠ বিরাট ও ব্যাপক নৈসর্গিক পরিবর্তনের দ্বারা আলোড়িত। পৃথিবী তখন ভূতত্ত্বীয় পরিবর্তনের সর্বশেষ পর্যায়ে। এক একবার পৃথিবীর উত্তাপ হিম-শীতল হইয়া সমগ্র উত্তর গোলার্ধ চাপা পড়িতেছে হাজার হাজার ফুট বরফের তলায়। এই অগ্রসরমান বর্ধমান বরফের পাহাড় পৃথিবীর অধিকাংশ জল আত্মসাৎ করিবার ফলে নদী, হ্রদ ও সমুদ্রের ব্যাপক অংশ শুষ্ক। যেখানে আজ সমুদ্রের জল থৈ থৈ করিতেছে, সে অঞ্চল তখন শুষ্ক ভূখণ্ড, তরুলতা, প্রাণীর প্রাণচাঞ্চল্যে মুখর। বহু সহস্র বৎসর এইরূপ অবস্থা চলিবার পর ধীরে ধীরে পৃথিবী আবার উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। বরফের পাহাড় গলিয়া মেরুর দিকে ফিরিয়া চলিল, আর সেই বিগলিত জলরাশিতে স্ফীত সমুদ্র, হ্রদ ও নদী বহু ভূখণ্ড গ্রাস করিল। ভূতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন, চারবার এইরূপ হিমযুগ পৃথিবীর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে,—প্রথমটি এক হইতে অর্ধ মিলিয়ন বৎসর এবং চতুর্থটি প্রায় ৫০,০০০ বৎসর আগে। অধ্যাপক আর্নেস্ট এণ্টেভ্সের অভিমত—পৃথিবীতে আবার হিমযুগ প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা তিরোহিত হয় নাই এবং আমরা সম্ভবতঃ হিমযুগের অন্তর্বর্তী চতুর্থ উষ্ণ যুগে এখন বাস করিতেছি।

নিয়াণ্ডার্থাল মানুষ

আমরা মানুষের বিবর্তনের কথা বলিতেছিলাম। সরল রেখার মত সোজাভাবে এই বিবর্তন যে সংঘটিত হয় নাই তাহার এক প্রমাণ নিয়াণ্ডার্থাল মানুষের মত কয়েকটি নিকৃষ্ট মনুষ্য প্রজাতির আবির্ভাব ও লোপ। পৃথিবীতে যখন চতুর্থ হিমযুগ চলিতেছে সেই সময়ে বা তাহার কিছু পূর্বে মানুষের এক নিকৃষ্ট প্রজাতি নিয়াণ্ডার্থাল মানুষের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর ডুসেলডর্ফের নিকট নিয়াণ্ডার উপত্যকায় এক গুহার তলদেশে নিয়াণ্ডার্থাল মানুষের একটি অসম্পূর্ণ কঙ্কাল পাওয়া যায়। তাহার কয়েক বৎসর পূর্বে জিব্রাল্টার হইতেও এইরূপ একটি কঙ্কাল প্রাপ্তির সংবাদ আসে। বর্তমান শতাব্দীতে ফ্রান্সের নানাস্থানে—লা শাপেল, ল মুস্তিয়ে, লা কিনায়, ইংল্যাণ্ড, ইতালী, স্পেন, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, ক্রোশিয়া, ক্রিমিয়া প্রভৃতি ইউরোপের সর্বত্র, এসিয়া মাইনর, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, ইরাক ও উত্তর আরবের মরুভূমি অঞ্চলে, উত্তর আফ্রিকায় ও চীনে নিয়াণ্ডার্থাল মানুষের বহু কঙ্কাল ও তাহার ব্যবহৃত বহু যন্ত্রপাতির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এই সব তথ্য হইতে এই মনুষ্য প্রজাতির আকৃতির ও ব্যবহারের এক নির্ভরযোগ্য চিত্র গড়িয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে। নিয়াণ্ডার্থাল মানুষ ছিল বেঁটে ও খর্বকায়, উচ্চতায় পাঁচ ফুট তিন চার ইঞ্চির মধ্যে। মাথা সাধারণতঃ একটু বড় ও সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়া; বৃহৎ ভ্রুযুগল, ক্ষুদ্র ও গোলাকৃতি চক্ষুদ্বয়, চ্যাপ্টা নাক ও কঠিন চোয়াল মুখের মধ্যে সম্ভবতঃ এক হিংস্রভাব ফুটাইয়া থাকিবে। দেহের তুলনায় বাহুদ্বয় কিছু ক্ষুদ্র।* হাত ও পায়ের পাতা আবার সেই তুলনায় বড়। আয়তন ও জটিলতার দিক হইতে তাহার মস্তিষ্কের সঙ্গে আধুনিক মানুষের মস্তিষ্কের প্রভেদ থাকিলেও পূর্ববর্তী যে কোন মনুষ্যেতর জাতির মস্তিষ্ক হইতে ইহা অনেক উন্নত। ক্রেনিয়ামের গঠন হইতে মনে হয় তাহার মধ্যে যথেষ্ট বুদ্ধি ও ধীশক্তির বিকাশ ঘটিয়াছে। নিয়াণ্ডার্থাল মানুষ গুহাবাসী, এক প্রকার পরিবার গঠনের প্রয়াস তাহাদের মধ্যে সুস্পষ্ট, মৃতকে তাহারা কবরস্থ করিত এবং সম্ভবতঃ অগ্নির ব্যবহারও তাহারা আয়ত্ত করিয়া থাকিবে। আধুনিক মানুষের আবির্ভাব ঘটিলে তাহার সহিত সংঘর্ষের ফলে সম্ভবতঃ নিয়াণ্ডার্থাল প্রজাতি ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়। ইহাদের শেষ বংশধরেরা যে খাঁটী মানুষের সমসাময়িক ছিল এবং

এই দুই প্রজাতির মধ্যে মাঝে মাঝে যে যৌন সম্বন্ধও স্থাপিত হইয়াছিল এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন।



৪। বিভিন্ন মনুষ্য প্রজাতির মাথার খুলি।
(১) পিথেকানথ্রোপাস, (২) সিনানথ্রোপাস, (৩) নিয়াণ্ডার্থাল, (৪) ক্রোম্যাগনন ও (৫) আধুনিক মানুষ

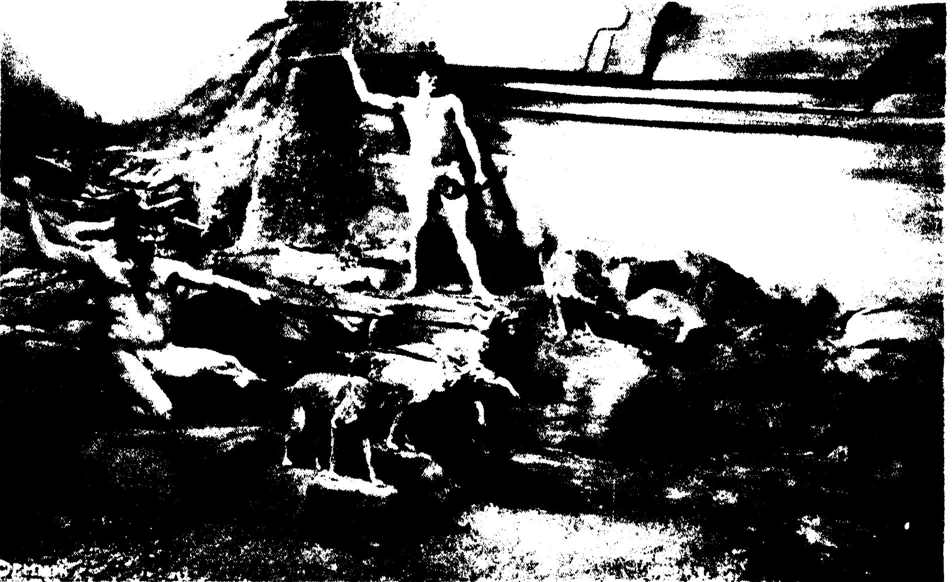
আধুনিক ক্রোম্যাগনন ও গ্রিমাল্ডি মানুষ

অবশেষে চতুর্থ হিমযুগের অবসান ঘটিয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীর আবহাওয়া আবার উষ্ণ হইতে আরম্ভ করিলে আমরা এক সম্পূর্ণ নূতন মনুষ্যজাতির আবির্ভাব লক্ষ্য করি। ইহারা ক্রোম্যাগনন ও গ্রিমাল্ডি মানুষ। বর্তমান মানুষের সহিত ইহাদের কোন প্রভেদ নাই: বস্তুতপক্ষে ক্রোম্যাগনন ও গ্রিমাল্ডি জাতিরূপ হইতেই আধুনিক ভূমধ্যসাগরীয়, অ্যালপাইন, নর্ডিক, সেমিটিক, মঙ্গোলীয়, নিগ্রয়েড, অস্ট্রেলয়েড প্রভৃতি জাতিসমূহের উদ্ভব। ফ্রান্সের দর্দোন অঞ্চলে ক্রোম্যাগনন মানুষের ও দক্ষিণ ফ্রান্সে মঁতোঁর নিকট গ্রিমাল্ডি গুহাকন্দরের তলদেশে গ্রিমাল্ডি মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। অরিনাক, ওৎ গারোন প্রভৃতি স্থানে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক এদুয়ার লার্তে যে সব প্রস্তরময় যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন ক্রোম্যাগনন মানুষ সেই সব যন্ত্রের নির্মাতা। ইহারা মাথায় অনেক লম্বা; দেহসৌষ্ঠব অতি চমৎকার; মস্তিষ্কের ক্রেনিয়াম পূর্ণমাত্রায় বিকশিত। নিয়াণ্ডার্থাল মানুষের মত ইহারাও গুহাবাসী, শিকারী, পরিবারবদ্ধ ও অগ্নি-ব্যবহারক। কিন্তু এই বর্বর জীবনের মধ্যেও ইহারা একরূপ সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে ব্যস্ত। প্রাচীর চিত্রাঙ্কন, যাদুবিদ্যা ও নৈসর্গিক প্রতিবেশ সম্বন্ধে এক ধরনের কৌতুহলের মধ্যে তাহাদের এই প্রয়াস পরিস্ফুট।

যে সব আবিষ্কার ও তথ্যের কথা বলা হইল তাহা অবশ্য খুবই অসম্পূর্ণ ও অপর্যাপ্ত। তাহা হইতে মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইটুকু বলা চলে যে, মানুষ ক্রমবিকাশের নিয়মে নিম্নশ্রেণীর এক জাতের অ্যানথ্রোপয়েড হইতে উদ্ভূত। অ্যানথ্রোপয়েড ও মানুষের মাঝামাঝি ক্রমশঃ মানুষের মত দেখিতে অনেক প্রকার জীব আত্মপ্রকাশ করিয়া পরে লুপ্ত হইয়াছে। মধ্যবর্তী এই সব জীবের অতি অল্প সন্ধানই মিলিয়াছে। সর্বাপেক্ষা উন্নত অ্যানথ্রোপয়েড ও সবচেয়ে নীচু ও অনুন্নত মানুষ পিথেকানথ্রোপাসের মধ্যে এখনও এক



নিয়ান্ডার্থাল মানুষের পারিবারিক জীবনের একটি কাল্পনিক দৃশ্য (জিব্রাল্টরে প্রাপ্ত নিয়ান্ডার্থাল মানুষের ধ্বংসাবশেষ অবলম্বনে)।



আজিলীয় শিকারী প্রাগৈতিহাসিক এক মনুষ্যগোষ্ঠী কুকুরকে প্রথম পোষ মানায় (মা দা'জিল, ফ্রান্স)।

বিরাট ফাঁক থাকিয়া গিয়াছে। এই সব ফাঁক ভরাট করিতে না পারা পর্যন্ত মানুষের আদিম বংশ-পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিতে বাধ্য। তথাপি ইহা সুনিশ্চিত যে, মায়োসিন অধ্যায়ের গোড়ার দিকে মানুষ অ্যানথ্রোপয়েডের পর্যায় অতিক্রম করে; মায়োসিন ও প্লায়োসিন অধ্যায়ে তাহার দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সোজা হইয়া দাঁড়াইবার উপযোগী হয়; তাহার মস্তিষ্কের

ভূতত্ত্বীয় অধ্যায়		কালের হিসাব, বৎসর
সাম্প্রতিক	মানুষ	২৫,০০০
প্লিস্টোসিন	ক্রোম্যাগনন গ্রিমাল্ডি, নিয়াণ্ডার্থাল মানুষ, গরিলা, শিম্পাঞ্জী, গিবন	১,০০০,০০০
প্লায়োসিন	পিথেকানথ্রোপাস, প্লিওপিথেকাস	১৫,০০০,০০০
মায়োসিন	শিভাপিথেকাস, প্যালিও পিথেকাস, ড্রায়োপিথেকাস জাতিরূপ, ওরাং, বৃহৎ অ্যানথ্রোপয়েড	৩৫,০০০,০০০
অলিগোসিন	প্রোপ্লিও পিথেকাস	৫০,০০০,০০০
ইয়োসিন	টার্সিয়য়েড	৭০,০০০,০০০

৫। উচ্চতর প্রাইমেটের ক্রমবিকাশের নক্সা।
(ডব্লু. কে. গ্রেগরির নক্সা অবলম্বনে)

পরিবর্তন ও সম্প্রসারণ ঘটে প্লায়োসিন ও প্লিস্টোসিন অধ্যায়ে এবং এই মস্তিষ্ক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বনমানুষের দেহের আকৃতিগত নানা বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য একে একে পরিত্যক্ত হয়। মানুষের ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত উপরিউক্ত তথ্যসমূহ নক্সার আকারে (৫নং চিত্র) দেখানো হইল।

২·২। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের তৎপরতা ও কয়েকটি আবিষ্কার

সুতরাং প্লিসটোসিন যুগের প্রথম হইতে মানুষ পৃথিবীতে বাস করিতেছে। প্রায় এক মিলিয়ন বৎসর। ইহার মধ্যে মানুষের লিখিত ইতিহাসের বয়স মাত্র পাঁচ হাজার বৎসরের বেশী নয়। সাত কি আট হাজার বৎসর যাবৎ সে ধাতু ব্যবহার করিতেছে—প্রথমে তাম্র ও পিতল, কিছু পরে লৌহ। ইহার পূর্বে লক্ষ লক্ষ বৎসর মানুষ শুধু প্রস্তর ব্যবহার করিয়াছে। জীবন-সংগ্রামে প্রস্তরনির্মিত যন্ত্রপাতি তাহার প্রধান সম্বল ও সহায়। পশ্চাতে ফেলিয়া যাওয়া কালজয়ী এই সব প্রস্তরের যন্ত্রপাতির ভগ্নাবশেষ তাহার লক্ষ লক্ষ বৎসরের তৎপরতার একমাত্র নিদর্শন। কঠিন পাষাণ মহাকালকে ফাঁকি দিয়া বিস্মৃত অতীতের কত কথা, কত ইতিবৃত্ত যুগের পর যুগ নিঃশব্দে, সযত্নে বহন করিয়া আনিয়াছে।

প্রস্তর ব্যবহার ও প্রস্তরনির্মিত যন্ত্রের উন্নতি ও ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সমগ্র প্রস্তরযুগকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করিয়া থাকেন—পুরা প্রস্তরযুগ (Paleolithic বা Old Stone Age) ও নব্য প্রস্তরযুগ (Neolithic বা New Stone Age)। মানুষের তৎপরতায় নব্য প্রস্তরযুগের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় আনুমানিক দশ হইতে বারো হাজার বৎসর পূর্বে। সুতরাং প্রস্তরযুগের প্রায় সবটুকুই বলিতে গেলে পুরা প্রস্তরযুগ। মানুষের ক্রমবিকাশের সর্বশেষ ধাপগুলি এই যুগের অন্তর্ভুক্ত। এই বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার যন্ত্রনির্মাণের দক্ষতারও লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। নিয়াণ্ডার্থাল মানুষের যন্ত্রপাতির সহিত

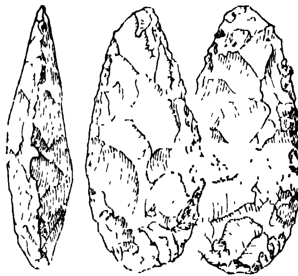
তাহার পূর্বগামী এওয়ানথ্রোপাস, সিনানথ্রোপাস ও পিথেকানথ্রোপাস মানুষের নির্মিত যন্ত্রের অনেক প্রভেদ। সেইরূপ প্রভেদ আবার নিয়াণ্ডার্থাল মানুষের ও সত্যকার মানুষ ক্রোম্যাগনন ও গ্রিমাল্ডিদের নির্মিত যন্ত্রের মধ্যে।

যন্ত্র ও তাহার ব্যবহারের বিবর্তন লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন যুগের তৎপরতা নির্দেশ করিতে বিজ্ঞানীরা ইংরেজীতে 'culture' কথাটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই culture কথায় যাহা বুঝানো হইয়া থাকে, বাংলা কৃষ্টি, সংস্কৃতি বা সভ্যতা প্রভৃতি কথায় ঠিক তাহা বুঝানো শক্ত; সুতরাং আমরা কালচার শব্দটিই ব্যবহার করিব। যাহা হউক নিয়াণ্ডার্থাল মানুষের পূর্ববর্তী কয়েক লক্ষ বৎসরের তৎপরতাকে আমরা চেলীয় কালচার (Chellean Culture) ও তাহার নিজের বিশ কি ত্রিশ হাজার বৎসরের তৎপরতাকে মুস্তেরীয় কালচার (Mousterian Culture) নামে অভিহিত করিব। ফ্রান্সের Chelles ও Le Moustier-এ প্রাগৈতিহাসিক মানুষের যন্ত্রপাতি ও দেহাবশেষ ইত্যাদি প্রথম পাওয়ার জন্য এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। আধুনিক মানুষের আবির্ভাবের পর তাহার তৎপরতার বিভিন্ন সূক্ষ্ম প্রভেদ ও বৈশিষ্ট্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে যন্ত্রপাতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া সেই সব স্থানের নামানুসারে ইহাদের তৎপরতা প্রকাশ করিবার রীতি; যেমন—অরিনেশীয় কালচার (ফ্রান্সের অরিনাক হইতে), সলুত্রীয় কালচার (ফ্রান্সের সলুত্রে হইতে), ম্যাগদালেনীয় কালচার (সুইটজারল্যাণ্ডের লা মাদলেইন হইতে), আজিলীয় কালচার (ফ্রান্সের মা দা'জিল নামানুসারে) ইত্যাদি।

(১) পুরা প্রস্তরযুগ

চেলীয় কালচার

পুরা প্রস্তরযুগের মানুষ খাদ্য সংগ্রাহক। শিকারই তাহার প্রধান উপজীবিকা। শিকার ও আত্মরক্ষার জন্য চেলীয় মানুষ পাথরের যে সব অস্ত্র বা 'ইয়োলিথ' (eolith) তৈয়ারী করে



৬। চেলীয় যুগের 'ইয়োলিথ'।

তাহা নিতান্তই বিশেষত্বহীন। পাথর ঠুকিয়া ও ভাঙিয়া সাধারণ অবস্থা হইতে অধিকতর কার্যকরী ও তীক্ষ্ণাগ্র পাথরের টুকরা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা ইয়োলিথের মধ্যে প্রকাশ পাইলেও স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত পাথরের টুকরার সঙ্গে ইহার প্রভেদ এত অল্প যে, ইয়োলিথগুলি সত্য সত্যই মানুষের হাতের কাজ কিনা, সে বিষয়ে এখনও অনেকের সন্দেহ আছে। প্রথমে এইরূপ এক ধরনের অস্ত্রের দ্বারা সব রকমের কাজ চালানো হইত, যেমন ছুরি, করাত, চাঁছা ছোলার অস্ত্র প্রভৃতি। পাথরের টুকরা হইতে ছুরি, করাত প্রভৃতি বিশেষ ধরনের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিবার কৌশল চেলীয় মানুষ অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অতি ধীরে ধীরে আয়ত্ত করে।

এইরূপ যন্ত্র নির্মাণের মধ্যে মানুষের উদ্ভাবনী ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় মিলে। যে কোন পাথর হইতেই আর ভাল ও কার্যকরী অস্ত্র তৈয়ারী করা যায় না। সুতরাং এই কাজের উপযোগী ফ্লিণ্ট বা চকমকি পাথর চিনিবার কৌশল তাহাকে আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। তারপর পাথরের টুকরা বাহির করিয়া কার্যকরী নানা ধরনের অস্ত্র গড়িতেও এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন আবশ্যক। গর্ডন চাইল্ড বলিয়াছেন—একপ্রকার বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যের সৃষ্টি না করিয়া এইরূপ যন্ত্র তৈয়ারী করা যায় না। "In the course of making tools, the earliest communities had to build up a scientific tradition, noting and transmitting what were the best stones, where they were to be expected and how they were to be handled."* এই মন্তব্য তাহার শিকার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। চেলীয় মানুষ যেমন বন্য জন্তু শিকার করিত, সে নিজেও ছিল সেরূপ বহু হিংস্র বন্য জন্তুর এক অতি লোভনীয় শিকার। সামান্য পাথরের টুকরার উপর নির্ভর করিয়া বহুগুণ বলশালী জন্তুদের শিকার করিতে হইলে ইহাদের স্বভাব, গতিবিধি, প্রাপ্তিস্থান, শিকারের প্রকৃষ্ট ঋতু ইত্যাদি নানা বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। ধীরে ধীরে এই সব জ্ঞান আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত শিকারে সাফল্য লাভের আশা যে দুরাশা তাহা সহজেই অনুমেয়। অতএব শিকার-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া সে নিঃসন্দেহে প্রাণিবিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করিয়াছিল।

চেলীয় মানুষের কালে, সম্ভবতঃ সর্বশেষ হিমযুগ আবির্ভাবের আগে, একপ্রকার প্রস্তর-শিল্প গড়িয়া উঠিবার নানা প্রত্নতত্ত্বীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। মূল পাথর হইতে নিষ্ক্রান্ত টুকরার সাহায্যে যে সব অস্ত্র তৈয়ারী হইত তদ্দ্বারা সম্ভবতঃ এক শ্রেণীর শিল্প flake industry, ইউরোপ ও এসিয়ার উত্তরাংশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। টুকরার পর টুকরা বাহির করিয়া মূল পাথরকেই অস্ত্র বা যন্ত্রে পরিণত করিবার যে দ্বিতীয় কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা গড়িয়া উঠে দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্প core industry। দক্ষিণ ভারত, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, আফ্রিকার সর্বত্র, স্পেন, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে শেষোক্ত শিল্পের অনেক নজির মিলিয়াছে।

পুরা প্রস্তরযুগের প্রথম ভাগে কয়েক লক্ষ বৎসরের মানব তৎপরতার ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই তৎপরতার গতি অতি শ্লথ। সামান্য একটুকু উন্নতি সাধন করিতে হাজার হাজার বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। একদিক দিয়া মানব ইতিহাসের ইহা মহা নিশ্চেষ্টতার যুগ।

মুস্তেরীয় কালচার

আনুমানিক ৫০,০০০ বৎসর পূর্বে চতুর্থ হিমযুগ অগ্রসর হইবার সময় ইউরোপে যে মুস্তেরীয় কালচারের পরিচয় পাওয়া যায়, নানা দিক দিয়া তাহা উন্নত ও বিশেষত্বপূর্ণ। মুস্তেরীয় কালচারের নায়ক খর্বকায় নিয়াণ্ডার্থাল মানুষ। আধুনিক মানুষের মত সহজ ও সাবলীলভাবে কথা বলিবার ক্ষমতা তাহার না থাকিলেও সে মোটের উপর কথা বলিতে পারিত। এ ক্ষমতা না থাকিলে নিয়াণ্ডার্থাল মানুষের মধ্যে যে সঙ্ঘবদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সম্ভব হইত না।

অগ্নির আবিষ্কার

মুস্তেরীয় কালচারের প্রথম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল কৃত্রিম উপায়ে অগ্নি উৎপাদনের কৌশল আয়ত্ত করা। কেহ কেহ বলেন, চেলীয় মানুষই অগ্নির আবিষ্কারক। এ সম্বন্ধে

* V. Gordon Childe, *Man Makes Himself*, 1936, p. 55.

সঠিকভাবে অবশ্য কিছু বলা যায় না। চেলীয় মানুষের আগুন ব্যবহারের প্রমাণ বিরল, মুস্তেরীয় কালচারের বহু নিদর্শনেই আগুন ব্যবহারের প্রমাণ বর্তমান। নানা প্রাকৃতিক ঘটনার মত প্রথম হইতেই মানুষের পরিচয় হইয়াছিল আগুনের সঙ্গে। স্বাভাবিক ছিদ্রপথে ভূগর্ভ হইতে নির্গত জ্বলন্ত পেট্রোলিয়াম বা স্বাভাবিক গ্যাসের আগুন সে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও দেখিয়া থাকিবে। বজ্রপাতের ফলে বা ডালে ডালে ঘষা লাগিয়া আপনা হইতেই উদ্ভূত দাবানলের অভিজ্ঞতা তাহার নিশ্চয়ই হইয়াছিল। তারপর আগ্নেয়গিরির আগুন। দাবানল বা আগ্নেয়গিরির আগুনের মূর্তি দেখিয়া সে ভীত ও বিহ্বল হইলেও জ্বলন্ত স্বাভাবিক গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামের অপেক্ষাকৃত শান্ত আগুন দেখিয়া হয়ত সে সাহসে ভর করিয়া আগাইয়া থাকিবে। কৌতূহলবশে তাহাতে একখণ্ড কাঠ বা শুষ্ক গাছের ডাল ফেলিয়া হয়ত দেখিয়া থাকিবে, তাহাও আগুনের স্পর্শে জ্বলিয়া উঠিতেছে। এরূপ অবস্থায় একখণ্ড কাঠ ধরাইয়া তাহার সাহায্যে অন্যত্র রক্ষিত আর একটি কাঠের স্তূপে অগ্নিসংযোগ করিবার প্রবল ইচ্ছা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আগুনের সহিত পরিচয়ের প্রথম পর্বে আদিম মানুষ নিঃসন্দেহে এ জাতীয় অনেক পরীক্ষা করিয়াছিল। আগুনের সর্বধ্বংসী প্রলয়ঙ্কর রূপ ছাড়া এক কল্যাণময় রূপও যে আছে—ইহা যে অন্ধকার নাশ করে, উত্তাপ দান করে ও বন্য জন্তুকে কাছে ঘেঁষিতে দেয় না--তাহা উপলব্ধি করিয়া সে প্রকৃতির উপর নির্ভর করিবার পরিবর্তে কৃত্রিম উপায়ে নিজেই অগ্নি উৎপাদনে উদ্যোগী হয়। চকমকি পাথরের সহিত হেমেটাইট বা লৌহঘটিত কোন খনিজ পাথর ঠুকিয়া অথবা দুইটি শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড পরস্পরের সহিত ঘষিয়া, অথবা বাঁশের চোঙের মধ্যে আবদ্ধ বাতাসের চাপ বৃদ্ধি করিয়া আদিম মানুষ কৃত্রিম উপায়ে অগ্নি উৎপাদনে সক্ষম হয়। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারটি ঠিক কখন ও কোথায় প্রথম সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা বোধহয় চিরকালের জন্যই রহস্যাবৃত থাকিয়া যাইবে।

মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে অগ্নির আবিষ্কারের গুরুত্বের উপর জোর দিবার প্রয়োজন নাই। এই আবিষ্কারের মধ্য দিয়া মানুষ প্রকৃতির এক বিরাট শক্তিকে বশীভূত করে। এই প্রথম প্রকৃতির এক শক্তির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজের ভাগ্য নিজেই নিয়ন্ত্রণ করিবার পথে অগ্রসর হয়। মানুষ নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াই ক্রমে পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই প্রচেষ্টার ইতিহাসে অগ্নির ব্যবহার আবিষ্কার এক বিরাট বৈপ্লবিক ঘটনা। গর্ডন চাইল্ড লিখিয়াছেন—"But in feeding and damping down the fire, in transporting and using it, man made a revolutionary departure from the behaviour of other animals. He was asserting his humanity and making himself."*

আদিম মানুষের মনের উপরেও এই আবিষ্কারের প্রতিক্রিয়া বড় কম হয় নাই। সে দেখিল, দুইখণ্ড কাঠ বা একটি চকমকি ও হেমেটাইট ঘষিবামাত্র প্রায় কিছু না হইতেই এক আশ্চর্য গুণ ও শক্তিসম্পন্ন জিনিষের উৎপত্তি হইতেছে। এই অভিনব অভিজ্ঞতা হইতে সে এক নূতন সৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করিল তো বটেই, অধিকন্তু সে নিজের মধ্যে আবিষ্কার করিল স্রষ্টার দুর্জ্ঞেয় ক্ষমতা। তাহার আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বর্ধিত হইল।

এখন হইতে দুরন্ত শীতের রাত্রি তাহার কাছে আর বিভীষিকা নহে। এমন কি, নাতিশীতোষ্ণ ও হিমমণ্ডলে গিয়া বসতি স্থাপনও তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইল। অগ্নির সাহায্যে একদিকে গুহা-কন্দর আলোকিত করিয়া ও অন্যদিকে হিংস্র পশুর অতর্কিত নৈশ আক্রমণ প্রতিহত করিয়া সে পূর্বাপেক্ষা অনেক নিরাপদ ও আরামপ্রদ আশ্রয় গড়িয়া তুলিল। এই সময়ে সম্ভবতঃ রন্ধন-বিদ্যাও আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে। ইহাতে খাদ্য-নির্বাচনের স্বাধীনতা অনেক বর্ধিত হয়। পরবর্তী যুগের মৃৎপাত্র ও ধাতব দ্রব্যাদির নির্মাণ-কৌশল আবিষ্কার

* V. Gordon Childe, loc. cit. p. 56.

মুখ্যতঃ এই অগ্নির আবিষ্কারেরই ফল। মানুষের জীবনে ও তাহার সমাজে অগ্নির অপরিহার্যতার কথা স্মরণ করিয়াই গ্রীকরা প্রোমেথিউসের অগ্নি অপহরণের উপাখ্যান রচনা করিয়াছিল।

মুস্তেরীয় মানুষ সপরিবারে বাস ও দলবদ্ধভাবে শিকার করিত। সমাজগঠনের ইহাই প্রাথমিক প্রয়াস। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, তাহারা বিশেষ যত্নের সহিত মৃতের কবর দিত। লা শাপেল-ও-স্যাঁতে প্রাপ্ত একটি মুস্তেরীয় কবরে মৃতের মাথার নীচে পাথরের বালিশ, তাহার কাছে কয়েকটি যন্ত্র ও মাংসের শিলীভূত টুকরা পাওয়া যায়। আশেপাশে পাথরের খিলান দিয়া মাটির চাপ হইতে মৃতের দেহরক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তারপর মৃত যাহাতে উত্তাপ পাইতে পারে সেই জন্য চুল্লী বা আগুন জ্বালিবার জায়গার অতি নিকটে মৃতদেহকে কবরস্থ দেখা যায়। মৃতদেহের এরূপ যত্ন দেখিয়া মনে হয়, মৃত্যুর পরও একপ্রকার জীবনের অস্তিত্বে মুস্তেরীয় মানুষ বিশ্বাসী ছিল; তাই তাহার জন্য উত্তাপ, যন্ত্রপাতি ও খাদ্যের ব্যবস্থা। তখন হইতেই সে মৃত্যুরহস্যের কথা গভীরভাবে চিন্তা করিতেছে। সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগে আদিম মানুষের মনোভাব ঐতিহাসিক কালের মানুষের চিন্তাধারা ও কার্যকলাপে যে কিরূপ প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতে পারে ও করিতেছে তাহার অকাট্য প্রমাণ পিরামিড ও তাজমহল। মৃতের পরিচর্যার বিশ্লেষণ হইতে নৃতাত্ত্বিকেরা চেলীয় মানুষের মধ্যে একপ্রকার প্রাথমিক যাদুবিদ্যার বিকাশ লক্ষ্য করিয়া থাকেন।

অরিনেশীয়, ম্যাগদালেনীয় ও অন্যান্য কালচার

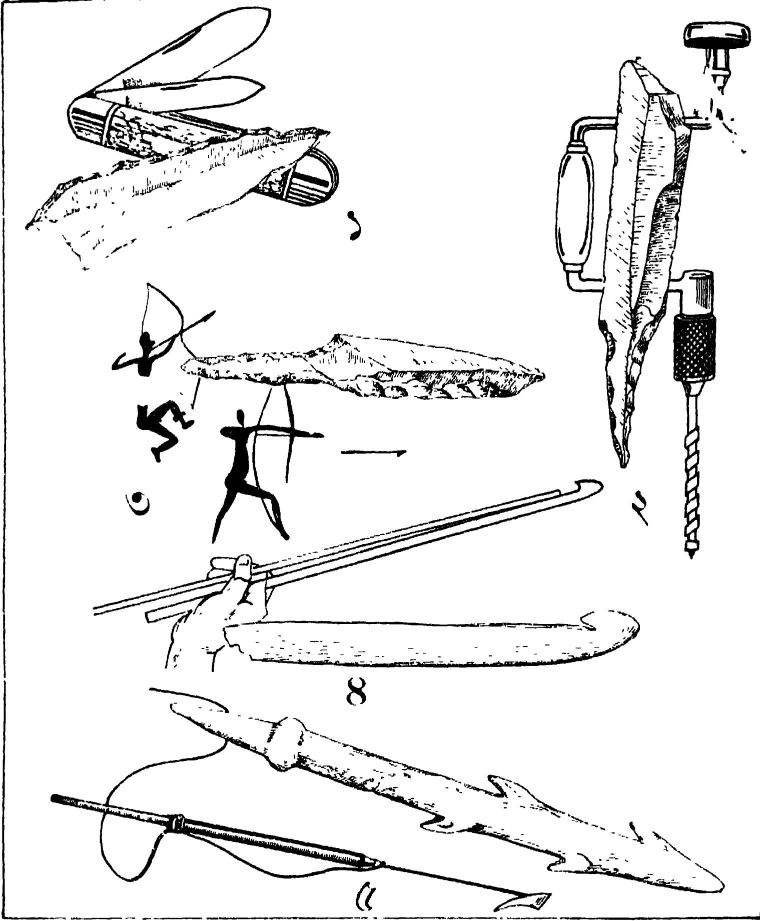
আনুমানিক ত্রিশ হাজার বৎসর পূর্বে চতুর্থ হিমযুগের অবসানের সঙ্গে বা অব্যবহিত পরে মুস্তেরীয় কালচারের সমস্ত অস্তিত্ব লোপ পায়। এইরূপ সময়ে সম্ভবতঃ নিয়াণ্ডার্থাল প্রজাতির মানুষ সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। নিয়াণ্ডার্থাল প্রজাতির লোপ ও আধুনিক মানুষ ক্রোম্যাগ্নন্ ও গ্রিম্যাল্ডি প্রজাতির উদ্ভব প্রায় একই সময় সংঘটিত হইতে দেখা যায়। এই শেষোক্ত মানুষ ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা, ইরান, ভারতবর্ষ প্রভৃতি নানা স্থানে প্রাগৈতিহাসিক তৎপরতার যে সব চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, তাহাতে পূর্ববর্তী যে কোন মনুষ্য প্রজাতি অপেক্ষা তাহাদের উন্নততর অবস্থা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। জীবনধারণের সংগ্রামে পরিবেশকে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে এই জাতি অনেক বেশী সাফল্যের পরিচয় দিয়াছে।

যন্ত্রের উন্নতি

প্রথমতঃ যন্ত্র নির্মাণ-কৌশলের কথাই ধরা যাক। ইহারা যে নানা ধরনের অধিকতর কার্যকরী যন্ত্রই তৈয়ারী করিয়াছে তাহা নহে, যন্ত্র তৈয়ারীর জন্য আবার যন্ত্রও গড়িয়াছে। তারপর যন্ত্র ও অস্ত্র নির্মাণের জন্য ফ্লিণ্ট পাথর ছাড়া অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর হাড় ও দাঁতের ব্যবহার ইহাদের আর একটি বিশেষত্ব। অস্ত্রের মধ্যে নানা ধরনের তীক্ষ্ণ যন্ত্র, ফলা, তীরের অগ্রভাগ, কাঠ, পাথর প্রভৃতি কঠিন দ্রব্য ছিদ্র করিবার ড্রিল বা বেধন যন্ত্র, বর্শা-নিক্ষেপক যন্ত্র ও হার্পুণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিশেষ ধরনের ফলার অস্তিত্ব ও তখনকার প্রাচীর চিত্র হইতে বুঝা যায় যে, এই নূতন মানবগোষ্ঠী তীর ধনুক ও বর্শা নিক্ষেপের কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ধনুক একপ্রকার ইঞ্জিন-বিশেষ। ইহার দ্বারা একই দৈহিক পেশী-শক্তির সাহায্যে অনেক বেশী জোরে তীর নিক্ষেপ করা সম্ভব। সেইরূপ বর্শা-নিক্ষেপক যন্ত্রও লিভারের সাহায্যে বর্শার গতিশক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। হার্পুণ, বড়শি প্রভৃতি দেখিয়া মনে হয়, তাহারা মাছ ধরিবার বিদ্যাও শিখিয়াছিল।

এই সব যন্ত্র ও অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অরিনেশীয়, ম্যাগদালেনীয় প্রভৃতি কালচারের মনুষ্যজাতি খাদ্য-সংগ্রহের ব্যাপারে মুস্তেরীয়দের অপেক্ষা অনেক বেশী সাফল্য অর্জন

করে। এই সাফল্যের ফলে এই সময়ে মনুষ্যজাতির লোকসংখ্যাও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এক মাত্র ফ্রান্সেই পুরা প্রস্তরযুগের শেষভাগে যে সব নর-কংকাল পাওয়া

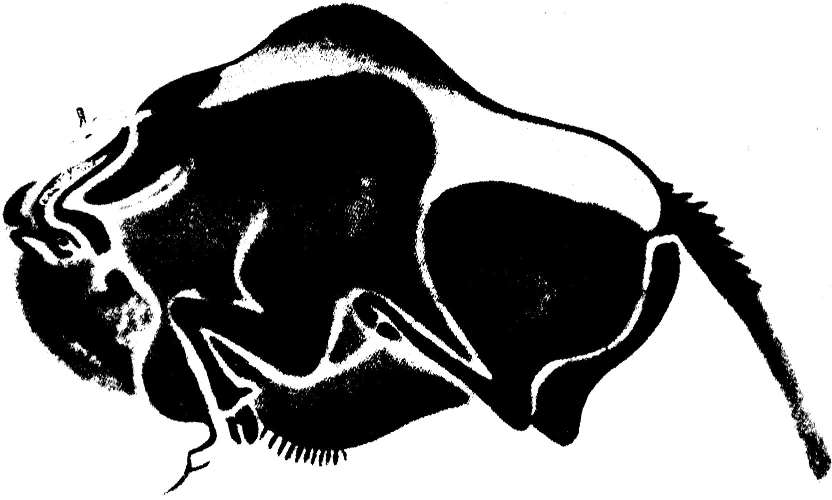


৭। প্রস্তরযুগের যন্ত্রপাতি।
(১) ছুরির ফলা, (২) ড্রিল বা বেধন যন্ত্র; (৩) তীরের ফলা;
(৪) বর্শা-নিক্ষেপক যন্ত্র, (৫) হাড়ের হার্পুন

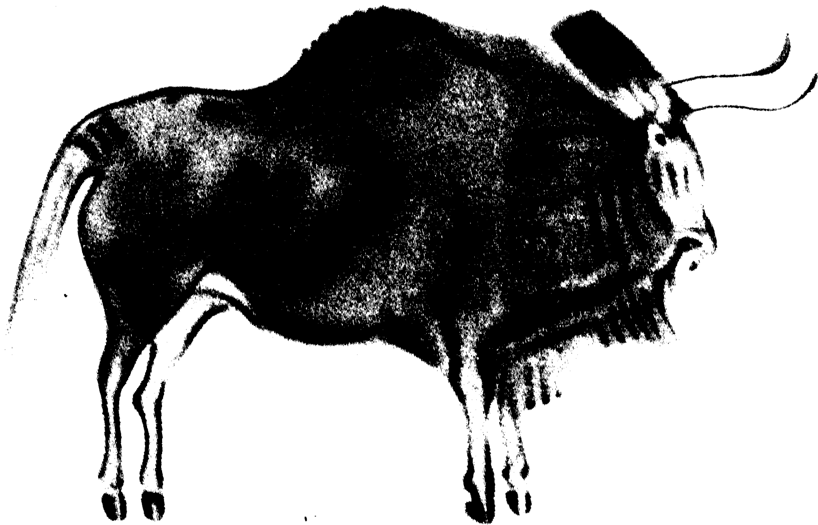
গিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা পূর্ববর্তী সমগ্র পুরা প্রস্তরযুগের নর-কংকালের একত্রিত সংখ্যা অপেক্ষা বেশী।

প্রাগৈতিহাসিক চিত্রাংকন ও ভাস্কর্য

খাদ্যের ভাবনা অনেকটা দূর হইলে মানুষের ভাগ্যে সম্ভবতঃ এই প্রথম কিছু কিছু অবসর মিলিতে লাগিল। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ চিত্রাংকন, ভাস্কর্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে মনোনিবেশ করে। ম্যাগ্‌দালেনীয় কালচার চিত্রাংকন ও ভাস্কর্যের দিক হইতে বিশেষ



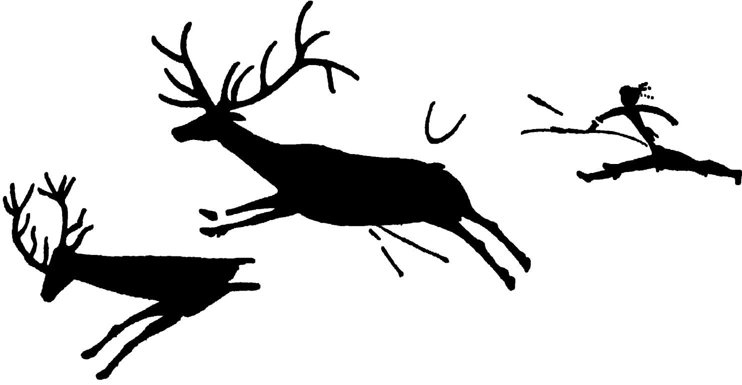
(১)



(২)

(১) ও (২)—বাইসন (উত্তর স্পেনের আল্‌তামিরা গুহাকন্দরে প্রাপ্ত)।

সম্বন্ধ। প্রস্তর ও হাতীর দাঁতে নির্মিত যন্ত্রপাতির উপরে এই সব চিত্র অঙ্কিত। গুহাপ্রাচীর ও ছাদ এইরূপ বহু চিত্রের দ্বারা সুশোভিত দেখা যায়। প্রায় সব ক্ষেত্রেই চিত্রের বিষয়বস্তু জন্তু-জানোয়ার, বিশেষতঃ সেই সব জন্তু যাহা প্রাগৈতিহাসিক মানুষের প্রিয় শিকার ছিল; যেমন—বাইসন, বলগা হরিণ, বন্য অশ্ব, ভল্লুক, বন্য শূকর, বন্য গবাদি পশু ও মাঝে মাঝে অতিকায় জন্তু। প্রথমে এই সব চিত্র ছিল কেবল রেখাঙ্কন। অরিনেশী[illegible] [illegible]চারে রেখাচিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। ম্যাগ্‌দালেনীয় চিত্রাঙ্কনে রেখার পর্যায় [illegible]স হইয়াছে; ইহা সর্বাদক দিয়াই পরিপূর্ণ। চিত্রের প্রকাশভঙ্গী ও গভীরতার মধ্যে শিল্পীর অপূর্ব নৈপুণ্যকে ভুল করিবার উপায় নাই। বর্তমান নামকরা চিত্রশিল্পীদের মতে এই সব প্রাগৈতিহাসিক চিত্র সর্বাদক দিয়াই খাঁটী আর্টের পর্যায়ভুক্ত।

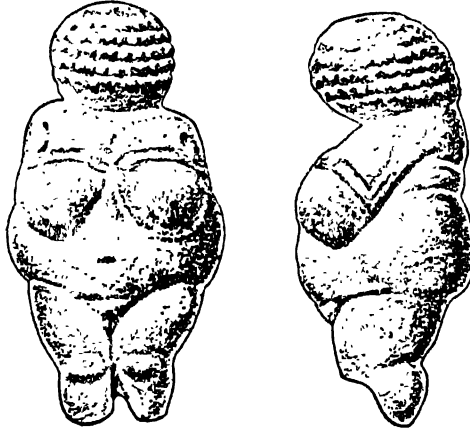


৮। বলগা হরিণ শিকার—স্পেনের কুইভা দেল্ মা দ' জোসেফ গুহাকন্দরে প্রাপ্ত পুরা প্রস্তরযুগের একটি প্রাচীর চিত্র।

এইখানে একটি কথা আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে। প্রাগৈতিহাসিক শিল্পী ঠিক আর্টের জন্য চিত্র অঙ্কিত করে নাই বা নানাপ্রকার প্রস্তরমূর্তি গড়ে নাই। তাহার উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ। শিকারের মধ্যে সব সময়েই একটি অনিশ্চয়তা থাকে। এই অনিশ্চয়তার উপর শিকারীর কোন হাত নাই; অথচ ইহা তাহার ও পরিবারবর্গের পক্ষে আহার বা উপবাসের সমস্যা। এইরূপ অবস্থায় শিকারের সম্ভাবনা বাড়াইবার জন্য প্রাগৈতিহাসিক শিকারী যাদুবিদ্যার শরণাপন্ন হইয়া থাকিবে। মনে হয় তাহার শিল্প-সৃষ্টি প্রধানতঃ এই যাদুবিদ্যার দ্বারা অনুপ্রাণিত। গুহাগাত্রে একটি বাইসন বা বলগা হরিণেব ছবি আঁকিবার সময় তাহার মনে হইয়াছে, এই একটু আগেও যেখানে কিছুই ছিল না, এখন দেখ সেখানে কেমন একটি নধরকান্তি বাইসন বা বলগা হরিণ দাঁড়াইয়া আছে, যেন হাত বাড়াইয়া ধরা চলে। পাথরের আর এক খোঁচায় এইবার একটি বর্শা আঁকিয়া বাইসনটিকে বিদ্ধ করিলেই হইল। গুহা-কন্দরে চিত্রিত এই মূর্তি কি মিথ্যা? বাহিরের মুক্ত প্রান্তরে গিয়া সে কি অবিলম্বে দেখিতে পাইবে না, সত্যই সেখানে এইরূপ একটি নধরকান্তি বাইসন তাহার বলিষ্ঠ হাতে বর্শা-বিদ্ধ হইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে? এইভাবে যাদুবিদ্যার প্রভাব বাড়াইবার জন্য প্রাগৈতিহাসিক চিত্রকর স্বেচ্ছায় দুর্গম বিপদসঙ্কুল ও বাসের অযোগ্য গুহা-গহ্বর বাছিয়া লইয়াছে এবং নানাপ্রকার দৈহিক ক্লেশ ও অসুবিধা সত্ত্বেও এই সকল দুরধিগম্য স্থানে বসিয়া ছবি আঁকিয়াছে। কারণ, তাহার মনে হইয়াছে, এইরূপ অসুবিধা

সত্ত্বেও যদি জীবন্ত চিত্রাঙ্কন সম্ভবপর হয়, তবে শত অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও হয়তো সে শিকারে সফল হইবে। আর একটি বিষয় লক্ষণীয় এই যে, এই সব চিত্রে কচিৎ মনুষ্য-মূর্তি দৃষ্ট হয়। মানুষের প্রতিকৃতি আঁকিলে পাছে জন্তুরা তাহা দেখিয়া মানুষের উপর অনুরূপ পাল্টা যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে, সম্ভবতঃ সেই ভয়ে এইরূপ চিত্রাঙ্কন হইতে সে সম্পূর্ণ বিরত থাকিয়াছে।

অরিনেশীয় ও প্রেদ্‌মোস্তীয় ভাস্করদের তৈয়ারী পাথর ও হাতীর দাঁতের কয়েকটি ক্ষুদ্র নারী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহারা সন্তান-সম্ভবা স্থূলকায়া নারীদের মূর্তি; স্ত্রী জাতির দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি অস্বাভাবিকভাবে অতিরঞ্জিত, অথচ মুখমণ্ডলে নাক, চোখ, মুখ প্রভৃতি কিছুই দেখানো নাই। এই মূর্তিগুলিও যাদুবিদ্যার এক প্রকাশ। এইরূপ উদ্ভট মূর্তির দ্বারা সম্ভবতঃ উর্বরতার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মনুষ্যজাতির উর্বরতা? শিকারের উর্বরতা?



৯। অরিনেশীয় ও প্রেদ্‌মোস্তীয় ভাস্করদের তৈয়ারী নারী মূর্তি।

পুরা প্রস্তরযুগের শেষভাগে অরিনেশীয়, ম্যাগ্‌দালেনীয়, প্রেদ্‌মোস্তীয় প্রভৃতি বিভিন্ন কালচারের মানুষের উপরিউক্ত তৎপরতা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, মানুষ এই সময়ে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। মাত্র ২০,০০০ বৎসরের মধ্যে পুরা প্রস্তরযুগের শেষ নেতারা পাথরের যন্ত্র নির্মাণে যুগান্তর আনিয়াছে। পাথরের সঙ্গে সঙ্গে হাড় ও দাঁত যন্ত্র ও অস্ত্র নির্মাণের কাজে প্রয়োগ করিয়াছে। তীর, ধনুক, বর্শা, হার্পুণ প্রভৃতি নূতন নূতন অস্ত্র উদ্ভাবন করিয়া তাহার শিকারী জীবনের সাফল্য সুনিশ্চিত করিয়া তুলিয়াছে। চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য ও যাদুবিদ্যার মধ্য দিয়া মানব মনের উচ্চতর বৃত্তিগুলির অনুশীলন আরম্ভ করিয়াছে। শেষের দিকে আজিলীয় কালচারের একদল মানুষ কুকুরকে পোষ মানাইয়া শিকারের ইতিহাসে আর একটি নূতন অধ্যায় রচনা করে। পশুকে পোষ মানাইবার ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত। সেইরূপ কাম্পিনীয় কালচারের আরও একদল মানুষকে মৃৎপাত্র গড়িবার প্রাথমিক চেষ্টাও এই সময়ে করিতে দেখা যায়। সুতরাং পূর্ববর্তী যুগের লক্ষ লক্ষ বৎসরের ব্যাপক নিশ্চেষ্টতার তুলনায় ইহা যে অতি দ্রুতগতি তাহাতে আর সন্দেহ কোথায়? তথাপি প্রস্তরযুগের প্রথম ও বিরাট বিপ্লব সংঘটিত হইতে তখনও বাকী। মানুষ তখনও খাদ্য-সংগ্রাহকের অবস্থা হইতে খাদ্য-উৎপাদকের অবস্থায় উন্নীত হয় নাই।

(২) নব্য প্রস্তরযুগের বিপ্লব—কৃষি, পশুপালন, মৃৎশিল্প ইত্যাদি

গর্ডন চাইল্ড্ খাদ্য-সংগ্রাহকের অবস্থা হইতে খাদ্য-উৎপাদকের অবস্থায় মানুষের উন্নীত হইবার ঘটনাকে বৈপ্লবাত্মক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পশু ও মৎস্য শিকারের দ্বারা ও তাহার ফাঁকে ফাঁকে বনের ফলমূল কুড়াইয়া যখন মানুষের দিন কাটিতেছিল, তখন একমাত্র খাদ্য সংগ্রহ করা ছাড়া তাহার আর কিছু করিবার ফুরসত ছিল না। শিকারের পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইবার জন্য স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রয়োজন হয় নাই, দলবদ্ধভাবে বিচরণ করিলেও এই অবস্থায় গ্রাম ও সমাজ জীবনের উদ্ভব অসম্ভব। এই যাযাবর জীবনে শিশু ও বৃদ্ধ অবাঞ্ছিত বোঝা স্বরূপ। তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি নির্ভর করিয়াছে শিকারের সংখ্যা ও সুলভতার উপর। শিকার যেখানে অপ্রতুল ও নিঃশেষের পথে, মনুষ্যগোষ্ঠীও সেখানে ক্রমশঃ ক্ষয়িষ্ণু।

এই অবস্থার সহিত খাদ্য-উৎপাদকের অবস্থার তুলনা করা যাক। কৃষির আবিষ্কারের ফলে সে এখন নিজেই শস্য উৎপাদন করিতেছে। মেষ, ছাগল, শূকর ও গবাদি পশুকে পোষ মানাইয়া খাদ্য-তালিকায় মাংস সরবরাহের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে। শস্যক্ষেত্র ও পশুর পাল তদারক করিবার জন্য এখন হইতে স্থায়ীভাবে একস্থানে বসবাসের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইহার ফলেই গ্রাম ও একপ্রকার সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। কৃষিজাত ও পশুজাত রকমারি খাদ্য মানুষের পুষ্টিবর্ধন করিতে থাকে। লোকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শিশু ও বৃদ্ধ তখন আর বোঝা নহে; তাহারা স্বল্প শ্রমসাধ্য পশুপালনে, ক্ষেতের আগাছা বাছিবার কাজে সহায়তা করিতে পারে। বৎসরের যে সময়ে কৃষির কাজ অচল তখন গ্রাম ছাড়িয়া পশু ও মৎস্য-শিকারে বাহির হইবার প্রলোভন তো আছেই। শিকার মিলিলে ভাল, রিক্তহস্তে ফিরিলেও অনশনের দুর্ভাবনা নাই; শস্য ও পশুর পাল ঘরে মজুত আছে। তারপর এই শস্য মজুতের জন্য তাহাকে মৃৎপাত্র গড়িতে হইতেছে; পটু কুম্ভকারেরা কেবল পাত্র গড়িয়া ও কৃষকের সহিত খাদ্য বিনিময় করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিতে পারে; ক্ষেতখামার, পশুপালন বা শিকারের ঝুঁকি পোহাইবার তাহাদের দরকার নাই। ইতিমধ্যে আর একদল লোক পশুর লোমের সাহায্যে বয়নবিদ্যা আয়ত্ত করিয়া মানুষের আর একটি প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইতে সহায়তা করিতেছে।

কৃষি ও পশুপালনের সাহায্যে খাদ্য-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের পর মানুষের অন্য দিকে মন দিবার অবসর হইল। সে নূতন নূতন অভাব সম্বন্ধে সচেতন হইতে আরম্ভ করিল। এতদিন সেই সব অভাবের কথা ভাবিবার ফুরসত তাহার মিলে নাই। এই সব বিচিত্র তৎপরতার জন্য সহযোগিতা ও সমাজ ব্যবস্থা অপরিহার্য। গ্রামের মোড়লকে এখন অনেক নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। একজনের ভেড়ার পাল আর একজনের গমের ক্ষেত নষ্ট করায় শেষোক্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের দাবী লইয়া মোড়লের শরণাপন্ন হইল। শিকারীদের দলপতিকে কখনও এই জাতীয় প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামাইতে হয় নাই। এমন কি, যাদুবিদ্যা, ভূত-প্রেত, দেব-দেবীর স্বরূপও বদলাইয়া গিয়াছে। এখন তাহার এমন যাদুবিদ্যার দরকার, যাহাতে ভূমির উর্বরতা অব্যাহত থাকে, অজন্মা না আসে, পশুর পালে মড়ক না লাগে। এইসব উৎপাত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ দেব-দেবীরই এইবার প্রয়োজন।

দুই অবস্থার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। মানুষের জীবনযাত্রায় ইহা এক বিরাট পরিবর্তন। আনুমানিক দশ হাজার বৎসর আগে এই পরিবর্তনের সূচনা এবং ছয় হাজার বৎসর আগে নব্য প্রস্তরযুগের কালচার পূর্ণভাবে বিকশিত। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যে—, ইহা যে কত অল্প তাহা পূর্ববর্তী মুস্তেরীয় অথবা তাহারও পূর্বে চেলীয় কালচারের দীর্ঘকাল স্থায়িত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝা যাইবে—মানুষ বর্বর জীবন পরিত্যাগ করিয়া সভ্যজীবন যাপন করিবার প্রায় প্রতিটি আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে এক বিরাট বিপ্লব।

যাহা হউক, নব্য প্রস্তরযুগের কয়েকটি প্রধান আবিষ্কার ও বৈশিষ্ট্য হইলঃ—

(১) কৃষি—গম, বার্লি, ধান, মিলেট, যব রাই;
(২) পশু পোষমানানো ও পশুপালন—মেষ, ছাগল, শূকর ও গবাদি পশু;
(৩) মৃৎশিল্প;
(৪) বয়ন;
(৫) হ্রদের উপর গৃহনির্মাণ।

এই আবিষ্কারগুলির বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

কৃষি

পুরা প্রস্তরযুগের শেষভাগে ফ্রান্সের অরিনেশীয় ও ম্যাগ্‌দালেনীয় মানুষ যন্ত্রনির্মাণে, চিত্রাংকনে, ও স্থাপত্যে যথেষ্ট উৎকর্ষতার পরিচয় দিলেও কৃষি আবিষ্কারের মারফৎ নিওলিথিক বিপ্লব প্রথম তাহাদের মধ্যে আসে নাই। এই বিপ্লবের ক্ষেত্র উত্তর আফ্রিকা, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া, পারস্য ও ভারতবর্ষ। মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্রে এই অঞ্চলগুলি জুড়িয়া দিলে বাঁকা চাঁদের মত যে ভূখণ্ড আত্মপ্রকাশ করে সেই fertile crescent বা খণ্ড চন্দ্রাকৃতি উর্বর ভূভাগে প্রথম কৃষিকার্যের উদ্ভব হয়। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা ও আবিষ্কৃত তথ্যসমূহ হইতে এই সিদ্ধান্ত এখন সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

গমঃ কৃষির মধ্যে গম ও বার্লির চাষ প্রাচীনতম। বর্তমানে যে প্রজাতির গম ও বার্লির চাষ হইয়া থাকে তাহাদের পূর্বপুরুষ কয়েক প্রকার বন্য তৃণ। আধুনিক গম ও বার্লি এই সব তৃণের সংমিশ্রণের ফলে উদ্ভূত সংকর উদ্ভিদ। গমের পূর্বপুরুষ ডিন্‌কেল ও এমের নামে দুইপ্রকার বুনো ঘাস এখনও প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। প্রথমটি জন্মে বলকান, ক্রিমিয়া, এসিয়া মাইনর ও ককেশাসের পার্বত্য অঞ্চলে এবং দ্বিতীয়টি জন্মে প্যালেস্টাইন ও পারস্যের পার্বত্য অঞ্চলে। বর্তমান অবস্থান হইতে অবশ্য সুদূর প্রস্তরযুগে ইহাদের আবাসভূমি আন্দাজ করা সহজ নয়; কারণ আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদেরও স্থান পরিবর্তন ঘটিয়াছে। উদ্ভিদ-ভূগোল (plant geography) সংক্রান্ত গবেষণা হইতে ভাবিলভ্ অনুমান করেন, আফগানিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম চীনে সম্ভবতঃ প্রথম গমের চাষ আরম্ভ হয়। প্রাগৈতিহাসিক সুইট্‌জারল্যাণ্ড ও মধ্য ইউরোপের নানাস্থানে যে একপ্রকার নিকৃষ্ট জাতের গমের চাষের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা সম্ভবতঃ ডিন্‌কেল ঘাস হইতে উদ্ভূত। এমের (*Triticum dicoccum*) চাষ হইতে পুরাকালে মিশর, এসিয়া মাইনর ও পশ্চিম ইউরোপে উৎকৃষ্ট গম উৎপন্ন হইত এবং কোন কোন স্থানে এখনও উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া *Triticum vulgare* নামে আর এক প্রজাতির গমের চাষ প্রাচীন মেসোপোটেমিয়া, তুর্কীস্তান, পারস্য ও ভারতবর্ষে দেখা যায় এবং বর্তমানে ইহার চাষই অধিকাংশ স্থানে চলিতেছে। ইহার কোন বন্য প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ এমের ও অজ্ঞাত আর একপ্রকার বন্য তৃণের সংমিশ্রণে উদ্ভূত ইহা একটি সংকর উদ্ভিদ।

বার্লির পূর্বপুরুষও একপ্রকার পার্বত্য তৃণ। উত্তর আফ্রিকার মার্মারিকা, প্যালেস্টাইন, ট্রান্স্‌ককেশাস্‌, পারস্য, আফগানিস্তান ও তুর্কীস্তানে এই পার্বত্য তৃণ জন্মায়। ভাবিলভের মতে, আফগানিস্তান ও দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় প্রথম বার্লির চাষ হওয়ার কথা। এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। প্যালেস্টাইনে নাটুফীয় কালচারে নব্য প্রস্তরযুগের প্রথম ভাগে বার্লি চাষের নজির দেখা যায়। তবে নাটুফীয়রাও যে অন্য স্থান হইতে এই জ্ঞান আমদানি করে নাই তাহাই বা কে বলিতে পারে?

ধানের চাষ গম ও বার্লির কিছু পরে। তবে ইহার আবিষ্কার যে প্রাগৈতিহাসিক

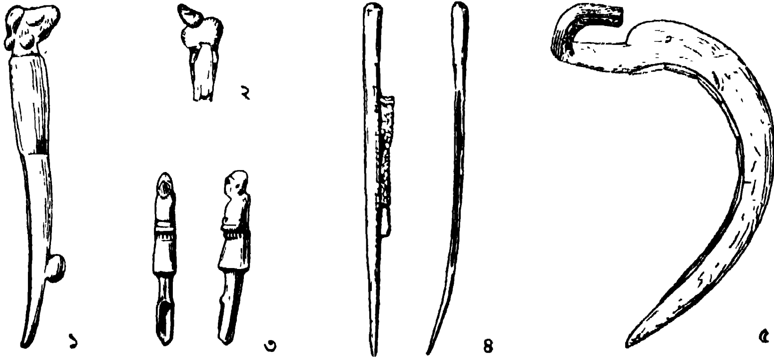
তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে ইহার চাষ প্রথম আরম্ভ হয়।* চীনদেশে ধান চাষের প্রবর্তন হয় আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দে। সে দেশের নিওলিথিক শস্য ছিল মিলেট।

গম, বার্লি, ধান ও মিলেট ছাড়া যব ও রাই-এর চাষও প্রবর্তিত হইয়াছিল নব্য প্রস্তরযুগে।

কৃষির প্রাচীনতা

এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক কৃষিজীবীদের আবির্ভাব সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিকদের আবিষ্কার বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্যালেস্টাইনে ওয়াদি-এল্-নাটুফ (Wadi-el-Natuf) নামক স্থানে প্রত্নতত্ত্বীয় খননকার্য হইতে যে সব দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রায় দশ হাজার বৎসর পূর্বে একদল মানুষ খাদ্য-সংগ্রাহকের জীবন পরিত্যাগ করিয়া খাদ্য-উৎপাদকের জীবন অবলম্বন করিতেছে। নাটুফীয়দের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদির মধ্যে ছোরা, চামড়া ছাড়াইবার যন্ত্র, বঁড়শি, কাঁটা প্রভৃতি পশু ও মৎস্য শিকারের উপযোগী অস্ত্রও যেমন অনেক পাওয়া গিয়াছে, সেইরূপ কয়েকটি কাস্তে এবং ঘাস ও শস্য কাটিবার ছুরিও এই সংগ্রহের মূল্যবান সামগ্রী। ঘাস ও শস্যের মধ্যে কিছু পরিমাণ সিলিকা বা বালি থাকে। এজন্য ক্রমাগত সিলিকার ঘর্ষণে শস্য কাটিবার যন্ত্র আপনা হইতেই মসৃণ ও চক্‌চকে ভাব ধারণ করে। উপরিউক্ত কাস্তে ও ছুরির মসৃণতা দেখিয়া মনে হয়, একদা ইহারা শস্য কাটিবার কাজে ব্যবহৃত হইত। তারপর কয়েকটি খল ও মেঝের উপর বৃহদাকার গর্ত দেখিয়া মনে হয়, এইখানে শস্য ভাঙ্গাই বা পেষাই হইত।

মেসোপোটেমিয়ায় মসুলের অনতিদূরে টেল হাসুনা (Tell Hassuna) নামক স্তূপের সর্বনিম্ন স্তরে নিওলিথিক কৃষির আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। এই স্থান হইতে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা উদ্ধার করিয়াছেন নিড়ানী, শস্য ভাঙ্গিবার খল ও নোড়া, শস্য রাখিবার মৃৎপাত্র, মেষ ও গবাদি পশুর হাড় ইত্যাদি। এই অঞ্চলের নিওলিথিক গোষ্ঠীরা যে কৃষিজীবী ও পশুপালক ছিল, দ্রব্যগুলি তাহার অকাট্য নিদর্শন। উপরের কয়েকটি স্তরে উন্নততর কৃষি ও পাকাপাকিভাবে বসতি স্থাপনের আরও অনেক চিহ্ন বিদ্যমান।



১০। প্যালেস্টাইন (১ ও ২), শিয়াল্‌ক্ (৩), ফায়ুম (৪) ও সাকারা (মিশর) (৫) প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের কৃষির উপযোগী যন্ত্রপাতি।

উত্তর পারস্যে কাসানের নিকট টেপ্ শিয়াল্‌কে (Tape Sialk) প্রত্নতত্ত্বীয় খননকার্যের আর একটি কেন্দ্রের সর্বনিম্ন স্তরে অনুরূপ প্রাথমিক কৃষিকার্যের অনেক চিহ্ন বর্তমান।

* Stuart Piggott, *Prehistoric India*, Penguine Books, 1950; p. 43.

এখানে একটি নরকঙ্কালের হাতে একটি প্রস্তরময় কুঠার এবং সেই সঙ্গে শস্য কাটিবার কয়েকটি ছুরি, কাস্তে ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। নাটুফে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতির সহিত ইহাদের বিশেষ মিল আছে। কয়েকটি ভাঙ্গা মৃৎপাত্রও এইখানকার বৈশিষ্ট্য। এইগুলি আবার দেখিতে হাসুনার মৃৎপাত্রের মত। সর্বনিম্ন স্তরের কিছু উপরে মাটির বাড়ী ও বসতি স্থাপনের নানাপ্রকার চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অঞ্চলে ধাতব দ্রব্যের ব্যবহারও সম্ভবতঃ প্রথম। তাম্র নির্মিত কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য-প্রাপ্তি তাহা নির্দেশ করিয়াছে।

ভারতবর্ষে নব্য প্রস্তরযুগের কৃষিকার্যের প্রমাণ বেলুচিস্তানের ঝোব উপত্যকার রাণা ঘুণ্ডাই টেল্ (Rana Ghundai Tell) হইতে পাওয়া গিয়াছে। এখানেও একদল নিওলিথিক কৃষিজীবীর তৎপরতার কয়েকটি চিহ্ন বর্তমান; তবে এই তৎপরতা প্যালেস্টাইন, মেসোপোটেমিয়া অথবা পারস্যের মত অত প্রাচীন নয় এবং সম্ভবতঃ এই সব অঞ্চল হইতে কৃষিবিদ্যা নব্য প্রস্তরযুগের শেষের দিকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল।

আমরা মিশরের কথা এ পর্যন্ত কিছু উল্লেখ করি নাই। কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের ধারণা, নীল নদের উপত্যকাই কৃষির আদি জন্মভূমি। নীল নদের নিয়মিত বন্যার ফলে পলিমাটি পড়িয়া এই উপত্যকার মৃত্তিকাকে চির-উর্বর রাখিবার যে আয়োজন প্রকৃতি আপনা হইতেই



১১। ফার্টাইল ক্রিসেণ্ট—মধ্যপ্রাচ্যের এই খণ্ডাকৃতি ভূভাগে প্রথম কৃষির উদ্ভব হয়।

করিয়া রাখিয়াছে তাহাতে কৃষির প্রথম আবির্ভাব এই স্থানেই হইয়াছিল, পেরী তাঁহার *Growth of Civilization* গ্রন্থে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কাইরোর দক্ষিণে নীল নদের ২৫ মাইল পশ্চিমে ফায়ুম হ্রদের ধারে ধারে একটানা বহু ছোট ছোট গ্রাম ও কৃষির উপযোগী নানা সরঞ্জামের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা যে এক অতি সমৃদ্ধ নিওলিথিক কালচারের সাক্ষ্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা যে প্রাচীনতম তাহাতে মতভেদ আছে। গর্ডন চাইল্ডের অভিমত এই যে, নীল নদের উপত্যকা অঞ্চলের বিশেষ প্রাকৃতিক অবস্থা কৃষি আবিষ্কারের কারণ মানিতে হইলে প্যালেস্টাইন, মেসোপোটেমিয়া, পারস্য প্রভৃতি স্থানের কৃষিকার্যের সুপ্রাচীনত্ব ব্যাখ্যা করা কঠিন। তারপর প্রত্নতত্ত্বীয় গবেষণার দ্বারা নাটুফ, হাসুনা, শিয়াল্ক্ প্রভৃতি স্থানের কাল ফায়ুমের কালের অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই কারণেই মনে হয়, নাটুফ, হাসুনা বা শিয়াল্কে নব্য প্রস্তরযুগে যাহারা প্রথম বসতি স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছিল তাহারাই সম্ভবতঃ প্রাচীনতম কৃষিজীবী মানবগোষ্ঠী। উপরিউক্ত কেন্দ্রসমূহের প্রত্নতত্ত্বীয় আবিষ্কারগুলি সারণীর আকারে দেখানো হইল।

দেশ	প্রত্নতত্ত্বীয় খনন-কার্যের কেন্দ্র	খাদ্য উৎপাদন ও পশুপালন											ব্যবহার্য দ্রব্য												
		শস্য উৎপাদন ও বোঝাই-এর সরঞ্জাম							গৃহপালিত পশু				বাসস্থান			বয়ন			যন্ত্রপাতি			যন্ত্র-নির্মাণের দ্রব্য			
		শস্য	কাস্তে	নিড়ানী	যাঁত	শিলন্	মৃৎপাত্র	ঝুড়ি	মেষ	কুকুর	শূকর	গবাদি পশু	গুহা	কুঁড়ে	গ্রাম	পিন	সুচ	বস্ত্র	তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্র	ছুরি	হাতুড়ি	ফ্লিন্ট পাথর	ঘষা পাথর	হাড়	ধাতু
মিশর	ফায়ুম	○	○	○	?	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
মেসোপোটেমিয়া	হাস্থনা	?	○	○	○	○	○		○		?	○		○	○		○		○	?		○	○	○	
পারস্য	শিয়াল্‌ক্		○	○	○		○		○			?		○	○	○				?		○	○	○	○
প্যালেস্টাইন	নাটুফ্		○		○					○			○			○	?		○	?	○	○		○	

○—দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। ?—অস্তিত্ব সন্দেহজনক।

১২। নব্য প্রস্তরযুগের কৃষিজীবী কয়েকটি মানবগোষ্ঠীর ব্যবহৃত দ্রব্য ও যন্ত্রপাতির নমুনা (রবার্ট ব্রেইডউডের *Prehistoric Men* গ্রন্থে প্রদত্ত তালিকা অবলম্বনে রচিত)

প্রথম অবস্থায় কৃষিজীবীদের পক্ষে একস্থানে অধিক দিন বসতি স্থাপন সম্ভবপর হয় নাই। পর পর কয়েক বৎসর একই ক্ষেত হইতে শস্য উৎপাদনের ফলে ভূমির উর্বরতা হ্রাস পাইলে উর্বর ক্ষেত্রের সন্ধানে তাহারা আবার অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইয়াছে। পশুপালন ও পশুবিচরণের দ্বারা ক্ষেত্রের উর্বরতা রক্ষার অভিজ্ঞতা না জন্মান পর্যন্ত কৃষিজীবীদেরও যাযাবরত্বের অবসান ঘটে নাই।

আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। গম, বার্লি প্রভৃতির বুনো ঘাস রোপণ করিয়া খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রথম কৃতিত্ব সম্ভবতঃ স্ত্রীজাতির। পুরুষেরা যখন বনে বাদাড়ে বন্য পশুর পশ্চাদ্ধাবনে ব্যস্ত, মেয়েরা সেই সময় গুহাকন্দরের আশে পাশে উদ্ভিদ্‌রাজ্য হইতে ফল মূল লতাপাতা আহরণের প্রচেষ্টা হইতে আকস্মিকভাবে ডিন্‌কেল্‌ বা এমের ঘাসের চারা রোপণ করিয়া এই আশ্চর্য ও যুগান্তকারী আবিষ্কারটি করিয়া থাকিবে।

পশুপালন

কৃষিকার্য আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে নিরীহ কয়েক জাতের বন্যজন্তুকে পোষ মানাইয়া নিওলিথিক মানুষ পশুপালনের অভ্যাস আরম্ভ করিয়াছিল কিনা, সে বিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে, শিকারীর পর্যায় হইতে কৃষকের পর্যায়ে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইবার পূর্বে মানুষের পশুপালকরূপে আবির্ভাবই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। আবার কেহ কেহ মনে করেন, প্রায় একই সময়ে মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে স্বতন্ত্রভাবে শিকারী, পশুপালক ও কৃষকরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। অর্থাৎ একদল লোক যখন বন্য তৃণের বীজ রোপণ করিয়া শস্য উৎপাদনের প্রাথমিক পরীক্ষা লইয়া ব্যস্ত, অন্যদল তখন আর এক স্থানে নিরীহ বন্যজন্তুদের পোষ মানাইবার কাজে মনোনিবেশ করিয়াছে। কিন্তু মেসোপোটেমিয়া, পারস্য ও মিশরে প্রাচীনতম নিওলিথিক কালচারের যে নমুনা পাওয়া যায় তাহাতে কৃষিকার্য ও পশুপালন এক সঙ্গেই চলিতে দেখা যায়। অন্ততঃ 'ফার্টাইল ক্রিসেণ্টে' পশুপালনের অভিজ্ঞতা যে কৃষির পরবর্তী ঘটনা তাহা এই অঞ্চলের মানব-তৎপরতার ধারা একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

পশুপালন বলিতে আমরা মেষ, ছাগল, শূকর ও গবাদি পশুর কথাই মনে করিতেছি। শুধু পোষ মানাইবার কথা উঠিলে অবশ্য নিঃসন্দেহে কৃষির আবির্ভাবের আগে শিকারী মানুষ প্রাণীদের মধ্যে প্রথম কুকুরকে পোষ মানাইয়াছিল। পুরা প্রস্তরযুগের শেষভাগে আজিলীয় কালচারের একদল শিকারী কুকুরকে পোষ মানাইয়া শিকারের যে বিশেষ সুবিধা করিয়া লইয়াছিল, সে কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

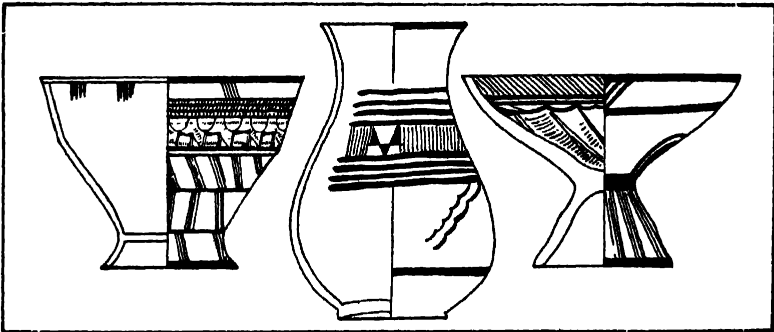
কৃষির সহিত পশুপালন আবিষ্কারের সম্পর্ক অনুমান করিবার একটি প্রধান কারণ এই যে, পৃথিবীর যে অঞ্চলে এক সময়ে গম ও বার্লির পূর্বপুরুষদের নিবাস ছিল, ঠিক সেই সব অঞ্চলে বা উহার অনতিদূরে বিচরণ করিত মেষ, ছাগল, শূকর ও গবাদি পশুর প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষেরা। পিরেনীজ হইতে হিমালয় পর্যন্ত প্রায় একটানা পার্বত্য অঞ্চলে এককালে বন্য মেষ ও ছাগলের বাস ছিল। বন্য মেষের এক প্রজাতি মুফ্লন ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপগুলিতে ও তুরস্ক হইতে পশ্চিম পারস্যের পার্বত্য অঞ্চলে এখনও বিচরণ করিয়া থাকে। আরও পূর্বদিকে তুর্কীস্তান, আফগানিস্তান ও পাঞ্জাবে বন্য মেষের আর এক প্রজাতি য়ুরিয়ালের বাস। আরও পূর্বে এসিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে থাকে আর্গল। মেসোপোটেমিয়ার প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভে মুফ্লন ও য়ুরিয়ালের চিত্র দেখা যায়। উপরিউক্ত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তৃণাচ্ছাদিত মুক্ত প্রান্তর, জংগল ও জলাভূমিতে গরু, মহিষ প্রভৃতি পশু ও শূকরের বন্য পূর্বপুরুষদেরও আদিনিবাস ছিল। সুতরাং এই সব অঞ্চলের অধিবাসীরাই যে মেষ, ছাগল, গরু, মহিষ ও শূকরকে প্রথমে পোষ মানাইয়া থাকিবে তাহার সম্ভাবনা প্রবল।

পশু পোষ মানাইবার কাজে শিকারী অপেক্ষা কৃষিজীবীদের অগ্রসর হইবার সম্ভাবনাই

বেশী। মধ্যপ্রাচ্যের যে সব অঞ্চলে কৃষির উদ্ভব হয় সেখানে নব্য প্রস্তরযুগে মাঝে মাঝে আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ উত্তর ইউরোপ ও এসিয়ার বরফ গলিবার ফলে এই অঞ্চলে বারিপাতের পরিমাণ কমিয়া মাঝে মাঝে দারুণ অনাবৃষ্টির সৃষ্টি হইয়াছিল। তখন জলাভাব ও উদ্ভিদাদির স্বল্পতার জন্য মানুষকেও যেমন ঝর্ণা, মরূদ্যান প্রভৃতি স্থানে সাময়িকভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে, সেইরূপ জল ও খাদ্যের সন্ধানে বন্য মুফ্লন, গরু, মহিষ প্রভৃতি জন্তুও এই সকল স্থানে মানুষকে অনুসরণ করিয়াছে। এই অবস্থায় মানুষ যদি ইতিপূর্বেই কৃষিকার্য গ্রহণ করিয়া থাকে তাহা হইলে শস্যের খোসা, ক্ষেতের নানা অব্যবহার্য উদ্ভিজ্জ পদার্থ নিরীহ দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত প্রাণীদের ঘুষ দিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের পোষ মানাইবার চেষ্টায় যে অগ্রসর হইবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, পোষ মানাইতে পারিলে প্রকারান্তরে তাহার নিজের খাদ্য-সমস্যারই একটা সুরাহা হইবার সম্ভাবনা আছে। এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া হয়ত সে এইসব প্রাণীদের অকারণে হত্যা বা ভয় দেখাইবার চেষ্টা হইতে বিরত রহিয়াছে, কাছে আসিতে উৎসাহ দিয়াছে, ইহাদের স্বভাব ও ব্যবহার ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করিয়াছে এবং শস্যের অখাদ্য অংশ হইতে জীবনধারণের সুযোগ দিয়া ক্রমে তাহাদের পোষ মানাইতে সমর্থ হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এরূপ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করা খাদ্য-উৎপাদক কৃষকের পক্ষেই সম্ভবপর। খাদ্য-সংগ্রাহক যে শিকারীকে দিন আনিয়া দিন খাইতে হয়, এরূপ পরীক্ষার কথা তাহার পক্ষে অচিন্তনীয়।

মৃৎশিল্প

কৃষি ও পশুপালন আবিষ্কারের সম্পর্ক সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও কৃষি ও মৃৎশিল্পের অভেদ্য সম্পর্কের বিষয়ে সেরূপ কোন মতভেদ নাই। মৃৎশিল্প কৃষি ব্যবস্থারই অনিবার্য ফল। গম বা বার্লির ফসল বৎসরে একবার মাত্র ফলে। কৃষিজীবীর ইহা সারা বৎসরের খাদ্য। কিছুটা অংশ আবার আগামী বৎসরের শস্যরোপণের বীজ হিসাবে ব্যবহার করিতে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে শস্য সঞ্চয় অপরিহার্য। শস্য সঞ্চয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্রের প্রয়োজন। একমাত্র গুহাবাসী নাটুফীয়দের ছাড়া শিয়াল্‌ক্‌, হাসুনা বা ফায়ুমে প্রাচীনতম কৃষিজীবীদের ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে মৃৎশিল্পের অস্তিত্বের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।



১৩। নিওলিথিক মৃৎপাত্র—রাণা ঘুণ্ডাই টেল্‌।

নানা কারণে মৃৎশিল্প একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। ইহা প্রাগৈতিহাসিক মানুষের চিন্তাধারার ও সভ্যতার যেমন একটি নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি তেমনি তাহার বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও তৎপরতার প্রকাশ ইহার মত আর কিছুতেই এত স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। বস্তুতপক্ষে মৃৎপাত্র নির্মাণের মধ্য দিয়া কুম্ভকার একটি জটিল রাসায়নিক পরিবর্তনই সজ্ঞানে

সম্পাদন করিয়া থাকে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে, মাটিকে নরম অবস্থায় ইচ্ছামত নানা আকারে গড়িয়া আগুনে পোড়াইলেই মৃৎপাত্র তৈয়ারী হইল। আসলে, হাইড্রেটেড্ অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট বা কুমোরের মাটি হইতে ৬০০ ডিগ্রীর উপর উত্তাপের সাহায্যে জলের কতকগুলি অণু তাড়াইয়া ও ভিতরে ভিতরে এক রাসায়নিক পরিবর্তন সম্ভব করিয়া তবে এই জমাটবাঁধা কঠিন পদার্থটি তৈয়ারী করিতে হয়। সবরকম মাটিতেই আর ভাল পাত্র গড়া যায় না। উপযুক্ত মৃত্তিকা নির্বাচন বহুদিনের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ। তারপর মাটির দানাগুলি মোটামুটি সমান হওয়া চাই; মোটা দানাগুলি ছাঁকিয়া বা ধুইয়া বাদ দিতে হইবে। মাটি আবার বেশী আঠাল হইলে হাতে লাগিয়া পাত্র গড়ার কাজে অসুবিধা সৃষ্টি করে; সুতরাং কিছু পরিমাণ বালি বা গুঁড়া পাথর মিশানো আবশ্যক। ভিজা ও নমনীয় অবস্থায় মৃৎপাত্রটিকে সরাসরি আগুনে পোড়াইতে গেলে ইহা ফাটিবার সম্ভাবনা; কাজেই ইহাকে রৌদ্র অথবা চুল্লীর অনতিদূরে অল্প উত্তাপে প্রথমে শুকাইয়া লইতে হইবে। আগুনে পোড়াইলে ভিজা কাদা মাটি শুধু কঠিনই হয় না, আশ্চর্যরূপে ইহার রং বদলাইয়া যায়। মাটির সঙ্গে নানারকমের রাসায়নিক দ্রব্যের ভেজাল থাকে—যেমন কিছু কিছু লৌহঘটিত লবণ। উন্মুক্ত চুল্লীতে পোড়াইবার ব্যবস্থা করিলে অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসিয়া লাল ফেরিক অক্সাইড উৎপন্ন হইবার ফলে পাত্রের রং লাল হইবে। কিন্তু কাঠকয়লার দ্বারা পাত্রটিকে ঢাকিয়া পোড়াইলে লৌহঘটিত লবণ বিজারিত হইয়া ফেরোসো-ফেরিক অক্সাইডে পরিণত হইবে। ইহার রং কালো; সুতরাং পাত্রের রং হইবে ধূসর।

নিওলিথিক কুম্ভকার এইরূপ রাসায়নিক পরিবর্তনের স্বরূপ ও কারণ নিশ্চয়ই জানিত না বটে; কিন্তু কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে বিভিন্ন রঙের ভাল মৃৎপাত্র তৈয়ারী করা যায়, সে বিদ্যা তাহার করায়ত্ত ছিল। গর্ডন চাইল্ড্ লিখিয়াছেন,—

> "The discovery of pottery consisted essentially in finding out how to control and utilize the chemical change just mentioned"

এবং অন্যত্র,

> "....the potter's craft, even in its crudest and most generalized form, was already complex. It involved an appreciation of a number of distinct processes, the application of a whole constellation of discoveries."

কৃষি আবিষ্কারের মত মৃৎশিল্পের আবিষ্কারের কৃতিত্বও সম্ভবতঃ স্ত্রীজাতির। প্রস্তরযুগ হইতে অদ্যাপি স্ত্রীজাতিই মৃৎপাত্রের প্রধান ব্যবহারক।

মানুষ মৃৎপাত্র আবিষ্কারের মধ্যে সৃষ্টির এক অব্যক্ত আনন্দের স্বাদ পাইয়াছিল। স্বাদ পাইয়াছিল তাহার অন্তর্নিহিত এক নূতন ক্ষমতার, যেমন একদিন সে পাইয়াছিল অগ্নি আবিষ্কারের মধ্যে। নোংরা কাদার তাল হইতে বিচিত্র বর্ণের বিবিধ আকৃতির অতি প্রয়োজনীয় কঠিন মৃৎপাত্র নির্মাণের অভিজ্ঞতার তুলনা নাই। মানুষ স্রষ্টার আসনে নিজেকে সেদিন প্রতিষ্ঠিত দেখিল। পরবর্তী যুগে ধর্মনায়কগণ ঈশ্বরের সৃষ্টিমহিমা কীর্তনে পার্থিব দৃষ্টান্ত খুঁজিতে গিয়া বার বার কুম্ভকারের সৃষ্টি-চাতুর্যেরই উল্লেখ করিয়াছেন।

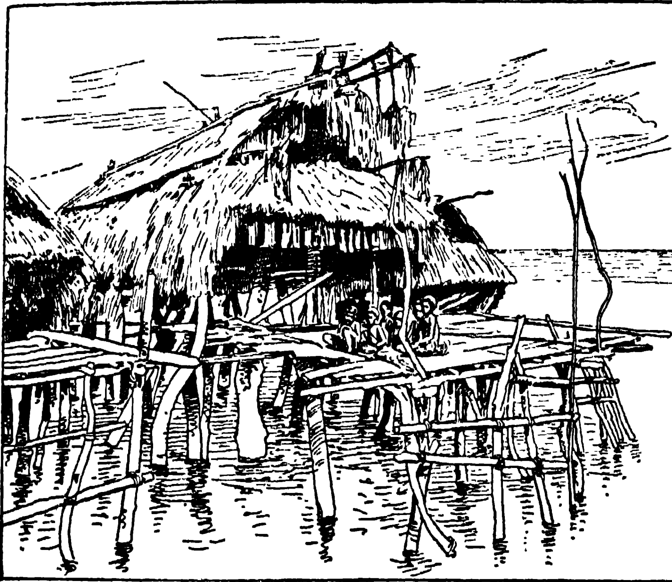
বয়ন শিল্প

বয়নবিদ্যার আবিষ্কার নব্য প্রস্তরযুগের শেষের ঘটনা। মানুষ পুরা প্রস্তরযুগ হইতেই জন্তু জানোয়ারের চামড়া চাঁছিয়া, শুকাইয়া পরিধেয় হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে। সেই চামড়ার দড়ি বানাইয়াছে এবং এই দড়ির সাহায্যে মাদুর বুনিয়াছে। বস্ত্র বুনিবার কাঁচা মাল হইল তিসি, তুলা বা পশুর লোম। কৃষিবিদ্যার যথেষ্ট অগ্রগতি না হইলে তিসি বা তুলা উৎপন্ন করিবার মত বিশেষ ধরনের উদ্ভিদের চাষ সম্ভবপর নহে। সেইরূপ বয়নের

কাজে পশুর লোম ব্যবহারের পূর্বে বিশেষ ধরনের লোমশ মেষের উৎপাদন আবশ্যক। মেষ সম্বন্ধে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ফলেই এইরূপ লোমশ মেষ-বংশের উদ্ভব সম্ভবপর। নব্য প্রস্তরযুগে মিশর ও সুইট্‌জারল্যাণ্ডে তিসির কাপড় বয়নের প্রমাণ পাওয়া যায়। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দে সিন্ধু উপত্যকায় ও অন্যান্য স্থানে তুলার চাষ ও বস্ত্র বয়নে ইহার ব্যবহার এবং মেসোপোটেমিয়ায় পশম ব্যবহার আরম্ভ হইয়া থাকিবে। তিসি, তুলা ও পশম হইতে কিরূপে সুতা প্রস্তুত হইত এবং বস্ত্র বয়নের জন্য কোন প্রকার আদিম তাঁত এই সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছিল কিনা এবং হইয়া থাকিলে তাহা কিরূপ, সে সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এখনও যথেষ্ট তথ্য উদ্ধার করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ সুতা প্রস্তুতের সরঞ্জাম ও তাঁত কাষ্ঠনির্মিত হওয়ায় এই দ্রব্যগুলি কালক্রমে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

হ্রদের উপর গৃহ-নির্মাণ

মধ্যপ্রাচ্যের নিওলিথিক কৃষিজীবীরা সাধারণতঃ মাটির ঘরে বাস করিত। এই সময়ে হ্রদ অঞ্চলের অধিবাসীরা জলের উপর কাঠের বাড়ী নির্মাণে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়। ১৮৫১-৫৪ সালের শীতকালে তাপমাত্রা অস্বাভাবিকরূপে কমিয়া গেলে জুরিক হ্রদের জল অনেক তলায় নামিয়া যায়। সেই সময় নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এই হ্রদের তীরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল পুরা একটি প্রাগৈতিহাসিক নিওলিথিক গ্রামের ধ্বংসাবশেষ। পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, নিওলিথিক আমলের সুইস্ হ্রদবাসীরা জলের মধ্যে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি পুঁতিয়া তাহার



১৪। নিউগিনিতে প্রাপ্ত নিওলিথিক আমলে হ্রদের উপর গৃহ-নির্মাণের নমুনা।

উপর শক্ত ও মজবুত গৃহ নির্মাণ করিত। হ্রদবাসীরা যে কর্মঠ ও কর্মকুশল জাতি ছিল তাহার অনেক প্রমাণ বিদ্যমান। ইহারা মেষ, ছাগল, শূকর ও গো-মহিষাদি পশু পালন করিত

এবং পশুর দুগ্ধ পান করিত। চাষের মধ্যে গম ও বার্লি উল্লেখযোগ্য এবং তিসি হইতে বস্ত্রবয়নে দক্ষতা লাভ করিয়াছিল। ফলের মধ্যে আপেল, চেরি, র‍্যাপস্‌বেরি, ব্ল্যাকবেরি ও আঙ্গুর প্রধান খাদ্য। অধিকন্তু ইহারা ছিল ভাল শিকারী। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের এই নিওলিথিক কালচার অবশ্য প্যালেস্টাইন, মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি স্থানের নিওলিথিক কালচারের অনেক পরবর্তী। স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, নিউগিনি প্রভৃতি আরও কয়েকটি স্থানে এই ধরনের নিওলিথিক হ্রদবাসীদের তৎপরতার কয়েকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে।

নিওলিথিক কালচারের বিচিত্র তৎপরতার ইহা অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এই যুগ নানা মৌলিক আবিষ্কারে সমৃদ্ধ। কৃষি, পশুপালন, মৃৎশিল্প, বয়ন, গৃহ-নির্মাণ এবং উন্নত ধরনের নানাপ্রকার যন্ত্রপাতির একটানা আবিষ্কার নব্য প্রস্তরযুগের তৎপরতাকে এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। এমন কি, ধাতুও আবিষ্কৃত হইয়াছিল এই যুগে। এক কথায়—সভ্যতা রচনার সকল বিদ্যা, সকল উপকরণ, সকল আয়োজন নিওলিথিক মানুষ সম্পূর্ণ করিয়াছিল এই অত্যল্প কালের মধ্যে। খ্রীষ্টজন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্বে তাইগ্রিস, ইউফ্রেতিস, নীল নদ ও সিন্ধু নদের উপত্যকায় সভ্যতার যে প্রথম বিকাশ, নূতন পথে বিজ্ঞানের যে জয়যাত্রা লক্ষ্য করিয়া আমরা বিস্ময়ে অবাক হই, ইহা তাহারই প্রস্তুতি।

২·৩। ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহার—স্বর্ণ, তাম্র, টিন, পিতল, রৌপ্য, সীসক, লৌহ—তথাকথিত তাম্র, ব্রোঞ্জ ও লৌহযুগ

স্বর্ণ

ধাতুর মধ্যে স্বর্ণের ব্যবহার প্রাচীনতম। স্বর্ণের সহিত নব্য প্রস্তরযুগের মানুষের যে পরিচয় ছিল তাহার প্রমাণ সে সময়কার পালিশ করা পাথরের যন্ত্রপাতির ধ্বংসাবশেষের সঙ্গে স্বর্ণময় দ্রব্যাদির অস্তিত্ব। ৬০০০ কি ৭০০০ বৎসর পূর্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলঙ্কার হিসাবেই স্বর্ণের আদি ব্যবহার দেখা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় বেলাভূমিতে মাঝে মাঝে স্বর্ণ পাওয়া যায়; নব্য প্রস্তরযুগে ব্যবহৃত স্বর্ণের ইহাই সম্ভাব্য প্রাপ্তিস্থান। স্বর্ণের বিশেষত্ব এই যে, অন্যান্য ধাতুর মত ইহার রং বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া কালো হইয়া যায় না। স্বাভাবিক অবস্থায় অক্সিজেনের সঙ্গে ইহার কোনরূপ যৌগিক ক্রিয়া না থাকায় ইহাকে উজ্জ্বল ও চকচকে অবস্থায় পাওয়া যায়। তারপর পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এই ধাতুটি বর্তমান; প্রাপ্তির দিক হইতে ইহা প্রায় লৌহঘটিত খনিজের মতই সুলভ। স্বর্ণের রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তা ও অন্যান্য পদার্থের তুলনায় অত্যধিক আপেক্ষিক গুরুত্বের জন্য কোন কোন শিলায় প্রথমাবস্থায় ইহা অল্প পরিমাণে অবস্থান করিলেও কাল সহকারে উক্ত প্রস্তরের ক্ষয় প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উহার স্বর্ণের ভাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে এবং একস্থানে সংগৃহীত হইতে দেখা গিয়াছে। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত এই উজ্জ্বল পদার্থের প্রতি যে সহজেই আকৃষ্ট হইবে এবং এই নমনীয় ধাতুটিকে অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহার করিবে, তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। নিওলিথিক ফ্রান্সের নানা ধ্বংসাবশেষের মধ্যে স্বর্ণের পুঁতি, মালা ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। সুমেরীয় উর, মিশরের প্রাক্-রাজবংশীয় স্মৃতিস্তম্ভ এবং ক্রীটের মিনোয়ান সভ্যতার ধ্বংসাবশেষগুলি ছোটবড় নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কারে সমৃদ্ধ।

তাম্র

তাম্রের ব্যবহার স্বর্ণের পূর্বে না পরে তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। কারণ তাম্রও স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থান করে। বাতাসের অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে

তাম্রের স্বাভাবিক তামাটে রং সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়। ইহা কালো বা সবুজ-কালো রং ধারণ করে। স্বর্ণ খুঁজিতে খুঁজিতে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ এইরূপ কালো বা সবুজ-কালো পাথর নিশ্চয়ই আবিষ্কার করিবে এবং লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে এই প্রকার পাথরকে সামান্য পিটাইলেই উজ্জ্বল হলুদ-লাল রং ধারণ করে। স্বর্ণের রং-এর সহিত এই নূতন পদার্থের রং-এর সাদৃশ্য এত প্রবল যে নিশ্চয়ই এই নূতন ধরনের প্রস্তরের প্রতি সে আকৃষ্ট হইবে। তাই স্বর্ণের পাশে অলংকার হিসাবে আমরা তাম্রেরও ব্যবহার লক্ষ্য করি ঐতিহাসিক কালের বহু পূর্ব হইতে। উত্তর পারস্যে টেপ্ শিয়াল্‌কে নিওলিথিক ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তাম্র



১৫। মিশরীয় স্বর্ণকারের কারখানা—চিত্রে স্বর্ণ ধোওয়া, গলানো, ওজন করা প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্রষ্টব্য।

নির্মিত ছোট ছোট পিন প্রাপ্তির কথা আগেই বলিয়াছি। টেপ্ শিয়াল্‌কের তারিখ হইতে এটুকু বলা যায় যে, তাম্রের ব্যবহার স্বর্ণের পূর্ববর্তী না হইলেও ইহা সমসাময়িক ত বটেই। প্রাক্-রাজবংশীয় আমলের মিশরীয় কবরে সোনা ও তামার পুঁতির মালা এক সঙ্গে অনেক পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন ক্যালডিয়ার ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও (খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০) তাম্রনির্মিত অলংকার ও দ্রব্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ইহা স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত তাম্রের ব্যবহারের কথা। খনিজ তাম্র হইতে বিশুদ্ধ ধাতুকে নিষ্কাশন করিয়া তাহার দ্বারা যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা এক সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। এই ব্যাপার সংঘটিত হইবার অর্থ ধাতুবিদ্যা সম্বন্ধে মানুষের যথেষ্ট জ্ঞানবৃদ্ধি। ধাতু যেখানে প্রচুর পরিমাণে স্বাভাবিক অবস্থাতেই পাওয়া যায়, সেখানে খনিজ ধাতুর সন্ধান ও তাহা হইতে বিশুদ্ধ ধাতু নিষ্কাশনের চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। আমেরিকার প্রাক্-কলম্বীয় রেড ইণ্ডিয়ানরা এই সেদিন পর্যন্ত সে দেশের প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত স্বাভাবিক তাম্র শুধু পিটাইয়া ও তাহার দ্বারা নানা দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিয়াছে। প্রকৃতির এই অযাচিত কৃপার জন্য খনিজ গলাইয়া বিশুদ্ধ ধাতু নিষ্কাশনের কথা তাহাদের ভাবিতে হয় নাই। তাই প্রাচীন পৃথিবীতে ধাতু নিষ্কাশন বিদ্যা প্রায় ৫,০০০ বৎসরের পুরাতন হওয়া সত্ত্বেও প্রাক্-কলম্বীয় রেড ইণ্ডিয়ানদের আমরা দেখি এ বিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

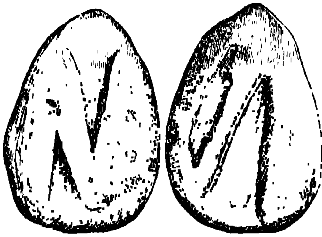
মেসোপোটেমিয়া ও পারস্যের অন্তর্গত 'ফার্টাইল ক্রিসেণ্টের' কুম্ভকার শ্রেণীর কারিগররা যে নিওলিথিক আমলেই তাম্র নিষ্কাশন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত। ম্যালাকাইট প্রভৃতি সুলভ খনিজ তাম্রকে প্রথমে ইহারা একপ্রকার প্রস্তর

বলিয়াই জ্ঞান করিত। হয়ত এইরূপ এক প্রস্তর নিতান্তই আকস্মিকভাবে বা খেলাচ্ছলে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবার ফলে প্রথমে কেহ দেখিয়া থাকিবে, এই প্রস্তর বিগলিত হইয়া একপ্রকার লোহিত পদার্থরূপে ক্ষরিত হইতেছে। এইরূপ অভিজ্ঞতা রীতিমত চাঞ্চল্যকর; সাধারণ প্রস্তর আগুনে এমন রহস্যজনকভাবে বদলায় না। তাম্রখনি অঞ্চলে নিওলিথিক বসতির তাঁবুতে বা গৃহে দৈব দুর্বিপাকে অগ্নিকাণ্ডের ফলেও এইরূপ অভিজ্ঞতালাভ অসম্ভব নহে। কাটাঙ্গা প্রদেশে খনি অন্বেষণকারীরা নিগ্রোপল্লীতে এই ধরনের অগ্নিকাণ্ডের পর অবশিষ্ট ভস্মস্তূপের মধ্যে তাম্রের দানা আবিষ্কার করিয়াছে।

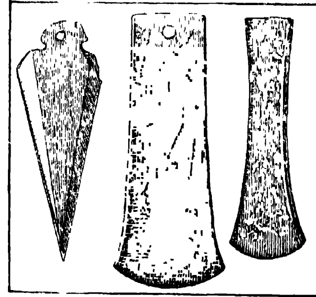
খনিজ গলাইয়া তাম্র নিষ্কাশন করিতে হইলে সাধারণতঃ ৭০০° হইতে ৮০০° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের মত উষ্ণতার প্রয়োজন। শুধু তাহাই নহে, অক্সিজেনের আধিক্য যথাসম্ভব কমাইয়া বিজারক প্রতিবেশের (reducing atmosphere) মধ্যে এই কার্য সমাধা করিতে হয়। আমরা দেখিয়াছি মৃৎপাত্র পোড়াইতেও এইরূপ উষ্ণতার প্রয়োজন। কাঠকয়লা ব্যবহার করিয়া বিজারক প্রতিবেশের সাহায্যে নিওলিথিক কুম্ভকার ধূসর বর্ণের মৃৎপাত্র গড়িতে ইতিপূর্বেই হাত পাকাইয়াছে। সুতরাং প্রস্তরবৎ খনিজতাম্রের বিগলন আকস্মিকভাবে কোথাও একবার দেখিয়া থাকিলে অনতিবিলম্বে খনিজ হইতে তাম্র নিষ্কাশন পদ্ধতি আবিষ্কার করা তাহার পক্ষে আদৌ কঠিন নহে। নিওলিথিক কুম্ভকার প্রথমে এইভাবেই যে তাম্র উৎপাদন করিয়া থাকিবে তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। স্টুয়ার্ট পিগট লিখিয়াছেন—

> "The transition from a closed kiln to a smelting furnace involves no great mental labour to conceive and it is not surprising, therefore, that we should find evidence of the earliest copper smelting among the makers of the painted pottery in the Ancient Orient."*

তাম্রখনিজ গলানো সহজ হইলেও ধাতুকে গলানো সহজ নয়। তাম্রের গলনাঙ্ক (melting point) ১০৮৫° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড্। এই উষ্ণতা নিওলিথিক কুম্ভকারের চুল্লীতে সম্ভবপর নহে। এইরূপ উচ্চ উষ্ণতা পাইতে হইলে বিশেষ ধরনের চুল্লী নির্মাণ আবশ্যক; তাহার



১৬। কুঠার ও ছুরির ফলা ঢালাই-এর উপযোগী পাথরের ছাঁচ।



১৭। তাম্র-নির্মিত দ্রব্যাদির কয়েকটি প্রাচীনতম নমুনা—ক্যাল্‌কোলিথিক যুগ।

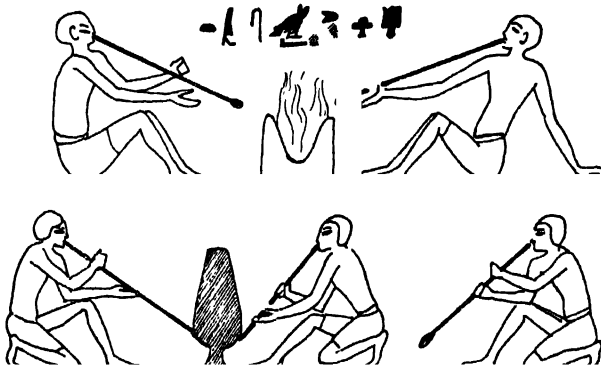
মধ্যে সজোরে বাতাসের ঝাপ্‌টা প্রবেশ করাইবার বন্দোবস্ত থাকা চাই এবং ইহার জন্য হাপরের প্রয়োজন। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে হাপর বহু পরে ঐতিহাসিক কালে আবিষ্কৃত

* Stuart Piggott. *loc. cit.*: p. 51-52.

হইয়াছিল। তারপর ঢালাই করিয়া নানা দ্রব্য প্রস্তুত করিবার জন্যই ধাতু গলাইবার প্রয়োজন। এই ঢালাই-এর পদ্ধতি বা টেক্‌নিক্‌ও এক কঠিন আবিষ্কার। ইহার জন্য ছাঁচ চাই। নিওলিথিক যুগে পাথর খোদাই করিয়া একপ্রকার ছাঁচ নির্মাণের কয়েকটি প্রমাণ বিদ্যমান। ছুরির ফলা অথবা কুঠারের ধাতব অংশের আকারে পাথর খোদাই করিয়া এইরূপ ছাঁচ তৈয়ার করা হইত। এইরূপ প্রাথমিক প্রচেষ্টা হইতেই পরে ফাঁপা ছাঁচের উদ্ভব হয়। সুতরাং নানা দ্রব্য নির্মাণে তাম্রের ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভব করিবার পূর্বে ধাতুবিদ্যা সম্বন্ধে আরও অনেক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় অপরিহার্য। ধীরে ধীরে এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা মানুষের আয়ত্ত হইলেই তাম্র প্রস্তরের স্থল অধিকার করিতে পারে। হয়ত ঐতিহাসিক কালের অব্যবহিত পূর্বে নদী-উপত্যকার নাগরিক সভ্যতার সূত্রপাতে তাম্রের ব্যবহার প্রসার লাভ করিয়াছিল। মেসোপোটেমিয়া ও মিশরে তাম্র নির্মিত দ্রব্যাদির ধ্বংসাবশেষ যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে উপরিউক্ত উপায়ে প্রাপ্ত তাম্রের ব্যবহার খৃীঃ পূঃ ৩,০০০ হইতে ৩,৫০০ অব্দের মধ্যে আরম্ভ হইয়াছিল, এইরূপ অনুমিত হয়।

ব্রোঞ্জ ও পিতল

তাম্রের কিছু পরেই ব্রোঞ্জ ও পিতলের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ব্রোঞ্জ তাম্র ও টিনের সংমিশ্রণে উৎপন্ন একটি সংকর ধাতু (alloy)। তাম্র ও দস্তার সংমিশ্রণে পিতল উৎপন্ন হয়। উভয় মিশ্র ধাতুই তাম্র অপেক্ষা অনেক কঠিন এবং অনেক কম উষ্ণতায় ইহাদের গলানো যায়। তাম্রের সহিত মাত্র ১ হইতে ৩ শতাংশ টিন মিশাইলে ইহার কাঠিন্য ও দৃঢ়তা অনেক বৃদ্ধি পায়। তারপর ঢালাই-এর কাজে বিশুদ্ধ তাম্র আদৌ সুবিধাজনক নহে। কারণ ইহার গলনাঙ্ক অনেক বেশী, ইহা গ্যাস শোষণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ধ্রের সৃষ্টি করে এবং ঠাণ্ডা হইবার সময় অধিকমাত্রায় সংকোচনের ফলে ছাঁচের আকৃতি নিখুঁতভাবে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয়। কিন্তু তাম্রের মধ্যে টিনের খাদ থাকিলে ইহার গলনাঙ্ক কমিয়া যায়। ধাতুর

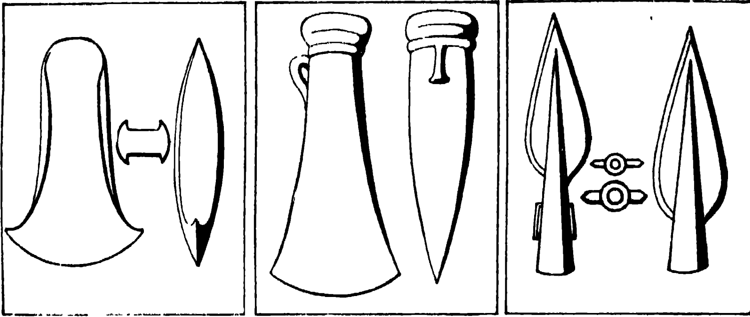


১৮। মিশরীয় কামারশালার দৃশ্য।

মধ্যে গ্যাসের বিশোষণ রুদ্ধ হয় এবং ঠাণ্ডা হইবার সময় ধাতুর সংকোচনও অনেক কম হইয়া থাকে। এই সব গুণের জন্যই ঢালাই-এর কাজে ব্রোঞ্জের ব্যবহার অনেক বেশী সুবিধাজনক। সুতরাং ব্যবহারের সুবিধার দিক বিবেচনা করিলে ব্রোঞ্জ ও পিতল তাম্র অপেক্ষা সব বিষয়ে শ্রেয়ঃ। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হইবে ইহাদের উদ্ভব টিন ও দস্তার আবিষ্কার সাপেক্ষ। কিন্তু ঠিক স্বতন্ত্রভাবে এই আবিষ্কার সংঘটিত হয় নাই। তাম্রের সঙ্গে কখনও টিনের কখনও এণ্টিমনির, কখনও দস্তার কিছু না কিছু খাদ থাকেই। তাম্র লইয়া কাজ করিতে করিতে এই খাদের

অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাম্রকার অবহিত হইয়া থাকিবে এবং এই খাদের মাত্রাধিক্য হেতু কাঠিন্যও যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ইহাও তাহার পক্ষে লক্ষ্য করা আশ্চর্য নয়। তারপর পৃথিবীর বহু স্থানে তাম্র-খনিজের সংগে টিনের খনিজও বর্তমান। কর্ণওয়াল, বোহেমিয়া, চীন মহাদেশের নানা স্থানের তাম্র-খনিজে অল্প বিস্তর টিনের খাদ থাকে। দক্ষিণ স্পেনের পারাজুয়েলস ও দ্য কাম্পো জেলার তাম্র-খনিজে ০·০৮ হইতে ০·২৫ শতাংশ টিন বর্তমান। ভারতবর্ষে কোন কোন স্থানে আবার তাম্র-খনিজের সহিত দস্তার খনিজ বর্তমান। তাম্র নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে এইরূপ মিশ্রখনিজ লইয়া কাজ করিতে করিতেই সম্ভবতঃ ব্রোঞ্জ ও পিতল প্রথম উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। আমরা এখন জানি উত্তর আমেরিকায় তাম্র যুগের পর কোন ব্রোঞ্জ-যুগ আসে নাই। অর্থাৎ সে দেশের অধিবাসীরা ব্রোঞ্জ বা পিতল নির্মাণের কৌশল প্রাচীনকালে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, এই মহাদেশের তাম্র-খনিজে সাধারণতঃ টিন, দস্তা, এণ্টিমনি প্রভৃতির কোন খাদ থাকে না।

খাঁটী ব্রোঞ্জের প্রাচীনতম নমুনা প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক শিলম্যান আবিষ্কার করেন হিসার্লিকের (Hissarlik) দ্বিতীয় নগরের ধ্বংসাবশেষ খনন-কার্যকালে। এই নগরের



১৯। ব্রোঞ্জ-নির্মিত কয়েকটি দ্রব্য—কুঠার, বর্শাফলক ইত্যাদি।

প্রাচীনত্ব খ্রীঃ পূঃ ২২০০ হইতে ১৯০০ অব্দের মধ্যে। হিসার্লিকের কাছে বোহেমিয়ার অন্তর্গত এর্ৎস্গেবির্জের (Erzgebirge) তাম্র ও টিনের খনি বিখ্যাত। হিসার্লিকের ব্যবসায়ীরা এই খনি হইতে প্রথমে তাম্র ও পরে টিন ব্যবহার করিয়া থাকিবে এবং এই দুই ধাতু লইয়া কাজ করিবার অভিজ্ঞতা হইতে শেষ পর্যন্ত সম্ভবতঃ ব্রোঞ্জ আবিষ্কার করিয়া থাকিবে। এই আবিষ্কার সম্বন্ধে বোহেমিয় কর্মকারদের দাবীও উপেক্ষণীয় নহে। সে যাহা হউক, পূর্ব-ইউরোপ ও ঈজীয়ান সাগরের অঞ্চলে আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২২০০ অব্দে ব্রোঞ্জের ব্যবহার প্রচলিত দেখা যায়।

মিশরে ব্রোঞ্জের ব্যবহার ইহা অপেক্ষাও প্রাচীনতর কি না সে বিষয়ে মতভেদ আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক পেট্রি ব্রোঞ্জ নির্মিত যে সকল দ্রব্য এইখানে আবিষ্কার করেন তাহা মিশরের চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ রাজবংশের রাজত্বকালে প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এই রাজত্বকালের তারিখ আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দের পূর্বে। প্রথম রাজবংশের আমলে (খ্রীঃ পূঃ ৩৪০০) ব্যবহৃত হইত বলিয়া অনুমিত ব্রোঞ্জ নির্মিত কয়েকটি দ্রব্যের কথা উল্লেখ করেন মোসো।* ইহা সত্য হইলে নিওলিথিক কালের শেষভাগেই মিশরে ব্রোঞ্জের ব্যবহার সুরু হইয়া থাকিবে। মিশরীয় পিতলের এইরূপ প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে প্রধান প্রশ্ন—ব্রোঞ্জের প্রধান উপাদান টিন আসিল কোথা হইতে? মিশরে টিনের অস্তিত্ব বিরল। সিনাই পার্বত্য

* J. R. Partington, *A Short History of Chemistry*, Macmillan, 1948, p. 6.

অঞ্চলের তাম্র-খনিজ হইতে মিশরীয়রা অতি প্রাচীনকাল হইতে তাম্র উৎপন্ন করিত বলিয়া জানা যায়। এই তাম্র-খনিজে টিনের অস্তিত্ব নাই। কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের অভিমত, বৃটেনের কর্ণওয়াল উপকূলভাগ হইতে সম্ভবতঃ এই টিন আসিয়া থাকিবে। বৃটেনের উপকূলভাগের অধিবাসীদের সহিত প্রাচীন মিশরীয়দের বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং ফিনিশীয় ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে মিশরীয় কর্মকারদের এই টিন সংগ্রহ করা কিছু অসম্ভব নহে। পার্টিংটনের অবশ্য অভিমত, এই টিন আসিত পারস্যের দ্রাঙ্গিয়ানা (Drangiana) টিন খনি হইতে।* স্ট্রাবো তাঁহার ভূগোলে দ্রাঙ্গিয়ানার টিনখনির উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমানে এইখানে টিনের কোন অস্তিত্ব নাই; সম্ভবতঃ বহু প্রাচীনকালেই পারস্যের টিনের খনি নিঃশেষিত হইয়াছিল। কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক আবার মনে করেন, মিশরের প্রাচীন কবর হইতে ব্রোঞ্জ নির্মিত যে সব দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে সম্ভবতঃ তাহা বিদেশ হইতে আমদানি করা মাল। মিশরে ব্রোঞ্জ-শিল্পের প্রকৃত গোড়াপত্তন হয় অষ্টাদশ রাজবংশের আমল হইতে, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ১৫৮০ অব্দের অনুরূপ সময়। এই সময় সিরিয়া মিশরের করতলগত হইলে বিদেশ হইতে টিন আমদানি তাহার পক্ষে সহজ হয়।

ভারতবর্ষেও তাম্রের ব্যবহার সুপ্রাচীন। ঋগ্বেদে 'অয়স্' নামে যে ধাতুর উল্লেখ পাওয়া যায় সম্ভবতঃ তাহার দ্বারা তাম্র অথবা লোহকে বুঝাইত। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার কথা আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগে তাম্র নির্মিত কিছু কিছু দ্রব্য পাওয়া যায়। সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতে হায়দরাবাদ, নাগপুর, মাদুরা ও মহীশূর হইতে তাম্র ও পিতল নির্মিত অনেক অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পিগট্ মনে করেন, রাজপুতনা, ছোটনাগপুর ও সিংভূম জেলা হইতে আগত তাম্র হইতে এই যন্ত্রপাতি ও দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইত। আরব সাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে ভারতীয় সভ্যতা উদ্ভবের আদি পর্বে তাম্র ও পিতলের যে ব্যাপক ব্যবহার ছিল, অর্থাৎ নব্য প্রস্তরযুগ হইতে লৌহ-যুগে পৌঁছিবার অন্তর্বর্তী সময়ে ভারতবর্ষকেও যে তাম্র ও পিতল-যুগের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত।† এমন কি পশ্চিম এসিয়ার পিতলকারদের তুলনায় ভারতীয় পিতলকারদের অনেক বেশী দক্ষতার নমুনা দেখিয়া অনেকে মনে করেন সম্ভবতঃ ভারতবর্ষেই পিতলের প্রথম আবিষ্কার ঘটে।

আবিষ্কার ও ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসারের দিক হইতে পিতল যুগ এক বিরাট তৎপরতার যুগ। পিতলের ব্যবহার ক্রমশঃ চালু হইলে ও ধাতুর চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে তাম্র ও অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য টিনের খনি আবিষ্কার অনিবার্য হইয়া পড়ে। ব্যবসায়ীরা এইসব ধাতুর অন্বেষণে দেশ হইতে দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়ে। ব্যাপক অন্বেষণের ফলে নিঃসন্দেহে বহু খনি আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে এবং সম্ভবতঃ এই সময়ে কর্ণওয়ালেব টিনের খনি আবিষ্কারও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এইরূপ প্রচেষ্টা হইতে এক প্রকার মণিকবিদ্যা, খনিবিদ্যা ও ভূবিদ্যার উদ্ভব হওয়া খুবই যুক্তিসঙ্গত। ভূপৃষ্ঠের আকৃতি দেখিয়া খনির অস্তিত্ব আন্দাজ করা, বিভিন্ন রকমের খনিজ প্রস্তরকে নিতান্ত অসংলগ্নভাবে হইলেও শ্রেণীবদ্ধ করা, তাহাদের পার্থক্য নির্ণয় করা প্রভৃতি ব্যাপারে নানা মূল্যবান জ্ঞান পিতল যুগের আবির্ভাবে মানুষ আয়ত্ত করিয়াছিল।

তাম্র ও পিতল সংক্রান্ত ধাতুবিদ্যা আবিষ্কারের বহু পরে তথাকথিত তাম্র ও পিতল যুগের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। এই দুয়ের মধ্যে আমরা অন্ততঃ এক হাজার বৎসরের ব্যবধান লক্ষ্য করি। তাম্র বা ব্রোঞ্জ যুগের অর্থ, এই সময়ে মানুষ যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র গড়িবার কার্যে

* *Ibid*, p. 6.

† R. C. Majumdar & A. D. Pusalker (Editors), *Vedic Age*, George Allen & Unwin, p. 136.

প্রস্তরের পরিবর্তে এই দুই ধাতুকেই ব্যবহার করিতেছে। পরিচিত পুরাতন দ্রব্য পুরাতন পদ্ধতির প্রতি মানুষের আসক্তি চিরন্তন। লক্ষ লক্ষ বৎসরের পরিচিত ও জীবন সংগ্রামের একমাত্র সহায় প্রস্তরকে মানুষ রাতারাতি ত্যাগ করিবে কিরূপে? তারপর নূতন দ্রব্যকে নূতন পদ্ধতিকে সম্যকরূপে কার্যকরী করিয়া তোলাও সময় সাপেক্ষ। প্রস্তরের একটি প্রধান দোষ এই যে, ইহার তীক্ষ্ণতা বড় তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। কুঠার, ছুরি প্রভৃতি যন্ত্র কয়েকবার ব্যবহার করিলেই অকেজো হইয়া যায়। কিন্তু প্রস্তর যেখানে প্রচুর সেখানে নূতন যন্ত্র তৈয়ারী করিয়া লইতে কতক্ষণ! পাথরের অস্ত্র গড়িবার জন্য পৃথক শিল্প স্থাপনেরও প্রয়োজন নাই। যে যার নিজের অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি নিজেই গড়িয়া লইতে পারে। কেবল প্রস্তর যেখানে অপ্রতুল, উপরিউক্ত অসুবিধা সেখানে প্রধান সমস্যা এবং ধাতু নির্মিত স্থায়ী যন্ত্রপাতির সুবিধা সেখানেই প্রথম উপলব্ধ হইবে। ব্যবহার করিতে করিতে ধাতব যন্ত্রেরও অবশ্য ক্ষয় হয়; কিন্তু আগুনে গলাইয়া পিটাইয়া লইলেই আবার সম্পূর্ণ একটি নূতন যন্ত্র তৈয়ারী হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া ধাতুর আরও অনেক গুণ আছে এবং সেই সব গুণ লক্ষ্য করিয়া প্রস্তর-ব্যবহারক যে ক্রমশঃ ধাতুর ব্যবহারের দিকেই আকৃষ্ট হইবে তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। তথাপি প্রস্তর ফেলিয়া ধাতুকে গ্রহণ করিতে তাহার কেন এত বিলম্ব হইল?

ইহার কারণ ধাতুর কাজ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত জটিল। প্রস্তরের মত খনিজ সুলভ নয়। প্রথমে খনিজ সরবরাহের পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তারপর এই খনিজ হইতে ধাতু নিষ্কাশন, ধাতুকে গলানো, ঢালাই করা, পিটানো, শান দেওয়া ইত্যাদি নানা পর্বের পর অবশেষে যন্ত্র-নির্মাণকার্য সম্পন্ন হইবে। এইরূপ জটিল ও বিশেষ ধরনের কাজ কৃষির বা শিকারের ফাঁকে ফাঁকে সম্ভব নয়। ইহা একজনের কাজও নহে। ইহার জন্য প্রয়োজন বহু সুদক্ষ কারিগরের সর্বক্ষণব্যাপী সম্মিলিত শ্রম। এই কারিগরদের খাদ্যের ভার অন্য দলকে গ্রহণ করিতে হইবে। যে অবস্থায় প্রত্যেককে নিজের নিজের খাদ্য উৎপাদন করিয়া লইতে হয় সে অবস্থায় এইরূপ বিশেষ ধরনের তৎপরতা সম্ভব নয়। যে ব্যবস্থায় কৃষক নিজের ও নিজের পরিবারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যোৎপাদনে সক্ষম এবং দলের প্রত্যেককে স্বহস্তে খাদ্যোৎপাদন না করিলেও চলে, শুধু সেই ব্যবস্থাই এইরূপ জটিল ও এক প্রকার বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সাপেক্ষ বিশেষ ধরনের শ্রম ও কর্মের জন্য প্রকৃষ্ট। খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দের পূর্বে এই ব্যবস্থার উদ্ভব হয় নাই এবং ইহার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই সভ্যতার অভ্যুদয়।

রৌপ্য ও সীসক

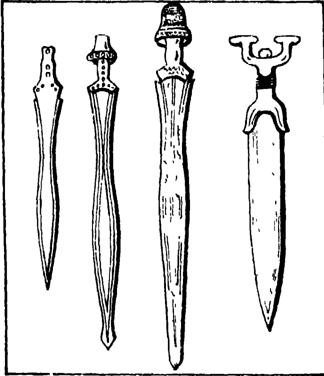
তাম্র ও টিনের খনিজ খুঁজিতে গিয়া তাহার পক্ষে কয়েকটি অন্য ধাতুও আবিষ্কার করা আশ্চর্য নহে। রৌপ্য ও সীসকের আবিষ্কার সম্ভবতঃ এইভাবেই হইয়াছিল। মিশরের প্রাগৈতিহাসিক গোরস্থান খনন করিয়া রৌপ্য ও সীসকের কয়েকটি অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে। প্রথম রাজবংশের রাজত্বকালে প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত একটি সীসকের মূর্তি এখন বৃটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত।

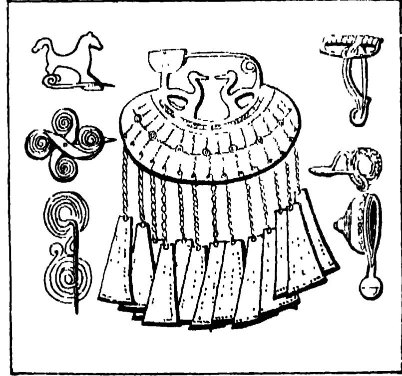
লৌহ

নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সর্বত্র খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় মিলেনিয়মের মাঝামাঝি সময় হইতে লৌহের ব্যবহার ব্যাপকভাবে দেখা যায়। সুতরাং ঐতিহাসিক কাল আরম্ভ হইবার প্রায় দেড় হইতে দুই হাজার বৎসর পরে লৌহযুগের আবির্ভাব। এই যুগ যে সর্বত্র ব্রোঞ্জযুগকে অনুসরণ করিয়াছে তাহা নহে। এক মিশর ব্যতীত আফ্রিকা মহাদেশের সর্বত্র আদিম অধিবাসীরা প্রস্তর যুগ হইতে সরাসরি লৌহযুগে প্রবেশ করিয়াছিল। তাম্র, পিতল প্রভৃতি ধাতুর কাজে মিশরের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও নীলনদের নিম্ন উপত্যকায়

সাধারণভাবে লৌহের ব্যবহার অর্থাৎ প্রকৃত লৌহযুগের সূত্রপাত আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৮০০ অব্দের পূর্বে সংঘটিত হয় নাই।

কিন্তু তাই বলিয়া ধাতু হিসাবে লৌহের জ্ঞান ও ইহার কিছু কিছু ব্যবহার এত পরের ঘটনা নহে। উল্কাপাতের পর যে প্রস্তরখণ্ড অবশিষ্ট থাকে তাহা লৌহপ্রধান। এইরূপ প্রস্তর বা উল্কার লৌহের সহিত প্রাগৈতিহাসিক মানুষের পরিচয় ছিল; এমন কি অলংকার হিসাবেও •ইহার ব্যবহারের কতকগুলি নমুনা পাওয়া গিয়াছে। ল্যাপিস্ লাজুলি বা লাজবর্দ মণির সঙ্গে লোহার পুঁতি গাঁথিয়া তৈয়ারী একটি হার পেত্রিসাহেব মিশরের প্রাক-রাজবংশীয় কবর হইতে আবিষ্কার করেন। ওয়েনরাইট্ এল্ গেজেতে অনুরূপ যে লোহার পুঁতি পান, তাহার তারিখ খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ অব্দ। চতুর্থ রাজবংশের রাজত্বকালে নির্মিত পিরামিডের (খ্রীঃ পূঃ ৩১০০ অব্দ) অভ্যন্তরে কতকগুলি লৌহ নির্মিত যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এইগুলি নিঃসন্দেহে লৌহ ব্যবহারের সুপ্রাচীনত্ব নির্দেশ করে।


১


২

২০। হল্স্টাটযুগে ব্রোঞ্জ ও লৌহ ব্যবহারের কয়েকটি নমুনা—(১) ব্রোঞ্জের হাতলযুক্ত লৌহ তরবারি; (২) ব্রোঞ্জ-নির্মিত কানের গহনা, ব্রুচ ইত্যাদি।

লৌহ-নিষ্কাশন-বিদ্যা ও লৌহশিল্পের আদি জন্মভূমি উত্তর-পূর্ব এসিয়া মাইনর। এই অঞ্চলে ক্যালিবিস্ (Chalybes) প্রাচীনকালে একচেটিয়া লৌহশিল্পের জন্য খ্যাত ছিল। ইহার ২০০ মাইল দক্ষিণে কোমাজেন (Commagene) সহরের লৌহশিল্প স্থাপনের অগ্রাধিকার দাবীও উপেক্ষনীয় নহে। বস্তুতপক্ষে এসিয়া মাইনর লৌহ খনিজে বিশেষ সমৃদ্ধ এবং হিট্টাইট্দের আমলের প্রাচীন লৌহশিল্পের ধ্বংসাবশেষ এই অঞ্চলে বিস্তর পাওয়া গিয়াছে। হিট্টাইট্রা লৌহশিল্পে বিশেষ পারদর্শী ছিল। ইহাদের কল্যাণেই মধ্য ও নিকট প্রাচ্যে ও পরে ইউরোপে লৌহের প্রচলন ঘটে। খ্রীঃ পূঃ ১২৫০ অব্দে মিশররাজ হিট্টাইট্দের রাজার নিকট লৌহ সরবরাহ করিতে অনুরোধ করিয়া যে পত্র লেখেন ও তাহাতে হিট্টাইটরাজ মিশররাজকে লৌহের পরিবর্তে স্বর্ণ পাঠাইবার অনুরোধ করিয়া যে উত্তর দেন সেই পত্রালাপের মূল পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে।* হিট্টাইট্দের লৌহশিল্প সম্পর্কিত প্রাধান্য এই পত্রালাপের মধ্যে পরিস্ফুট।

ইউরোপে দানিয়ুব উপত্যকায় হল্স্টাট প্রভৃতি স্থানে প্রাচীনকালে লৌহ শিল্পের খ্যাতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। পূর্বদেশ হইতে আগত কেল্ট, ডোরিয়ান প্রভৃতি জাতিদের সঙ্গে

* Partington, *loc. cit*, p. 8.

এসিয়া মাইনরের লৌহ নিষ্কাশন সম্পর্কিত ধাতুবিদ্যা প্রথম দানিয়ুব উপত্যকায় পেঁৗছে এবং সেইখানে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এই শিল্পের প্রভূত উন্নতি ঘটে।* লৌহ-ব্যবহারক কেল্‌ট, ডোরিয়ান প্রভৃতি দানিয়ুব অঞ্চলের জাতিদের আক্রমণের ফলেই ক্রীট দ্বীপের নোসস্‌ ও গ্রীসে মিসিনের ব্রোঞ্জ সভ্যতার অবসান হইয়াছিল খৃীঃ পূঃ দ্বিতীয় মিলেনিয়মের শেষ ভাগে। এই সময় হইতেই (খৃীঃ পূঃ ১১০০) ক্রীটে ও ঈজীয়ান সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে লৌহ যুগের সূচনা। ঈজীয়ান অঞ্চলে লৌহ যুগের সূচনার কিছু পরেই আমরা দেখি এক সম্পূর্ণ নূতন সভ্যতার আকস্মিক ও অত্যুজ্জ্বল বিকাশ। ইহাই গ্রীক সভ্যতা।

কাচ

কাচ মানুষের সৃজনী প্রতিভার অপূর্ব বিকাশ। মৃৎশিল্প, ধাতু ও সংকর ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহারের মধ্য দিয়া মানুষের বহুমুখী প্রতিভার যে পরিচয় আমরা পাই তাহারই আর এক আশ্চর্য ও অভিনব প্রকাশ কাচের আবিষ্কার।

কাচের আবিষ্কার সুপ্রাচীন। ঠিক কোথায় ও কখন ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি অজ্ঞাত। প্লিনি লিখিয়াছেন, বালি ও সোডাঘটিত মৃত্তিকার এক স্বাভাবিক মিশ্রণে আকস্মিকভাবে অগ্নি সংযোগের ফলে কাচ উৎপন্ন হয়। এইরূপ সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করিয়া পরবর্তীকালে নানারূপ গল্পও রচিত হইয়াছে। অবশ্য এই সব গল্পের ঐতিহাসিক সত্যতা যাচাই করিতে যাওয়া বৃথা। তবে বজ্রপাতজনিত আগুনে বালি ও সোডার স্বাভাবিক মিশ্রণ গলিয়া অনেক সময় কাচে রূপান্তরিত হইতে দেখা যায়, এবং এইরূপ নৈসর্গিক উপায়ে উৎপন্ন কাচের কয়েকটি নমুনাও পাওয়া গিয়াছে।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা, রঙ্গীন ও মসৃণ মৃৎপাত্র প্রস্তুত করিবার প্রচেষ্টা হইতে কাচ আবিষ্কৃত হয়। মিশর ও মেসোপোটেমিয়ার প্রাচীন অধিবাসীরা রঙ্গীন ও মসৃণ মৃৎপাত্র গড়িতে সুদক্ষ ছিল। কাচ এই সুদক্ষ মৃৎশিল্পীদেরই আবিষ্কার। এই দুই দেশের মধ্যে কাচের আবিষ্কারের অগ্রাধিকার সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বহুদিন পর্যন্ত একদল প্রত্নতাত্ত্বিকের ধারণা ছিল, মিশরই কাচের আদি জন্মস্থান। এখন দেখা যাইতেছে, এই আবিষ্কারের অগ্রাধিকার ব্যাপারে মেসোপোটেমিয়ার দাবীও উপেক্ষণীয় নহে। স্যার ফ্লিণ্ডার্স পেত্রি বলেন, আনুমানিক খৃীঃ ১২,০০০ পূর্বাব্দে মিশরে বাদারীয় (Badarian Age) পাথরের পুঁতির উপর সবুজ রং-এর যে মসৃণতা দেখা যায়, কৃত্রিম উপায়ে সম্পাদিত মসৃণতার ইহাই প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত। এই বিদ্যা সম্ভবতঃ এসিয়া হইতে মিশরে আসিয়াছিল। খৃীঃ ৭০০০ পূর্বাব্দের বলিয়া অনুমিত লাজবর্ধ মণির মত দেখিতে এক টুক্‌রা বিশুদ্ধ কাচের নমুনাও তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন। বিশুদ্ধ কাচের ইহা অপেক্ষা প্রাচীনতর নমুনা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মিশরীয় রাজবংশের আমলে অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহৃত নানা রং-এর কাচের পুঁতি, বালা ইত্যাদি যে সব দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে, পেত্রির অনুমান, তাহা এসিয়া হইতে মিশরে আমদানি হইয়াছিল।

উপরিউক্ত পরোক্ষ প্রমাণ ছাড়া পশ্চিম এসিয়ায় কাচ শিল্পের সুপ্রাচীনত্বের প্রত্যক্ষ প্রত্নতত্ত্বীয় প্রমাণও কিছু কিছু পাওয়া যায়। বাগ্‌দাদের উত্তর-পশ্চিমে টেল্‌ আস্‌মারে হালকা নীল রং-এর কাচের যে সিলিণ্ডারটি ফ্রাঙ্কফোর্ট আবিষ্কার করেন, তাহার নির্মাণকাল খৃীঃ পূঃ ২৭০০-২৬০০ অব্দ। এইস্থানে খৃীঃ পূঃ ২৪৫০ অব্দের একটি প্রাচীন কবরখানা খুঁড়িয়া বহু রঙ্গীন কাচের পুঁতি পাওয়া গিয়াছে।

কাচের আদি ইতিহাস যাহাই হউক, পরবর্তীকালে কাচশিল্পের উন্নতি ও প্রসারের

---

* *Encyclopaedia Britannica* 1, vol. 2; p. 253; 'Archaeology' শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

প্রধান কেন্দ্র ছিল মিশর। অষ্টাদশ রাজবংশের আমল হইতেই এক অতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্প হিসাবে ইহার পরিচয় আমরা পাই। আমেনহোটেপের (খ্রীঃ পূঃ ১৫৫১-১৫২৭) নামাঙ্কিত একটি বড় গোল কাচের পুঁতি এই শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচীনতম মিশরীয় নিদর্শন। তৃতীয় থটমেসের (খ্রীঃ পূঃ ১৫২৭-১৪৭৫) আমলের কারুকার্যখচিত কয়েকটি ছোট পানপাত্র এখন বৃটিশ মিউজিয়মের মূল্যবান সামগ্রী। এই কাচদ্রব্যগুলি ছিল রঙ্গীন ও অস্বচ্ছ; স্বচ্ছ কাচ নির্মাণবিদ্যা আবিষ্কৃত হয় অনেক পরে। ধাতুবিদ্যায় পারদর্শী মিশরীয়রা নানা রং-এর কাচ উৎপাদনে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল। তাম্রঘটিত বিভিন্ন লবণ ব্যবহারে নীল, সবুজ ও লাল কাচ এবং টিন অক্সাইড ব্যবহারে সাদা কাচ উৎপাদনে মিশর ছিল প্রাচীন জাতিদের মধ্যে অদ্বিতীয়।

গলিত অবস্থায় ফুঁ দিয়া ফুলাইয়া বিভিন্ন আকারের কাচপাত্র নির্মাণ-কৌশল আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে কি প্রকারে এই দ্রব্যাদি তৈয়ারী হইত তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ফাঁপা ফুলদানি ও অনুরূপ পাত্র গড়িতে প্রথমে একটি ধাতব দণ্ডের চারিদিকে অভীপ্সিত পাত্রের আকারে ভিজা বালির একটি তাল তৈয়ারী করিয়া সেই তালের উপরে উত্তপ্ত কাচের দণ্ড নমনীয় অবস্থায় ধীরে ধীরে প্রভৃত যত্ন ও ধৈর্য সহকারে গায়ে গায়ে জড়ানো হইত। বিকল্প পদ্ধতিতে গলিত কাচের মধ্যে উপরিউক্ত বালির তাল বার বার ডুবাইয়া ইচ্ছানুযায়ী পুরু পাত্র তৈয়ারীর প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে কাচ ঠাণ্ডা হইয়া কঠিন হইলে কেন্দ্রীয় বালির তাল খুঁড়িয়া বাহির করিলেই একটি গোটা ফাঁপা পাত্র নির্মিত হইয়া যাইবে। ডিস, কাপ প্রভৃতি খোলা পাত্র উপরিউক্ত পদ্ধতিতে তৈয়ারী করা সম্ভবপর নয়। এইরূপ দ্রব্য তৈয়ারী করিতে ছাঁচের ব্যবহার প্রয়োজন। খ্রীঃ পূঃ ১২০০ অব্দের অনুরূপ সময়ে ছাঁচ ব্যবহার করিয়া কাপ, ডিস প্রভৃতি খোলা কাচ দ্রব্যাদি মিশরীয়দের নির্মাণ করিতে দেখা যায়।* খ্রীঃ পূঃ ১৫৫০ অব্দ হইতে খ্রীষ্টীয় শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত এই ধরনের কাচপাত্র নির্মাণে মিশরীয়রা প্রাচীন জাতিদের মধ্যে শুধু অগ্রণীই ছিল না, সমগ্র কাচশিল্পের কেন্দ্রস্থলই ছিল মিশর। ফিনিশীয় ব্যবসায়ীদের কল্যাণে এই বিদ্যা কাল সহকারে অন্যান্য দেশে বিস্তারলাভ করে।

ফুঁ দিয়া কাচপাত্র নির্মাণ-কৌশল ঃ ফুঁ দিয়া কাচপাত্র নির্মাণ-কৌশল কাচশিল্পের প্রধানতম আবিষ্কার। ইহাকে সমগ্র কারিগরি বিদ্যার শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বলিতে গেলে, এই কৌশল বা টেক্‌নিক্‌ আবিষ্কারের পর হইতেই কাচশিল্পের প্রকৃত গোড়াপত্তন হয়।

এই টেক্‌নিক্‌ কোথায় ও কখন আবিষ্কৃত হয় তাহা ঠিক জানা নাই। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের অভিমত, খ্রীঃ পূঃ ৩০০ হইতে ২০ অব্দের মধ্যে ফিনিশীয় কাচশিল্পীদের হাতে এই বিদ্যা আবিষ্কৃত হয়। আর এক অভিমত অনুযায়ী অগাস্টাসের সময়ে সিডনে টেক্‌নিক্‌টি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ৪ হইতে ৫ ফুট লম্বা লোহার নল ফুঁ দিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, এই মাপের লম্বা নল অদ্যাপি কাচশিল্পে ফুঁ দিবার কার্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২·৪। অন্যান্য কয়েকটি আবিষ্কার

কথায় কথায় আমরা ঐতিহাসিক কালের অনেক দূর আসিয়া পড়িলাম। গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশের আলোচ্য বিষয় অবশ্য ঐতিহাসিক কালে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস। ঐতিহাসিক কালের বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোচনা আরম্ভ করিবার পূর্বে প্রাগৈতিহাসিক কালের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের উল্লেখ প্রয়োজন। চাকার আবিষ্কার, পশুশক্তির

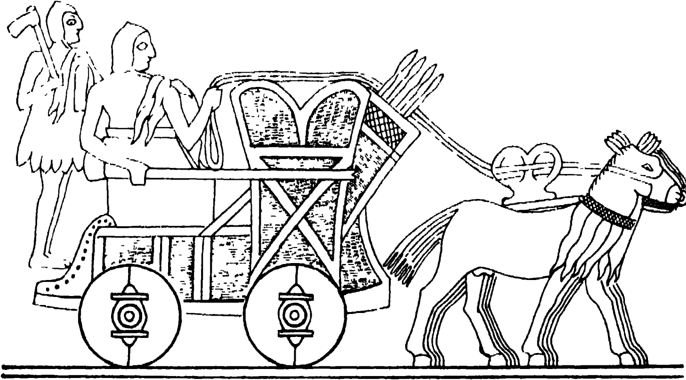
* *Encyclopaedia Britannica,* Vol. 10, p. 400; 'Glass' শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

ব্যবহার, সেচ ব্যবস্থা উদ্ভাবন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে কয়েকটি কথা না বলিলে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

চাকা

চাকার আবিষ্কার রহস্যাবৃত। এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য অতি অল্প তথ্যই পাওয়া যায়। তবে ইহা যে প্রাগৈতিহাসিক আবিষ্কার সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ নাই। চাকা কাষ্ঠ নির্মিত হওয়াই স্বাভাবিক এবং কাষ্ঠের স্থায়িত্ব নাই। এজন্য কাষ্ঠ নির্মিত প্রাগৈতিহাসিক চাকার কোন নমুনা পাওয়া যায় না। পাথরের ও মৃৎপাত্রের উপর প্রাগৈতিহাসিক বা ঐতিহাসিক কালের গোড়ার দিকে শিল্পীরা চাকার যে সব চিত্র আঁকিয়া গিয়াছে একমাত্র তাহাকেই সম্বল করিয়া চাকার আদি ইতিহাস সম্বন্ধে সামান্য কিছু তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

সুমেরীয় চিত্রাঙ্কনে চাকার গাড়ির প্রথম নমুনা পাওয়া যায় খ্রীঃ পূঃ ৩৫০০ অব্দে। এইরূপ একটি প্রাচীন চিত্রের নমুনা দেখানো হইল। উত্তর সিরিয়ার চিত্রাঙ্কনে যে সব চাকার গাড়ি দেখা যায় তাহা ইহা অপেক্ষাও প্রাচীনতর। সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতায় (খ্রীঃ পূঃ ৩২৫০-২৫০০) প্রথম হইতেই চাকার ব্যবহার দেখা যায় কুম্ভকারের শিল্প ও যানবাহনাদিতে। ইহার প্রায় ৫০০ বৎসর পরে এসিয়া মাইনরে ও ক্রীটে চাকার ব্যবহার প্রচলিত হয়। খ্রীঃ পূঃ ১৬৫০ অব্দের পূর্বে মিশর চাকার ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল। মিশরে চাকার প্রথম প্রবর্তক পশ্চিম এসিয়ার দুর্ধর্ষ জাতি হিক্‌সস্‌রা। হিক্‌সস্‌দের মিশর আক্রমণ ও বিজয়ের পর হইতেই নীলনদের দেশে চাকার ব্যবহার প্রথম দৃষ্ট হয়।



২১। প্রাচীন সুমেরীয় যুদ্ধরথ।

চাকার প্রথম প্রয়োগ মৃৎশিল্পে ও পরিবহণে। কোথাও একসঙ্গে, কোথাও আগে পরে। পশ্চিম এসিয়ায় ও ভারতবর্ষে চাকার ব্যবহার প্রায় এক সঙ্গেই দেখা যায়। মিশরের পরিবহণে চাকার ব্যবহার আরম্ভ হইবার বহু পূর্বে কুম্ভকারেরা মৃৎশিল্পে চাকার ব্যবহার প্রবর্তন করে। ক্রীট দ্বীপে আবার চাকার গাড়ি আবির্ভাবের অন্ততঃ দুই শত বৎসব পরে আমরা কুমোরের চাকার নজির পাই। ইউরোপে আল্‌পস্‌ পর্বতের উত্তরে খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দ পর্যন্ত কুম্ভকাররা কুমোরের চাকা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল; অথচ ইহার এক হাজার বৎসর পূর্ব হইতে সেই সব অঞ্চলে চাকার গাড়ির প্রচলন হইয়াছিল।

চাকার প্রবর্তনে মৃৎশিল্পে ও পরিবহণ ব্যবস্থায় যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্বে একটি মাঝারি ধরনের পাত্র গড়িতে কুম্ভকারের যেখানে কয়েক দিন সময় লাগিত এখন কয়েক

মিনিটে সেই পাত্র তৈয়ারী হইল। শুধু সময় সংক্ষেপেই নহে, চাকার সাহায্যে প্রস্তুত পাত্রের সহিত আগেকার হাতে গড়া পাত্রের কোন তুলনাই হয় না। আপাত-সামান্য একটি আবিষ্কারের যথাযথ সুযোগ গ্রহণ করায় মৃৎশিল্প প্রায় সহস্র বৎসর আগাইয়া গেল। চাকার পূর্বেও মৃৎ-শিল্প ছিল, কিন্তু কোন প্রকার গাড়ি বা রথ ছিল কিনা সন্দেহ। বরফের উপর দিয়া চক্রহীন স্লেজ টানা সম্ভব হইলেও উষ্ণ বা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের বন্ধুর পথে চক্রহীন গাড়ির কল্পনা কঠিন। 'গাড়ির সহিত চক্রযোজনা অবশ্য প্রথম প্রথম সহজসাধ্য হয় নাই। সম্ভবতঃ অর্ধ বৃত্তের আকারে কাটা দুইটি অথবা বৃত্তাংশের আকারে কাটা একাধিক কাষ্ঠখণ্ড তামার পেরেকের সাহায্যে জোড়া দিয়া ও চামড়ার একপ্রকার চক্রবেষ্টনীর দ্বারা কাষ্ঠখণ্ডগুলিকে কঠিন ভাবে আবদ্ধ করিয়া গাড়ির চাকা তৈয়ারী করা হইত। তারপর অক্ষদণ্ডের সহিত আষ্টেপিষ্টে বাঁধা চাকাগুলি এই দণ্ডের সহিত এক সঙ্গেই আবর্তিত হইত। কোন কোন অনগ্রসর অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা এখনও এই পদ্ধতিতে চাকা তৈয়ারী করিয়া থাকে।

নৌকা ও পাল

এক ধরনের চামড়ার নৌকা বা কাঠের গুঁড়ি জলে ভাসাইয়া প্রাগৈতিহাসিক মানুষ মৎস্য শিকার করিত। এইরূপ অভিজ্ঞতা হইতে ক্রমশঃ নৌকা নির্মাণ ও বাতাসের বেগ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পাল আবিষ্কারের মধ্যে অনেকগুলি ধাপ আছে। কিভাবে একটির পর একটি ধাপ সাফল্যের সহিত অতিক্রম করিয়া শেষ পর্যন্ত পাল টাঙানো নৌকা আবিষ্কৃত হইয়াছিল সে বৃত্তান্ত আমাদের জানা নাই। প্রস্তর ও মৃৎপাত্রের উপর অঙ্কিত প্রাগৈতিহাসিক মিশরীয় চিত্রে নৌকার যে সব নমুনা দেখা যায় তাহাতে মনে হয়, প্যাপিরাসের আঁটি বাঁধিয়া ভেলার মত এক ধরনের নৌকা সে সময়ে ব্যবহৃত হইত। নৌকার মাঝখানে একটি ছোট ছাউনি থাকিত; যাত্রী ও মাঝি মিলিয়া প্রায় চল্লিশজনকে বহন করিতে পারে এইরূপ বড় নৌকার চিত্রও কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে। খৃীঃ পূঃ ৩৫০০ অব্দের অনুরূপ সময় হইতে পাল তোলা নৌকার চিত্র মিশরীয় মৃৎশিল্পের কারুকার্যে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা যায়। এই ধরনের নৌকা সমুদ্রের উপকূল অঞ্চলে যাতয়াত করিত।

সেচ ও নদী-শাসন

সভ্যতার ইতিহাসের একটি চরম সত্য এই যে, নদ-নদী বিধৌত উপত্যকায় ইহার প্রথম আবির্ভাব ঘটে। অথচ সভ্যতার প্রাথমিক উপাদান কৃষি, পশুপালন, বস্ত্রবয়ন, মৃৎশিল্প, ধাতুর ব্যবহার প্রভৃতি নানা ব্যবহারিক বিজ্ঞানের আবিষ্কার সংঘটিত হইয়াছিল 'ফার্টাইল ক্রিসেণ্টে'র অর্ধ উসর অঞ্চলে নিওলিথিক আমলে। আমরা দেখিয়াছি, 'ফার্টাইল ক্রিসেণ্ট' এই সব আবিষ্কারের প্রত্নতত্ত্বীয় নিদর্শনে বিশেষ সমৃদ্ধ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কোথাও নিওলিথিক অধিবাসীদের মধ্যে প্রথম সভ্যতার উদ্ভব না হইয়া তাহা হইয়াছে ইহার দক্ষিণে অবস্থিত বিশেষ ধরনের কতকগুলি নদী-উপত্যকায়—নীলনদ, তাইগ্রিস, ইউফ্রেতিস ও সিন্ধুনদের তীরে। ইহার কারণ কি?

নদ-নদী-বিধৌত উপত্যকা শেষ পর্যন্ত কৃষকের স্বর্গ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, প্রথম অবস্থায় নহে। নীলনদের বাৎসরিক বন্যায় নদের দুই কূলবর্তী সরু জমি পলিমাটির দ্বারা যেমন চির উর্বর থাকে, অদূরে বন্যার জল জমিয়া তেমনি আবার সৃষ্টি করে বাসের অযোগ্য কুৎসিত ও ভয়াবহ শ্বাপদ সংকুল জলাভূমি। নদীর কূল ও জলাভূমির কিছু পরেই দুর্গম পর্বত ও দুস্তর মরুভূমি। নীলনদের মত এত নিয়মিতভাবে তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিসে বন্যা আসে না; এ অঞ্চলে বারিপাতও সামান্য। মাঝে মাঝে অতর্কিতে দুরন্ত নদী বন্যায় দুই কূল ভাসাইয়া যায়। সিন্ধুনদের অবস্থাও তদ্রূপ। স্বাভাবিক অবস্থায় সভ্যতা গড়িবার কাজে নদী আদৌ সহায়ক নহে। তথাপি, নদীর তীরে অবস্থিত হেলিওপোলিস,

মেমফিস্, নিনেভে, ব্যাবিলন, ইরেক, মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি জনপদই ত মানব সভ্যতার প্রথম লীলাক্ষেত্র।

বন্য নদীকে পোষ মানাইবার ও শাসন করিবার কৌশল আবিষ্কারের মধ্যে এই সাফল্যের কারণ অন্তর্নিহিত। বন্য ডিন্‌কেল ও এমের ঘাস আবাদের পূর্বে পৃথিবীর উদ্ভিদরাজ্য মানুষের কতটুকু সাহায্যে আসিয়াছিল? পশু পোষ মানাইবার পূর্বে পশু শিকার অপেক্ষা পশুর দৌরাত্ম্য হইতে আত্মরক্ষার চিন্তাতেই সে কি অধিকতর বিব্রত হয় নাই? উচ্ছৃঙ্খল অশান্ত নদীকে বশীভূত করিয়া তাহাকে দিয়া কাজ করাইবার কৌশল মানুষ যেদিন আবিষ্কার করিল সেদিন হইতেই সভ্যতার সিংহদ্বার তাহার কাছে উন্মুক্ত।

বন্যাবিধ্বস্ত নীলনদের উপত্যকার প্রয়োজন বাঁধের সাহায্যে বন্যার জল আটক করিয়া সুবিধা মত কৃষিকার্যে তাহার পূর্ণ ব্যবহার। দক্ষিণ মেসোপোটেমিয়ায় তাইগ্রিস ও ইউ-ফ্রেতিস হইতে কৃত্রিম খাল কাটিয়া সেচের সাহায্যে সমগ্র উপত্যকা জলসিক্ত রাখিবার ব্যবস্থা অবলম্বনই প্রধান সমস্যা। এইরূপ প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত সাধ্যের অতীত। স্বল্প বারিপাতসিক্ত অর্ধ-উসর প্যালেস্টাইন, সিরিয়া বা পারস্যের নিওলিথিক কৃষক যে যাহার নিজের এক ফালি জমি আবাদ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন করিতে পারে বটে, কিন্তু খামখেয়ালী নদীর উপকূলবর্তী বাসিন্দাদের টিকিয়া থাকিবার একমাত্র পথ হইল সকলের মিলিত পরিশ্রমের দ্বারা বাঁধ নির্মাণ, খাল কাটা, সম্বৎসর এই বাঁধ ও খাল পাহারা দেওয়া ও সংরক্ষণ। ইহা এক বিরাট সমবায় প্রচেষ্টা। এই সমবায় প্রচেষ্টার ফলে বন্যামুক্ত, সেচসিক্ত উপত্যকা যে শুধু ধন-ধান্যে পুষ্পে-শস্যে ভরিয়া উপছাইয়া পড়িল তাহা নহে, মানুষ শিখিল মানুষের সহিত ঐক্যবদ্ধ-ভাবে কাজ করিতে, মানুষে মানুষে স্থাপিত হইল নূতন সম্পর্ক, আত্মপ্রকাশ করিল নানা আইন, নানা বাধা-নিষেধ, নানা শাসন-ব্যবস্থা। তারপর সভ্যতার প্রাচুর্যের অনিবার্য আকর্ষণে উত্তর হইতে নামিয়া আসিল বুভুক্ষু অনগ্রসর নানা বর্বর জাতি, সংঘর্ষের মুখে আত্মপ্রকাশ করিল কত যোদ্ধা, বীর, নৃপতি ও সম্রাট, স্থাপিত হইল কত রাজ্য ও সাম্রাজ্য, অনিবার্য হইয়া পড়িল যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্য ও রাজত্বের উত্থান-পতন, সুরু হইল সভ্যতার বিচিত্র ঘটনাস্রোত, বিপুল আবর্ত। আর সেই আবর্তে যে দুঃসাহসী, বলিষ্ঠ কৃষক, পশুপালক, কারিগর ও মজুর নীলনদ, তাইগ্রিস, ইউফ্রেতিস ও সিন্ধুনদের তীরে একদা সভ্যতার প্রথম বীজ বপন করিয়াছিল প্রাচুর্যের মধ্যে বাঁচিবার আশায়, অদৃষ্টের পরিহাসে সেই পড়িয়া গেল সকলের পশ্চাতে চিরন্তন দুর্ভাগ্যকে পাথেয় করিয়া।

তৃতীয় অধ্যায়

৩·১। সভ্যতার বিকাশ — ব্যাবিলন, মিশর ও ভারতবর্ষ

নব্য প্রস্তরযুগের নানা আবিষ্কার, মানুষের নানা তৎপরতার কথা আমরা আলোচনা করিলাম।• কৃষি, পশুপালন, মৃৎশিল্প, বয়ন, গৃহনির্মাণ, ধাতুবিদ্যা ও ইহাদের প্রত্যেকটির সহিত সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য আবিষ্কার নব্য প্রস্তরযুগের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। তথাপি এই যুগের শেষ ভাগে ছয় হাজার বৎসর পূর্বে নীলনদের মোহনা ও প্যালেস্টাইন হইতে পারস্য, বেলুচিস্তান ও পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের কোথাও সভ্যতার বিকাশ আমরা লক্ষ্য করি না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য বিচ্ছিন্ন মানবগোষ্ঠী নানাভাবে জীবন সংগ্রামে বিব্রত। কোন দল পাহাড়ে জঙ্গলে জলাভূমিতে শিকার করিয়া, কোন দল পশুর পাল তাড়াইয়া, কোন দল মৎস্য ধরিয়া, কোন দল কৃষিকার্যকে প্রধান অবলম্বন করিয়া, কোন কোন দল আবার উপরিউক্ত সর্বপ্রকার বৃত্তিই কিছু কিছু অনুসরণ করিয়া জীবনধারণ করিতেছে। এই সব বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন মানব-গোষ্ঠীর বহুধা তৎপরতার মধ্যে এমন কোন সমতা নাই যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া নব্য প্রস্তরযুগের তৎপরতাকে সভ্যতা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। গর্ডন চাইল্ড দেখাইয়াছেন, বৃহত্তম নিওলিথিক গ্রামের বিস্তৃতি এ পর্যন্ত ছয় সাত কাঠার বেশী দেখা যায় নাই এবং এইরূপ গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত কবরের সংখ্যা সাধারণতঃ বিশ হইতে পঁচিশের ঊর্ধ্বে নহে।

কিন্তু ইহার এক হাজার বৎসর পরে খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দের অনুরূপ সময় হইতে নীল নদের নিম্ন উপত্যকা, তাইগ্রিস-ইউফ্রেতিসের মধ্যবর্তী ভূভাগে অবস্থিত সুমের ও আক্কাদ অথবা সিন্ধুনদের তীরবর্তী মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার ভূগর্ভস্থ স্তরসমূহে যে সব দ্রব্য প্রত্নতত্ত্বীয় খনন কার্যের ফলে পাওয়া গিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ অন্য জাতের।

এখন হইতে শিকারের বা প্রাথমিক কৃষির উপযোগী অতি সাধারণ যন্ত্রপাতি বা গৃহ-শিল্পজাত অনাড়ম্বর দ্রব্যাদি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত। সেই স্থানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে সুবৃহৎ প্রাসাদ, মন্দির, সমাধিস্তম্ভ, সুমেরের জিগ্‌গুরাট, মিশরের পিরামিড, শস্যশালা ও কারখানা; কারুকার্য খচিত স্বর্ণ, পিতল, সীসক প্রভৃতির নানা ধাতব অলংকার, যুদ্ধের উপযোগী নানা অস্ত্র, চাকার সাহায্যে নির্মিত উন্নত ধরনের বিচিত্র মৃণ্ময় পাত্র, ধাতব দ্রব্যাদি এবং লিপি। যে সমাজ ও গোষ্ঠী এইসব কীর্তি ও দ্রব্যসম্ভার সম্ভব করিয়াছে, তাহাদের পুরোভাগে আমরা অনায়াসে কল্পনা করিতে পারি এক শ্রেণীর পুরোহিত ও যাজক সম্প্রদায়, রাজবংশ ও শাসক শ্রেণী, লিখন ও পঠনে অভিজ্ঞ শিক্ষিত সম্প্রদায়, শাসন পরিচালনায় নিযুক্ত কর্মচারী; তাহার পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনী; বিভিন্ন শিল্প ও কারিগরিবিদ্যায় পারদর্শী কারিগর শ্রেণী; বণিক সম্প্রদায়; আরও পরে মজুর ও কৃষক। বৃহত্তম নিওলিথিক গ্রামের বিস্তৃতি যেখানে ৬।৭ কাঠার অধিক নয়, মহেঞ্জোদড়ো নগর সেখানে এক বর্গ মাইল ক্ষেত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। 'উরে'র নিকটবর্তী গোরস্থান হইতে অন্যূন ৭০০ কবরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং ইহারা কর্মচঞ্চল এক একটি বৃহৎ নগর, বৃহৎ জনপদ। এই জনপদের লোকসংখ্যার এক ভগ্নাংশ—অবশ্য বৃহৎ ভগ্নাংশ, কেবল খাদ্যোৎপাদনে ও দিন-মজুরের কাজে নিযুক্ত। অবশিষ্ট অংশ শিল্প ও স্থাপত্যের দ্বারা জীবনযাত্রার মান ও সৌন্দর্য বাড়াইবার জন্য তৎপর; ব্যবসায় ও বাণিজ্যের দ্বারা সম্পদবৃদ্ধি ও সভ্যতাপ্রসারে সহায়তা করিতেছে; শাসন-ব্যবস্থার দ্বারা আভ্যন্তরিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেছে; সামরিক তৎপরতার দ্বারা বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছে। ঐতিহাসিকেরা ও সমাজবিদ্যাবিশারদেরা এইরূপ তৎপরতার আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়াই নীলনদ, তাইগ্রিস—ইউফ্রেতিস ও সিন্ধুনদের উপত্যকায় প্রথম সভ্যতা বিকাশের কথা বলিয়া থাকেন।

উপরিউক্ত তিনটি নদী উপত্যকার সভ্যতাই সমসাময়িক কালের সৃষ্টি, ইহাদের মধ্যে নানা

সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকিলেও ইহার উপাদান ও স্বরূপ এক। দৃষ্টান্তস্বরূপ সিন্ধুনদের উপত্যকার সভ্যতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যাইতে পারে।

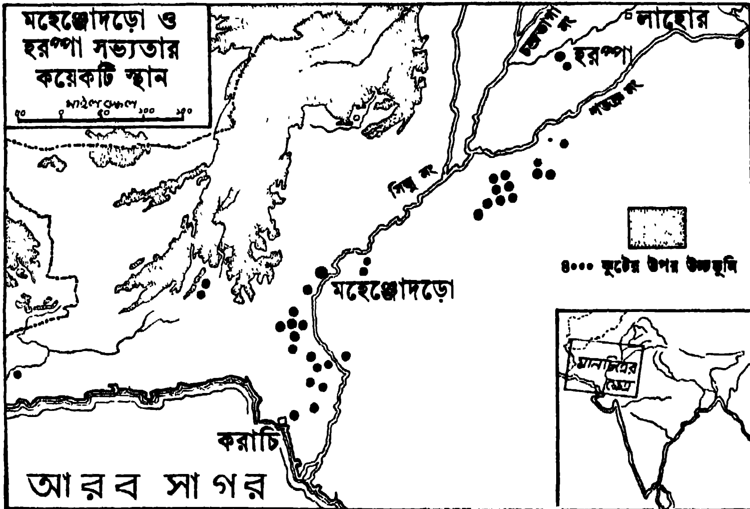
সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা—নদী উপত্যকার সভ্যতার এক নমুনা

মহেঞ্জোদড়োর (বা মোঅন্‌জোদড়ো—মৃতের স্তূপ)* পর পর সাতটি স্তরের ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকেরা দেখাইয়াছেন, খ্রীঃ পূঃ ৩২৫০ অব্দের অনুরূপ সময়ে প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড্‌, ভূমধ্যসাগরীয়, অ্যাল্পিনয়েড্‌ ও মঙ্গোলয়েড্‌ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির এক মিশ্র দল সিন্ধুনদের উপত্যকায় মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে প্রথম বসতি স্থাপন করে। এই অঞ্চলে এইরূপ দলের সর্বশেষ বসতি স্থাপনের কাল খ্রীঃ পূঃ ২৭৫০ অব্দ। ইহার মধ্যে খ্রীঃ পূঃ ২৮০০ হইতে ২৫০০ অব্দ, অর্থাৎ তিন কি চারিশত বৎসর, ডাঃ ফাব্রির মতে প্রকৃত সভ্যতা সৃষ্টির কাল। সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার এইরূপ কাল নির্ণয়ের প্রধান যুক্তি হইল:—

(১) এই অঞ্চলের কোনও প্রত্নতত্ত্বীয় অঞ্চল হইতে এপর্যন্ত লৌহ নির্মিত দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হয় নাই; খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় মিলেনিয়মের মাঝামাঝি সময় হইতে মধ্য ও নিকট প্রাচ্যের সর্বত্র লৌহের ব্যবহার দেখা যায়।

(২) ডাঃ গ্যাড্‌ মেসোপোটেমিয়ায় সিন্ধু উপত্যকার যে শীলমোহর আবিষ্কার করেন, তাহা পরীক্ষা করিয়া এই শীলমোহরের কাল খ্রীঃ পূঃ ২৮০০ অব্দ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত 'উর' ও 'এশনুন্না'য় প্রাপ্ত মহেঞ্জোদড়োর আরও কয়েকটি শীলমোহরের কাল খ্রীঃ পূঃ ২১৫০ ও ২৬০০-২৫০০ অব্দ বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

(৩) সুমের, এলাম ও মিশরে উৎপন্ন মৃৎপাত্রের সহিত মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার মৃৎপাত্রের



২২। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা সভ্যতার কয়েকটি স্থান।

তুলনা করিয়াও দেখা যায় খ্রীঃ পূঃ ৩০০০-২৫০০ অব্দের মধ্যে সিন্ধু উপত্যকায় ঐরূপ মৃৎশিল্পের উদ্ভব হইয়াছিল।

*ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বলেন, সিন্ধি ভাষা অনুযায়ী এই শব্দের যথার্থ উচ্চারণ নাকি 'মোঅন্‌জোদড়ো', অর্থ মৃতের স্তূপ, কাহারও কাহারও মতে, মৃতের পুরী। —প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, পৃ. ২২৬।



মহেঞ্জোদড়োর বৃহৎ বাপী—চতুষ্পার্শ্বের প্রাকার, গৃহ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।



মহেঞ্জোদড়োর সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত রাজপথ 'প্রথম সরক'।

PLATE IV



নর্দমা মহেঞ্জোদড়ো।



নর্দমার বহির্মুখে জঞ্জাল ধারণের জন্য বসানো মাটির পাত্র—মহেঞ্জোদড়ো।



ময়লা জল নিকাশের জন্য ইটের দেয়ালের সঙ্গে বসানো মাটির পাইপ।

গৃহাদি নির্মাণ, নগর পরিকল্পনা ও স্থাপত্য : জনৈক ইংরেজ পর্যটক মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বলিয়াছেন, তিনি যেন ল্যাংকাশায়ারের মত আধুনিক কালের কোন শিল্প-প্রধান নগরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন। এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী যে নগর নির্মিত হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৯ হইতে ৩৪ ফুট চওড়া ছোট বড় রাস্তা সোজাসুজি পূর্ব-পশ্চিমে ও উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত থাকিয়া সমগ্র সহরটিকে ছোট বড় নানা বর্গ ও আয়তক্ষেত্রে ভাগ করিয়াছে। এই সব বর্গ ও আয়তক্ষেত্রের উপর ইটের বাড়ী সারিবন্ধভাবে নির্মিত। ক্ষুদ্রতম বাড়ী দুই কামরাবিশিষ্ট মধ্যবিত্ত দরিদ্রের জন্য। বহু কামরা-যুক্ত সুবৃহৎ অট্টালিকারও অভাব নাই। এইগুলি ধনীর বাসস্থান ও সরকারী দপ্তরখানা।

বড় বড় শস্যাগার ও সাধারণের উদ্দেশ্যে নির্মিত স্নানাগার মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার বিশেষত্ব। হরপ্পায় প্রাপ্ত এক বিরাট শস্যাগারের আয়তন দৈর্ঘ্যে ১৬৯ ফুট ও প্রস্থে ১৩৫ ফুট। সেইরূপ ৩৯×২৩×৮ ফুট গভীর একটি স্নানাগার বা সন্তরণ-বাপীও আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের সব চেয়ে বিস্মিত করে সহর দুইটির জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা। রাস্তা-ঘাট আলোকিত করিবার ব্যবস্থা সর্বত্র বিদ্যমান। সহরের সর্বত্র ময়লা জল নিকাশের নালা বসানো; বড় বড় রাস্তার নীচে ১।২ ফুট ব্যাসের কয়েকটি প্রধান নলের সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালাগুলি সংযুক্ত। ভূগর্ভস্থ নলের অবস্থা যাহাতে মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা যায়, তজ্জন্য কিছুদূর তফাতে একটি করিয়া পিট। সহরের নালা ও জলনিকাশের নালাগুলি পরিষ্কার করিবার বন্দোবস্ত ছিল, নালার জল সহরের বাহির করিবার ও সহরের অনতিদূরে একটি গভীর খাদের মধ্যে আবর্জনা রাশিকৃত করিবার ব্যবস্থাও দেখা যায়। স্বাস্থ্যরক্ষার এইরূপ ব্যাপক ও বিজ্ঞানসম্মত বন্দোবস্ত এই সময়ে পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না—না ব্যাবিলনে না মিশরে। ব্যাবিলনের জিগ্‌গুরাটের মত অতিকায় কৃত্রিম পাহাড়ের মন্দির অথবা মিশরের পিরামিডের মত সমাধিসৌধ মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় চোখে পড়িবে না। ইহাদের স্থাপত্য ও নগর পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণ যাহাতে স্বাচ্ছন্দ্যে ও আরামে বসবাস করিতে পারে। কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতি নানা ধরনের শ্রমজীবী প্রোলেটেরিয়েটদের ইহা ভূস্বর্গ। ইহার স্থাপত্যের কোথাও সর্বাধিনায়ক কোন পুরোহিত সম্প্রদায়ের বা রাজবংশের অমিত ক্ষমতার দম্ভের প্রকাশ নাই।

কৃষি : সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার মেরুদণ্ড কৃষি। শস্যের মধ্যে গম, বার্লি ও ধানের চাষ প্রধান। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় যে গম ও বার্লির চাষ হইত, বর্তমানে পাঞ্জাবে সেই একই প্রকার শস্যের চাষ হইয়া থাকে। খাদ্য হিসাবে খেজুর প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। খাদ্য তালিকায় দুগ্ধ, শাকসবজি ও ফল গুরুত্বপূর্ণ অংগ। পশুর মধ্যে মেষ, ছাগল, শূকর ও গবাদি পশুর মাংস, পক্ষীর মধ্যে মুরগী ও হরিয়াল এবং নদীর সুস্বাদু মৎস্য ও কচ্ছপ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইত।

পশুপালন : গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে কুব্জ বৃষ, মহিষ, মেষ, শূকর, কুকুর, বিড়াল ও হস্তী উল্লেখযোগ্য। সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা এই সময়ে অশ্বের ব্যবহার জানিত, কেহ কেহ এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। মহেঞ্জোদড়োর উপরের স্তরে প্রাপ্ত কয়েকটি অশ্বের অস্থি হইতে এইরূপ অনুমিত হয়। খ্রীঃ পূঃ ১৬০০ অব্দে অশ্বারোহী যাযাবর আর্য জাতির ভারতে প্রবেশের পর হইতেই অশ্বের সহিত এদেশের প্রথম পরিচয়। পিক ও ফ্লুয়র (Fleur) সাহেবের অভিমত মধ্য এসিয়া ও দক্ষিণ রাশিয়ার বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে অশ্বকে প্রথম পোষ মানানো হইয়াছিল।* এই তৃণভূমির পশ্চিমে ছিল সলুত্রীয় মানুষের বংশধরদের বাস এবং পূর্বে হিমযুগের অবসানে মঙ্গোলদের। এই তৃণভূমির এরৎজেভাল্‌স্‌কিস্ (Erzewalskis) অঞ্চলে এখনও বন্য অশ্ব দেখা যায়। সম্ভবতঃ যাযাবর ও শিকারী সলুত্রীয় ও মঙ্গোলরা

* M. S. Randhawa,—'Role of Domesticated Animals in Indian History', *Science & Culture*, 12, 1, 1946, p. 10.

সভ্য মানুষের অনেক পূর্বে অশ্বকে পোষ মানাইয়া থাকিবে। কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দের পূর্বে সভ্যজগতের কোথাও অশ্ব ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় না। বন্যজন্তুদের মধ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভারতীয় বাইসন, গণ্ডার, বানর, ভাল্লুক প্রভৃতির সহিত সিন্ধু উপত্যকার লোকেরা পরিচিত ছিল; শীলমোহরে এই সব জন্তুর প্রতিকৃতি অঙ্কিত দেখা যায়।

বয়নঃ তুলা ও পশমের সূতা কাটা ও এই সূতার দ্বারা বস্ত্রাদি বয়নে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার তাঁতীরা বিশেষ পারদর্শী ছিল, টাকুর ও টাকুর আবর্তের (spindle whorl) কতকগুলি ধ্বংসাবশেষ ইহা নির্দেশ করে। পাঁচ সহস্র বৎসর পরে তুলা বা পশমের বস্ত্রাদির লেশ মাত্র অবশেষ আশা করা বাতুলতা মাত্র। তথাপি নিতান্ত আকস্মিকভাবেই একটি রৌপ্য-পাত্রের গায়ে তুলার সামান্য অংশ পাওয়া যায়। মাতুঙ্গার (বোম্বাই) তুলা সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে (Cotton Technological Laboratory—Matunga) এই তুলার ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, উত্তর ভারতে বর্তমানে মোটা আঁশাল যে এক প্রকার তুলা উৎপন্ন হয় সিন্ধু উপত্যকার তুলা ছিল সেই জাতের।*

মৃৎশিল্পঃ মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার মৃৎপাত্র প্রধানতঃ কুমোরের চাকার সাহায্যে তৈয়ারী হইত। নানা রং-এর কাজ করা পাত্রের চেয়ে কারুকার্যহীন সাদাসিধা পাত্রের আধিক্যই বেশী। ইরাণ ও মেসোপোটেমিয়ার পাতলা ও হাল্কা পাত্রের অপেক্ষা সিন্ধু উপত্যকার মৃৎপাত্রগুলি পুরু ও ভারী। সর্বদা ব্যবহারের উপযোগী করিয়া গড়িবার জন্য সম্ভবতঃ পাতলা ও হাল্কা কারুকার্য সুশোভিত সৌখিন পাত্রের বদলে এইরূপ পুরু ভারী ও সাদাসিধা পাত্র তৈয়ারী হইত। সিন্ধুর পলিমাটি, বালি ও কিছু অভ্র ও চূণের গুড়া মৃৎশিল্পের প্রধান উপাদান। তলদেশ হইতে অগ্নিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, এইরূপ গোলাকার চুল্লীতে পাত্রগুলিকে পোড়াইবার ব্যবস্থা ছিল।

রঙ্গীন ও চিত্রিত বিশেষ ধরনের মৃৎপাত্রও অবশ্য এখানে পাওয়া গিয়াছে। চিত্রগুলি হয়, জ্যামিতিক নক্সা-প্রধান, নয় জন্তু জানোয়ারের প্রতিকৃতিবহুল। বহির্জগতে সিন্ধু মৃৎশিল্পের যে যথেষ্ট আদর ছিল তাহার প্রমাণ টেল্ আস্মার প্রভৃতি স্থান হইতে এই জাতীয় ভারতীয় মৃৎপাত্র প্রাপ্তি।

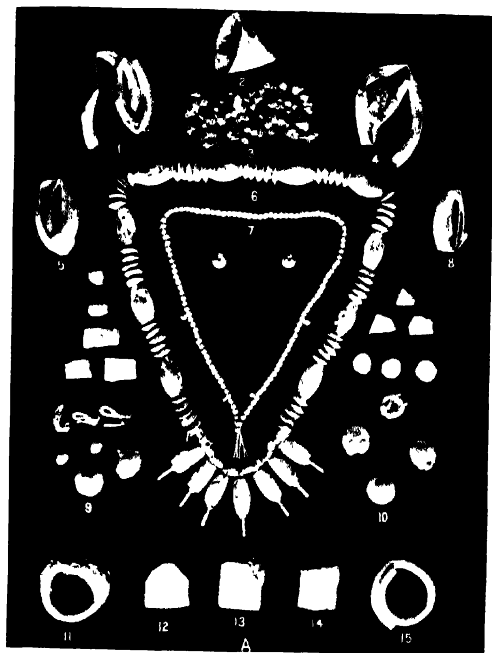
কাচের মত চক্চকে ও মসৃণ চীনামাটির পাত্রনির্মাণ মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার মৃৎশিল্পের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ফরাসী ভাষায় যাহাকে ফেইয়ঁস (faience) বলে সেইরূপ চীনামাটির বহু দ্রব্য এখানে পাওয়া গিয়াছে। পাত্রগুলি সাদা, গাঢ় বা হাল্কা সবুজ ও নীল রং-এর, মসৃণতা সম্পাদনে এইরূপ নৈপুণ্যের ছাপ আছে যে সহসা দেখিলে ইহাদিগকে কাচপাত্র বলিয়া ভুল হওয়া স্বাভাবিক এবং অনেকে প্রথম প্রথম এই ভুল করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন, সিন্ধু উপত্যকার প্রাচীন ভারতীয়রা কাচের ব্যবহার জানিত। সমসময়ের মৃৎশিল্পীদের মধ্যে কচিৎ এইরূপ উচ্চাঙ্গের দক্ষতা ও জ্ঞান দৃষ্ট হয়।

ধাতুর ব্যবহারঃ স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিতল ও সীসক এই পঞ্চ ধাতুর সহিত সিন্ধু উপত্যকার কর্মকাররা পরিচিত ছিল। লৌহের ব্যবহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। স্বর্ণের প্রাপ্তিস্থান সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারতের কোলার ও অনন্তপুর জিলার স্বর্ণখনি। একমাত্র অলঙ্কার হিসাবেই ইহার ব্যবহার দেখা যায়, সূক্ষ্ম কারুকার্যের দিক হইতে ব্যাবিলনীয় (উর) স্বর্ণকারেরা ভারতীয়দের অপেক্ষা অবশ্য অনেক বেশী নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছে।

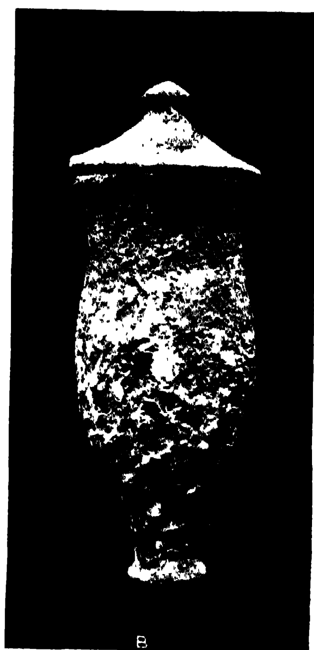
রৌপ্যের জন্য মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পাকে বিদেশী আমদানির উপর নির্ভর করিতে হইত, আফ্গানিস্তান, আর্মেনিয়া ও পারস্য ছিল রৌপ্য সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র।

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার সর্বনিম্ন স্তরেও তাম্র ও পিতল-নির্মিত দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে। রাজপুতানা, বেলুচিস্তান বা মাদ্রাজ হইতে তাম্রের খনিজ সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়, তবে টিনের

* *The Vedic Age*, p. 181.



স্বর্ণ-নির্মিত অলংকার– মহেঞ্জোদড়ো।



রৌপ্য-নির্মিত পাত্র– মহেঞ্জোদড়ো।







চিত্রিত ও কারুকার্যখচিত মৃৎপাত্র—মহেঞ্জোদড়ো।

PLATE VI







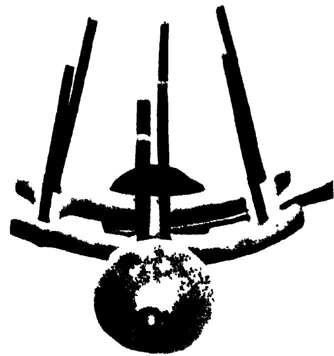


মহেঞ্জোদড়োর শীলমোহর বিভিন্ন জন্তুর আকৃতি ও লিপির নমুনা দ্রষ্টব্য।





চীনামাটির কয়েকটি দ্রব্য--মহেঞ্জোদড়ো।



উপরে—খোলকের মাপনী।
নীচে চাকার ব্যবহার।

প্রাপ্তিস্থান সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নাই। পারস্য বা কর্ণওয়াল হইতে সুদূর মিশরের পক্ষে টিন সংগ্রহ করা যদি দুঃসাধ্য না হয়, পারস্য বা মালয় হইতে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার তাম্রকারদিগের টিন সংগ্রহ করা কঠিন মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাম্রের কাজে সুমেরীয়দের ভারতীয়রা না ছাড়াইলেও পিতল বা ব্রোঞ্জের কাজে ভারতীয় কর্মকার নিঃসন্দেহে অদ্বিতীয়। প্রাচীনকালের পরিচিত *cire perdue* পদ্ধতিতে পিতল ঢালাই-এর কাজ হইত। পিতলের কুঠার, খড়্গ, বর্শা, করাত, ক্ষুর প্রভৃতি নানা যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়াছে। ১৬½ ইঞ্চি লম্বা পিতলের এক বড় করাত সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলেন, রোমকদের আগে দাঁত-বিশিষ্ট এত বড় করাত নাকি আর কোন জাতির জানা ছিল না। পিতলের কয়েকটি অতি সুন্দর নর্তকী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। পিতলের দর্পণ এইখানে প্রাপ্ত আর একটি উল্লেখযোগ্য দ্রব্য।

প্রাচীন ভারতে খনি হইতে যথেষ্ট পরিমাণ সীসক উত্তোলন করা হইত। সীসক সরবরাহের কেন্দ্র ছিল আজমীর।

ওজন, মাপনী, দশমিক পদ্ধতিঃ মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় ছোট বড় নানা রকমের বহু ওজন পাওয়া গিয়াছে। স্বর্ণকারের ব্যবহারের উপযোগী অতি ক্ষুদ্র ওজন হইতে টানিয়া তুলিতে কষ্ট হয় এইরূপ বড় ও ভারী ওজনও আবিষ্কৃত হইয়াছে। বড় ওজনগুলি সাধারণতঃ চতুষ্কোণ ঘনর আকারে নির্মিত, ছোট ওজনের আকার অনেকটা চোঙের মত; মেসোপোটেমিয়া ও এলামে এইরূপ ওজনের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। একক (unit) হিসাবে মহেঞ্জোদড়ো বা হরপ্পায় যে ওজনের ব্যবহার দেখা যায় গ্র্যামে (gram) পর্যবসিত করিলে ইহার মান দাঁড়ায় ০·৮৭৫০ গ্র্যাম। বৃহত্তম ওজন হইল ১০৯৭০ গ্র্যাম। একটি ওজন দুই স্থান হইতেই যথেষ্ট সংখ্যায় আবিষ্কৃত হওয়ায় মনে হয় এই ওজনটিই সাধারণ বেচাকেনার কাজে হামেশা ব্যবহৃত হইত। ইহার মান ১৩·৬৪ গ্র্যাম একক ওজনের ঠিক ১৬ গুণ। মাপজোখ ও হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে ভারতীয় পদ্ধতিতে ১৬র প্রাধান্য সুবিদিত। হয়ত মহেঞ্জোদড়োর আমলেই এই প্রাধান্য স্থিরীকৃত হইয়াছিল।

কয়েকটি দাঁড়িপাল্লার ভগ্নাবশের পাওয়া গিয়াছে। উপরের দণ্ডটি পিতলের ও পাল্লা দুইটি তামার। হাল্কা ও মূল্যবান দ্রব্যাদি ওজনার্থ সম্ভবতঃ এই প্রকার তুলাদণ্ড ব্যবহৃত হইত। ভারী দ্রব্যাদি ওজনের জন্য সম্ভবতঃ কাঠের দাঁড়িপাল্লার ব্যবস্থা ছিল।

৬·৬২ ইঞ্চি লম্বা একটি খোলকের বা শেলের মাপনী পরীক্ষা করিয়া ডাঃ ম্যাকে দেখাইয়াছেন, এইরূপ মাপনীর সাহায্যে দৈর্ঘ্য মাপিবার যে ব্যবস্থা ছিল তাহার এককের মান ০·২৬৪ ইঞ্চি। মাপনীটি আবার পাঁচটি করিয়া দাগে (১·৩২ ইঞ্চি) পর পর বিভক্ত। ইহাতে ম্যাকে অনুমান করেন, গণনার ব্যাপারে সিন্ধু উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক অধিবাসীরা সম্ভবতঃ দশমিক পদ্ধতির সহিত পরিচিত ছিল। উপরিউক্ত মাপনীটি সম্ভবতঃ ১৩·২ ইঞ্চি লম্বা একটা সম্পূর্ণ মাপনীর ভগ্নাবশেষ। চতুর্থ রাজবংশের আমল হইতে মিশরে এবং একই সময়ে এলামে দশমিক পদ্ধতি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। প্রথমে কোন একটি সভ্যতার কেন্দ্রে এই পদ্ধতি আবিষ্কৃত ও প্রচলিত হইয়া পরে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও যোগাযোগের মাধ্যমে অন্যত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল কিনা সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই; তবে স্বাধীনভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহার ব্যবহার আবিষ্কৃত ও প্রচলিত হওয়াও কিছু অসম্ভব নহে।

ঔষধ সম্বন্ধে জ্ঞানঃ সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের ঔষধ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞান সম্বন্ধে অতি অল্প তথ্যই আবিষ্কৃত হইয়াছে। কয়লার মত কালো রং-এর এক প্রকার দ্রব্য কতকগুলি মৃৎপাত্রের মধ্যে সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই দ্রব্যকে জলে দ্রবীভূত করিলে গাঢ় বাদামী রং-এর এক দ্রবণের উদ্ভব হয়। শিলাজিতের সহিত এই দ্রব্যের সাদৃশ্য প্রমাণিত হইয়াছে। শিলাজিৎ একটি মূল্যবান ঔষধ; পেটের অসুখ, বাত, ডায়াবেটিস্, যকৃতের পীড়া প্রভৃতিতে ইহা প্রযোজ্য। কাট্ল (Cuttle) নামে কম্বুজ জাতীয় এক প্রকার সামুদ্রিক মৎস্যের হাড় মৃৎপাত্রে রক্ষিত দেখা যায়। এই হাড় চিবাইলে ক্ষুধার

উদ্রেক হয় এবং চক্ষু, কর্ণ ও গলদেশের পীড়ায় ইহা ঔষধরূপে কার্য করে। প্রবাল ও নিমপত্র, হরিণ, গণ্ডার প্রভৃতি জানোয়ারের শিঙ্ সম্ভবতঃ ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। আয়ুর্বেদে উপরিউক্ত ঔষধের উল্লেখ আছে। এজন্য অনেকের ধারণা হইয়াছে, সম্ভবতঃ আয়ুর্বেদ ও ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের মূল সুপ্রাচীন সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার কাল পর্যন্ত প্রসারিত।*

লিপিঃ মহেঞ্জোদড়োর ভগ্নস্তূপে সিন্ধু সভ্যতার যুগে প্রচলিত লিপির কয়েকটি নমুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই লিপির পাঠ ও মর্মোদ্ধার বহু চেষ্টা ও পরিশ্রম সত্ত্বেও এপর্যন্ত সম্ভবপর হয় নাই। যাঁহারা এ চেষ্টায় পণ্ডশ্রম হইয়াছেন তাঁহাদের অভিমত, এই লিপি চিত্রলিপিরই (pictograph) এক বিশেষ অবস্থা। পক্ষী, মৎস্য, মনুষ্য দেহের বিভিন্ন অবস্থান, আকৃতির ও ভঙ্গীর দ্বারা এক প্রকার অর্থ-প্রকাশের চেষ্টা সুপরিস্ফুট। তথাপি ইহারই মধ্যে নানা চিহ্ন ও প্রতীক ব্যবহারের নমুনা দেখিয়া মনে হয়, চিত্রলিপির পর্যায় অতিক্রম করিয়া চিহ্ন ও প্রতীকগুলিকে ক্রমশঃ অর্থবোধক করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। সমসময়ে মেসোপোটেমিয়ায় কিউনিফর্ম (cunieform) লিপি এবিষয়ে যতদূর অগ্রসর হইয়াছিল চিহ্ন ও প্রতীকগুলিকে ততদূর অর্থবোধক ও সর্বজনস্বীকৃত করিয়া তুলিবার কার্যে সিন্ধু উপত্যকার লিপিকাররা ততদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। যে কোন কারণেই হউক, বিভিন্ন স্তরে লিপির নমুনা আবিষ্কৃত না হওয়ায় ইহার ক্রমবিকাশের ধারা পরীক্ষা করিবার কোন সুযোগ এপর্যন্ত হয় নাই।

মহেঞ্জোদড়োর লিপির একটি বিশেষত্ব চিহ্নগুলির সহিত স্বরচিহ্নবোধক রেখার (strokes or accents) ব্যবহার। এই রেখার সাহায্যে সম্ভবতঃ চিহ্নগুলির উচ্চারণ-ধ্বনির পার্থক্য ঘটানো হইত। প্রায় ৪০০ বিভিন্ন চিহ্নের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। এইরূপ সংখ্যাবহুল চিহ্ন ও রেখার ব্যবহার দেখিয়া পণ্ডিতদের অনুমান, সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার কালে এদেশে আক্ষরিক অথবা বর্ণমালার লিপির আবির্ভাব হয় নাই।

সুমেরীয়, প্রোটো-এলমাইট্, হিট্টাইট্, মিশরীয়, ক্রীটান এমন কি চৈনিক লিপির প্রাথমিক অবস্থার সহিত মহেঞ্জোদড়োর লিপির কতকগুলি বিষয়ে মিল আছে। রায় বাহাদুর কাশীনাথ দীক্ষিত মহাশয় সুমেরীয় ও প্রোটো-এলমাইট্ লিপির সহিত ইহার মিল লক্ষ্য করিয়া মনে করেন, প্রথম বিবর্তনের সময় উপরিউক্ত দুই অঞ্চল হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিলেও সিন্ধু উপত্যকার লিপি শেষ পর্যন্ত স্বাধীনভাবেই ভারতীয় মৃত্তিকায় পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল। কোন কোন বিশেষজ্ঞ ব্রাহ্মী লিপির সহিত সিন্ধু লিপির সম্পর্ক নির্দেশের চেষ্টা করিয়াছেন। এবিষয়ে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পেঁছান এখনও সম্ভবপর হয় নাই।

সিন্ধু সভ্যতার বিস্তৃতি ঃ মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার প্রধান নিদর্শনগুলি আবিষ্কৃত হইলেও ইহা কোনক্রমেই একটি স্থানীয় ঘটনা নহে। সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারত ও গাঙ্গেয় উপত্যকা জুড়িয়া এই সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল। সিন্ধু প্রদেশে প্রত্নতত্ত্বীয় গবেষণা হইতে ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় উক্ত প্রদেশের বহু স্থানে এই সভ্যতার অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। স্যার অরেল ষ্টাইন উত্তর ও দক্ষিণ বেলুচিস্তানে ইহার অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন। বক্সার ও পাটনার নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে সিন্ধু উপত্যকার বিশেষত্ব-সম্বলিত টেরাকোটার আবিষ্কার হইতে প্রমাণিত হয় যে, উত্তর ভারতে সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকায় এই সভ্যতার বিস্তার লাভ ঘটিয়াছিল।

তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন উপত্যকা-অঞ্চলে এইরূপ সময়ে মানব সভ্যতা গড়িবার যে প্রাথমিক উদ্যম চলিতেছিল, সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে।

* *The Vedic Age*, p. 178.

এই সব উপত্যকার বিভিন্ন নগর ও জনপদের মধ্যে একরূপ বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্কের মারফত নিঃসন্দেহে একে অন্যকে প্রভাবিত করিয়াছিল। সে যুগের এক প্রধান ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্র মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক বিশেষভাবে বিদ্যমান। বেলুচিস্তান ও পারস্যের মধ্য দিয়া স্থলপথে অথবা আরব্য সাগর ও পারস্য উপসাগরের পথে সিন্ধু উপত্যকার নানা নগরের সহিত সুমের ও এলামের বর্ধিষ্ণু বাণিজ্যিক সম্পর্কের অকাট্য প্রমাণ আমরা পাই শীলমোহর ও দ্রব্যাদির বিনিময়ের মধ্যে।

"In several Mesopotamian cities stray seals, beads, and even pots have turned up that are Sumerian in character, but are, on the other hand, common in contemporary cities in Sindh and Punjab. They afford conclusive proof of international trade linking the Tigris with the Indus 1,200 miles away. They reveal a picture of caravans regularly crossing the rugged ranges and salt deserts that seperate the two valleys, or of fleets of dhows sailing along the waterless coasts of the Arabian sea between the rivers' mouths."

—গর্ডন চাইল্ড এইরূপ লিখিয়াছেন।*

৩·২। লিপি ও বর্ণমালার আবিষ্কার

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা লিপির উল্লেখ করিয়াছি। লিপি মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। ভাষাকে স্থায়িত্ব দিয়া ও ভাব বিনিময় সহজ করিয়া লিপি মানুষের মননশীলতার পথ উন্মুক্ত করিয়াছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্ভবপর করিয়াছে।

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব কালের তুলনায় লিপির আবিষ্কার নিতান্তই সাম্প্রতিক ঘটনা। ইহা মাত্র পাঁচ কি ছয় হাজার বৎসরের কথা। পূর্ণাঙ্গ আক্ষরিক লিপির ইতিহাস আরও সাম্প্রতিক। লিপি প্রচলনের পূর্বে প্রধানতঃ কথ্য ভাষাকে সম্বল করিয়া ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে মানুষকে অতি ধীরে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। প্রস্তরযুগের মহানিশ্চেষ্টতার ও অনগ্রসরতার এক প্রধান কারণ হইল লিপির অনাবিষ্কার। ইহার অভাবে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর উত্থান, পতন ও বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বহু ভাষারও জন্মমৃত্যু ঘটিয়াছে। এই সব মানব গোষ্ঠীর তৎপরতায় যে সব মূল্যবান অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছিল, লিপিবন্ধ না হইবার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই পরবর্তী গোষ্ঠী তাহার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হইয়াছে। তাহাদের সব কিছু আবার প্রথম হইতেই সুরু করিতে হইয়াছে। এইভাবে মানুষকে কত যে মূল্যবান তথ্য, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বার বার হারাইয়া পুনরাবিষ্কার করিতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। লিপির আবিষ্কারে মানব প্রচেষ্টার বিরাট অপচয় বন্ধ হইল। পূর্বগামীদের লিপিবন্ধ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান পরবর্তীদের কাজকে সহজ করিয়া দিল। সভ্যতার পথে তাহার মহাভিযান ত্বরান্বিত হইল।

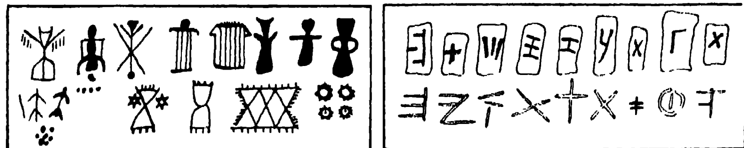
লিপি বাণীর লৈখিক প্রতিরূপ। বাণীর ধ্বনি ও ভাব লিপির মধ্যে চিরস্থায়ীরূপে প্রকাশিত। আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে গেলে, উচ্চারিত কথার ধ্বনি-বৈচিত্র্য অথবা অব্যক্ত চিন্তা ও ভাব প্রস্তর, ধাতু, কাষ্ঠ, চর্ম, বস্ত্র, কাগজ বা অনুরূপ কোন বস্তুর উপর দৃশ্যমান এক ধরনের সঙ্কেতের সাহায্যে পাকাপাকিভাবে খোদিত বা চিহ্নিত করিবার নাম লিপি। বর্ণমালার ব্যবহার আবিষ্কৃত হইবার পর এই প্রকার লিপির উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছে। খৃীঃ পূঃ

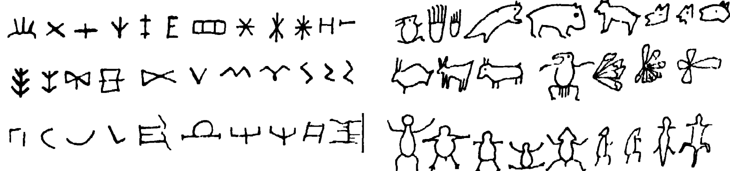
* V. Gordon Childe, *loc. cit*, p. 168.

দ্বিতীয় মিলেনিয়মের প্রথমভাগে এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সংঘটিত হয়। বর্তমানে সভ্য-জগতের সর্বত্র বর্ণমালার লিপিই প্রচলিত।

প্রাগৈতিহাসিক চিত্রাঙ্কন

বর্ণমালার লিপি লিপি-বিবর্তনের সর্বশেষ পরিণতি। বহু ধাপে এই বিবর্তনের ইতিহাস বিভক্ত। এই সব ধাপের সম্পূর্ণ ইতিহাস উদ্ধার এখনও লিপিবিশারদদের গবেষণা ও বিতর্কের বিষয়। ধ্বনি প্রকাশ করিবার ক্ষমতা বাদ দিয়া শুধু ভাব প্রকাশের ক্ষমতার দ্বারা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, প্রাগৈতিহাসিক কালের চিত্রাঙ্কনও এক ধরনের লিপি বিশেষ। প্রস্তরযুগের





২৩। লিপির পথ-প্রদর্শক প্রাগৈ সিক চিত্রাঙ্কনের কয়েকটি নমুনা।
(১) স্পেনে প্রাপ্ত; (২) প্যালেস্টাইনে প্রাপ্ত নানাবিধ জ্যামিতিক প্রতীক;
(৩) ক্রীটে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের উপর অঙ্কিত নানাবিধ জ্যামিতিক প্রতীক;
(৪) ক্যালিফোর্ণিয়ায় প্রাপ্ত জীবজন্তুর চিত্র।

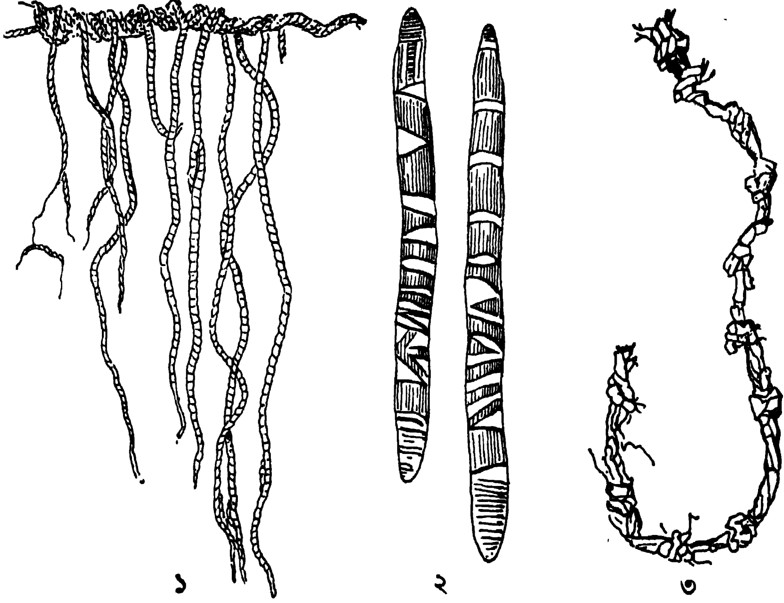
গুহাবাসী মানুষ পাথরের দেয়ালে আঁচড় কাটিয়া নানা জন্তু জানোয়ারের অথবা প্রাকৃতিক বস্তুর যে সকল চিত্র আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছে তাহাই প্রকৃত লিপির পথ-প্রদর্শক। প্রস্তরযুগের শেষভাগে পৃথিবীর সর্বত্র--ফ্রান্সে, স্পেনে, আফ্রিকায়, অস্ট্রেলিয়ায়, সাইবেরিয়ায়, এই ধরনের প্রাচীর চিত্রের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা যেমন প্রথম চিত্রাঙ্কনের নিদর্শন, তেমনই এইরূপ প্রচেষ্টার মধ্যে লিপির সম্ভাবনাও অন্তর্নিহিত। চিত্র ও লিপি উভয়েরই ইহা শৈশব অবস্থা। শিশু এখনও ছবি আঁকিতে শিখিয়াই লিখিতে শিখে।

প্রাগৈতিহাসিক মিশরে ও গ্রীসে চিত্রাঙ্কন ও লিখনের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হইত না। মিশরীয় শব্দ 'স্-শ্' (s-sh) বা গ্রীক শব্দ 'গ্রাফিন' (graphein) চিত্রাঙ্কন ও লিপি দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইত। ফরাসী পণ্ডিত ও লিপিবিদ্ মরিস্ দুনাঁ অবশ্য জীবজন্তুর বা বস্তুর এই প্রকার প্রতিমূর্তিকে লিপি বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ। কারণ লিপির মধ্যে যে চিন্তাস্রোতের ও গতির ইঙ্গিত থাকে এই ধরনের চিত্রে তাহা নাই। ইহা নিতান্তই স্থিতীয়।

স্মৃতি-সহায়ক লিপি

লিপি স্মৃতি-সহায়ক। পেরুভিয়ার, পলিনেসিয়ার দ্বীপপুঞ্জের ও ভারতবর্ষের আসাম, সাঁওতাল পরগনা প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীরা লিপির ব্যবহার না জানিয়াও স্মারক হিসাবে

নানাবিধ কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। দড়িতে গিঁট বাঁধিয়া অথবা লাঠির গায়ে দাগ কাটিয়া লোক মারফত একস্থান হইতে অন্য স্থানে বার্তা প্রেরণ করিতে এই সব অধিবাসীদের দেখা যায়। বার্তাবাহককে এই সব গিঁট বা দাগের তাৎপর্য বুঝাইয়া দেওয়া হয় যাহাতে নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট বক্তব্য বিষয় যথাযথ জ্ঞাপন করিতে তাহার বেগ পাইতে না হয়। প্রকৃত-পক্ষে গিঁট-বাঁধা দড়ি (knotted string) বা দাগকাটা যষ্টি (notched stick) এক



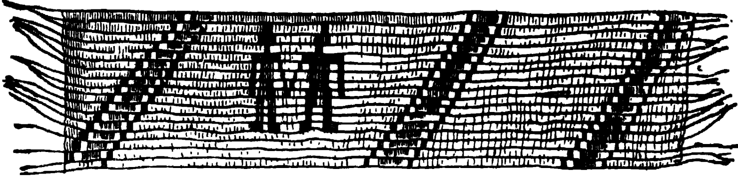
২৪। দাগকাটা যষ্টি ও গিঁট-বাঁধা দড়ি।

(১) পেরুভীয় 'কিপাস্'; (২) অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের ব্যবহৃত দাগকাটা যষ্টি;
(৩) টাঙ্গানিকায় প্রাপ্ত আদিম অধিবাসীদের গিঁট-বাঁধা দড়ির একটি নমুনা।

ধরনের পত্র বিশেষ। অস্ট্রেলিয়া, উত্তর আফ্রিকা, চীন, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশের কোন কোন অঞ্চলের অধিবাসীদের এই উপায়ে সপ্তাহ, মাস ও বৎসরের হিসাব, দেনা-পাওনার এমন কি ব্যবসায় সংক্রান্ত হিসাব পর্যন্ত রাখিতে দেখা যায়। পেরুভিয়ার আদি অধিবাসীদের বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ও বর্ণের দড়িতে গিঁট বাঁধিয়া প্রধান প্রধান ঘটনার ও দলপতিদের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার কাহিনী পর্যন্ত প্রকাশ ও প্রচার করিতে দেখা গিয়াছে। পেরুভীয় ভাষায় এই পদ্ধতির নাম 'কুইপাস' (Quipus) বা 'কিপাস' (Kipus)। উত্তর আমেরিকার ইরোকোয়া আদিবাসীর 'ওয়াম্পুম' (Wampum) সাঙ্কেতিক পদ্ধতিও অনেকটা এই জাতের। 'ওয়াম্পুম' খোলক বা পুঁতির চওড়া কটিবন্ধ বিশেষ। পুঁতিগুলি গাঁথিবার ও সাজাইবার বৈচিত্র্যের মধ্যে বক্তব্য বিষয় প্রচ্ছন্ন থাকে।

পৃথক পৃথক ভাবে অঙ্কিত জীবজন্তু বা জড়বস্তুর চিত্র ঠিক লিপির পর্যায়ভুক্ত নহে, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। শুধু একটি মানুষের চিত্রের সাহায্যে একটি মানুষকেই বুঝানো যায়। একটি বৃত্তের সাহায্যে বড় জোর চন্দ্র, সূর্য, চাকা বা অনুরূপ কোন গোলাকার বস্তুকে প্রকাশ করা সম্ভবপর। কিন্তু একাধিক চিত্রের নিপুণ সমাবেশের দ্বারা অনেক সময় রীতিমত

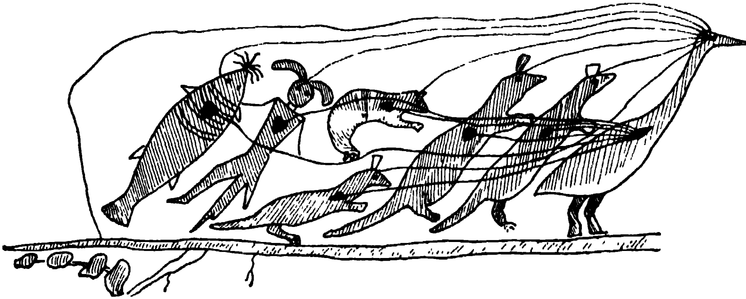
জটিল বিষয় ও ঘটনারও অতি সুন্দর ও প্রাঞ্জল প্রকাশ ও ব্যাখ্যা সম্ভবপর। এইরূপ ভাবব্যঞ্জক চিত্রের গতি আছে। ইহাকে পড়া যায়। একান্ত সঙ্গত কারণেই এইরূপ চিত্র লিপির



২৫। ইরোকোয়া অধিবাসীর 'ওয়াম্‌পুম'—পেনসিল্‌ভানিয়ার ইতিহাস-সোসাইটি কর্তৃক সংরক্ষিত।

পর্যায়ভুক্ত। বিশেষজ্ঞরা এই প্রকার চিত্রকে ভাবব্যঞ্জক-লিপি (Ideographic writing) বা চিত্র-লিপি (Picture-writing) নামে অভিহিত করেন। তাহাদের মতে চিত্র-লিপি প্রকৃত লিপির প্রাচীনতম অবস্থা। বিজ্ঞাপন সাহিত্যে চিত্র-লিপির আসন এখনও সুপ্রতিষ্ঠিত আছে।

আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত চিত্র-লিপির একটি নমুনা দেওয়া যাইতেছে (২৬নং চিত্র)। চিত্র-লিপিটি আমেরিকার রেড্‌-ইণ্ডিয়ানদের পক্ষ হইতে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিকট প্রেরিত একখানি আবেদনপত্র। এই পত্রে কোনও হ্রদে সাতটি রেড্‌-ইণ্ডিয়ান উপজাতির মৎস্য শিকারের অধিকার দাবী করা হইয়াছে। মৎস্য শিকার দাবীর ব্যাপারে সাতটি উপজাতির ঐক্যমতের কথা বুঝানো হইয়াছে সাতটি প্রাণীর চক্ষু ও হৃৎপিণ্ড রেখার দ্বারা যুক্ত করিয়া। চিত্রের সাতটি প্রাণী সাতটি উপজাতির প্রতীক। সারস পাখীটি হইল নেতৃস্থানীয় 'অস্‌কাবাওইস্‌' উপজাতি। দলের পুরোভাগে অবস্থিত সারস পাখীর সহিত পশ্চাৎভাগে অবস্থিত হ্রদের কয়েকটি মাছকে যুক্ত করিয়া চিত্র-লিপিকার স্বজাতিদের মৎস্য শিকারের দাবী বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে।*



২৬। রেড্‌-ইণ্ডিয়ান চিত্র-লিপির একটি নমুনা
—যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিকট প্রেরিত একখানি আবেদনপত্র।

চিত্র-লিপির উন্নততর অবস্থায় আমরা দেখিতে পাই, কোন একটি ভাব সব সময় একই চিত্রের অথবা প্রতীকের দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। যেমন, একটি চক্ষু ও তাহা হইতে নিঃসৃত দুই ফোটা অশ্রু আঁকিয়া দুঃখকে প্রকাশ করা হইতেছে। কোন কিছু প্রত্যাখ্যান করিবার ব্যাপার একটি মনুষ্য মূর্তির পৃষ্ঠদেশ আঁকিয়া বুঝানো যাইতেছে, ইত্যাদি। নির্দিষ্ট একই

* David Diringer, *The Alphabet,* Hutchinson, 1947, p. 34.

ধরনের অংকনের দ্বারা ক্রমাগত নির্দিষ্ট একই ধরনের বস্তু বা ভাব প্রকাশের অর্থ, চিত্রগুলি সংকেতের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে এবং ইহাদের তাৎপর্য ও ব্যবহার দলের বা উপজাতির প্রত্যেকের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত হইয়াছে। চিত্র-লিপির এই সাংকেতিকতার জন্যই ইহা লিপির পর্যায়ভুক্ত।

চিত্র-লিপির প্রধান দুর্বলতা এই যে, ইহার সহিত ধ্বনি সংযুক্ত হয় নাই। চোখে যে সকল বস্তু আমরা দেখি এবং চিন্তা করিবার সময় মানসপটে যে চিত্র ফুটিয়া উঠে, যথাসম্ভব তাহারই অনুকরণ করিয়া চিত্র-লিপির উদ্ভব। এই লিপি উচ্চারিত ভাষার প্রতিরূপ নহে। ধ্বনি-লিপি (Phonetic writing) উদ্ভবের পূর্বে উচ্চারিত বাণীর যথার্থ লৈখিক প্রতিরূপ আত্মপ্রকাশ করে নাই।

ধ্বনি-লিপি

কথা বলিবার সময় আমরা বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি সৃষ্টি করিয়া থাকি। হ্রস্ব, দীর্ঘ নানা-প্রকার ধ্বনি ও ধ্বনি সমষ্টির বিশেষ বিশেষ অর্থ নির্দিষ্ট হইয়া তাহা যখন একদল লোকের বা মানবগোষ্ঠীর সাধারণ স্বীকৃতি ও সমর্থন লাভ করে, উচ্চারিত সেই সব ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন শব্দ সমষ্টিকে তখন ভাষা নামে অভিহিত করা হয়। উচ্চারিত ধ্বনির ও ধ্বনি-সমষ্টির এইরূপ অর্থকরণ মানুষের ইচ্ছাধীন; পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, এমন কি একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের উচ্চারিত ধ্বনির বিভিন্ন অর্থকরণের ফলে বিভিন্ন ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। এখন এই ধ্বনির কতকগুলি সংকেত বা চিহ্ন যদি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়, তবে উচ্চারণের অনুকরণে সংকেতগুলিকে পর পর সাজাইয়া আমরা ভাষার একটি লৈখিক প্রতিরূপ পাইতে পারি। কারণ সংকেতগুলি যে সব ধ্বনির নির্দেশক বাগ্‌যন্ত্রের দ্বারা তাহাদের পর পর বাহির করিলেই ভাষাকে আবার আমরা ফিরিয়া পাইতে পারি। এইরূপ সংকেতের সাহায্যে যে লিপির উদ্ভব হইয়াছিল তাহার নাম ধ্বনি-লিপি (Phonetic writing)।

ধ্বনি-লিপি দুই প্রকার। প্রথমটিতে শব্দাংশ বা অক্ষরের (syllable) প্রতীক ব্যবহৃত; দ্বিতীয়টিতে বর্ণমালার (alphabet) বর্ণ। এই দ্বিতীয় পদ্ধতিই ধ্বনি-লিপির উন্নততর ও সর্বশেষ অবস্থা। ভাষার সহজ ও সরল অবস্থায় স্বাভাবিক কারণেই অক্ষরের প্রতীক ব্যবহার করিয়া ধ্বনি-লিপি রচিত হইত। এবং প্রথমে তাহাই হইয়াছিল। আসিরীয় কিউনিফর্ম লিপি অথবা চৈনিক বা জাপানী লিপি ইহার দৃষ্টান্ত। কিন্তু ভাষার জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং নানা কারণে, যেমন উচ্চারণের বিকার, ধ্বনির অবনতি অথবা শব্দাংশে ব্যঞ্জনবর্ণের বাহুল্যের জন্য এই পদ্ধতি ক্রমশঃ অচল হইয়া পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ, ইংরেজী 'family' কথাটি তিনটি শব্দাংশে বা অক্ষরে (fa-mi-ly) সহজে ভাগ করা যায় এবং তিনটি শব্দাংশের জন্য তিনটি প্রতীক ব্যবহার করিয়া ইহা সহজেই প্রকাশ করা যায়। কিন্তু 'strength'-এর মত একটি শব্দকে উপরিউক্ত পদ্ধতিতে (se-te-re-ne-ge-the ?) প্রকাশ করা রীতিমত অসুবিধাজনক। আধুনিক বর্ণমালার ব্যবহারে এই প্রকার অসুবিধা সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে। কারণ, বর্ণমালার এক একটি বর্ণ যতদূর সম্ভব একটি মাত্র বিশুদ্ধ ধ্বনিকে প্রকাশ করিয়া থাকে। বিভিন্ন ধ্বনিকে বিশুদ্ধভাবে প্রকাশ করিবার জন্য অল্পসংখ্যক একই ধরনের বর্ণের দ্বারা একাধিক ভাষাকে ব্যক্ত করা সম্ভবপর হইয়াছে। একই রোমক বর্ণমালার দ্বারা ইংরেজী, ফরাসী, ইতালীয়, জার্মানী, পোলিশ, চেক, হাঙ্গেরীয়, ওয়েলশ্‌ প্রভৃতি বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষা বর্তমানে লিখিত হইতেছে। এমন কি এই বর্ণমালার সাহায্যে বাংলা আসামী, ওড়িয়া, হিন্দী প্রভৃতি সংস্কৃতজাত বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাকেও প্রকাশ করা যে দুঃসাধ্য নহে, বিশেষজ্ঞগণ তাহা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

চিত্র-লিপি ও আক্ষরিক লিপির অন্তর্বর্তী অবস্থা

চিত্র-লিপি হইতে সরাসরি আক্ষরিক ও বর্ণমালা সম্বলিত লিপির উদ্ভব হয় নাই। চিত্র-লিপির ও আক্ষরিক লিপির মাঝামাঝি একটি অন্তর্বর্তী অবস্থা লিপি বিবর্তনের ইতিহাসে বিশেষ লক্ষণীয়। লিপির এই অন্তর্বর্তী অবস্থায় সংকেতগুলি ভাব ও ধ্বনি দুই-ই আংশিকভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। প্রাচীন মেসোপোটেমীয়, মিশরীয়, ক্রীটান অথবা হিট্‌টাইট্ লিপি অনেকটা এই জাতের। সুদূর প্রাচ্যে চীনে ও নূতন গোলার্ধে ল্যাটিন আমেরিকার মায়া ও অ্যাজ্‌টেক্‌দের মধ্যে এইরূপ লিপির আবির্ভাব দেখা যায়। এই সব লিপির বাহ্যিক আকৃতি হইতে প্রথমে ইহাদের শুদ্ধ ভাব-ব্যঞ্জক বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, এই সব লিপির বহু সংকেত উচ্চারিত ভাষার ধ্বনিকেও আংশিকভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, এইসব লিপি আসলে চিত্র-লিপি ও আক্ষরিক লিপির মধ্যগা। ইহাদের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।

কিউনিফর্ম লিপি

চিত্র-লিপি ও আক্ষরিক লিপির মধ্যে যে সব অন্তর্বর্তীকালীন লিপির কথা বলা হইল, তাহাদের মধ্যে কিউনিফর্ম লিপি প্রাচীনতম। সুমের, মেসোপোটেমিয়া, ব্যাবিলন, আসিরিয়া, এলাম, পারস্য, প্রভৃতি দেশের প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে এই লিপির প্রচলন ছিল। 'কিউনিফর্ম' শব্দের উদ্ভব ল্যাটিন *Cuneus* (ইংরেজী 'wedge' ও বাংলা 'কীলক') ও *forma* (ইংরেজী 'shape' ও বাংলা 'আকৃতি') হইতে। নরম মাটির চাক্‌তি, সিলিণ্ডার বা প্রিজ্‌মের উপর কাঠির সরু অগ্রভাগের দ্বারা দাগ কাটিয়া লিখিলে লিপি-চিহ্নগুলি অনেকটা কীলকের মত দেখিতে হয় বলিয়া বিখ্যাত লিপিবিদ্ টমাস হাইড্ এইরূপ নামকরণ প্রস্তাব করেন। কিউনিফর্মের জার্মান প্রতিশব্দ keilschrift-এর অর্থও কীলকাকৃতি লিপি।

খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ মিলেনিয়মের মাঝামাঝি সময় হইতে কিউনিফর্ম লিপির ব্যবহার দেখা যায়। ঠিক কোন সময়ে ও মধ্যপ্রাচ্যের ঠিক কোথায় এই লিপি প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা এখনও অজ্ঞাত। অনেকের অভিমত, প্রাচীন সুমেরীয়রাই এই লিপির আবিষ্কর্তা; আবার কেহ কেহ বলেন, মেসোপোটেমিয়া ইহার জন্মস্থান। সত্য যাহাই হউক, কিউনিফর্ম লিপির প্রাচীনতম নমুনার ধ্বংসাবশেষ এ পর্যন্ত একমাত্র 'উরুক' বা বাইবেল বর্ণিত 'ইরেক' হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা মেসোপোটেমিয়ার প্রাক্-রাজবংশীয় আমলের কথা।

একপ্রকার চিত্র-লিপি হইতে যে কিউনিফর্ম লিপির উদ্ভব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উরুকে যে সব নমুনা পাওয়া গিয়াছে তাহা বস্তু ও প্রাণীর চিত্র-প্রতীক বিশেষ। ইহার পরবর্তী অবস্থায় প্রতীকগুলি ক্রমশঃ ভাব-ব্যঞ্জক হইয়া উঠিয়াছে এবং মাঝে মাঝে এমন সব প্রতীকও আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা যায় যাহা পুরা একটি শব্দ বা শব্দসমষ্টিকে বুঝাইতে চাহিয়াছে। চিত্র-লিপির একটা প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহার দ্বারা সর্বনাম, ক্রিয়া বিশেষণ, উপসর্গ প্রভৃতি শব্দকে প্রকাশ করা যায় না। এই অসুবিধার উপলব্ধি হইতে ক্রমশঃ সংকেতের সহিত উচ্চারিত ধ্বনির যোগ-সাধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ইহার পরবর্তী অবস্থাই হইল ধ্বনির অনুকরণে সম্পূর্ণ এক একটি অক্ষর (syllable) নির্দেশ করিয়া নানা ধরনের কতকগুলি সংকেতের সৃষ্টি। এই অক্ষর সৃষ্টিতেই কিউনিফর্ম লিপির সর্বশেষ পরিণতি। ইহার পরবর্তী ধাপ বর্ণমালার আবিষ্কার পর্যন্ত এই লিপি অগ্রসর হইতে সক্ষম হয় নাই।

চিত্র-লিপির পর্যায় অতিক্রম করিয়া একপ্রকার ধ্বনি-লিপিতে উন্নীত হইলে কিউনিফর্ম

লিপির প্রতীকগুলি যে রূপ পরিগ্রহ করে তাহাতে একটি প্রতীক প্রায়শঃ একাধিক ধ্বনিকে প্রকাশ করিত, আবার একই ধ্বনি চিহ্নিত করিতে একাধিক প্রতীক ব্যবহৃত হইত। এইরূপ অবস্থায় লিপির ব্যাখ্যা লইয়া নানা অনিশ্চয়তা, সন্দেহ ও বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা প্রবল এবং

প্রাথমিক চিত্র-লিপি	চিত্র-লিপির পরবর্তী অবস্থা	প্রাথমিক কিউনিফর্ম লিপি	প্রাচীন অ্যাসিরীয় (কিউনিফর্ম) লিপি	অর্থ
				মাটি
				মানুষ
				মস্তক
				পক্ষী
				মৎস্য
				বৃষ
				সূর্য দিন
				বালি শস্য
				খাদ্য
				আহার করা
				লাঙল দেওয়া কর্ষণ করা
				দাঁড়ানো যাওয়া

২৭। চিত্র-লিপি হইতে কিউনিফর্ম লিপির বিবর্তন।

সম্ভবতঃ প্রথম প্রথম এইরূপ বিরক্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভবও হইয়াছিল। এই অনিশ্চয়তা এড়াইবার উদ্দেশ্যে প্রতীকগুলির আগে বা পিছনে বিশেষ ধরনের কতকগুলি চিহ্ন ব্যবহৃত

হইতে দেখা যায়। এই চিহ্নগুলি উচ্চারিত হইত না। কিন্তু যেখানে একই প্রতীক একাধিক ধ্বনিকে, অতএব একাধিক বস্তুকে বা ভাবকে, প্রকাশ করে, সেখানে ঠিক কোন ধ্বনিকে বা ভাবকে লেখক প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক, এই জাতীয় চিহ্নের দ্বারা তাহা নির্দেশ করা সম্ভবপর। এইজন্য কিউনিফর্ম লিপিতে সাধারণভাবে আমরা দেখি একইপ্রকার প্রতীক কয়েকটি বিশিষ্ট চিহ্নের সহায়তায় কখনও একটি অক্ষর, কখনও একটি স্বরবর্ণ, কখনও একটি শব্দ, কখনও বা সম্পূর্ণ একটি ভাব প্রকাশ করিতেছে।

এই প্রসঙ্গে কিউনিফর্ম লিপির প্রতীকগুলির আকৃতির বাহ্যিক পরিবর্তন বিশেষ লক্ষণীয়। ২৭নং চিত্রে প্রথম যুগের চিত্র-প্রতীকগুলি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া কিরূপে কীলকের রূপ ধারণ করিয়াছে তাহা পরিষ্কারভাবে দেখানো হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় সারির চিত্র-প্রতীকগুলি মূলতঃ এক; শুধু ইহারা ৯০° ডিগ্রী ঘুরিয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ কোন লেখকের খেয়াল বশতঃ এই পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রতীকগুলি সহজবোধ্য চিত্রের অনুকরণে গঠিত; একটি মুণ্ড আঁকিয়া মানুষের মাথা, অথবা শস্যের একটি শীষ আঁকিয়া গম বা বার্লিকে বুঝানো হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারিতে কিউনিফর্ম প্রতীকের পরিণত অবস্থা দেখানো হইয়াছে। প্রতীকগুলির সহিত বস্তুর চিত্রের এখন আর কোন সম্পর্ক নাই; সোজা, সমান্তরাল অথবা তির্যক রেখার সাহায্যে ইহারা গঠিত। নরম মাটির উপর কাঠির সরু অগ্রভাগের দ্বারা রেখা সৃষ্টির জন্য ইহাদের এইরূপ কীলকাকৃতি। নরম মাটিতে অনায়াসে বক্র বা বৃত্তাকার রেখা কাটা যায় না; এজন্য প্রতীকগুলিতে বক্র রেখা একেবারেই নাই। সর্বশেষ সারির প্রতীকগুলিতে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক রেখার সমাবেশ ও শৃংখলাবদ্ধ যোজনা আসিরীয় কিউনিফর্ম লিপির উন্নততর অবস্থা প্রকাশ করিতেছে। এই উন্নততর লিপিতেও প্রায় ৫৭০টি প্রতীক ব্যবহার না করিয়া উপায় ছিল না। এই লিপি বাম হইতে দক্ষিণে লিখিবার রীতি ছিল।

কতিপয় রক্ষণশীল পুরোহিত সম্প্রদায় কর্তৃক এই লিপি প্রায় খ্রীষ্টীয় সনের প্রথম-ভাগ পর্যন্ত ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। তবে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম কি ষষ্ঠ শতাব্দী হইতেই সাধারণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইহার চল একরূপ উঠিয়া যায়।

হায়রোগ্লিফিক, হায়রেটিক ও ডিমোটিক লিপি

হায়রোগ্লিফিক লিপিঃ কিউনিফর্ম লিপির মত হায়রোগ্লিফিক লিপিও অতি প্রাচীন। ইহার জন্ম নীল নদের উপত্যকায়। কিউনিফর্ম ও হায়রোগ্লিফিক লিপিদ্বয়ের মধ্যে কোনটি অধিকতর প্রাচীন সে প্রশ্নের এখনও মীমাংসা হয় নাই। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ মিলেনিয়মের শেষ ভাগে আমরা উভয় লিপির অস্তিত্বই লক্ষ্য করি।

হায়রোগ্লিফিক 'পবিত্র লিপি'। ইহা গ্রীক শব্দ hiero's (পবিত্র) ও glyphein (রেখাঙ্কন) হইতে উদ্ভূত। প্রাচীন মিশরীয়রা এই লিপির যে নামকরণ করিয়াছিল (mdw-ntr) তাহার অর্থ দেব ভাষা। মন্দির, কবর প্রভৃতি পবিত্র স্থানের মর্মর ফলক অলংকৃত করিবার উদ্দেশ্যে এই দেবলিপি ব্যবহৃত হইত।

প্রথম রাজবংশের আমলে (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দ) মিশরের একত্রীকরণের সময় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে এই লিপি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, অনেকে এইরূপ মনে করেন। তাঁহারা বলেন, মিশরে লিপির যিনি প্রথম প্রবর্তক, অন্যত্র প্রচলিত লিপির কথা তিনি জানিতেন এবং প্রয়োজন দেখা দিতেই সেই জ্ঞান তিনি স্বজাতীয়দের মধ্যে প্রয়োগ ও প্রচলন করেন। অপরের অভিজ্ঞতার অনুপ্রেরণা লাভ হইতেই যে সভ্যতার বিস্তার সম্ভবপর, অধ্যাপক এ· ল· ক্রোয়েবারের এইরূপ অভিমতে যাহারা বিশ্বাসী, তাহারা মিশরে লিপির প্রবর্তন সম্বন্ধে উপরিউক্ত ধারণার বিশেষ পক্ষপাতী। আর একদল লিপিবিশারদ এই মতে আস্থাবান নহেন। তাহারা বলেন, কিউনিফর্ম লিপির মত হায়রোগ্লিফিক লিপিও

চিত্র-লিপি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল; এই চিত্র-লিপির সহিত ধীরে ধীরে ধ্বনি সংযুক্ত হইয়া ভাব ও ধ্বনিজ্ঞাপক একরূপ মিশ্র প্রতীক আত্মপ্রকাশ করে; এবং কিউনিফর্ম লিপির মত একই প্রতীকের একাধিক ধ্বনি-প্রকাশের অসুবিধা দূর করিবার জন্য বিভিন্ন অর্থ-বোধক চিহ্নের অবতারণা হয়। লিপি পাঠ করিবার সময় এই চিহ্নগুলি উচ্চারিত হইত না।

হায়রোগ্লিফিক লিপির প্রধান বিশেষত্ব বিভিন্ন ব্যঞ্জন-ধ্বনি (consonantal sound) প্রকাশ করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকের ব্যবহার। কতকগুলি প্রতীক নির্দিষ্ট একটি মাত্র ব্যঞ্জন-ধ্বনিকে প্রকাশ করিত, কতকগুলি আবার দুইটি ও তিনটি ব্যঞ্জন-ধ্বনির সমষ্টিকে। একক ব্যঞ্জন-ধ্বনি বিশিষ্ট ২৪টি প্রতীক এবং দুই প্রকার ব্যঞ্জন-ধ্বনি বিশিষ্ট ৭৫টি প্রতীকের ব্যবহার হায়রোগ্লিফিক লিপিতে দৃষ্ট হয়। নিম্নে এইরূপ কয়েকটি প্রতীকের নমুনা দেখানো হইল।

(১) (২)

২৮। হায়রোগ্লিফিক লিপির ব্যঞ্জন-ধ্বনি বিশিষ্ট প্রতীক।
(১) একক ব্যঞ্জন-ধ্বনি বিশিষ্ট প্রতীক; (২) দ্বিবিধ ব্যঞ্জন-ধ্বনি বিশিষ্ট প্রতীক।

ব্যঞ্জন-ধ্বনির এইরূপ সাঙ্কেতিকতার নমুনা দেখিয়া অনেকের ধারণা হইয়াছে, মিশরীয়রাই একরূপ প্রাথমিক বর্ণমালার আবিষ্কারক। ইহা ঠিক নহে।* প্রথমতঃ একই ব্যঞ্জন-ধ্বনি একাধিক প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছে; দ্বিতীয়তঃ অর্থজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে এই প্রতীক ছাড়াও আরও কতকগুলি চিহ্ন ব্যবহৃত হইত, উচ্চারণের সহিত যাহার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। বর্ণমালার আবিষ্কারের কথা আমরা পরে বলিতেছি।

হায়রোগ্লিফিক লিপি সাধারণতঃ দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হইত। অনেক সময় লেখার সমতার জন্য বাম হইতে দক্ষিণেও ইহা লিখিত দেখা যায়। এই লিপি একান্তই জাতীয় লিপি। মিশরে ইহার জন্ম, মিশরের মাটিতে ইহার বৃদ্ধি এবং মিশরেই ইহার

* Diringer, *loc. cit*, p, 61-63.

মৃত্যু। কিউনিফর্ম লিপির মত ইহা আন্তর্জাতিকতা লাভ করে নাই, একমাত্র মিশরীয় ভাষা ছাড়া ইহা আর কোন জাতির ভাষার বাহন হইতে পারে নাই।

হায়রেটিক ও ডিমোটিক লিপিঃ হায়রেটিক ও ডিমোটিক লিপি হায়রোগ্লিফিকেরই অপভ্রংশ। মন্দির গাত্রে, রাজকীয় বা ধর্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে হায়রোগ্লিফিক লিপির ব্যবহার নিবদ্ধ থাকায় ইহার আকৃতিগত শোভা ও সৌন্দর্য বজায় রাখা প্রয়োজন ছিল। এজন্য প্রতীকগুলি নানা সূক্ষ্ম রেখার বাহুল্যে জটিল। ইহা আদৌ সাধারণ কাজের উপযোগী নহে। ব্যবসায়, বাণিজ্য ও দেনা-পাওনার ব্যাপারে দ্রুততার প্রয়োজন; লিপির ছাঁচগুলি সেখানে যত সরল ও সহজ হয় ততই বাঞ্ছনীয়। প্রথমে হায়রেটিক ও আরও পরে ডিমোটিক লিপি এই প্রয়োজন মিটাইয়াছিল। হায়রেটিক লিপিতেও পবিত্রতার গন্ধ আছে; মিশরীয় পুরোহিতবর্গই ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ও ব্যবহারক। ধর্মসম্বন্ধীয় নানা অনুশাসন ও গ্রন্থ রচনার কার্যে ইহার প্রয়োগ প্রধানতঃ দেখা যায়।

সেইদিক দিয়া ডিমোটিক লিপিই মিশরের প্রকৃত জনসাধারণের লিপি। খৃঃ পূঃ সপ্তম কি ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়া খৃষ্টাব্দ পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত ইহা প্রচলিত ছিল। ইহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হায়রেটিকের একান্ত সঙ্গত কারণেই অপমৃত্যু ঘটিয়াছিল। হায়রেটিক ও ডিমোটিক লিপির কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখানো হইল।

হায়রোগ্লিফিক	
হায়রেটিক	
ডিমোটিক	

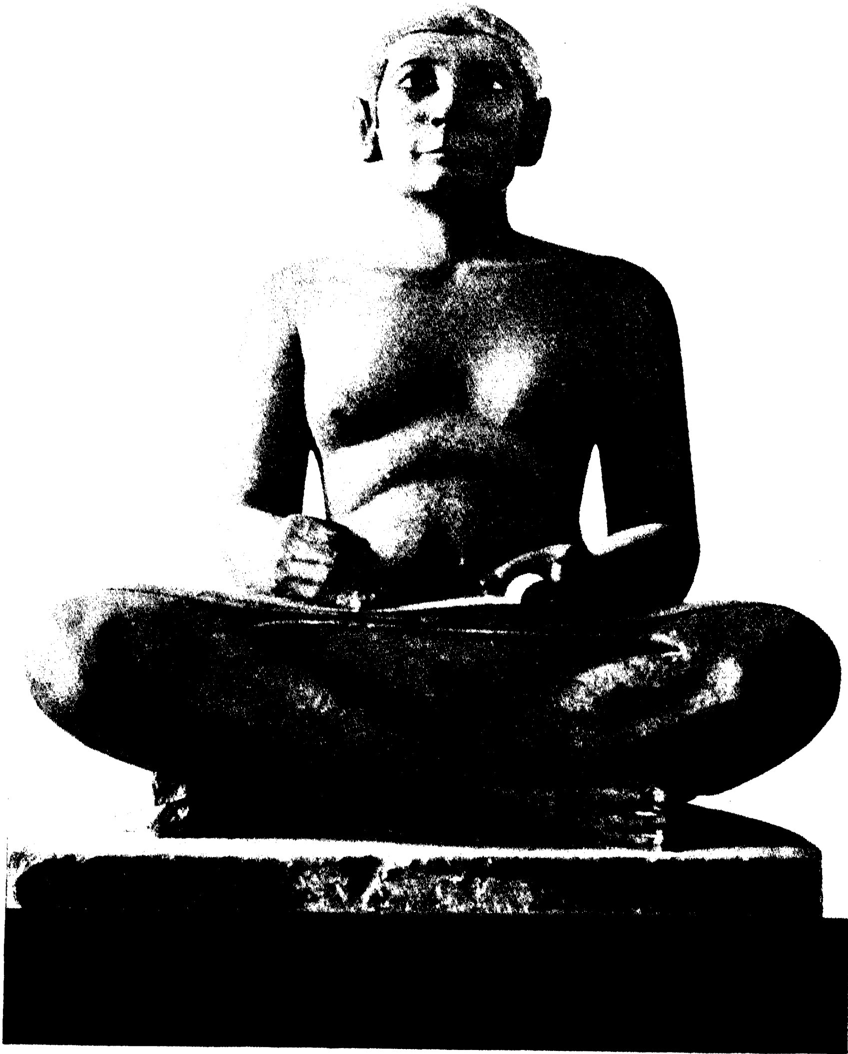
২৯। হায়রোগ্লিফিক, হায়রেটিক ও ডিমোটিক লিপির নমুনা।

রসেটা মর্মর ফলকঃ প্রাচীন মিশরীয় লিপির পাঠোদ্ধার কার্যে বিখ্যাত রসেটা মর্মর ফলকের আবিষ্কার ও অবদান সর্বজনবিদিত। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে নাপোলিয়ঁর মিশর অভিযানের সময় ফরাসী ক্যাপ্টেন এম. বুসা (M. Boussard) স্যাঁ জুলিয়াঁ দ্য রসেটা দুর্গে এই প্রস্তরখণ্ডটি আবিষ্কার করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা এই ফলক হস্তগত করে এবং এক্ষণে ইহা বৃটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত।

রসেটা ফলকের লিপি পঞ্চম টলেমী এপিফানেসের সম্মানার্থে খৃঃ পূঃ ১৯৬-৯৭ অব্দে রচিত পুরোহিতদের একখানি ঘোষণাপত্র বিশেষ। ঘোষণাপত্রটি মিশরীয় ও গ্রীক দুই ভাষায় এবং হায়রোগ্লিফিক, ডিমোটিক ও গ্রীক তিন প্রকার লিপিতে লিখিত। উপরের ১৪টি লাইন হায়রোগ্লিফিকে লিখিত, মধ্যের ৩২টি লাইন ডিমোটিকে এবং নীচের ৫৪টি লাইন গ্রীক ভাষায় ও বর্ণমালায় লিখিত। সুইডেনের জে· ডি· আকেরব্লাড্, ফ্রান্সের সিল্ভেস্তর দ্য সাকি, কেম্ব্রিজের ডাঃ টমাস ইয়ং প্রমুখ প্রখ্যাত পণ্ডিত ও লিপিবিদ্দের চেষ্টায় রসেটা ফলকের লিপির পাঠোদ্ধার এবং সেই সঙ্গে হায়রোগ্লিফিক, হায়রেটিক ও ডিমোটিক লিপির রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

সিন্ধু উপত্যকার লিপি

সিন্ধু উপত্যকার লিপি সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু আলোচনা করিয়াছি। ইহা চিত্র-লিপি ও আক্ষরিক লিপির এক মধ্যবর্তী অবস্থা। এই লিপিতে প্রায় ৩০০ বিভিন্ন প্রতীকের ব্যবহার দেখা যায় (গ্যাড ও স্মিথের মতে ৩৯৬; ল্যাংডনের মতে ২৮৮; হাণ্টারের মতে ২৫৩)।



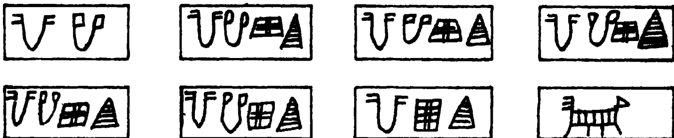
জনৈক মিশরীয় লিপিকারের প্রস্তর মূর্তি (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ অব্দ)
—লুভ্‌র্ মিউজিয়ম, প্যারী।

এত অধিক সংখ্যক প্রতীক ব্যবহারের জন্য ইহা আক্ষরিক লিপির পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। আবার সম্পূর্ণ চিত্র-লিপির পক্ষেও এই সংখ্যা অপর্যাপ্ত। সুতরাং সিন্ধু উপত্যকার লিপিকে আংশিকভাবে চিত্র-লিপি ও আংশিকভাবে ধ্বনি-লিপি বলিয়া বর্ণনা করাই নিরাপদ।

১	২	৩	৪

৩০। সিন্ধু উপত্যকার লিপির নমুনা — মনুষ্য ও মৎস্য চিহ্ন।

এই লিপির পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভবপর হয় নাই। মেরিগ্গি ভাব-ব্যঞ্জক চিত্র-লিপির পরিপ্রেক্ষিতে এই লিপির মর্মোদ্ধারের চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়াছেন। ল্যাংডন ও হাণ্টার ব্রাহ্মী লিপির সহিত ইহার সম্পর্ক প্রদর্শনের চেষ্টা করেন। হিট্টাইট্-লিপিবিশারদ বি. রোজনি (B. Hrozny) হিট্টাইট্ লিপির সহিত মহেঞ্জোদড়োর লিপির একপ্রকার সম্পর্কে বিশ্বাসী। হাণ্টারের সুচিন্তিত অভিমত, মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার লিপি হইতেই ব্রাহ্মী বর্ণমালার লিপি উদ্ভূত। তাঁহার আরও বিশ্বাস, সিন্ধু উপত্যকার লিপি ফিনিশীয়, সাবীয় ও সাইপ্রাস দ্বীপের প্রাচীন অধিবাসীদের সাইপ্রিয়োট লিপির বর্ণমালাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।*



৩১। সিন্ধু উপত্যকার লিপি—শীলমোহরে অঙ্কিত।

সিন্ধু উপত্যকার লিপি আপনা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল, না কোন বিদেশী লিপির জ্ঞান ইহার আবির্ভাব প্রভাবিত করিয়াছিল, সে বিষয়ে অনুমানের অধিক কিছু বলা সম্ভবপর হয় নাই। এপর্যন্ত যতটুকু তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে নিম্নোক্ত অনুমান যুক্তিসংগত বলিয়া মনে হয়। (১) কিউনিফর্ম, এলামাইট ও মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার লিপি ইহাদের প্রত্যেকের অপেক্ষা প্রাচীনতর কোন এক সাধারণ লিপি হইতে উদ্ভূত; অর্থাৎ এই তিন লিপির একটি সাধারণ 'পূর্বপুরুষ' থাকা আশ্চর্য নহে। (২) এই তিন লিপির মধ্যে কোনও

* G. R. Hunter, *The Script of Harappa and Mohenjodaro and its connection with other Scripts*, London, 1934.

একটি সর্বপ্রথম স্বাধীনভাবে আবিষ্কৃত হয় এবং তাহার দেখাদেখি অপর দুইটি লিপি অন্যত্র আত্মপ্রকাশ করে।

বর্ণমালার আবিষ্কার

বর্ণমালার লিপি আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে কিরূপ ধরনের লিপি প্রচলিত ছিল তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা কিউনিফর্ম, হায়রোগ্লিফিক, হায়রেটিক, ডিমোটিক ও মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার লিপির কথা আলোচনা করিলাম। এইরূপ লিপির দৃষ্টান্ত অবশ্য ইহাতেই নিবদ্ধ নহে। সুদূর প্রাচ্যে চীনে ও জাপানে, আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এবং পৃথিবীর আরও অনেক স্থানে এই জাতীয় লিপির উদ্ভব ও বিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন জাপানে, ইহা আক্ষরিক লিপির (Syllabic writing) পর্যায় পর্যন্ত উন্নীত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোনটাই বর্ণমালার লিপির ধাপ পর্যন্ত উঠিতে পারে নাই। সে লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল অন্যত্র, মেসোপোটেমিয়া, মিশর প্রভৃতি সভ্যতার প্রাচীনতম ঘাঁটি হইতে অনেক দূরে। সেকথা এবার বলিতেছি।

বর্ণমালা উদ্ভবের হায়রোগ্লিফিক মতবাদ ঃ প্রথম প্রথম পণ্ডিতদের মনে হইয়াছিল, সভ্যতার অন্যতম প্রাচীন কেন্দ্র মিশরেই বর্ণমালার উদ্ভব হয়। শাপোলিয়োঁ, লেনোরমঁ, আলেভি, দ্যরুজে, টেইলর, বাওয়ের প্রমুখ প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এইরূপ অভিমত পোষণ করেন। হায়রোগ্লিফিক, হায়রেটিক অথবা ডিমোটিক লিপিকে বর্ণমালার লিপি নামে অভিহিত করিবার প্রধান আপত্তি এই যে, ইহাতে ব্যঞ্জনধ্বনি-বিশিষ্ট নানা প্রতীক থাকিলেও একই ব্যঞ্জনধ্বনি প্রকাশ করিতে একাধিক প্রতীক ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এই সব প্রতীক ছাড়া অর্থবোধক এমন কতকগুলি চিহ্ন প্রবর্তিত হইয়াছে যাহাদের উচ্চারণ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। পক্ষান্তরে বর্ণমালার এক একটি বর্ণ বাগ্‌যন্ত্র নিঃসৃত এক একটি বিশুদ্ধ শব্দকে প্রকাশ করিয়া থাকে।

সিনাইটিক মতবাদ ঃ ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লিন্‌ডার্স পেত্রি সিনাই উপদ্বীপে প্রাচীন লিপির কয়েকটি নমুনা আবিষ্কার করেন। এই লিপি পরীক্ষা করিয়া ডাঃ এ. গার্ডিনার দেখান, ইহা হায়রোগ্লিফিক লিপি ও সেমিটিক বর্ণমালার লিপির মধ্যবর্তী অবস্থা। এই আবিষ্কারে তাঁহার প্রত্যয় হয় যে, সিনাইটিক লিপি সেমিটিক বর্ণমালার পথ-প্রদর্শক এবং সেই হিসাবে মিশরের হায়রোগ্লিফিক লিপি হইতেই বর্ণমালার লিপি আবিষ্কৃত হয়। এখনও অনেক লিপিবিদ্ ডাঃ গার্ডিনারের মত পোষণ করিয়া থাকেন। আবার মঁসিয় দুনা প্রমুখ অন্যান্য লিপিবিদেরা এই মতের বিরুদ্ধে। সিনাইটিক লিপির পাঠোদ্ধারের অপর্যাপ্ততা ও ইহার অন্তর্নিহিত অসংগতি প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা বলেন, বর্ণমালার লিপি উদ্ভাবনের ইহা এক প্রাথমিক চেষ্টা নির্দেশ করিলেও ইহা হইতে বর্ণমালার উদ্ভব হইয়াছে এইরূপ মত গ্রহণযোগ্য নহে।

ক্রীটান মতবাদ ঃ স্যার আর্থার ইভান্স তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Scripta Minoa*-তে বর্ণমালার লিপি আবিষ্কারের কৃতিত্ব অর্পণ করিয়াছেন ক্রীটের প্রাচীন সভ্যজাতির উপর। তিনি বলেন, ফিলিস্টিনরা ক্রীট হইতে বর্ণমালার লিপি প্রথমে প্যালেস্টাইনে আনে এবং পরবর্তীকালে ফিনিশীয়রা ইহার উন্নতি ও সংস্কার সাধন করে। ঐতিহাসিক কারণেই এই অভিমত স্বীকার্য নহে। ফিলিস্টিনরা খ্রীঃ পূঃ ১২২০ অব্দে প্রথম প্যালেস্টাইনের উপকূলভাগ অধিকার করে; তাহার বেশ কয়েকশত বৎসর পূর্বেই মধ্যপ্রাচ্যের নানা স্থানে বর্ণমালার লিপির আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে ক্রীটান বর্ণের সহিত সেমিটিক বর্ণের কতকগুলি বিষয়ে আকৃতিগত মিল আছে; সম্ভবতঃ সেমিটিক বর্ণমালার আবিষ্কারক ক্রীটান হরফের কথা জানিত।

ইউগারিট কিউনিফর্ম বর্ণমালা ঃ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে শেফার, শনে ও ভিরোলা সিরিয়ার

টিপক্‌লে রাস্‌ শামরায় (Ras Shamrah) [প্রাচীন ইউগারিট] প্রাচীন বর্ণমালার লিপির কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নমুনা আবিষ্কার করেন। এই লিপির হরফগুলির আকৃতি কিউনিফর্ম লিপির প্রতীকের মত এবং ইহার লিখিবার রীতিও হইল বাম হইতে দক্ষিণে। এই একান্ত বাহ্যিক আকৃতিগত মিল ছাড়া ইউগারিট লিপির সহিত সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয় বা আসিরীয় কিউনিফর্ম লিপির আর কোন মিল নাই। ইহাতে ৩২টি বর্ণের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এই লিপির কাল খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দী এবং খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর অনুরূপ সময় হইতেই ইহার ব্যবহার উঠিয়া যায়।

১	'a	৯	w	১৭		২৫	$ś^3$(ṭ, $ẓ^1$)
২	i-e	১০	z	১৮	p	২৬	q
৩	'u-'o	১১	ḥ	১৯	s^2	২৭	r
৪	b	১২	ḅ	২০	s^1	২৮	sh^1
৫	l	১৩	ṭ	২১	c	২৯	sh^2(s^1)
৬	d	১৪	y	২২	ẋ	৩০	ś(?) th(?) ṯ(?)
৭	ḏ	১৫	k	২৩	p	৩১	ž(ĝ)
৮	h	১৬	1	২৪	$ṣ^1$	৩২	t

৩২। ইউগারিট-কিউনিফর্ম বর্ণমালা।

কয়েকটির ক্ষেত্রে ইউগারিট বর্ণমালার সহিত উত্তর সেমিটিক বর্ণমালার আকৃতিগত কিছু কিছু মিল আছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, ইউগারিট লিপির প্রবর্তক উত্তর সেমিটিক লিপি হইতে বর্ণমালার ধারণা লাভ করে, কিন্তু বর্ণগুলির প্রতীক উদ্ভাবনে কিউনিফর্ম চিহ্নের সাহায্য গ্রহণ করে। এই দুইয়ের মিশ্রণে ইহা যে এক অতি অভিনব আবিষ্কার তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিব্লসের নকল হায়রোগ্লিফিক লিপি ঃ সিরিয়ায় বিব্লস নামে আর একস্থানে ফরাসী পণ্ডিত দুনা ১৯২৯ ও ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নূতন ধরনের কয়েকটি প্রাচীন লিপি আবিষ্কার করেন। ইহা অনেকটা হায়রোগ্লিফিক লিপির ছাঁদে গঠিত। দুনা মনে করেন, বিব্লস লিপির হরফগুলিকেই আরও সহজ ও সরল করিয়া ফিনিশীয়রা তাহাদের ভাষার উপযোগী করিয়া লয়। তিনি দেখাইয়াছেন, *kheth* ও *qoph* হরফ দুইটি ছাড়া অন্যান্য ফিনিশীয় হরফ অনেকটা বিব্লস লিপির হরফের মত। এই দুই লিপিই দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হইত। এইরূপ আরও কয়েকটি তথ্য হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, বিব্লস লিপি ও ফিনিশীয় লিপি সমসাময়িক, ইহার কাল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২০০০ হইতে ১৭৮০ অব্দের মধ্যে, এবং বর্ণমালা সৃষ্টির পথে সম্ভবতঃ ইহাই প্রাচীনতম প্রয়াস। এই অভিমতের প্রধান দুর্বলতা এই যে, লিপির তারিখ সম্বন্ধে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা আছে। তবে খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয়

মিলেনিয়মের প্রারম্ভে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের যে সব অঞ্চলে একরূপ বর্ণমালার সাহায্যে লিপির আমূল সংস্কারের প্রচেষ্টা চলিতেছিল, বিব্লস যে সেই সব অঞ্চলের অন্যতম, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিব্লস											
প্রাচীন ফিনিশীয়	ʾ	b	g	d	h	w	z	kh	lh	y	k
বিব্লস											
প্রাচীন ফিনিশীয়	l	m	n	s	c	p	ts	q	r	sh	t

৩৩। বিব্লস ও প্রাচীন ফিনিশীয় বর্ণমালার মধ্যে সাদৃশ্য।

ক্যানানাইট লিপি ঃ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় মিলেনিয়মের প্রথমভাগে বর্ণমালার লিপি সৃষ্টির ব্যাপারে প্যালেস্টাইনে আমরা এক বিশেষ তৎপরতার পরিচয় পাই। প্যালেস্টাইনে তখন ব্রোঞ্জযুগ চলিতেছে। এই যুগের মধ্য ও শেষভাগে প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমিত এগারটি লিপির নমুনা ১৯২৯ হইতে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রত্নতত্ত্বীয় গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। নানাদিক দিয়া ক্যানানাইট লিপির আবিষ্কার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ডাঃ গার্ডিনারের সিনাইটিক লিপির কথা আলোচনা করিয়াছি। তিনি এবং তাঁহার সমর্থকগণের ধারণা, সিনাইটিক লিপি হইতেই সেমিটিক বর্ণমালার উদ্ভব। ক্যানানাইট লিপি আবিষ্কৃত হইলে এই লিপি যে সিনাইটিক ও উত্তর সেমিটিক লিপির একরূপ মধ্যবর্তী অবস্থা তাঁহারা ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। ক্যানানাইট হরফগুলির আকৃতির সহিত সিনাইটিক ও সেমিটিক হরফগুলির আকৃতির অনেক মিল থাকিলেও নানা অমিল ও অসঙ্গতিরও অভাব নাই। এজন্য বর্ণমালার লিপি উদ্ভাবনে ইহা একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন প্রচেষ্টাও হইতে পারে। দুনা প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিতদের অভিমত, ইহা এইরূপ একটি স্বাধীন প্রচেষ্টারই নিদর্শন।

উত্তর সেমিটিক লিপি ঃ পরিশেষে উত্তর সেমিটিক বর্ণমালার গোড়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রীক ও পরবর্তী ইউরোপীয় বর্ণমালার সহিত সেমিটিক বর্ণমালার যোগ অভেদ্য। এই বর্ণমালার প্রাচীনতম কয়েকটি নমুনা হইতেছেঃ (১) মোয়াবাইট প্রস্তরফলক (Moabite Stone)—ইহার তারিখ খ্রীঃ পূঃ নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ; (২) সাইপ্রাসে প্রাপ্ত একটি পাত্রের গায়ে খোদিত ফিনিশীয় লিপির কিয়দংশ—ইহাও সম্ভবতঃ মোয়াবাইট ফলকের সমসাময়িক; এবং (৩) সিরিয়ার জেন্‌জির্‌লি নামক স্থানে প্রাপ্ত প্রাচীন আরামিক লিপির কয়েকটি নমুনা—খ্রীঃ পূঃ নবম কি অষ্টম শতাব্দীতে এইরূপ লিপির প্রচলন ছিল। উত্তর সেমিটিক লিপির আরও কয়েকটি প্রাচীন দৃষ্টান্ত হইল ঃ (১) এলিবা'ল (Eliba'al inscription)—খ্রীঃ পূঃ দশম শতাব্দী; (২) আবিবা'ল লিপি (Abiba'al inscription)—খ্রীঃ পূঃ দশম শতাব্দী; (৩) ইয়েখিমিল্‌ক লিপি (Yekhimilk inscription)—খ্রীঃ পূঃ একাদশ শতাব্দী। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক পি. মোনে বিব্লসে (ফিনিশিয়া) 'অখিরাম লিপি' নামে আর একটি উত্তর সেমিটিক লিপির নমুনা আবিষ্কার করেন। ইহার তারিখ খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক মরিস দ্যূনা বিরসে আব্দো (Abdo), শাফাৎবাল (Shafatba'al) ও 'আস্‌দ্রুবাল' (Asdrubal) নামে অভিহিত প্রাচীন সেমিটিক লিপির আরও কয়েকটি

আধুনিক ইউরোপীয়	A B G D E V Z KH T Y K L M N S O P TS Q R SH T
প্রাচীন গ্রীক বর্ণমালা	[illegible]
ফিনিশীয় (সাইপ্রাস) খ্রীঃ পূঃ ৯ম শতাব্দী	[illegible]
মোয়াবাইট্ স্টোন খ্রীঃ পূঃ ৯ম শতাব্দী	[illegible]
এলিবা'ল খ্রীঃ পূঃ ১০ম শতাব্দী	[illegible]
আবিবা'ল খ্রীঃ পূঃ ১০ম শতাব্দী	[illegible]
ইয়েহিমিল্ক খ্রীঃ পূঃ ১১শ শতাব্দী	[illegible]
অহিরাম খ্রীঃ পূঃ ১৩শ শতাব্দী	[illegible]
আস্‌দ্রুবাল খ্রীঃ পূঃ ১৪শ শতাব্দী	[illegible]
শাফাৎবাল খ্রীঃ পূঃ ১৭শ শতাব্দী	[illegible]
আব্দো খ্রীঃ পূঃ ১৮শ শতাব্দী	[illegible]

৩৪। উত্তর সেমিটিক বর্ণমালার বিবর্তন।

নমুনা সম্প্রতি উদ্ধার করিয়াছেন। তাহার কাল নির্ণয় নির্ভুল হইলে খ্রীঃ পূঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'আব্দো'-লিপির, খ্রীঃ পূঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর

প্রথমভাগে 'শাফাৎবাল'-লিপির এবং খ্রীঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে 'আস্‌দ্রুবাল'-লিপির উদ্ভব হইয়াছিল। প্রথমোক্ত লিপিদ্বয়ের এইরূপ প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অবশ্য মতদ্বৈধ আছে। যাহা হউক, বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত এই সব উত্তর সেমিটিক লিপির বর্ণমালার আকৃতি সারণীর আকারে দেখানো হইল (৩৪নং চিত্র)।

বর্ণমালা আবিষ্কারের কাল ও স্থান

বর্ণমালা আবিষ্কার সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদ এবং কয়েকটি প্রাচীনতম বর্ণমালার কথা সংক্ষেপে আলোচিত হইল। দেখা যাইতেছে, খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় মিলেনিয়মের প্রথমার্ধে মধ্যপ্রাচ্যের নানা স্থানে—সিনাই উপদ্বীপে, ক্রীটে এবং ব্যাপকভাবে সিরিয়ায় ও প্যালেস্টাইনে—বিভিন্ন ছাঁচের বর্ণমালার লিপি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। এখন প্রশ্ন হইল, ঠিক কোথায় এবং কখন এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটি সংঘটিত হয়।

সাধারণভাবে প্রাচীন লিপিবিশারদদিগের অভিমত, উত্তর সেমিটিক বর্ণমালার অব্যবহিত পূর্ববর্তী রূপ অর্থাৎ প্রোটো-সেমিটিক বর্ণমালাই প্রাচীনতম; হিক্‌সস্‌দিগের রাজনৈতিক প্রাধান্যের কালে আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৭৩০ হইতে ১৫৮০ অব্দের মধ্যে এই বর্ণমালা আবিষ্কৃত হয়; এবং সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন ইহার আদি জন্মভূমি। 'আব্দো'-লিপির সময় হইতে 'মোয়াবাইট্‌'-ফলকের লিপি পর্যন্ত প্রায় নয়শত বৎসরের মধ্যে প্রচলিত উত্তর সেমিটিক লিপির অনেকগুলি নমুনা প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আবিষ্কার করিয়াছেন। বিভিন্নকালের এই সব লিপির মধ্যে এক আশ্চর্য মিল পরিলক্ষিত হয়। এমন কি প্রথমদিকের ফিনিশীয় ও হিব্রু বর্ণমালার সহিত উত্তর সেমিটিক বর্ণমালার পার্থক্য সামান্য। কালসহকারে বর্ণগুলির ছাঁচ অবশ্য কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু পরিবর্তনের নমুনা দেখিয়া মনে হয়, ইহা অতীব মন্থর গতিতে সাধিত হইয়াছিল। এজন্যই অনেকের ধারণা হইয়াছে, উত্তর সেমিটিক বর্ণমালার অব্যবহিত পূর্ববর্তী রূপ, যাহাকে বিশেষজ্ঞগণ প্রোটো-সেমিটিক বর্ণমালা বলিয়াছেন এবং অখিরাম, ইয়েখিমিল্‌ক, এলিবা'ল, মোয়াবাইট্‌ প্রভৃতি খাঁটী উত্তর সেমিটিক বর্ণমালার মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল না।

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ উত্তর সেমিটিক বর্ণমালার যে কাল নির্দেশ করিয়া থাকেন (আব্দো—খ্রীঃ পূঃ ১৮শ শতাব্দী; অখিরাম—খ্রীঃ পূঃ ১৩শ শতাব্দী, ইত্যাদি), তাহা মোটামুটি ভাবে মধ্যপ্রাচ্যে হিক্‌সস্‌দিগের রাজনৈতিক প্রাধান্যের যুগ (খ্রীঃ পূঃ ১৭৩০—১৫৮০ অব্দ)। হিক্‌সস্‌দের আবির্ভাব নানাদিক দিয়া নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ও সমাজজীবনে এক মহা বিপ্লব ও পরিবর্তন সূচিত করে। হিক্‌সস্‌ আন্দোলনে এই সব অঞ্চলে যে নূতন উৎসাহ, উদ্দীপনা ও পরিবেশের সৃষ্টি হয় তাহা বর্ণমালার উদ্ভবের বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

বর্ণমালার আদি জন্মভূমি হিসাবে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের দাবী নানাকারণে সমর্থনযোগ্য। প্রাচীন উত্তর সেমিটিক লিপির বহু নমুনা এই দুই দেশে প্রত্নতত্ত্বীয় খননকার্যকালে পাওয়া গিয়াছে। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় মিলেনিয়মে এই দুই দেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সংস্কৃতির বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বহু শতাব্দী যাবৎ এই অঞ্চল প্রাচীনকালের দুইটি শ্রেষ্ঠ সভ্যদেশ মিশর ও মেসোপোটেমিয়ার সেতুস্বরূপ ছিল। এই দুই সভ্যতার সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান মুখ্যতঃ সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের পথেই সংঘটিত হইয়াছে। পশ্চিমে ক্রীট ও সাইপ্রাসের ব্রোঞ্জযুগের উন্নত মিনোয়ান সভ্যতাও এই অঞ্চলকে কম প্রভাবিত করে নাই। ব্যবসায়, বাণিজ্য ও জটিলতর সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনে লিপি যে সময়ে দ্রুত পরিবর্তনের মুখে, কিউনিফর্ম, হায়রোগ্লিফিক্‌ প্রভৃতি প্রাচীন লিপির অসুবিধা যে সময়ে ব্যাপকভাবে অনুভূত হইতেছে, সেই সময়ে উন্নততর লিপিপদ্ধতির আবিষ্কার সম্ভবপর করিতে যে প্রকার অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে তাহা পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল।

সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের মৃত্তিকায় বর্ণমালার জন্ম হইলেও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজ্ঞতা ও প্রচেষ্টা যে এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার আবিষ্কারে অন্ততঃ মিশরীয়, কিউনিফর্ম ও ক্রীটান লিপির প্রভাব বিদ্যমান। সেমিটিক বর্ণমালার সহিত এই সব প্রাচীনতর লিপির নানা সংকেতের এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে ধ্বনিগত মিল এইভাবেই ব্যাখ্যা করা সহজ ও যুক্তিসংগত।

উত্তর সেমিটিক বর্ণমালার ২২টি বর্ণ কেবলমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ। ইহাতে একটিও স্বরবর্ণ নাই। গ্রীকরা প্রথম বর্ণমালার মধ্যে স্বরবর্ণ যোজনা করে। সেমিটিক বর্ণমালায় স্বরবর্ণের অনস্তিত্ব সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই। কোন কোন বিশেষজ্ঞ মনে করেন, সেমিটিক জাতিরা ইচ্ছা করিয়াই স্বরবর্ণের প্রতীক ব্যবহারে বিরত থাকিয়াছে। দেশ কাল ভেদে ভাষা ও উচ্চারণের পার্থক্য বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা নিজেদের সুবিধামত স্বরবর্ণ বসাইয়া লইবে, ইহাই হয়ত তাহাদের ইচ্ছা ছিল। বলা বাহুল্য, আপাত-দৃষ্টিতে স্বরবর্ণের অনস্তিত্ব একটি গুরুতর ত্রুটী বলিয়া প্রতিভাত হইলেও ইহাই আবার সেমিটিক বর্ণমালার ব্যাপক প্রচলনের কারণ। শুদ্ধ ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রতীক হওয়ায় সেমিটিক বর্ণমালাকে বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির পক্ষে গ্রহণ করা সহজ হইয়াছিল।

উত্তর সেমিটিক বর্ণমালার নাম আধুনিক হিব্রু বর্ণমালায় অদ্যাপি বহুলাংশে সংরক্ষিত। এই ২২টি বর্ণের হিব্রু নাম হইল এইরূপঃ—আলেফ্ ('aleph), বেথ্ (beth), গিমেল্ (gimel), ডালেথ্ (daleth), হে (he), ওয়াও (waw), জাইন (zayin), খেথ্ (kheth), তেথ্ (teth), ইওড্ (yod), কাফ্ (kaph), লামেড্ (lamed), মেম্ (mem), নুন (nun), সামেখ্ (samekh), আইন্ ('ayin), পে (pe), শাদে (sade), কোফ্ (qoph), রেশ (resh), শিন্ (shin), টাও (taw)। গ্রীক বর্ণমালার নাম যথা, আল্‌ফা (alpha), বিটা (beta), গামা (gamma), ডেল্‌টা (delta) ইত্যাদি হিব্রু নাম হইতেই গৃহীত। এইখানে লক্ষণীয় এই যে, হিব্রু নামগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন না কোন একটি ব্যঞ্জনবর্ণে সমাপ্ত হয়, গ্রীক নামগুলি স্বরবর্ণে। হিব্রুভাষায় এই নামগুলি আবার কোন না কোন বস্তুর, মানবদেহের অথবা জন্তুর নামও বটে। যেমন, বেথ্—বাড়ী; ডালেথ্—দরজা; ইওড্—হাত; আইন্—চক্ষু; পে—মুখ; আলেফ্—বৃষ; কোফ্—বানর; ইত্যাদি।

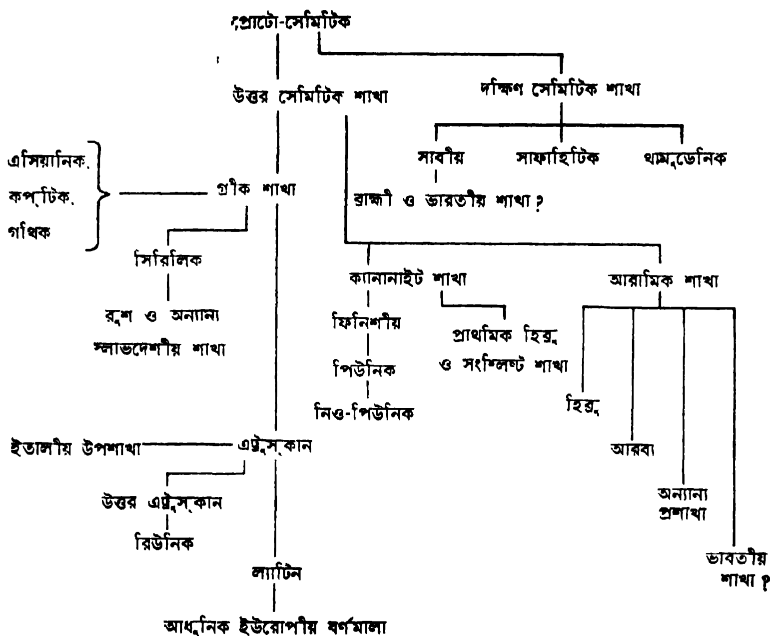
সংক্ষেপে বর্ণমালার ইহাই আদি ইতিহাস। বর্ণমালা আবিষ্কারের দেশ ও কাল সংক্রান্ত খুঁটিনাটি সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর থাকিলেও সাধারণভাবে এই সিদ্ধান্ত অসংগত বা অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না যে, খৃীঃ পূঃ দ্বিতীয় মিলেনিয়মের প্রথম ভাগে উত্তর-পশ্চিম সেমিটিক জাতিদের হাতে এই যুগান্তকারী আবিষ্কারটি সংঘটিত হইয়াছিল। উক্ত মিলেনিয়মের শেষার্ধে বর্ণমালা পূর্ণ পরিণতি ও বিকাশ লাভ করে। আমরা দেখিয়াছি, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার লিপি পারস্পরিক প্রভাব বশতঃ অথবা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কোন কোন লিপি প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রম করিবার পূর্বেই লুপ্ত হইয়াছিল, কোন কোন লিপি আবার বিশেষ উন্নত স্তর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। স্বাধীনভাবে সম-সময়ে অথবা বিভিন্ন সময়ে একাধিক জাতি যে আক্ষরিক লিপি আবিষ্কার ও ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা অনস্বীকার্য। কিন্তু বর্ণমালা আবিষ্কৃত হইয়াছিল মাত্র একবারই। মঁসিয় দুনাঁর ভাষায় 'C'est la une invention qu'on ne peut faire deux fois'—অর্থাৎ ইহা এমনই একটি আবিষ্কার যাহা দুইবার সংঘটিত হইবার উপায় নাই।

ভৌগোলিক সংস্থান, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষত্ব সেমিটিক জাতি কর্তৃক বর্ণমালা আবিষ্কারের মূলে বিদ্যমান। সেমিটিক জাতিদের আর একটি

বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাদের ভাষা ব্যঞ্জন-ধ্বনি-প্রধান। বিশেষজ্ঞদিগের অভিমত, সেমিটিক ভাষার এই বৈশিষ্ট্য বর্ণমালা আবিষ্কারের জন্য বড় কম দায়ী নহে।

বর্ণমালার বিভিন্ন শাখা

আদি সেমিটিক বা প্রোটো-সেমিটিক বর্ণমালা হইতে কালসহকারে বিভিন্ন বর্ণমালার উদ্ভব হয়। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় মিলেনিয়মের শেষভাগে ব্রোঞ্জযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, আসিরীয়, হিট্‌টাইট্‌, ক্রীটান প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যজাতির রাজনৈতিক প্রাধান্যও অন্তর্হিত হয়। এই সময় পৃথিবীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে যে নূতন অধ্যায় সূচিত হয় তাহার ভারকেন্দ্র সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন। এই নূতন নাটকের প্রধান নায়ক তিনটি জাতি—ইস্রায়েল, ফিনিশিয়া ও আরাম। আরও দক্ষিণে সাবীয় ও কয়েকটি আরব্য জাতি ব্যবসায় ও বাণিজ্যে এই সময়ে বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছে দেখা যায়। পশ্চিমে



৩৫। বর্ণমালার বিভিন্ন শাখা

সাগরপারে হেলাসে এক নূতন জাতি ধীরে ধীরে সংহতি ও প্রাধান্য লাভের পথে। এই সব বিভিন্ন জাতির অভ্যুত্থানে প্রোটো-সেমিটিক বর্ণমালার অগ্রগতি কয়েকটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। উত্তরে ইহার মূল শাখা, উত্তর সেমিটিক বর্ণমালা, যথাক্রমে আরামিক, ক্যানানাইট ও গ্রীক বর্ণমালার সৃষ্টি করে। দক্ষিণে ইহার আর একটি প্রধান শাখা, দক্ষিণ সেমিটিক বর্ণমালা, হইতে সাবীয়, সাফাইটিক, থামুডেনিক প্রভৃতি কয়েকটি বর্ণমালার উদ্ভব হয়। আরামিক শাখা হইতে হিব্রু, আরব্য, ভারতীয় ও অন্যান্য প্রশাখা আত্মপ্রকাশ করে। প্রাথমিক হিব্রু, ফিনিশীয়, পিউনিক প্রভৃতি সেমিটিক বর্ণমালার বিবর্তন ক্যানানাইট শাখা হইতে। এসিয়ানিক, কপ্‌টিক্‌, গথিক্‌, সিরিলিক (রুশ ও অন্যান্য স্লাভদেশীয় বর্ণমালা), এট্রুস্‌কান, ল্যাটিন

ও আধুনিক ইউরোপীয় বর্ণমালা কিরূপে গ্রীক বর্ণমালা হইতে জন্মলাভ করে, তাহা ছক কাটিয়া বুঝানো হইল। এই ছকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, আধুনিক কালে প্রচলিত প্রধান বর্ণমালার সবগুলিই দেশ কাল ও ভাষাভেদে মূল প্রোটো-সেমিটিক বর্ণমালার রূপান্তর।

ভারতীয় লিপি : খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী

পরিশেষে ভারতীয় লিপি, বিশেষতঃ খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী লিপির আদি ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। আমরা সিন্ধু সভ্যতার লিপির কথা আলোচনা করিয়াছি। ইহা বর্ণমালার এমন কি আক্ষরিক লিপিরও অনেক পূর্বেকার অবস্থা। এদেশে আর্যগণের আবির্ভাবের পর হইতে যে কয়েকটি লিপির প্রচলন দেখা যায় তাহাদের মধ্যে খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মীলিপি অন্যতম এবং প্রাচীনতম। বর্তমানে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব লিপি প্রচলিত তাহারা প্রধানতঃ ব্রাহ্মীলিপি হইতে উদ্ভূত। খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মীর আদি ইতিহাস সম্বন্ধে বহু গবেষণা হইয়াছে, পরস্পর-বিরোধী বহু মতবাদ প্রস্তাবিত হইয়াছে, কিন্তু সর্ববাদিসম্মত কোন মীমাংসায় পৌঁছান সম্ভবপর হয় নাই।

ভারতীয় লিপির প্রাচীনত্ব : প্রথমে ভারতীয় লিপির প্রাচীনত্ব বিচার করা যাক। বেদ হিন্দুদের প্রাচীনতম গ্রন্থ। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের কোথাও লিপির উল্লেখ পাওয়া যায় না। এইরূপ কোন উল্লেখ নাই বলিয়াই যে লিপি ছিল না তাহা বলা চলে না। অধ্যাপক ডেভিড্স্-এর মতে বৈদিক সাহিত্যে লিপির অনুল্লেখই ইহার অস্তিত্বের বড় প্রমাণ। সে যাহাই হউক, লিপির প্রথম উল্লেখ আমরা পাই বৌদ্ধ সাহিত্যে। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর এক বৌদ্ধ গ্রন্থে 'অক্ষরিকা' নামে একটি ক্রীড়ার উল্লেখ আছে; বর্ণমালার সাহায্যে বিভিন্ন শব্দ-রচনা এই ক্রীড়ার উদ্দেশ্য। বৌদ্ধ জাতকে 'লেখ' ও 'লেখক' শব্দ বহু স্থানে ব্যবহৃত: লেখকেরা যে সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন এইরূপ মন্তব্যও দেখা যায়। 'ললিত-বিস্তারে' কথিত আছে, বুদ্ধ বাল্যকালে লিপি অভ্যাস করিয়াছিলেন। তারপর গোরখপুর জেলায় প্রাপ্ত সোগোরা তাম্রশাসনে অথবা সৌগর জেলায় প্রাপ্ত মুদ্রায় ব্রাহ্মীলিপির প্রাচীনতম যে সব নমুনা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের কাল খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী।

এই সব তথ্য হইতে এখন প্রমাণিত হইয়াছে যে, খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে এদেশে বর্ণমালার লিপি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার অন্ততঃ দুই তিন শত বৎসর পূর্বে যে এই লিপির ব্যবহার সুরু হয় তাহাতে কোন সংশয় নাই। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেও খ্রীঃ পূঃ নবম হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী ভারতবর্ষে বর্ণমালার লিপি প্রচলনের বিশেষ অনুকূল সময়। এই সময়ে এদেশে ব্যবসায় ও বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল; বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। নৃপতি বিম্বিসারের নেতৃত্বে মগধের রাজশক্তি এই সময়ে উত্তর-ভারতের এক বিরাট অংশে রাজনৈতিক ঐক্য ও সংহতি স্থাপন করে। ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক হইতেও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ইহা এক মহা বৈপ্লবিক যুগ। এইরূপ অনুকূল অবস্থায় ভারতবর্ষে বর্ণমালার লিপি প্রবর্তিত হইবার অনুমান নানা কারণে যুক্তিসংগত।

খরোষ্ঠী : আমরা বলিয়াছি, খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী ভারতীয় বর্ণমালার প্রাচীনতম নিদর্শন। এই দুইয়ের মধ্যে খরোষ্ঠীর আদি ইতিহাস উদ্ধার অনেকটা সহজসাধ্য হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ১৭৫ পূর্বাব্দ হইতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যে বহু ইন্দো-গ্রীক ও ইন্দো-সাইদীয় মুদ্রায় খরোষ্ঠীলিপির নমুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। অশোকের অনুশাসনের একটি খরোষ্ঠী অনুবাদ ইন্দো-আফগান সীমান্তে অবস্থিত শাহ্‌বাজগারহি নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। এই অনুবাদ লিপির কাল খ্রীঃ পূঃ ২৫১ অব্দে। স্যার অরেল স্টাইন নিয়া, লো-লান, পূর্ব তুর্কীস্তান প্রভৃতি স্থানে খরোষ্ঠীলিপির বহু নমুনা আবিষ্কার করিয়াছেন।

এই বর্ণমালায় রচিত কয়েকটি বৌদ্ধ গ্রন্থও এই সংগ্রহের অন্যতম। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর এই লিপির ব্যবহার ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ এইরূপ সময় হইতেই এই লিপির প্রচলন এদেশ হইতে উঠিয়া যায়। এই লিপি দক্ষিণ হইতে বামে লিখিবার রীতি। কয়েকটি নমুনায় অবশ্য ইহা বাম হইতে দক্ষিণেও লিখিত দেখা যায়।

আরামিক বর্ণমালা হইতে খরোষ্ঠীর উদ্ভব হইয়াছিল, সাধারণভাবে এইরূপ মত এখন স্বীকৃত। আরামিক বর্ণমালার সহিত খরোষ্ঠী বর্ণমালার বাহ্যিক ও ধ্বনিগত অনেক মিল আছে। তারপর প্রাচীনকালে আরামিকভাষী সেমিটিক জাতিদের সহিত ভারতীয়দের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সম্ভবতঃ পারস্যের পথে উত্তর-পশ্চিম ভারতে আরামিক ভাষার প্রভাব প্রথম অনুভূত হয়।

সাবীয়	[illegible]
ব্রাহ্মী	[illegible]
খরোষ্ঠী	[illegible]
আরামিক	[illegible]
আধুনিক ইউরোপীয়	A B G D E F(W) Z H TH I K L M N X(SH) O P S Q R S T

৩৬। সাবীয়, ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী ও আরামিক বর্ণমালার নমুনা।

ব্রাহ্মী ঃ ব্রাহ্মী বর্ণমালাই বিভিন্ন ভারতীয় বর্ণমালার পূর্বরূপ। এই বর্ণমালা আবিষ্কারের ইতিহাস এখনও রহস্যাবৃত। লিপিবিশারদগণ এই আবিষ্কার সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুই দলে বিভক্ত। প্রথম দল মনে করেন, ব্রাহ্মী বর্ণমালা ভারতবর্ষেই স্বাধীনভাবে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহা কোন বিদেশী বর্ণমালার প্রভাবের অপেক্ষা রাখে নাই। মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার লিপি আবিষ্কৃত হইলে এই দল সিন্ধু সভ্যতার লিপির সহিত ব্রাহ্মীলিপির নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেন।

দ্বিতীয় দলের ধারণা, ব্রাহ্মী বর্ণমালার বিবর্তনে বিদেশী প্রভাব বিদ্যমান। ঠিক কোন্ বিদেশী বর্ণমালা কতদূর পর্যন্ত ইহার আবিষ্কারকে প্রভাবিত করিয়াছিল, সে বিষয়ে অবশ্য বিস্তর মতভেদ আছে। জেমস্ প্রিন্সেপ*, রাউল দ্য রোশেত, ওট্‌ফ্রিড মুলের, এমিল সেনার্ট প্রমুখ পণ্ডিতদের অভিমত, ব্রাহ্মী বর্ণমালা গ্রীক বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত। জোসেফ আলেভি,

* জেমস্ প্রিন্সেপ (১৭৯৯-১৮৪০) সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মীলিপির ও আংশিকভাবে খরোষ্ঠীলিপির পাঠোদ্ধারে সফলকাম হন। হায়রোগ্লিফিক লিপির মর্মোদ্ধার করিয়া শাপোলিয়োঁ মিশরীয় প্রত্নতত্ত্বে যেইরূপ অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপির রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া প্রিন্সেপও সমগ্র ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে সেইরূপ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ২০ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতার ট্যাঁকশালে সহকারী অ্যাসে মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসেন। ডাঃ উইলসন তখন ট্যাঁকশালের অ্যাসে মাষ্টার। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উইলসন অক্সফোর্ডে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে প্রিন্সেপ অ্যাসে মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। ইহার কিছু পূর্বে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী (১৮৩১-১৮৩৮) নির্বাচিত হইয়াছিলেন। উইলসনের সংস্পর্শে আসায় ভারতীয় ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ জন্মে এবং এসিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী রূপে প্রাচীন ভারতীয় লিপি, মুদ্রা প্রভৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করিবার সুবর্ণ সুযোগ তিনি লাভ করেন। গুজরাটে দিল্লীর ফিরোজশাহ্ তোগলকের প্রাসাদে ও সাঁচী স্তূপে প্রাপ্ত অশোকের কয়েকটি শিলালিপির প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং এই লিপির মর্মোদ্ধার করিতে গিয়াই ব্রাহ্মীলিপির রহস্যভেদ করেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়ারের শাহ্‌বাজগারহি, মানশেরা প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত কয়েকটি শিলালিপি সম্বন্ধে গবেষণা করিবার কালে তিনি খরোষ্ঠীলিপির মর্মোদ্ধারেও আংশিক সাফল্যলাভ করেন।

উইলসন প্রমুখ পণ্ডিতগণও হেলেনীয় প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ঐতিহাসিক কারণেই এই মত স্বীকার্য নহে। ভারতবর্ষে গ্রীক সাংস্কৃতিক প্রভাব অনুভূত হইবার কয়েক শত বৎসর পূর্বেই ব্রাহ্মী বর্ণমালা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

বর্তমান অধিকাংশ লিপিবিদ ও পণ্ডিতদের ধারণা, অন্যান্য প্রাচীন বর্ণমালার ন্যায় ব্রাহ্মী বর্ণমালাও সেমিটিক বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত। বেনফি, ওয়েবার, বুহ্‌লের, ইয়েনসেন প্রমুখ পণ্ডিতগণ এক সময় মনে করিয়াছিলেন, ফিনিশীয় বর্ণমালা ব্রাহ্মী বর্ণমালাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। কিন্তু প্রাচীনকালে ফিনিশিয়া ও ভারতবর্ষের মধ্যে এমন কোন ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক বা সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কথা জানা যায় না যাহাতে এইরূপ প্রভাব সমর্থনযোগ্য মনে করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে দক্ষিণ-সেমিটিক অথবা আরামিক বর্ণমালা হইতে ব্রাহ্মী লিপির উদ্ভবের সম্ভাবনা খুবই প্রবল। অধ্যাপক ডীক্‌, ক্যানন টেলর, অধ্যাপক সেঠি প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন, ব্রাহ্মী বর্ণমালা দক্ষিণ-সেমিটিক বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত এবং সম্ভবতঃ ইহাদের অভিমত স্মরণ করিয়াই *Encyclopaedia Britannica* লিখিয়াছে :

> "Its origin is obscure; but there seems little doubt that it derives from the South Semitic group of alphabets through contact with Sabataean traders," (Vol. I, 1947, p. 683).

ডেভিড ডিরিংগার আরামিক বর্ণমালা হইতে ব্রাহ্মী বর্ণমালার উদ্ভবে অধিকতর বিশ্বাসী। বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে আরামিক বর্ণমালাই যে ব্রাহ্মী বর্ণমালাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিবার সুযোগ পাইয়াছিল, ইহা তিনি দেখাইয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত হইল :

> "All historical and cultural evidence is best co-ordinated by the theory which considers the early Aramic alphabet as the prototype of the Brahmi script. The acknowledged resemblance of the Brahmi signs to the Phoenician letters also applies to the early Aramic letters, while in my opinion there can be no doubt that of all the Semites, the Aramaean traders were the first who came in direct communication with the Indo-Aryan merchants."*

আরামিক অথবা অন্য কোন সেমিটিক বর্ণমালার সহিত ব্রাহ্মী বর্ণমালার সম্পর্কের ইতিহাস সত্য হইলেও ইহার উদ্ভাবনে আর্যগণ যে যথেষ্ট স্বকীয়তার পরিচয় দিয়াছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই বর্ণমালা সংস্কৃত ভাষা প্রকাশের উপযোগী করিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ভাষাতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বের দিক হইতে এইরূপ নিখুঁত সর্বাঙ্গসুন্দর বর্ণমালার দৃষ্টান্ত অল্পই আছে।

*Diringer, *loc. cit,* p. 336.

৩·৩। ব্যাবিলন, মিশর, ভারতবর্ষ, মহাচীন প্রভৃতি সভ্যতার প্রাচীনতম কেন্দ্রে বিজ্ঞানের প্রথম বিকাশ : গণিতের আদি ইতিহাস

গণিত ও জ্যোতিষের আবির্ভাবের সহিত কৃষিনির্ভর সভ্যতা ও অর্থনীতির সম্বন্ধ অতি নিবিড়। কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে ঋতুপরিবর্তন ও তাহার সময় নির্ণয়, অর্থাৎ একপ্রকার প্রাথমিক পঞ্জিকার বিশেষ প্রয়োজন। গণনা পদ্ধতি যথেষ্ট উন্নত না হইলে ঋতুপরিবর্তন প্রভৃতি নৈসর্গিক ঘটনার হিসাব রাখা অসম্ভব। কৃষি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ আদিম জাতিদের মধ্যে ঋতুপরিবর্তনের জ্ঞান অতি অল্পই দেখা যায়। খ্রীঃ পূঃ ৫৭০০ অব্দের অনুরূপ সময় হইতে সুমের অঞ্চলের প্রাচীনতম কৃষিজীবী অধিবাসীদের মহাবিষুব (vernal equinox) হইতে বৎসরারম্ভের হিসাব রাখিতে দেখা যায়।* ইহার প্রায় এক হাজার বৎসর পরে (খ্রীঃ পূঃ ৪০০০) সুমেরীযবা বৃষের নামানুসারে বৎসরের প্রথম মাসকে অভিহিত করিতে আরম্ভ করে। বৃষ-তারামণ্ডলে মহাবিষুবে তখন সূর্যের অবস্থিতি। প্রাথমিক পাটীগণিতে বিলক্ষণ জ্ঞান না ঘটিলে এইরূপ নির্ভুল জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণ সম্ভবপর নয়।

আদিম পূর্তবিদ্যাও গাণিতিক অগ্রগতির বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। গৃহাদি ও নগর নির্মাণে এবং সেচসংক্রান্ত পূর্তবিদ্যায় প্রাচীনকালে ব্যাবিলনীয়, মিশরীয় ও ভারতীয়দের আশ্চর্য নৈপুণ্য প্রদর্শনের নানা প্রমাণ আজও বিদ্যমান। এই সকল পূর্তকার্যের সাফল্য গাণিতিক ও জ্যামিতিক জ্ঞানের উন্নতির জন্য বিশেষভাবে দায়ী।

ব্যবসায় ও বাণিজ্যের প্রসার গাণিতিক অগ্রগতির আর একটি কারণ। সুমের, এলাম, মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা প্রভৃতি শত সহস্র মাইল ব্যবধানে অবস্থিত নানা জনপদের মধ্যে যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের নানা প্রত্নতত্ত্বীয় প্রমাণ উদ্ঘাটিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে গণিতের, বিশেষতঃ পাটীগণিতের নানা মৌলিক আবিষ্কারের অনুকূল হইয়াছিল।

ব্যাবিলন

ব্যাবিলনীয়রা নরম মাটির চাকতি, সিলিণ্ডার বা প্রিজ্‌মের উপর কাঠির সরু অগ্রভাগের দ্বারা অনেকটা কীলকের আকারে দেখিতে একপ্রকার লিপির সাহায্যে তাহাদের হিসাব-নিকাশ, গাণিতিক পদ্ধতি ইত্যাদি লিখিয়া রাখিত। পরে এই চাকতি, সিলিণ্ডার বা প্রিজম্‌গুলিকে পোড়াইয়া লিপির স্থায়িত্ব সম্পাদন করিত। বলা বাহুল্য, কিউনিফর্ম লিপিসম্বলিত এই চাকতিগুলিই তখনকার দিনের মূল্যবান ব্যাবিলনীয় গ্রন্থ। অসুরবাণিপালের (মৃত্যু খ্রীঃ পূঃ ৬২৬ অব্দ) গ্রন্থাগারে ২২,০০০ কিউনিফর্ম লিপির চাকতি পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি এখন বৃটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত। নিপ্‌পুর মন্দিরের গ্রন্থাগারে খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ হইতে ৪৫০ অব্দের মধ্যে লিখিত প্রায় ৫০,০০০ কিউনিফর্ম লিপির মৃন্ময় চাকতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।† গণিত সংক্রান্ত ব্যাবিলনীয় লিপির অস্তিত্বকাল প্রায় দুই হাজার বৎসর—আনুমানিক প্রথম ব্যাবিলনীয় রাজবংশের আমল (খ্রীঃ পূঃ ২১৮৬-১৯৬১) হইতে খ্রীষ্টীয় অব্দের সূচনা পর্যন্ত। ইহার মধ্যে খ্রীঃ পূঃ ২০০০ হইতে ১২০০ পর্যন্ত এই আট শত বৎসর গাণিতিক তৎপরতার জন্য প্রসিদ্ধ—গণিত সংক্রান্ত অধিকাংশ মৃন্ময় লিপি এই সময়ে রচিত হয়।

কিউনিফর্ম লিপির সাহায্যে সংখ্যার অঙ্কপাতন প্রণিধানযোগ্য। এক, দশ ও একশ লেখা হইত যথাক্রমে 𒁹, 𒌋 ও 𒁹𒀸 দ্বারা। এইরূপ অঙ্কপাতনের দ্বারা বড় বড় সংখ্যা, যেমন সহস্র, দশ সহস্র ইত্যাদি প্রকাশ করাও কিছু মাত্র কঠিন ছিল না।

* E. T. Bell, *The Development of Mathematics;* 1940, p. 25.

† Benjamin Farrington, *Science in Antiquity;* 1936, p. 22.

যোগ ও গুণের ধারণা প্রয়োগ করিয়া উপরিউক্ত প্রতীকের সাহায্যে যে কোন বড় সংখ্যা লিখিত হইত (৩৭নং চিত্র)।

YYY	= ৩;	এইগুলিতে যোগের ধারণা	
<<<	= ৩০;	প্রয়োগ করা হইয়াছে।	
<Y>—	=১০০০;	অর্থাৎ একশ'র দশ গুণ;	এইগুলিতে গুণনের
<<Y>—	=১০,০০০;	অর্থাৎ এক হাজারের দশ গুণ	ধারণা প্রয়োগ
		(একশ'র বিশ গুণ নহে);	করা হইয়াছে।

৩৭। কিউনিফর্ম অঙ্কপাতন পদ্ধতি।

ষষ্ঠিক পদ্ধতি : উপরিউক্ত অঙ্কপাতন দশমিক পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। সম্ভবতঃ হাতের বা পায়ের দশটি আঙ্গুল হইতে দশমিক পদ্ধতির উদ্ভব হইয়া থাকিবে। কিন্তু দশমিক পদ্ধতি সুবিধার দিক হইতে আদর্শস্থানীয় নহে। অনেকে এরূপ মন্তব্য পর্যন্ত করিয়াছেন যে, মানুষের যদি দশটির পরিবর্তে হাতে ও পায়ে বারটি করিয়া আঙ্গুল থাকিত, তবে পাটীগণিত অনেক বেশী সহজ হইত। দ্বাদশিক পদ্ধতির (duo-decimal) প্রধান সুবিধা এই যে, ১২ যথাক্রমে ২, ৩, ৪ ও ৬ সংখ্যার দ্বারা বিভাজ্য; ১০ বিভাজ্য কেবলমাত্র ২ ও ৫ সংখ্যার দ্বারা। তথাপি দ্বাদশিক পদ্ধতিও সব দিক দিয়া পুরাপুরি সন্তোষজনক নহে; কারণ ইহা আবার ৫ সংখ্যার দ্বারা বিভাজ্য নহে। সম্ভবতঃ এইসব কারণ বিবেচনা করিয়াই ব্যাবিলনীয়রা দশমিক ও দ্বাদশিক উভয় পদ্ধতির সুবিধা বজায় রাখিয়া ষষ্ঠিক (sexagesimal) পদ্ধতি আবিষ্কার করে। দশমিকের যেমন ১০ ও দ্বাদশিকের ১২, সেইরূপ ষষ্ঠিক অঙ্কপাতন পদ্ধতির মূলভিত্তি হইল ৬০। ৬০ সংখ্যাটি অন্ততঃ দশটি গুণকের দ্বারা বিভাজ্য—২, ৩, ৪, ৫, ৬, ১০, ১২, ১৫, ২০ ও ৩০। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দ হইতে ব্যাবিলনীয়দের ষষ্ঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করিতে দেখা যায়। ঘণ্টা অথবা কোণকে ডিগ্রী, মিনিট ও সেকেণ্ডে ভাগ করিতে এখনও আমরা এই পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া থাকি।

ষষ্ঠিক পদ্ধতিতে অঙ্কপাতনের কয়েকটি নমুনা দেওয়া যাইতেছে:—

(১)

$$১২৩ = ১ \times (১০)^২ + ২ \times (১০) + ৩$$ (দশমিক : আধুনিক)

$$= ১ \times (৬০)^২ + ২ \times (৬০) + ৩$$ (ষষ্ঠিক : ব্যাবিলনীয়)

(২)

$$১{\cdot}২৩ = ১ + \frac{২}{১০} + \frac{৩}{(১০)^২}$$ (দশমিক : আধুনিক)

$$= ১ + \frac{২}{৬০} + \frac{৩}{(৬০)^২}$$ (ষষ্ঠিক : ব্যাবিলনীয়)

ব্যাবিলনীয় গাণিতিক লিপি আবিষ্কৃত হইলে প্রথম প্রথম ইহাদের অন্তর্নিহিত গাণিতিক পদ্ধতি একেবারেই ধরা যায় নাই। ১২৩ বলিতে আমরা যে সংখ্যা বুঝি

ব্যাবিলনীয়রা তাহা বুঝিত না; তাহারা বুঝিত ৩৭২৩। সেইরূপ, ব্যাবিলনীয় মৃন্ময় লিপিতে কতকগুলি বর্গরাশির দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে; যেমন—

$$১\text{'}৪ = ৮^২,\ ১\text{'}২১ = ৯^২,\ ১\text{'}৪০ = ১০^২,\ ২\text{'}১ = ১১^২\ ;$$

একমাত্র ষষ্ঠিক পদ্ধতিতেই ইহাদের তাৎপর্য বোধগম্য।

$$১\text{'}৪ \text{ হইতেছে } ১ \times ৬০ + ৪\ (= ৮^২)\ ;$$
$$১\text{'}২১ \text{ হইতেছে } ১ \times ৬০ + ২১\ (= ৯^২)\ ;$$
$$২\text{'}১ \text{ হইতেছে } ২ \times ৬০ + ১\ (= ১১^২)।$$

শূন্যের ব্যবহার: ব্যাবিলনীয় গণিতে 'শূন্য' বলিয়া কিছু ছিল কি না, সে বিষয়ে অনেক গবেষণা হইয়াছে। হিন্দুরাই প্রথম 'শূন্যে'র আবিষ্কারক ইহা এখন সর্ববাদিসম্মত। তবে ইহার ধারণা স্বাধীনভাবে অন্যত্র যে আত্মপ্রকাশ করে নাই, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। কত আবিষ্কারই তো স্বাধীনভাবে সংঘটিত হইয়া আবার বিস্মৃতির অতলগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে এবং পরবর্তীকালের মানুষকে নূতন করিয়া তাহা পুনরাবিষ্কার করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, খৃঃ পূঃ ২০০ অব্দের কাছাকাছি কয়েকটি ব্যাবিলনীয় লিপিতে সংখ্যার মধ্যে শূন্য স্থান বা কোন সংখ্যার অনস্তিত্ব নির্দেশ করিতে একপ্রকার কৌণিক প্রতীক ⋞ ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে টলেমী তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ 'অ্যাল্‌মাজেস্টে' ষষ্ঠিক পদ্ধতির ব্যবহার প্রসঙ্গে শূন্যস্থান নির্দেশ করিতে গ্রীক অক্ষর 'ο' (ওমিক্রন) ব্যবহার করেন। এই সব নজির হইতে ফ্লোরিয়ান ক্যাজরি মন্তব্য করিয়াছেন যে, কোন সংখ্যার অন্তর্বর্তী শূন্যস্থান পরিপূর্ণ করিতে ব্যাবিলনীয়রা সম্ভবতঃ শূন্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়াছিল এবং ইহার জন্য এক প্রতীকও তাহারা ব্যবহার করিত; কিন্তু যে কোন কারণেই হউক গণনার কার্যে তাহারা শূন্যের কোন ব্যবহার করে নাই।*

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে এইচ্‌. ভি. হিলপ্রেট প্রাচীন নিপ্‌পুরে প্রত্নতত্ত্বীয় খননকার্যের ফলে কতকগুলি নামতার তালিকা আবিষ্কার করেন। তালিকাগুলি বিভিন্ন রাশির গুণ, ভাগ, বর্গ, বর্গমূল প্রভৃতি নির্ণয় করিবার প্রাচীন ব্যাবিলনীয় ধারাপাত বিশেষ। প্রত্যেক শিক্ষার্থী ও ব্যবসায়ীকে তাড়াতাড়ি গণনা ও হিসাব-নিকাশের সুবিধার জন্য এইসব তালিকা বা নামতা মুখস্থ করিতে হইত।

অবশ্য ব্যাবিলনীয় পাটীগণিতের ইহাই সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। কিন্তু যেটুকু বলা হইল তাহাতে চার হাজার বৎসর পূর্বে ব্যাবিলনীয়রা পাটীগণিতে যে কিরূপ উন্নত ছিল তাহা বুঝিবার পক্ষে ইহা যথেষ্ট।

বীজগণিত: অধ্যাপক বেল বীজগণিতে ব্যাবিলনীয় অবদান আরও বেশী মৌলিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাক-প্রতীক বীজগণিতের (pre-symbolic algebra) কালে (ব্যাবিলনীয়দের প্রায় দুই হাজার বৎসর পরে প্রখ্যাত গ্রীক বীজগণিতজ্ঞ ডায়োফ্যাণ্টাস বীজগণিতের প্রতীক ব্যবহারের চেষ্টা করেন) ব্যাবিলনীয়দের আমরা একঘাত, দ্বিঘাত ও ত্রিঘাত সমীকরণ সমাধান করিতে দেখি। সহ-সমীকরণ সমাধানের কয়েকটি দৃষ্টান্তও আছে। সমীকরণগুলির সমাধান-পদ্ধতির কোন নমুনা অবশ্য পাওয়া যায় নাই; সম্ভবতঃ এইসব সমাধান অতীব গোপনীয় তথ্য হিসাবে জ্ঞান করা হইত। সমীকরণগুলি সবক্ষেত্রেই বিশেষ ধরনের, অর্থাৎ অজ্ঞাত রাশিটি ছাড়া আর সবগুলিই সংখ্যারাশি। বিভিন্ন রাশির গুণ, ভাগ, বর্গ, বর্গমূল প্রভৃতির যেসব তালিকার কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেই তালিকা অবলম্বনে

* Florian Cajori, *A History of Mathematics*, 1926, p. 5.

প্রধানতঃ সমীকরণগুলির সমাধান নির্ণীত হইত। কোন সাধারণ নিয়ম ও পদ্ধতি হয় আবিষ্কৃত হয় নাই, না হইলেও তাহার কথা কেহ লিখিয়া প্রকাশ করিয়া যায় নাই।

আঙ্কিক সমাধান নির্ণয়েও তাহারা যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহার প্রমাণ নিম্নোক্ত সহ-সমীকরণ সমাধানের মধ্যে বিদ্যমানঃ

$$xy = 600 \; ; \; (ax + by)^2 + cx + dy = e$$

a, b, c, d ও e'র ৫৫টি বিভিন্ন সংখ্যা প্রয়োগ করিয়া এই সমীকরণটি সমাধান করিবার চেষ্টা দেখা যায়। দ্বিতীয়টি একটি দ্বিঘাত সমীকরণ। দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মাত্র মূল হয় ইহাই ব্যাবিলনীয়রা জানিত।

অমূলদ সংখ্যা (irrational number) সম্বন্ধে একরূপ অস্পষ্ট জ্ঞানের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন রাশির বর্গমূল নির্ণয় করিয়া বর্গমূল তালিকা প্রণয়নকল্পে তাহারা নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবে, কোন কোন রাশির বর্গমূল পূর্ণসংখ্যা নহে, পূর্ণসংখ্যার কাছাকাছি একটি স্থূল (approximate) সংখ্যা। অমূলদ রাশির স্থূল বর্গমূল নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে ব্যাবিলনীয়দের আমরা দেখি

$$(a^2 + b^2)^{\frac{1}{2}} = a + \frac{b^2}{2a}$$

নিয়মটি ব্যবহার করিতে। দুই হাজার বৎসর পরে আলেকজান্দ্রিয়ার হীরো এই নিয়মটির ব্যবহার করেন। অমূলদ রাশি ২-এর বর্গমূল ($\sqrt{২}$) ব্যাবিলনীয় লিপিতে আমরা পাই ১—৫/১২; ইহা দশমিকের দুই ঘর পর্যন্ত শুদ্ধ।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার বহুক্ষেত্রে গ্রীকরা ব্যাবিলনীয়দের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ব্যাবিলনীয় বীজগণিত আরও উন্নত হওয়া দূরে থাকুক, ডায়োফ্যাণ্টাসের পূর্বে বীজগণিতের প্রাথমিক চর্চা পর্যন্ত গ্রীকদের মধ্যে দেখা যায় না। গণিতের আর একটি বিভাগ জ্যামিতি গ্রীক প্রতিভার স্পর্শে চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল, অথচ বীজগণিত ও পাটীগণিতে গ্রীকদের শৈশব অবস্থা কোন দিনই কাটে নাই। ইহার কারণ, সংখ্যা সম্বন্ধে গ্রীকদের দুর্জ্ঞেয় দুর্বলতা। নিরালম্ব, অমূর্ত সংখ্যার রাজ্য গ্রীকরা বরাবরই এড়াইয়া গিয়াছে। একমাত্র পিথাগোরাস ও তাঁহার সম্প্রদায় ইহার বিরাট ব্যতিক্রম। কিন্তু গ্রীক বিজ্ঞানে পিথাগোরাসের প্রভাব সামান্য ও ক্ষণস্থায়ী।

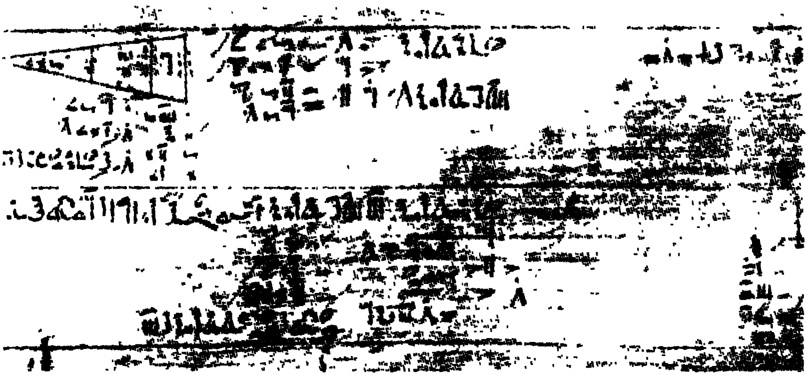
ব্যাবিলনীয় জ্যামিতি, পাটীগণিত ও বীজগণিতের মত এত সমৃদ্ধ নহে। তবু তাহাদের জ্যামিতিক জ্ঞান উপেক্ষনীয় নহে। বৃত্তের জ্ঞান যথেষ্ট উন্নত। ব্যাসার্ধের সমান জ্যা বৃত্তের কেন্দ্রে যে ৬০° কোণ উৎপন্ন করে এবং মোটামুটিভাবে এই জ্যা যে বৃত্তের মধ্যে অঙ্কিত সুষম ষড়ভুজের বাহুর সমান, এইরূপ মন্তব্য কয়েকটি লিপিতে পাওয়া যায়। বৃত্তের মধ্যে সুষম ষড়ভুজ অঙ্কনের কতকগুলি দৃষ্টান্তও আছে। বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত, অর্থাৎ π -এর মান ব্যাবিলনীয়রা বাহির করে ৩। একটি ত্রিভুজের তিন বাহুর দৈর্ঘ্য ৩, ৪ ও ৫ হইলে ইহা একটি সমকোণ ত্রিভুজ হয়, ইহা তাহারা জানিত। এই তথ্য হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, পিথাগোরাসের প্রতিপাদ্যের সহিত তাহাদের পরিচয় থাকাও কিছুমাত্র আশ্চর্য নহে। ইহা অবশ্য নিছক অনুমান।

মিশর

জোসেফাস্ বলেন, মিশরীয়েরা আব্রাহামের কাছে পাটীগণিত শিক্ষা করে। আব্রাহাম ক্যালডিয়া হইতে জ্যোতির্বিদ্যার সঙ্গে পাটীগণিতও মিশরে প্রথম আনয়ন করেন এবং গ্রীকরা পরে মিশরীয়দের কাছে গণিতবিদ্যায় শিক্ষানবিসি করে। মিশরের গণিতবিদ্যা আয়ত্তের আদি ইতিহাস যাহাই হউক, তাহারা যে গ্রীকদের প্রধান শিক্ষক এবং গ্রীকরাও

যে অকপটে মুক্তকণ্ঠে এই ঋণ বরাবর স্বীকার করিয়া গিয়াছে, তাহা সত্য। শুধু তাহাই নহে, এই শ্রদ্ধাবশতঃ প্রত্যেক প্রাচীন গ্রীক লেখক একবাক্যে প্রচার করিয়া গিয়াছে যে, মিশরীয়েরাই গণিতের জন্মদাতা। Phoedrus-এ প্লেটো বলিয়াছেন, "মিশরের নয়ক্রেটিস্ সহরে এক বিখ্যাত বৃদ্ধ দেবতার বাস ছিল; এই দেবতার নাম থয়েট্। আইবিস্ নামে পক্ষীটিকে তিনি পবিত্র জ্ঞান করিতেন। এই দেবতাই পাটীগণিত, গণনা, জ্যামিতি, জ্যোতিষ, পাশাখেলা প্রভৃতি বিদ্যার আবিষ্কর্তা। কিন্তু তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার অক্ষরের ব্যবহার।" ইহা মূলতঃ প্রশংসার উক্তি। ইহার ঐতিহাসিক সত্যতা যাচাই করিতে যাওয়া বৃথা। তবে হিরোডোটাস্, অ্যারিস্টটল, ডিয়োডোরাস্, ডিয়োজেনিস্ লের্টিয়াস, আয়াম-ব্লিকাস প্রমুখ বিখ্যাত প্রাচীন লেখকগণ মিশরে জ্যামিতি বিদ্যার উদ্ভব সমর্থন করিয়া যে সব মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য। হিরোডোটাস্ লিখিয়াছেন, মিশরের রাজারা চতুষ্কোণ করিয়া কাটা খণ্ড খণ্ড জমি প্রজাদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করিয়া তাহা হইতে দেয় বাৎসরিক রাজস্বের পরিমাণ ঠিক করিয়া দিতেন। নদীর ভাঙ্গনের ফলে কোন প্রজার জমি নদীগর্ভে বিলীন হইলে সেই প্রজাকে তাহা রাজার নিকট জানাইতে হইত। রাজা তখন নদী কতটুকু জমি গ্রাস করিয়াছে তাহা মাপিয়া নূতন করিয়া রাজস্বের পরিমাণ নিরূপণের জন্য পূর্ত-বিশারদদের পাঠাইতেন। এইভাবে সে দেশে প্রথম জ্যামিতির উদ্ভব হয় এবং তথা হইতে পরে এই বিদ্যা হেলাসে পেঁছায়। ইহা প্রাচীন কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের কথা।

আহ্মেস্ প্যাপিরাস্ঃ তবে প্রাচীন মিশরীয়দের গাণিতিক জ্ঞান কি প্রকার ছিল, তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইতে হইলে আমাদের প্রত্নতত্ত্বীয় গবেষণার উপর নির্ভর করাই



৩৮। রাইণ্ড প্যাপিরাসের একাংশ। মূল সম্পূর্ণ প্যাপিরাস্টি ১৮ ফুট লম্বা ও ১৩ ইঞ্চি চওড়া; ইহা হায়রেটিক লিপিতে রচিত এবং দক্ষিণ হইতে বামে ও উপর হইতে নীচে পড়িবার রীতি।

উচিত। বৃটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত রাইণ্ড সংগ্রহের মধ্যে বিখ্যাত 'আহ্মেস্ প্যাপিরাস্' প্রাচীন মিশরের গাণিতিক প্রতিভার অকাট্য নিদর্শন। ১৮৭৭ খৃীষ্টাব্দে আইসেনলোর এই প্যাপিরাসের মর্মোদ্ঘাটন করেন। গ্রন্থটি আনুমানিক খৃীঃ পূঃ ১৬৫০ অব্দে আহ্মেস্ নামে জনৈক পুরোহিত কর্তৃক সঙ্কলিত। আহ্মেস্ নিজে ইহা রচনা করেন নাই। তাঁহার বহু শত কি সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে (বার্চ সাহেবের মতে খৃীঃ পূঃ ৩৪০০ অব্দ) আর একজন মিশরীয় পুরোহিতের রচিত গ্রন্থের ইহা একটি প্রতিলিপি মাত্র। শাঁপোলিয়োঁ, ইয়ং প্রমুখ পণ্ডিতদের চেষ্টায় হায়রোগ্লিফিক লিপিপাঠ সম্ভব হইলে মিশরীয় অঙ্কপাতন

সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গিয়াছে। সম্প্রতি মস্কো প্যাপিরাসের অনুবাদের ফলে মিশরীয় জ্যামিতির আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সব প্রামাণিক লিপি হইতে প্রাচীন মিশরের গাণিতিক জ্ঞান সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

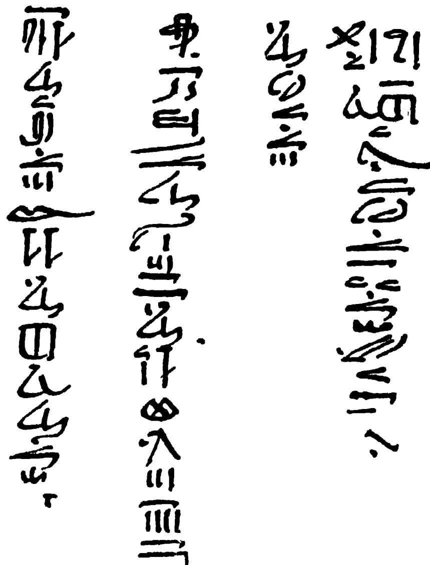
পাটীগণিত: মিশরীয় অংকপাতন পদ্ধতি দশমিক। একক, দশক, শতক প্রভৃতি সংখ্যা নির্দেশ করিতে ৩৯নং চিত্রে প্রদত্ত প্রতীকগুলি ব্যবহৃত হইত।

এক (১)	= 𓏺	অযুত (১০,০০০)	= 𓂭
দশ (১০)	= 𓎆	লক্ষ (১০০,০০০)	= 𓆐
শত (১০০)	= 𓍢	নিযুত (১,০০০,০০০)	= 𓁨
সহস্র (১,০০০)	= 𓆼	কোটি (১০,০০০,০০০)	= 𓍶

৩৯। হায়রোগ্লিফিক অংকপাতন পদ্ধতি।

প্রতীকগুলি অর্থবোধক। ১ হইল দণ্ডায়মান যষ্ঠি; ১০,০০০ অংগুলি; ১০০,০০০ পক্ষী; ১,০০০,০০০ বিস্ময়াভিভূত মানুষ ইত্যাদি। অন্তর্বর্তী সংখ্যা রচনায় যোগের ধারণা প্রযুক্ত দেখা যায়। যেমন ২৩ হইল 𓎆𓎆𓏺𓏺𓏺 (২ দশ+৩ এক)।

এইরূপ বড় বড় সংখ্যার প্রতীক ব্যবহারের নমুনা হইতে বুঝা যায়, মিশরীয়েরা বৃহৎ



৪০। রাইণ্ড প্যাপিরাসের নামপত্রের একাংশ।

সংখ্যা অনায়াসে কল্পনা করিতে পারিত। হায়রোগ্লিফিক লিপিতে বহু বৃহৎ সংখ্যার উল্লেখ আছে। যেমন—জনৈক রাজা এক যুদ্ধে জয়ী হইয়া ১,২০,০০০ বন্দী, ৪০০,০০০ বলদ, ও

১,৪২২,০০০ ছাগল লাভ করিয়াছিল। সত্য হইলে ইহা সেই যুগের এক বিরাট সাম্রাজ্য বিজয়ের ঘটনা। তারপর প্রায় দেড় মিলিয়ন ছাগলের সংখ্যা গুণিয়া বাহির করা আধুনিক কালেও এক বিরাট ব্যাপার। হয়তো এরূপ সংখ্যা লিপিকারের বা কবির নিছক কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, আদিম অসভ্য জাতিরা এইরূপ বিরাট সংখ্যার কথা চিন্তা করিতেও পারে না। এমন কি, সুসভ্য ও উন্নত গ্রীকরা পর্যন্ত বিরাট সংখ্যা কল্পনার ব্যাপারে অক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে।

মিশরীয়েরা যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ এই চারি নিয়মের সহিত পরিচিত ছিল। গুণন পদ্ধতির মধ্যে কিছুটা বিশেষত্ব দেখা যায়। ৫-কে ৩ দিয়া গুণ করিতে আমরা বুঝি ৫-কে ৩ বার লিখিয়া যোগ বাহির করা। গুণ অর্থে মিশরীয়েরা ঠিক তাহা বুঝিত না বা আমরা যে পদ্ধতিতে এখন এই কার্য সমাধা করিয়া থাকি ঠিক সে ভাবেও তাহারা গুণ করিত না। গুণ্য ও গুণককে ক্রমশঃ দ্বিগুণ করিয়া ও গুণ্যের সারিকে যোগ দিয়া ফল নির্ণীত হইত। কয়েকটি উদাহরণের দ্বারা পদ্ধতিটি বুঝানো সহজ হইবে। মনে করা যাক—(১) ৪০-কে ১৫-র দ্বারা ও (২) ৩৭-কে ১৮-র দ্বারা গুণ করিতে হইবেঃ

গুণক	গুণ্য	গুণক	গুণ্য
১\	৪০	১	৩৭
২\	৮০	২\	৭৪
৪\	১৬০	৪	১৪৮
৮\	৩২০	৮	২৯৬
	———	১৬\	৫৯২
	৬০০ (উঃ)		———
			৬৬৬ (উঃ)
	(১)		(২)

গুণক ও গুণ্য দুইটি সারিতে প্রথমে গুণকের ঘরে ১ ও গুণ্যের ঘরে প্রদত্ত সংখ্যাকে (উপরিউক্ত উদাহরণে ৪০ ও ৩৭) লিখিতে হইবে। তারপর দুই সারির সংখ্যাকেই ক্রমশঃ দ্বিগুণ বাড়াইয়া যাইতে হইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না গুণকের সারির দুই বা ততোধিক সংখ্যা মিলিয়া প্রদত্ত গুণকের সমান হয়। গুণকের সারির যে সংখ্যাগুলিকে যোগ করিলে প্রদত্ত গুণকটিকে পাওয়া যায়, গুণ্যের সারিতে তাহাদের বিপরীত সংখ্যাগুলি যোগ করিলেই ঈপ্সিত গুণফল পাওয়া যাইবে।

আহ্‌মেস্ প্যাপিরাসে নানাবিধ ভগ্নাংশকে একাধিক ভগ্নাংশে বিশ্লেষণ করিবার প্রয়াস দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল ভগ্নাংশটির লব (numerator) ২ এবং ইহাকে এমনভাবে বিশ্লেষণ করা হয় যাহাতে বিশ্লিষ্ট ভগ্নাংশগুলির প্রত্যেকের লব ১ হয়। যেমন,

$$\frac{২}{৯৭} = \frac{১}{৫৬} + \frac{১}{৬৭৯} + \frac{১}{৭৭৬}$$

এই জাতীয় গণিতের মধ্যে বুদ্ধির খেলা অবশ্য কিছুই নাই।

বীজগণিতীয় সমীকরণের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। কোন দ্রব্যের ২/৩, তাহার ১/২, ও তাহার ১/৭ দ্রব্যটির সহিত যোগ করিলে মোট ৩৩ হয়; দ্রব্যটি কত? আমাদের অংকপাতন পদ্ধতিতে অজ্ঞাত রাশিটিকে x ধরিলে সমীকরণটি দাঁড়ায়ঃ

$$\frac{2}{3}x + \frac{x}{2} + \frac{x}{7} + x = 33$$

প্যাপিরাসে প্রদত্ত অজ্ঞাত রাশির মান হইতেছেঃ

$$১৪+\frac{১}{৪}+\frac{১}{২৭}+\frac{১}{৫৬}+\frac{১}{৬৭৯}+\frac{১}{৭৭৬}+\frac{১}{১৯৪}+\frac{১}{৩৮৮}$$

সব কিছুই ভগ্নাংশে প্রকাশ করিবার একটা অহেতুক চেষ্টা মিশরীয়দের মধ্যে দেখা যায়। একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, কিছু আগে ভগ্নাংশের বিশ্লেষণের যে নমুনা দেওয়া হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলি ভগ্নাংশই আলোচ্য সমীকরণটির সমাধানে স্থান পাইয়াছে।

সমান্তর ও গুণোত্তর শ্রেণীর (arithmatic and geometric progression) ব্যবহার প্রয়োজন হয় এরূপ কতকগুলি বিবিধ প্রশ্নের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। আহ্মেসের একটি প্রশ্নে ৭, ৪৯, ৩৪৩, ২৪০১ ও ১৬৮০৭ সংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং সংখ্যাগুলির পাশে যথাক্রমে একটি মানুষ, বিড়াল, ইঁদুর, বার্লি ও শস্যের দানা অঙ্কিত আছে। বহুদিন পর্যন্ত এইরূপ পাঁচটি সংখ্যা ও তাহার সহিত কয়েকটি আপাত-অসংলগ্ন চিত্র অঙ্কিত করিবার রহস্য উদ্ঘাটিত হয় নাই। ক্যান্টর সাহেব আহ্মেস ধাঁধার সমাধান আবিষ্কার করিয়া বলেন যে, ইহা একটি গুণোত্তর শ্রেণীর দৃষ্টান্ত এবং চিত্র ও সংখ্যাগুলির তাৎপর্য হইতেছে এইরূপঃ—৭ জন ব্যক্তির প্রত্যেকের ৭টি করিয়া বিড়াল আছে, প্রত্যেকটি বিড়াল ৭টি করিয়া ইঁদুর ধরে, প্রত্যেকটি ইঁদুর ৭টি করিয়া বার্লির শীষ খায়, প্রত্যেকটি শীষে ৭টি করিয়া বার্লির দানা আছে; সংখ্যাগুলি ও তাহাদের যোগফল কত? অর্থাৎ

৭+৪৯+৩৪৩+২৪০১+১৬৮০৭=১৯৬০৭।

জ্যামিতিঃ প্রাচীন মিশরীয়দের পাটীগণিত ও বীজগণিত সংক্রান্ত জ্ঞানের দৃষ্টান্ত আমাদের খুব বেশী মুগ্ধ করে না। ইহা নিঃসন্দেহে ব্যাবিলনীয় জ্ঞান অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। কিন্তু মিশরীয় জ্যামিতি বাস্তবিকই ব্যাবিলনীয়দের অপেক্ষা অনেক বেশী উন্নত ছিল। ত্রিভুজ, বৃত্ত, চতুর্ভুজ ও বহুভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল, সিলিণ্ডার, পিরামিড প্রভৃতি ঘন যথাযথ ভাবেই তাহাদের আমরা নির্ণয় করিতে দেখি। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে $\frac{1}{2}$ (ভূমি)×(উচ্চতা) নিয়মের প্রয়োগ দেখা যায়। বৃত্তের ক্ষেত্র নিরূপণ হইতে মিশরীয়েরা π -এর যে মান নির্ণয় করে তাহা ব্যাবিলনীয়দের নির্ণীত মান (৩) অপেক্ষা অনেক বেশী নির্ভুল। আহ্মেস প্যাপিরাসে উল্লিখিত নিম্নোক্ত প্রশ্নটি প্রণিধানযোগ্য।

"৯ খেত (khet) ব্যাসের একটি বৃত্তাকার ভূমির ক্ষেত্রফল নিরূপণের উপায়। ক্ষেত্রফল কত?

ব্যাস হইতে উহার ১/৯ ভাগ, অর্থাৎ ১ প্রথমে বাদ দিতে হইবে। অবশিষ্ট ৮।

এখন ৮-এর ৮ গুণ বাহির কর। উত্তর হইবে ৬৪। ইহাই ভূমির ক্ষেত্রফল..."*

বৃত্তের ব্যাস যদি a মনে করা যায়, তবে উপরিউক্ত পদ্ধতি অনুসারে বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিবার নিয়ম হইতেছে

$$S=\left(a-\frac{a}{9}\right)^2$$

সুতরাং π -এর মান হইল ৩·১৬; † π -এর প্রকৃত মান ৩·১৪১৬।

* *Man Makes Himself*-এর গ্রন্থকার ডাঃ ভি. গর্ডন চাইল্ড কর্তৃক উধৃত আহ্মেস্ প্যাপিরাসের কিয়দংশের ইংরেজী অনুবাদের বঙ্গানুবাদ।

† $\pi\left(\frac{a}{2}\right)^2=\left(a-\frac{a}{9}\right)^2$ $\qquad$ $\pi=\frac{4}{a^2}a^2\left(\frac{8}{9}\right)^2=\left(\frac{16}{9}\right)^2=3\cdot16$

ব্যাবিলনীয়রা পিরামিডের আকারে নির্মিত শস্যাধারে শস্য ভরিয়া রাখিত। শস্যের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য আধারের আয়তন মাপা আবশ্যক। উপরের দিক কাটা এইরূপ পিরামিডের বা ফ্রাস্‌টামের আয়তন বা ঘন (V) ব্যাবিলনীয়রা বাহির করিত এইভাবেঃ

$$V=h\left[\frac{(a+b)^2}{2}+\frac{(a-b)^2}{2}\right]$$

h=উচ্চতা; a=নীচের ভূমির দৈর্ঘ্য; b=উপরের ভূমির দৈর্ঘ্য। শস্য মাপিবার কাজে যথেষ্ট হইলেও এই নিয়মে ফ্রাস্‌টামের নির্ভুল আয়তন পাওয়া যায় না। কিন্তু স্থপতি ও ইঞ্জিনীয়ারদের পিরামিড বা ফ্রাস্‌টাম গড়িতে হইলে আরও নির্ভুল পদ্ধতিতে অগ্রসর হইতে হইবে। সেইখানে সামান্য ভুলও মারাত্মক। এজন্য স্থাপত্যের প্রয়োজনে মিশরীয়েরা নির্ভুল নিয়ম আবিষ্কারে সমর্থ হইয়াছিল। মস্কো প্যাপিরাসে আমরা ফ্রাস্‌টামের ঘনর নিম্নলিখিত নিয়ম পাইঃ—

$$V=\frac{h}{3}\left(a^2+ab+b^2\right)$$

এই প্যাপিরাসে বর্ণিত প্রশ্নের একটি নমুনা দেওয়া যাইতেছে।

"উপরের অংশ কাটা গিয়াছে এইরূপ একটি পিরামিডের (ফ্রাস্‌টাম) আয়তন বাহির করিতে হইবে।

"তোমাকে বলা হইল কর্তিত পিরামিডের উচ্চতা ৬ কিউবিট, নীচের ভূমির দৈর্ঘ্য ৪ কিউবিট, উপরের ভূমির দৈর্ঘ্য ২ কিউবিট।

"৪-এর বর্গ বাহির কর; উত্তর ১৬।

"৪-এর দ্বিগুণ বাহির কর; উত্তর ৮।

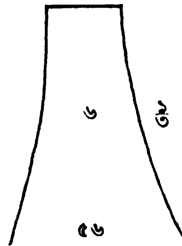
"২-এর বর্গ বাহির কর; উত্তর ৪।

"১৬-র সহিত ৮ এবং তাহার সহিত ৪ যোগ কর; যোগফল ২৮।

"৬-এর ⅓ বাহির কর; ফল ২। ২৮-এর দ্বিগুণ বাহির কর; উত্তর হইবে ৫৬।

"দেখ, ইহা ৫৬। তুমি উত্তর পাইয়া গিয়াছ।"*

মিশরীয়েরা কি ভাবে এই সূত্রটি আবিষ্কার করিয়াছিল তাহা জানা নাই এবং জানা



৪১। পিরামিডের ফ্রাস্‌টাম (মস্কো প্যাপিরাসে প্রদত্ত চিত্রাবলম্বনে)।

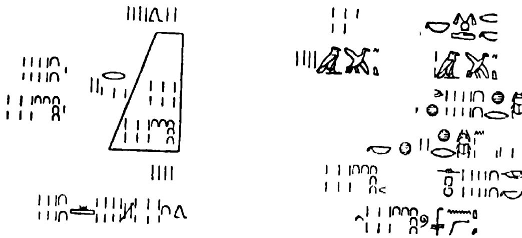
সম্ভবও নয়। নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ কোন গাণিতিক পদ্ধতিতে তাহারা সূত্রটি আবিষ্কার করে নাই; কারণ তাহাতে যে ধরনের গাণিতিক জ্ঞানের প্রয়োজন সে যুগে তাহা সম্ভবপর ছিল না।

* *Man Makes Himself* —গ্রন্থে প্রদত্ত ইংরেজী অনুবাদের বঙ্গানুবাদ।



দক্ষিণ মেসোপোটেমিয়ায় ফারা নামক স্থানে (প্রাচীন শুরুপাক) প্রাপ্ত কিউনিফর্ম সংখ্যা-লিপির এক সুমেরীয় মৃন্ময় ফলক, মধ্যের সারির নীচ হইতে উপরে ১, ২, ৩, ৪, ৫ এবং ৭, ৮ ও ৯ এবং শেষের সারির উপরে ১০ ও ২০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।





মস্কো প্যাপিরাসের যে অংশে ফ্রাস্টামের ঘন নিরূপণের নিয়ম আলোচিত হইয়াছে তাহার এক প্রতিলিপি, প্যাপিরাস্‌টি হায়রেটিক লিপিতে লিখিত, নীচে তাহাই আবার হায়রোগ্লিফিকে দেখানো হইয়াছে। সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ ৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্যালকুলাসের সাহায্যে খাঁটী গাণিতিক পদ্ধতিতে এই সূত্র প্রমাণিত হইয়াছিল অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে। এমন কি সপ্তদশ শতকে ক্যাভালিয়েরি তথাকথিত অবিভাজ্য পদ্ধতি (method of indivisibles) অবলম্বন করিয়াও এই সূত্র পুরাপুরি প্রমাণ করিতে সমর্থ হন নাই। পিরামিড নির্মাণের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা হইতে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে কোন প্রকার তত্ত্বীয় প্রমাণের অপেক্ষা না রাখিয়াই তাহারা এই নির্ভুল সূত্রটি প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্বে আবিষ্কার করিয়াছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক এইরূপ প্রায়োগিক আবিষ্কারের (empirical discovery) উচ্চমূল্য দিতে অস্বীকার করিয়া থাকেন। ইহা একেবারেই ভুল বিচার। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে প্রয়োগবাদের প্রভূত মূল্য আছে; বিজ্ঞানের নানাক্ষেত্রে এখনও ইহার প্রয়োজনীয়তার প্রচুর অবকাশ রহিয়াছে। অধ্যাপক বেল তাই মস্কো প্যাপিরাসে বর্ণিত ফ্রাস্টামের সূত্র সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন—'Even the empirical discovery of such a process or its verbal equivalent is evidence of extraordinary mathematical insight' (*Development of Mathematics*, p. 41).

ভারতবর্ষ—বৈদিক যুগ

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা আলোচনা-প্রসঙ্গে মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত ওজন ও মাপনীর নমুনা পরীক্ষা করিয়া প্রাচীন ভারতীয়দের গণনা পদ্ধতি সম্বন্ধে যে সামান্য তথ্য পাওয়া যায় তাহার উল্লেখ করিয়াছি। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার প্রত্নতত্ত্বীয় নিদর্শন হইতে ইহার অধিক কিছু বলা সম্ভবপর নহে। প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পরিচয় পাইতে হইলে আমাদের অমূল্য বৈদিক সাহিত্যের প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হয়। পৃথিবীতে সভ্যতা বিকাশের প্রথম যুগে বৈদিক ঋষিগণ অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়া যে সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার তুলনা নাই।

বৈদিক যুগের প্রাচীনত্ব: বৈদিক যুগে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক তৎপরতা লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে এই যুগের প্রাচীনত্ব ও সংহিতা, ব্রাহ্মণ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থাদির রচনা-কাল সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। তাহার কারণ এই যে, ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব স্বীকারে কুণ্ঠাবোধবশতঃ একদল পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত যেমন বৈদিক কালকে ক্রমশঃ খৃষ্টীয় শতকের কাছাকাছি আগাইয়া আনিবার জন্য উদ্বিগ্ন, সেইরূপ অনেক ভারতীয় পণ্ডিত আমাদের সভ্যতা ও ঐতিহ্যের সুমহান প্রাচীনত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে বৈদিক যুগকে ক্রমশঃ অতীতের দিকে ঠেলিয়া এক ঐতিহাসিক অবাস্তবতার ও অসম্ভাব্যতার সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার ফলে খৃীঃ পূঃ ১০০০ হইতে ৪০০০ অব্দের মধ্যে অসংখ্য তারিখ বৈদিক যুগের আরম্ভ হিসাবে নানা পণ্ডিতের রচনায় উল্লিখিত দেখা যায়। এমন কি নক্ষত্র-সংস্থানের জ্যোতিষীয় বিচার হইতে কেহ কেহ ঋগ্বেদের রচনাকাল খৃীঃ পূঃ ৬০০০ বৎসর মনে করেন। আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, মধ্য ও নিকট প্রাচ্যের সর্বত্র তখন নব্য প্রস্তরযুগ চলিতেছে; পৃথিবীর কোথাও কৃষিনির্ভর সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করে নাই; এবং সর্বোপরি খৃীঃ পূঃ ৩৫০০ অব্দের আগে কোনও প্রকার আক্ষরিক লিপি আবিষ্কারের প্রত্নতত্ত্বীয় প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৯৫০ খৃীষ্টাব্দে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-এসিয়ায় বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধীয় এক আলোচনা-সভায় বৈদিক যুগের ও প্রাচীন ভারতের কাল সম্পর্কে উপরিউক্ত মতান্তর ও অসঙ্গতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি ঐ সভায় পঠিত এক প্রবন্ধে* এবং আরও বিশদভাবে সম্প্রতি প্রকাশিত *The Vedic Age* গ্রন্থে বৈদিক যুগের

* R. C. Majumdar, 'Scientific Achievements of the Ancient Hindus: Chronological and Sociological Background' দক্ষিণ এসিয়ার বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কিত আলোচনা-সভায় পঠিত প্রবন্ধ; ১৯৫০।

প্রাচীনত্ব ও বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বৈদিক সভ্যতার কাল খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ হইতে ১০০০ অব্দের মধ্যে মনে করাই এখন সব দিক দিয়া যুক্তিসঙ্গত।

ইহা হইল বৈদিক যুগের প্রথম পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাল খ্রীঃ পূঃ ১০০০ হইতে ৫০০ অব্দ। প্রাচীনতম বেদ ঋক্-সংহিতার রচনাকাল আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দ; এই বেদের কিছু কিছু অংশ হয়ত ইহার কয়েক শত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়া থাকিবে। সুতরাং খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময় হইতে ঋক্-সংহিতার রচনা অল্প অল্প আরম্ভ হইয়া খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দের কিছু আগে ইহা বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, এখন ইহাই অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অভিমত। অন্যান্য সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সাহিত্য খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দের পরবর্তী কালের রচনা (যদিও ডাঃ বিভূতিভূষণ দত্ত ও অভধেশ-নারায়ণ সিংহ *History of Hindu Mathematics*-এ তৈত্তিরীয় সংহিতার রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দ ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের কাল খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দ লিখিয়াছেন)। সাম, যজু, অথর্ব প্রভৃতি পরবর্তীকালের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সাহিত্য সম্ভবতঃ রচিত হইয়াছিল খ্রীঃ পূঃ নবম ও অষ্টম শতাব্দীতে। ঋক্-সংহিতার মত ইহাদের কিছু কিছু অংশ আবার উপরিউক্ত সময়ের কিছু আগে, এমন কি ঋক্-সংহিতার কালেও রচিত হওয়া অসম্ভব নহে।

উপনিষদের কাল নির্ণয় সুকঠিন, কারণ ইহাতে যে সকল তথ্যের ও তত্ত্বের আলোচনা আছে তাহাদের প্রাচীনতা সম্বন্ধে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। তবে উপনিষদের প্রাচীনতম অংশগুলি যে প্রাক্-বৌদ্ধ যুগের, সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ সপ্তম কি অষ্টম শতাব্দীর, তাহাতে কোন সংশয় নাই। উপনিষদ্ রচনার সর্বশেষ কাল খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দী ধরা যাইতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান আলোচনার জন্য বেদাঙ্গ জ্যোতিষ অতিশয় মূল্যবান। সূত্রযুগে (খ্রীঃ পূঃ ৬০০—২০০) ইহা সংকলিত হইয়াছিল। ডাঃ দত্ত ও সিংহ খ্রীঃ পূঃ ১২০০ অব্দের উল্লেখ করিয়া বেদাঙ্গ জ্যোতিষের প্রাচীনত্বের যে ইঙ্গিত করিয়াছেন ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। স্মৃতি ও পুরাণ রচিত হইয়াছিল খ্রীষ্টীয় শতকের প্রারম্ভে।

মহাভারতের রচনাকাল সম্বন্ধে যথেষ্ট অনিশ্চয়তা ও মতদ্বৈধ আছে। মহাভারতে বর্ণিত ঘটনাবলী, ভারত যুদ্ধ বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সম্ভবতঃ সংঘটিত হইয়াছিল খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ হইতে ১০০০ অব্দের মধ্যে। এই বৃত্তান্ত বহু শত বৎসর মুখে মুখে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হইয়া খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকের কাছাকাছি সময়ে গ্রন্থাকারে লিখিত হইতে আরম্ভ হয় এবং বর্তমান আকারে পৌঁছিতে এই মহাকাব্য যে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত গড়াইয়া গিয়াছিল তাহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছুদিন আগে পর্যন্ত পণ্ডিতদের ধারণা ছিল, ইহার রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগ; এখন দেখা যাইতেছে ইহার অন্ততঃ দুইশত হইতে চারিশত বৎসর পরে এই বিখ্যাত গ্রন্থটি রচিত হইয়াছিল।

প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রামাণিক গ্রন্থাদির তারিখ সম্বন্ধে নানা অনিশ্চয়তা ও পরস্পর-বিরোধী নানা দাবী থাকায় এ বিষয়ে তথ্যাভিজ্ঞ ঐতিহাসিক মহলের সর্বশেষ অভিমত উল্লেখ করিলাম। প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান-সাধনার আলোচনার প্রারম্ভে প্রামাণিক গ্রন্থাদির রচনাকাল সম্বন্ধে সঠিক ধারণা অত্যাবশ্যক।

সংখ্যা ও গণনা-পদ্ধতি ঃ গণিত অর্থ গণনাবিদ্যা। বৈদিক ঋষিগণ গণিত বলিতে সাধারণতঃ পাটীগণিত ও জ্যোতিষকে বুঝিতেন; জ্যামিতি বা রেখাগণিত (ক্ষেত্র গণিত) ছিল কল্পসূত্রের অন্তর্ভুক্ত। সকল প্রকার বিদ্যার মধ্যে গণিত যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, বৈদিক সাহিত্যে এইরূপ উল্লেখ আমরা একাধিক স্থানে দেখিতে পাই। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের মতে গণিতের স্থান সর্বোচ্চ; বেদোক্ত সকল বিদ্যার ইহা শীর্ষস্থানীয়। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের এক জায়গায় আছেঃ

"যথা শিখা ময়ূরাণাং নাগানাং মণয়ো যথা।
তদ্বদ্বেদাঙ্গশাস্ত্রাণাং গণিতং মূর্ধনি স্থিতম্॥"
—বেদাঙ্গ জ্যোতিষ, ৪।

অর্থাৎ ময়ূরের মাথার শিখার মত, সাপের মাথার মণির মত, বেদাঙ্গ নামে অভিহিত সকল বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানে গণিতের অবস্থিতি।

বৈদিক হিন্দুদের গণনাপদ্ধতি দশমিক। মিশরীয়দের মত বিরাট সংখ্যাসমূহ কল্পনা করিবার ক্ষমতা হিন্দুদের এক বিশেষত্ব। হিন্দুরা বিরাট সংখ্যার নানা নামকরণ পর্যন্ত করিয়াছে। যজুর্বেদ সংহিতায় বিভিন্ন সংখ্যার আমরা এইরূপ নামকরণ পাই: এক (১), দশ (১০), শত (১০০), সহস্র (১,০০০), অযুত (১০,০০০), নিযুত (১০০,০০০), প্রযুত (১,০০০,০০০), অর্বুদ (১০,০০০,০০০), ন্যর্বুদ (১০০,০০০,০০০), সমুদ্র (১,০০০,০০০,০০০), মধ্য (১০,০০০,০০০,০০০), অন্ত (১০০,০০০,০০০,০০০) ও পরার্ধ (১,০০০,০০০,০০০,০০০)।

বিভিন্ন ও এইরূপ বিরাট সংখ্যার নামকরণ আর কোন প্রাচীন জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় না। গ্রীকদের গণিতে মিরিয়াড বা ১০,০০০-এর ঊর্ধ্বে কোন সংখ্যার নাম পাওয়া যায় না; অক্ষরের সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশ করিবার দুর্বলতার জন্য বৃহৎ সংখ্যা চিরদিনই গ্রীকদের কল্পনাতীত থাকিয়া গিয়াছে। সাধারণ ব্যবহারিক কাজে অবশ্য সহস্রের উপর সংখ্যা ব্যবহারের বেশী প্রয়োজন হয় না। সেজন্য অযুত, নিযুত, প্রযুত ইত্যাদি ব্যবহারের পরিবর্তে সহস্র বা শতকে আশ্রয় করিয়া বৃহত্তর সংখ্যা প্রকাশ করিবার আর একপ্রকার রীতি দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, পঞ্চাশৎ সহস্রম্ (৫০,০০০), দ্বাসপ্ততি সহস্রাণি (৭২,০০০), ইত্যাদি।

আমরা ১০-এর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি মাত্রার কয়েকটি বিশেষ বিশেষ সংখ্যার নাম দিয়াছি। ইহাদের মধ্যবর্তী নানা সংখ্যা নির্দেশ করিতে যোগ ও বিয়োগ উভয় ধারণারই ব্যবহার করা যায়। 'একাদশ' (১০+১), 'সপ্তবিংশতি' (২০+৭) প্রভৃতি নামকরণে যোগের এবং 'একোন-বিংশতি' (২০−১), 'একোন-ত্রিংশৎ' (৩০−১) প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিয়োগের ব্যবহার অবলম্বিত হইয়াছে। 'একোন-বিংশতি' কথারই অপভ্রংশ 'ঊনবিংশতি' ও 'ঊনবিংশ'।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
I	II	III	X	IX	IIX	IIIX	XX
১০	২০	৪০	৫০	৬০	৭০	৮০	
?	3	33	?33	333	?333	3333	
১০০	২০০	৩০০	১২২	২৭৪			
?I	?II	?III	II3?I	X?333?II			

৪২। খরোষ্ঠী সংখ্যা-লিপি।

মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত শীলমোহরে ও অন্যান্য লিপিতে সংখ্যা লিখিবার যে নমুনা পাওয়া যায় তাহা নিতান্তই প্রাথমিক প্রচেষ্টা বলিয়া অনুমিত হয়। এক বা একাধিক দাঁড়ির সাহায্যে সংখ্যা নির্দিষ্ট হইত। ২০, ৩০, ৪০ প্রভৃতি বড় সংখ্যার জন্য বিশেষ বিশেষ কোন চিহ্ন ব্যবহৃত হইত কিনা তাহা জানা যায় না। মহেঞ্জোদড়োর লিপির পাঠোদ্ধার এখন পর্যন্ত সম্ভবপর হয় নাই। ইহার পর ভারতে ব্যবহৃত প্রাচীনতম সংখ্যালিপির যে নমুনা পাই তাহা

হইল খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মী। অশোকের শিলালিপিতে এই উভয়বিধ সংখ্যালিপির প্রচুর নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রাচীন গান্ধার দেশে (আধুনিক পূর্ব-আফ্গানিস্তান ও উত্তর-পাঞ্জাব) খরোষ্ঠী লিপির প্রচলন ছিল। এই লিপি দক্ষিণ হইতে বামে লিখিবার রীতি। অশোকের শিলালিপিতে এই লিপির যে নমুনা দেখা যায়, তাহার অনেক উন্নতি আমরা লক্ষ্য করি শক, পার্থিয়ান ও কুশানদের আমলের খরোষ্ঠী লিপিতে। এই সময়ের উন্নত খরোষ্ঠী সংখ্যা লিপির একটি নমুনা (৪২নং চিত্র) দেওয়া হইল। এই লিপির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ৪ সংখ্যা লিখিবার মধ্যে। পূর্বে এই লিপিতে ৪ লিখা হইত শুধু পর পর চারিটি দাঁড়ির সাহায্যে (।।।।); এখন সম্পূর্ণ একটি নূতন প্রতীকের উদ্ভব হইয়াছে। ইহার সহিত ব্রাহ্মী ৪-এর '+' বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ৯ সংখ্যার কোন নমুনা পাওয়া যায় নাই; ডাঃ দত্ত ও সিংহ অনুমান করেন ইহা সম্ভবতঃ লেখা হইত ।××। তারপর দশ লিখিবার জন্য কেন একটি ভিন্ন প্রতীক ব্যবহারের প্রয়োজন হইল এবং × ও । প্রতীকদ্বয় ব্যবহার করিয়া কেন ইহা ।।×× ভাবে লেখা হইল না তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। খরোষ্ঠী সংখ্যা যৌগিক নিয়ম অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। সব শেষের সংখ্যার দৃষ্টান্ত ধরা যাক্। ২৭৪-এর অর্থ ঃ ৪+৭০+২০০ (দক্ষিণ হইতে বামে লিখিলে, কারণ খরোষ্ঠীর উহাই রীতি)। সুতরাং

$$\times + {}^{7}333 + \,?\,\text{II} = \times{}^{7}333?\text{II}$$

খরোষ্ঠী বিদেশী লিপি। ভারতবর্ষে ইহার প্রবর্তনের কাল অজ্ঞাত। পারসিক রাজ

	অশোক লিপি	নানাঘাট লিপি	নাসিক লিপি		অশোক লিপি	নানাঘাট লিপি	নাসিক লিপি
১	।	—	—	৮০		∞	
২	॥	=	=	৯০			
৩			≡	১০০		ꟸ	ൗ
৪	+	¥ ¥	¥ ⅄	২০০	⋎.⋎.E	H	ൗ
৫			ɦ ⅃	৩০০		ⱶ	
৬	ϵ ϵ	φ	५	৪০০		⋊	
৭		?	7	৫০০			ൗ
৮			५ ५	৭০০		ൗ	
৯		?	?	১০০০		T	ၑ
১০		α α α	α α	২০০০			ၑ
২০		O	Θ	৩০০০			ၑ
৩০				৪০০০		Tⲩ	ၑ+
৪০			⋌	৬০০০		Tφ	
৫০	G.J			৮০০০			ၑ५
৬০		٦		১০০০০		Tα	
৭০			ϒ	২০০০০		TO	

৪৩। ব্রাহ্মী সংখ্যা-লিপি।

দরায়ুসের (বা দারয়বোষের) (খৃঃ পূঃ ৫২২—৪৮৬) পাঞ্জাব বিজয়ের পর এদেশে খরোষ্ঠীর প্রচলন অনেকে অনুমান করেন।

খরোষ্ঠী লিপির পাশাপাশি আমরা ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহারও দেখিতে পাই। ভারতের

নানা স্থান হইতে বিভিন্ন সময়ের ব্রাহ্মী সংখ্যা লিপির যে সব নমুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে অবশ্য কোন সমতা পওয়া যায় না এবং তাহা আশা করাও অসংগত। কালের ব্যবধানে ও ভৌগলিক স্বাতন্ত্র্যের জন্য এই লিপির যথেষ্ট প্রভেদ ঘটিয়াছে। খৃীঃ পূঃ তৃতীয় বা চতুর্থ শতকে অশোকের শিলালিপিতে, মধ্যভারতে পুণার ৭৫ মাইল দূরে নানাঘাট পাহাড়ের গুহাভ্যন্তরে (খৃীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক) ও বোম্বাই প্রদেশের নাসিক জিলার এইরূপ আর একটি গুহায় (খৃীষ্টাব্দ প্রথম ও দ্বিতীয় শতক) ব্রাহ্মী সংখ্যা লিপির কিছু নমুনা পাওয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মীলিপি বাম হইতে দক্ষিণে লিখিবার রীতি, খরোষ্ঠীর ঠিক বিপরীত। প্রাচীনতম খরোষ্ঠী ও সেমিটিক সংখ্যা লিপিতে আমরা শুধু ১, ১০, ২০, ও ১০০-র জন্য পৃথক পৃথক প্রতীকের ব্যবহার লক্ষ্য করি। ব্রাহ্মীতে ১, ৪ হইতে ৯, ১০, ২০, ৩০, ৪০, ৫০, ৬০, ৭০, ৮০, ৯০, ১০০, ২০০, ১০০০, ২০০০ ইত্যাদি প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক ব্যবহৃত হইত। ১০, ২০, ১০০, ২০০ ইত্যাদি সংখ্যার প্রতীক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, শূন্যের ব্যবহার ও দশমিক স্থানিক অংকপাতন পদ্ধতির আবিষ্কার তখন পর্যন্ত সংঘটিত হয় নাই।

খরোষ্ঠীর মত মধ্যবর্তী নানা যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশ করিবার জন্য যৌগিক নিয়মের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, উপরিউক্ত তালিকায় নানাঘাট লিপি অনুযায়ী,

২৮৯ = ২০০ + ৮০ + ৯ = Ƕ ⍵ ~

প্রাচীন ভারতীয় সংখ্যা লিপি বিবর্তনের ইতিহাস যাহারা বিশদভাবে জানিতে আগ্রহী তাহাদের ডাঃ দত্ত ও সিংহের *History of Hindu Mathematics* এবং স্মিথ্ ও কার্পিনস্কির *The Hindu Arabic Numerals* পড়িতে অনুরোধ করি।

পাটীগণিত: সংখ্যা সম্বন্ধে যে জাতি সুদূর অতীতে এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল, পাটীগণিতে তাহারা যে নানা স্বকীয়তার পরিচয় দিবে ইহা সহজেই অনুমেয়। আমরা এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিব। প্রথমে সমান্তর প্রগতির (aritmatic progression) কথা ধরা যাক। তৈত্তিরীয় সংহিতায় কাব্যাকারে রচিত কয়েকটি স্থানে আমরা নিম্নলিখিত প্রগতির উল্লেখ পাই *ঃ—

১, ৩, ৫,······১৯, ২৯, ৩৯,···৯৯
২, ৪, ৬,······২০
৪, ৮, ১২,······২০,
৫, ১০, ১৫,······১০০,
১৯, ২০, ৩০,······১০০,

সমান্তর প্রগতিগুলিকে আবার যুগ্ম ও অযুগ্ম দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইত। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে একটি গুণোত্তর প্রগতির (geometric progression) দৃষ্টান্ত আছেঃ

২৪, ৪৮, ৯৬, ১৯২···৪৯১৫২, ৯৮৩০৪, ১৯৬৬০৮, ৩৯৩২১৬

শ্রৌতসূত্রে এই প্রগতিটি পুনরুল্লিখিত হইয়াছে।

সমান্তর বা গুণোত্তর প্রগতির যোগফল নির্ণয়ের পদ্ধতি বৈদিক হিন্দুরা জানিতেন। শতপথ ব্রাহ্মণে সমান্তর প্রগতির যোগফল নির্ণয়ের একটি দৃষ্টান্ত আছে

---

* *The Cultural Heritage of India,* Vol. 3, রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত: ডাঃ বিভূতিভূষণ দত্তের' Vedic Mathematics' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

[৩×(২৪+২৮+৩২+...৭টি রাশি পর্যন্ত)=৭৫৬]। একটি বর্গ সংখ্যাকে কিরূপে একটি সমান্তর প্রগতিতে রূপান্তরিত করিতে হয় বোধায়ন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।

সহজ ভগ্নাংশের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের সহিত বৈদিক হিন্দুরা পরিচিত ছিলেন। শুল্বসূত্রে লিপিবন্ধ ভগ্নাংশ গণিতের কয়েকটি নমুনা হইতে তাহা প্রমাণিত হয়।

$$৭\frac{১}{২} \div \frac{২}{৫} = ১৮\frac{৩}{৪}\,;$$

$$\left(২\frac{২}{৭}\right)^{২} + \left(\frac{১}{২} + \frac{১}{১২}\right)\left(১ - \frac{১}{৮}\right) = ৭\frac{১}{৬}\,;$$

$$\sqrt{৭\frac{১}{৯}} = ২\frac{২}{৩}\,;$$

$$৭\frac{১}{২} \div \frac{১}{১৫} \text{ এর } \frac{১}{২} = ২২৫\,।$$

দৃষ্টান্তগুলি অবশ্য আধুনিক গাণিতিক পদ্ধতিতে লিখিত হইল। উপরিউক্ত দৃষ্টান্তের তৃতীয়টিতে বর্গমূলের জ্ঞান সুপরিস্ফুট। বর্গমূল নির্ণয়ে ও অমূলদ রাশির ব্যবহারে বৈদিক হিন্দুরা নিঃসন্দেহে তদানিন্তন অপরাপর জাতির তুলনায় অনেক বেশী অগ্রগামী ছিলেন। বোধায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন প্রমুখ বৈদিক ঋষিগণের শুল্বসূত্রে $\sqrt{২}$, $\sqrt{৩}$ প্রভৃতি অমূলদ রাশির বর্গমূল নির্ভুলরূপে বাহির করিবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। জ্যামিতিক পদ্ধতিতে বর্গক্ষেত্রকে নানাভাবে ভাগ করিয়া নির্ণীত $\sqrt{২}$ ও $\sqrt{৩}$ অমূলদ রাশির স্থূলমান হইলঃ—
দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করিলে

$$\sqrt{২} = ১ + \frac{১}{৩} + \frac{১}{৩.৪} - \frac{১}{৩.৪\ ৩.৪} = ১\cdot৪১৪২১$$

$$\sqrt{৩} = ১ + \frac{২}{৩} + \frac{১}{৩.৫} - \frac{১}{৩.৫\ ৫২} = ১\cdot৭:৪৬২$$

বীজগণিতঃ বেদী নির্মাণ বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের একটি অপরিহার্য অংগ ছিল। বেদী নির্মাণ হইতে যে শুধু হিন্দু জ্যামিতির উদ্ভব তাহা নহে, ইহা বীজগণিতের প্রাথমিক বিকাশের জন্যও দায়ী। বেদী সংক্রান্ত জ্যামিতিক সমস্যা হইতে উদ্ভূত একঘাত ও দ্বিঘাত সমীকরণ এবং নির্ণেয় ও অনির্ণেয় সহ-সমীকরণ সমাধানের ব্যাপারে বৈদিক হিন্দুরা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়। জ্যামিতিক পদ্ধতিতে এই সব সমীকরণের সমাধান বাহির করা হইত। শুল্বসূত্রে ও বাখ্শালী পান্ডুলিপিতে একঘাত, দ্বিঘাত ও সহ-সমীকরণ সমাধানের অনেক নজির আছে। একঘাত সমীকরণের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছেঃ—"প্রথম রাশিটি অজ্ঞাত; দ্বিতীয় রাশি প্রথম রাশির দ্বিগুণ; তৃতীয় রাশি দ্বিতীয়ের তিন গুণ; চতুর্থ রাশি তৃতীয়টির চার গুণ; এখন চারিটি রাশির যোগফল ১৩২ হইলে, প্রথম অজ্ঞাত রাশিটি কত?" আধুনিক পদ্ধতিতে অজ্ঞাত রাশিকে x ধরিয়া সমীকরণটি লিখিলে তাহা দাঁড়ায়ঃ—

$$x+2x+6x+24x=132$$

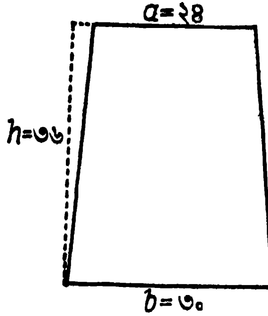
বেদীর ক্ষেত্র সংক্রান্ত পরিবর্তন সাধন করিতে হইলে কিরূপে বিভিন্ন মাত্রার সমীকরণ সমস্যার উদ্ভব হয় তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। মনে করা যাক, একটি প্রদত্ত বর্গক্ষেত্রকে (বাহু$=a$) একটি আয়ত ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করিতে হইবে যাহার একটি বাহু হইতেছে b; আয়ত ক্ষেত্রের অপর বাহু x কত? অর্থাৎ আমাদের

$$bx=a^2$$

একঘাত সমীকরণটি সমাধান করিতে হইবে।

বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে 'মহাবেদী'র প্রায়ই উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মহাবেদী আসলে

একটি সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়ম, ইহার দুই সমান্তরাল বাহুর দৈর্ঘ্য ২৪ ও ৩০ এবং উচ্চতা ৩৬। এখন এই সমান্তরাল বাহুদ্বয় ও উচ্চতাকে সমান অনুপাতে, অর্থাৎ x গুণ বাড়াইলে



৪৪। সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়ম।

ট্রাপিজিয়মের ক্ষেত্রফল যদি m বর্ধিত হয়, তবে x ও m-এর সম্পর্ক কিরূপ? অর্থাৎ দেখাইতে হইবে যে,

$$36x \times \frac{(24x+30x)}{2} = 36\frac{(24+30)}{2} + m$$

ভাঙ্গিয়া সহজ করিয়া লিখিলে উপরিউক্ত সমীকরণটি দাঁড়ায়

$$972x^2 = 972 + m$$

ইহা একটি দ্বিঘাত সমীকরণ। শতপথ ব্রাহ্মণে m-এর কতকগুলি বিশেষ মান ধরিয়া এইরূপ দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান করা হইয়াছে।

জ্যামিতিঃ উপরিউক্ত আলোচনা বৈদিক হিন্দুদের জ্যামিতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পরিচায়ক। ট্রাপিজিয়মের ক্ষেত্রফল $h(a+b)/2$ জানা না থাকিলে এইরূপ সমীকরণে পৌঁছানো অসম্ভব। বৈদিক যুগে জ্যামিতির নাম ছিল 'শুল্ব'। শুল্বকারগণ ঋজুরেখার ক্ষেত্র (rectilineal figure) রচনায়, ক্ষেত্রফল ও ঘনফল নিরূপণে, বৃত্তকে বর্গে পরিণত করিতে (squaring the circle) বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। শুল্বশাস্ত্রে বৈদিক হিন্দুদের পারদর্শিতা ও বৌধায়ন, আপস্তম্ব প্রমুখ শুল্বকারগণের নানা উক্তি বিশ্লেষণ করিয়া গণিতের অনেক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক মনে করেন, তথাকথিত পিথাগোরীয় উপপাদ্য হিন্দুদের আবিষ্কার। এই উপপাদ্য হইল, সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল উহার অপর বাহুদ্বয়ের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান। আপস্তম্ব, বৌধায়ন, কাত্যায়ন প্রমুখ প্রখ্যাত বৈদিক শুল্বকারগণ এই উপপাদ্যকে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেনঃ—"একটি আয়ত ক্ষেত্রের কর্ণ যে বর্গক্ষেত্র উৎপন্ন করে তাহার ক্ষেত্রফল আয়তক্ষেত্রের বাহুদ্বয়ের উপর উৎপন্ন বর্গক্ষেত্রের মিলিত ক্ষেত্রফলের সমান।" হ্যাঙ্কেল, ইয়ুঙ্গে (Junge) প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মতে পিথাগোরাস তাঁহার নামে প্রচলিত উপপাদ্যের প্রথম আবিষ্কর্তা নহেন। স্যার টমাস হীথ এই উপপাদ্য আবিষ্কার সম্পর্কে গ্রীস, মিশর, ভারতবর্ষ ও চীনের দাবী চুলচেরা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পিথাগোরাস ইহার আবিষ্কর্তা এইরূপ কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে তাঁহার অভিমত, ভারতবর্ষে এই উপপাদ্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা প্রবল। ডাঃ বিভূতিভূষণ দত্ত বৌধায়নের কাল খ্রীঃ পূঃ ৮০০ অব্দ ধরিয়া মনে করেন, পিথাগোরাসের অনেক পূর্বে হিন্দুরা

এই উপপাদ্যের কথা জানিত। তৈত্তিরীয় সংহিতা ও শতপথ ব্রাহ্মণে এই উপপাদ্যের প্রয়োগ দেখা যায়।*

কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা খুবই কঠিন। কারণ বৌধায়ন, আপস্তম্ব, কাত্যায়ন প্রভৃতি শুল্বকারদের কাল অনিশ্চিত। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যের রচনাকাল সম্বন্ধে বর্তমান ঐতিহাসিকদের অভিমত আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। তাহারা বৈদিক সাহিত্যের এইরূপ প্রাচীনত্ব স্বীকার করিতে নারাজ। বিজ্ঞানের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জর্জ সার্টন এই আবিষ্কার সম্বন্ধে ভারতীয় দাবীর যৌক্তিকতা আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন:—

"Some of the writers quoted below (for example, G Milhaud, 1910) claim that Pythagorean geometry may have been partly inspired by Hindu models. Their argument is based upon the assumption that the high antiquity of Apastamba's work is proved. It is not. The dates of the Sulvasutras (rules of the chord) are so uncertain that I cannot deal with them in this part of the Introduction..It is highly probable that the Sulvasutras date from a period posterior to 500 B. C. and pre-Christian. They are most probably post-Pythagorean." G. Sarton, *Introduction to the History of Science*. Vol. 1, p. 74.

এই কাল নির্ণয় সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের অগ্রাধিকার চিরকাল নিষ্ফল বিতর্কের বিষয় হইয়া থাকিতে বাধ্য।

চীন

চিউ-চ্যাং সুয়ান-শু: চীনে গণিতের গবেষণা ব্যাবিলন, মিশর বা ভারতবর্ষের মতই সুপ্রাচীন। 'চিউ-চ্যাং সুয়ান-শু' (Chiu-chang Suan-shu) বা 'নয় খণ্ডে পাটীগণিত' চীনদেশের প্রাচীনতম গাণিতিক গ্রন্থ। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে চ্যাং সাং (মৃত্যু খ্রীঃ পূঃ ১৫২ অব্দ) নামে এক গণিতজ্ঞ এই পাটীগণিত প্রতিসংস্কার করেন। 'চিউ-চ্যাং সুয়ান-শু'র এই প্রতিসংস্করণটিই এক্ষণে সংরক্ষিত। মূল গ্রন্থটির রচয়িতা কে ও কখন ইহা রচিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু জানা যায় না। চৈনিক লেখকদের ধারণা, খ্রীঃ পূঃ ২৭০০ হইতে ২৬০০ অব্দের ভিতর গ্রন্থটি রচিত হইয়া থাকিবে।

চীনদেশের প্রাচীন গাণিতিক জ্ঞান সম্বন্ধে জানিবার পক্ষে 'চিউ-চ্যাং সুয়ান-শু' যে একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার নয়টি খণ্ডে যথাক্রমে নিম্নোক্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছে:—(১) ক্ষেত্র-জ্যামিতি, ভগ্নাংশ; (২) ত্রৈরাশিক নিয়ম (rule of three) সম্পর্কিত বিবিধ প্রশ্ন; (৩) সম্ভূয়-সমুত্থান (partnership); (৪) বর্গ ও ঘনমূল নির্ণয়; (৫) ঘন-জ্যামিতি; (৬) বিমিশ্র প্রক্রিয়া (allegation); (৭) লাভ-ক্ষতির অঙ্ক; (৮) একাধিক অজ্ঞাত রাশি সম্বলিত একঘাত সমীকরণ; এবং (৯) পিথাগোরীয় উপপাদ্য।†

* ....The Hindu Baudhayana (800 B.C.), in whose *Sulva* we now meet with the general enunciation of the theorem, was much anterior to the Greek Pythagorus. Instances of application of it occur in the *Baudhayana Srauta* and *Sataptha Brahmana* (c 2000 B.C.). There are reasons to believe it to be as old as the *Taittiriya* and other *Samhitas* (c. 3000 B. C.)—"Vedic Mathematics", *Cultural Heritage of India;* p. 385.

† G. Sarton, *Introduction to the History of Science*, Vol. 1, p. 183.

ক্ষেত্র-জ্যামিতির আলোচনা প্রসঙ্গে ত্রিভুজ, ট্রাপিজিয়ম, বৃত্তের ও বৃত্তাংশের ক্ষেত্র নিরূপণের নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপঃ

ত্রিভুজের ক্ষেত্র $= \frac{1}{2}ah$; a = ভূমি ; h = উচ্চতা ;

ট্রাপিজিয়মের ক্ষেত্র $= \frac{1}{2}(a_1+a_2)\,h$; a_1, a_2 = সমান্তরাল বাহুদ্বয়, h = উচ্চতা ;

বৃত্তের ক্ষেত্র $= \frac{1}{4}cd$

অথবা $\frac{3}{4}d^2$

অথবা $\frac{1}{12}c^2$

c = পরিধি,
d = ব্যাস ;

বৃত্তাংশের ক্ষেত্র $= \frac{1}{2}(ch+h^2)$; c = জ্যা, h = উচ্চতা।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, চৈনিকেরা π -এর মান ৩ ধরিয়া বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিত। ঘন-জ্যামিতিতে প্রিজম্, সিলিণ্ডার, পিরামিড, শঙ্কু, কীলক প্রভৃতি ঘনর আয়তন নির্ণয় করিবার নিয়ম আলোচিত হইয়াছে।

'চিউ-চ্যাং'এ আলোচিত বিবিধ প্রশ্নের একটি নমুনা দেওয়া যাইতেছে। ১০ ফুট উঁচু একটি বাঁশের উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া গোড়া হইতে ৩ ফুট দূরে ভূমি স্পর্শ করিলে, ভূমি হইতে কতদূর উচ্চে বাঁশটি ভাঙ্গিয়াছে? উচ্চতার মান x ধরিলে উত্তর দেওয়া হইয়াছে এইরূপঃ—

$$x=\frac{10}{2}-\frac{3^2}{2\times 10} \quad *$$

ভারতীয় গণিতজ্ঞ ব্রহ্মগুপ্ত (জন্ম—খৃঃ অঃ ৫৯৮) এই ধরনের অনেক প্রশ্নের আলোচনা করেন।

আর একটি বিবিধ প্রশ্নে, বর্গাকৃতি একটি সহরের চারি সীমার ঠিক মধ্যস্থলে একটি করিয়া তোরণ আছে। উত্তর সীমান্তবর্তী তোরণটির ২০ গজ উত্তরে একটি বৃক্ষ অবস্থিত: দক্ষিণ তোরণ হইতে ১৪ গজ দক্ষিণের এক স্থান হইতে এবং এইখান হইতে আবার বরাবর পশ্চিমদিকে ১৭৭৫ গজ হাঁটিয়া যেখানে পেঁছানো যায়, সেই স্থান হইতে বৃক্ষটিকে দেখা যায়। বর্গাকৃতি সহরটির ভুজের দৈর্ঘ্য কত? সমস্যাটি একটি দ্বিঘাত সমীকরণকে নির্দেশ করিতেছে। সমীকরণটি হইতেছে এইরূপঃ

$$x^2+(20+14)\,x-2\times 10\times 1775=0 \quad \dagger$$

দেখা যাইতেছে চৈনিক গণিতজ্ঞরা এই সময় দ্বিঘাত সমীকরণের সহিত পরিচিত ছিল। তারপর ধনাত্মক ও ঋণাত্মক সংখ্যাও তাহাদের ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

সান-ৎজু সুয়ান-চিংঃ চ্যাং সাং-এর পর উল্লেখযোগ্য চৈনিক গণিতজ্ঞ হইলেন সান-ৎজু। ইনি খৃষ্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে জীবিত ছিলেন এবং 'সান-ৎজু সুয়ান-চিং' বা 'সান্-ৎজুর পাটীগণিত' নামে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। এই পাটীগণিত 'চিউ-চ্যাং' অপেক্ষা অনেক বেশী প্রণালীবদ্ধ। তিন খণ্ডে গ্রন্থটি সমাপ্ত। আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে অনির্ণেয়

* F. Cajori, *A History of Mathematics*, Macmillan, 1926, p. 72.
† Cajori, *loc. cit.*

সমীকরণ, সংখ্যা, ওজন ও পরিমাপ-পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য। একটি খণ্ডে পদার্থের ঘনত্ব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে।

পরবর্তী চৈনিক গণিতজ্ঞদের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। গ্রীকদের আবির্ভাবের পূর্বে ব্যাবিলনীয়, মিশরীয় ও বৈদিক হিন্দুদের সমসময়ে চৈনিকদের গাণিতিক জ্ঞান কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার চেষ্টা করিলাম। ইহা জানিবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য সূত্র 'চিউ-চ্যাং সুয়ান-শু'। কিন্তু চ্যাং সাং-এর সংস্করণে গ্রন্থের প্রাচীনতম অংশগুলি যথাযথভাবে কতদূর সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহা বলা কঠিন। ইহাতে পরবর্তী কালের উন্নততর জ্ঞান যে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে?

৩.৪। জ্যোতির্বিদ্যার আদি ইতিহাস

ব্যাবিলন

আমরা বলিয়াছি প্রাচীনকালে পৃথিবীর সর্বত্র গণিত চর্চার এক প্রধান অনুপ্রেরণা ছিল জ্যোতিষ। এই জ্যোতিষ আবার কৃষি-নির্ভর অর্থনীতি হইতে উদ্ভূত। গম, বার্লি প্রভৃতি শস্যের চাষ এবং এই চাষের উন্নতিকল্পে খাল কাটিয়া তাইগ্রিস্-ইউফ্রেতিস্ নদীর জলের সাহায্যে উপত্যকায় নিয়মিত সেচের ব্যবস্থা প্রাচীন সুমের ও মেসোপোটেমিয়ার সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ। এই ধরনের আবর্তমান তৎপরতার জন্য কালের হিসাব রাখা অত্যাবশ্যক। কখন ঋতু পরিবর্তন হইতেছে, কখন বৎসর ঘুরিয়া যাইতেছে, তাহা নিরূপণের উপায় জানা না থাকিলে কৃষি-নির্ভর অর্থনীতির সাফল্য সুদূরপরাহত। প্রাথমিক জ্যোতির্বিদ্যার আবির্ভাবের পক্ষে ইহা বড় অনুকূল অবস্থা।

দিন, মাস ও বৎসর: সময় নিরূপণে দিন ও রাত্রির পরিবর্তন প্রথম হইতেই এক অতি নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত হইয়াছিল। সূর্যের উদয়াস্ত কালের গতি সম্বন্ধে মানুষকে প্রথম সচেতন করিয়া তোলে। ইহা অপেক্ষা দীর্ঘতর মাপকাঠি বা এককের যখন প্রয়োজন হইল তখন ধীরে ধীরে চন্দ্রকলার নিয়মিত হ্রাসবৃদ্ধির প্রতি তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। ক্রমশঃ চন্দ্রকলার পর্যায়-কাল সম্বন্ধে মানুষের নিশ্চিত ধারণা জন্মিল। এক অমাবস্যা হইতে আর এক অমাবস্যায় পৌঁছিতে সূর্যের যে ৩০ বার উদয়াস্ত ঘটে ইহা সম্ভবতঃ বহু বৎসরের দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের ফল। চন্দ্রের পর্যায়-কাল নিরূপিত হইবার পর ঋতু-পরিবর্তনের হিসাব রাখা অনেক সহজসাধ্য হইল। এক শীত গিয়া আর এক শীত আসিতে সূর্যের কতবার উদয়াস্ত হয় তাহার হিসাব না রাখিয়া কতবার অমাবস্যা হয় তাহার হিসাব রাখা অনেক বেশী সহজ। এইভাবে ধীরে ধীরে প্রাচীন কৃষি-নির্ভর জাতিদের মধ্যে সর্বাগ্রে দিন, মাস ও বৎসরের ধারণা জন্মিয়াছিল।

খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দেরও পূর্ব হইতে ব্যাবিলনীয়দের যে পঞ্জিকা ব্যবহার করিতে দেখা যায়, তাহাতে ৩০ দিনে এক মাস ও ১২ মাসে বা ৩৬০ দিনে এক বৎসর নির্ধারিত হইয়াছিল। আমরা এখন জানি, রবিমার্গে সূর্যের একবার ঘুরিয়া আসিবার জন্য, আরও সঠিকভাবে বলিতে গেলে পৃথিবীর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিবার জন্য, ঋতু-পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। এই প্রদক্ষিণের পর্যায়-কাল ৩৬০ দিন নহে, ইহা ৩৬৫.২৪২২ দিন। চন্দ্রের পর্যায়-কালের ভিত্তিতে বৎসরের হিসাব রাখিতে গেলে কয়েক বৎসর পরেই দেখা যাইবে ঋতুর আবির্ভাবের সময় বিশৃঙ্খলভাবে আগাইয়া বা পিছাইয়া যাইতেছে, কিছুতেই তাহাদের ৩৬০ দিনের বৎসরের গণ্ডীর মধ্যে ধরিয়া রাখা যাইতেছে না। এই বিরক্তিকর অসুবিধা সম্বন্ধে ব্যাবিলনীয়রা অতি প্রাচীন কাল হইতেই অবহিত হইয়াছিল। সৌর বৎসরের সহিত চান্দ্র বৎসরের অসঙ্গতি দূর করিবার জন্য তাহারা কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর একটি করিয়া মলমাস

প্রযোজনার কৌশল বাহির করে; অর্থাৎ মাঝে মাঝে ১৩ মাসে বৎসর ধার্য করিবার বিধি বলবৎ করা হয়। এই মলমাসে সর্বপ্রকার ধর্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ। কোন্ বৎসর মলমাস যোজনা করিতে হইবে তাহা স্বয়ং রাজা রাজপুরোহিতের পরামর্শ অনুযায়ী নির্দিষ্ট করিতেন।

পর্যবেক্ষণের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাবিলনীয়রা ঠিক কয়দিনে এক চান্দ্রমাস হয় তাহা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়। খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দে নবরিয়াম্নু ও খ্রীঃ পূঃ ৩৮৩ অব্দে কিদিন্নু চান্দ্রমাসের যে হিসাব দেন তাহার সহিত অধুনা নির্ণীত হিসাবের আশ্চর্য মিল আছে।

নবরিয়াম্নু (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দ)—২৯·৫৩০৬১৪ দিন
কিদিন্নু (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩৮৩ অব্দ)—২৯.৫৩০৫৯৪ দিন
আধুনিক হিসাব —২৯·৫৩০৫৯৬ দিন

রাশিচক্র ঃ সূর্য ও চন্দ্রের আপাত আহ্নিক গতি ছাড়া আকাশে স্থির নক্ষত্রদের অনুপাতে ইহাদের যে আর একপ্রকার গতি আছে ব্যাবিলনীয় নক্ষত্রদর্শকেরা এই সত্য আবিষ্কার করিয়াছিল। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় সূর্য চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ যেন আকাশে একটি বিশেষ পথে পৃথিবীকে কেহ দ্রুতগতিতে কেহ ধীরে পরিক্রমণ করিতেছে। এই পরিক্রমণ পথে যে সব তারকা বা তারামণ্ডলের অবস্থিতি, তাহাদের চিহ্নিত ও বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়া ব্যাবিলনীয় জ্যোতির্বিদেরা একটি রাশিচক্রের পরিকল্পনা করিয়াছিল। সূর্য বৎসরে একবার রাশিচক্রকে সম্পূর্ণ ঘুরিয়া আসে; সুতরাং ইহাকে সমান বার ভাগে ভাগ করিলে প্রতি মাসে রাশিচক্রে সূর্যের অগ্রগতি নির্দিষ্ট হইয়া যায়। এক একটি ভাগের প্রধান তারকা বা তারামণ্ডল লক্ষ্য করিয়া ও পরিচিত জন্তুজানোয়ারের সহিত তারামণ্ডলের সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া কোন ভাগের নাম বৃষ, কোন ভাগের কর্কট, কোন ভাগের বৃশ্চিক ইত্যাদি দেওয়া হইল। নিতান্তই কল্পনাপ্রসূত এই নামগুলি কাল সহকারে লোকের মনে এমনই গাঁথিয়া যায় যে, রাশিচক্রের তারামণ্ডলের সেই পুরাতন নাম আজও চলিয়া আসিতেছে। কোন কোন স্থানে জন্তুজানোয়ারের পরিবর্তে সে দেশের পৌরাণিক গল্পের বীরদের বা দেব-দেবীর নামে তারামণ্ডলগুলিকে উৎসর্গ করিতে দেখা যায়। এইরূপ নামকরণের ধরন জ্যোতির্বিদ্যার সুপ্রাচীনত্বের আর একটি প্রমাণ।

সপ্তাহ ও বার ঃ ব্যাবিলনীয়দের আর একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার সপ্তাহ ও বার। সপ্তাহ আবিষ্কারের পূর্বে তাহারা মাসকে সম্ভবতঃ ৬ ভাগে ভাগ করিয়াছিল। এক এক ভাগে পাঁচদিন। পরে ৭ দিনে একটি সপ্তাহ ধরিয়া মাসকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করিয়া লয়। ৭টি গ্রহ আবিষ্কারের সঙ্গে সপ্তাহের ধারণা যে তাহাদের মাথায় আসিয়াছিল তাহা সুনিশ্চিত। উপরন্তু ৭ সংখ্যাকে তাহারা যাদুশক্তিসম্পন্ন একটি বিশেষ সংখ্যা জ্ঞান করিত। সপ্তাহের এক একটি দিন এক একটি দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল; এই দেবতারা এক একটি গ্রহ। সপ্তাহের ৭ দিনের নামকরণ কিভাবে হইয়াছিল এবং তাহার পর্যায়-কাল কিরূপে নির্ণীত হইত তাহা বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক। গ্রহ ও গ্রহদের অধিপতি ব্যাবিলনীয় দেবতাদের নাম হইলঃ

গ্রহ—	শনি	বৃহস্পতি	মঙ্গল	রবি	শুক্র	বুধ	চন্দ্র
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
ব্যাবিলনীয় দেবতা--	নিনিব	মার্দুক	নের্গাল	শামাশ	ইশ্তার	নাবু	সিন্
	(মড়ক)	(রাজা)	(যুদ্ধ)	(ন্যায়)	(প্রেম)	(লেখন)	(কৃষি)

পৃথিবী হইতে গ্রহদের আপাত-দূরত্ব হিসাবে উল্টা দিক হইতে গ্রহগুলিকে সাজানো হইয়াছে।

ব্যাবিলনীয়রা দিনকে ২৪ ঘণ্টায় ভাগ করিয়াছিল। উপরিউক্ত দেবতারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রতি ঘণ্টার উপর নজর রাখিত। একটি নূতন দিন আরম্ভের প্রথম ঘণ্টায় যে দেবতার

পাহারা দিবার কথা তাহার নামে সেই দিন উৎসর্গ করা হইত। উদাহরণস্বরূপ, শনিবারের প্রথম ঘণ্টার পাহারাদার শনিগ্রহ বা নিনিব দেবতা (১), পরের ঘণ্টার দায়িত্ব বৃহস্পতির (২), তার পরের ঘণ্টার মঙ্গলের (৩), ইত্যাদি।

ঘণ্টা	১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭	৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪	১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১
পাহারাদার দেবতা	১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭	১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭	১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
ঘণ্টা	২২ ২৩ ২৪ ২৫		
পাহারাদার দেবতা	১ ২ ৩ ৪		

উপরের হিসাবের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে শনিবারের সর্বশেষ ঘণ্টার ভার পড়িয়াছে মঙ্গলগ্রহের উপর। সুতরাং পরের দিনের প্রথম ঘণ্টার দায়িত্ব রবির: অতএব পরের দিন রবিবার। এইভাবে হিসাব করিলে পর পর বারের নামগুলি পাওয়া যাইবে।*

পঞ্জিকা রচনায় বারের কোন জ্যোতিষীয় গুরুত্ব নাই। কিন্তু কাল সহকারে মানুষের জীবনযাত্রার সহিত ইহা এমনভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছে যে, মাস, বর্ষের মত ইহাও কাল নিরূপণের এক প্রধান মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত। বর্তমানে বহুগুণ উন্নত জ্যোতিষীয় জ্ঞান অবলম্বনে অনেক সহজ ও বিজ্ঞানসম্মত পঞ্জিকা রচনা সম্ভবপর হইলেও বারের কুসংস্কার তাহার এক প্রধান অন্তরায়।

গ্রহ-গতি ঃ গ্রহদের গতি-সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ব্যাবিলনীয় নক্ষত্রদর্শকেরা অতি নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে। তাহাদের আমলে নির্ভুলভাবে সময় নিরূপণের কোন নির্ভরযোগ্য যন্ত্র ছিল না। ব্যাবিলনীয়রা অবশ্য জলঘড়ি ও সূর্যঘড়ির ব্যবহার জানিত, কিন্তু এইরূপ ঘড়ির সাহায্যে দিনের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের নির্ভুল হিসাব করা রীতিমত এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। ইহা সত্ত্বেও গ্রহদের গতি, সেই গতির নানা বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তাহারা যে সব তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিল তাহা আশ্চর্যরূপে নির্ভুল পর্যবেক্ষণের পরিচায়ক। শুক্র গ্রহ আট বৎসরে পাঁচবার দিগন্তের অবিকল ঠিক একই জায়গায় দেখা দেয়, ব্যাবিলনীয় নক্ষত্রদর্শকেরা খৃষ্টজন্মের প্রায় দুই হাজার বৎসর আগে এই প্রকার তথ্য আবিষ্কারে সফলকাম হয়। ঠিক কতদিনে চান্দ্রমাস হয় তাহা একটু আগে উল্লেখ করিয়াছি। এইরূপ আর দুইটি গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষীয় আবিষ্কার হইল, গ্রহণ সংঘটিত হইবার কাল পূর্বাহ্নে নির্ণয় করিবার পদ্ধতি ও ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন-চলনের আবিষ্কার।

সূর্যগ্রহণ ও সারোণিক পর্যায়-কাল ঃ আমরা জানি সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে চন্দ্র আসিয়া পড়িয়া সূর্যকে সাময়িকভাবে আড়াল করিবার জন্যই সূর্যগ্রহণ ঘটিয়া থাকে। সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র যদি একই সমতলক্ষেত্রের উপর অবস্থিত থাকিয়া পরিক্রমণ করিত, তবে প্রতি মাসেই অমাবস্যায় একবার করিয়া সূর্যগ্রহণ হইত। কিন্তু তাহা হয় না, কারণ পৃথিবী ও চন্দ্রের পরিক্রমণ-পথ একই সমতলক্ষেত্রের উপর অবস্থিত নহে। ব্যাবিলনীয়রা আবিষ্কার করে, ৬৫৮৫ দিনের বা ১৮ বৎসর ১১⅓ দিনের ব্যবধানে সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়। সূর্যগ্রহণের এই পর্যায়-কালের নাম 'সারোণিক পর্যায়-কাল' (Saronic Cycle) বা সংক্ষেপে 'সারোস'। সারোণিক পর্যায়-কাল আবিষ্কারের ফলে ব্যাবিলনীয় জ্যোতির্বিদেরা সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিত। গ্রীকরা ব্যাবিলনীয়দের কাছ হইতে এই পদ্ধতি শিক্ষা করে এবং সম্ভবতঃ এই পদ্ধতিবলেই প্রসিদ্ধ গ্রীক বিজ্ঞানী থালেস্ সূর্যগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিতেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই ও

* M. N. Saha, *The Reform of the Indian Calendar* (a pamphlet), Indian Science News Association, 1952, p. 18.

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট যে সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা সারোশিক পর্যায়-কালের একটি আধুনিক দৃষ্টান্ত।*

ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন-চলন : ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন-চলনের (precision of the equinoxes) আবিষ্কার সম্পর্কে যদিও গ্রীক জ্যোতির্বিদ হিপার্কাসের (খ্রীঃ পূঃ ১৯০-১২০) নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত, হিপার্কাসের প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে ব্যাবিলনীয় জ্যোতির্বিদ্ কিদিন্নু এই গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষীয় আবিষ্কারটি করিয়াছিলেন। কয়েক সহস্র বৎসর যাবৎ নিরবচ্ছিন্নভাবে গৃহীত জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণের ফল মিলাইতে গিয়া কিদিন্নু লক্ষ্য করেন যে, আকাশে নক্ষত্রদের অবস্থান প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই সমানভাবে কিছুটা বদলাইয়া গিয়াছে। ইহাতে তাঁহার প্রত্যয় হয়, ক্রান্তিবিন্দুদ্বয় ক্রমশঃ সরিয়া যাইতেছে। হিপার্কাস্ কিদিন্নুর আবিষ্কারের কথা জানিতেন কিনা তাহা বলা যায় না, তবে ব্যাবিলনীয় নক্ষত্র-তালিকা পরীক্ষা করিবার কালে তিনিও যে এই সত্য উপলব্ধি করেন তাহা একপ্রকার সুনিশ্চিত। হিপার্কাস্ ও কোপার্নিকাসের জ্যোতিষীয় গবেষণা আলোচনা প্রসঙ্গে ক্রান্তি-বিন্দুর অয়ন-চলনের কথা আবার বিবৃত হইবে।

নির্ভুল পর্যবেক্ষণ ছাড়া এই প্রকার জ্যোতিষীয় জ্ঞানের আর একটি প্রধান কারণ এই যে, ধারাবাহিকভাবে পরম নিষ্ঠার সহিত ব্যাবিলনীয় নক্ষত্রদর্শকেরা জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ৭৪৭ অব্দে নবোনসোরের রাজত্বকাল হইতে খ্রীষ্টীয় ১০০ অব্দ পর্যন্ত একটানা পর্যবেক্ষণ গ্রহণের ও সেই পর্যবেক্ষণ সারণীর আকারে লিপিবদ্ধ করিবার এক দৃষ্টান্ত ঐতিহাসিকগণ আবিষ্কার করিয়াছেন। খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দেরও পূর্ব হইতে ধারাবাহিকভাবে গৃহীত জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণের কতকগুলি মৃন্ময় লিপি সুমেরের এক মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে। হাম্মুরাবির (খ্রীঃ পূঃ ২০০০) এক অনুশাসনে দেখা যায়, ব্যাবিলনের রাজারাই ছিল জ্যোতিষীয় তৎপরতার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। রাজার আদেশে জ্যোতির্বিদ্ ও নক্ষত্রদর্শকেরা নিযুক্ত হইত; তাহাদের কার্য ছিল নিয়মিতভাবে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান ও গতি পর্যবেক্ষণ করিয়া যাওয়া, মাস, বৎসর, ঋতু প্রভৃতি আবির্ভাবের কথা রাজার নিকট জ্ঞাপন করা এবং পঞ্জিকা প্রণয়ন ও সংস্কারসাধনে তাঁহাকে সাহায্য করা। অনেক ক্ষেত্রে রাজা নিজেই ছিলেন রাজ্যের সর্বোচ্চ পুরোহিত ও জ্যোতির্বিদ্।

ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনা : পর্যবেক্ষণের এইরূপ উন্নতি সত্ত্বেও ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনায় ব্যাবিলনীয়রা সেই অনুপাতে বিশেষ কোন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে নাই। তাহাদের ধারণা ছিল, পৃথিবী একটি বদ্ধ বাক্সের মত; এই বাক্সের মধ্যস্থলে পৃথিবীর ভূভাগ; এই ভূভাগের কেন্দ্রদেশ হইতে একটি বিরাট পাহাড় উপরে উঠিয়াছে; ইউফ্রেতিস্ নদীর উৎপত্তি এই পাহাড় হইতে। ভূভাগের চারিদিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে সমুদ্র, এই সমুদ্রের পরেই স্বর্গীয় পর্বতমালা আকাশকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।† কোন কোন ব্যাবিলনীয় জ্যোতির্বিদ্‌কে পৃথিবীকে গোলকরূপে পরিকল্পনা করিতে দেখা যায়।

কল্পনাপ্রবণ গ্রীকরা ব্যাবিলনীয় জ্যোতিষের পরিকল্পনার দারিদ্র্য পূরণ করিয়াছিল। জ্যামিতি ও গণিতকে জ্যোতিষীয় পরিকল্পনা রচনার কাজে প্রয়োগ করিয়া তাহারা ব্রহ্মাণ্ডের ও নক্ষত্রজগতের যে চিত্র আঁকিবার প্রয়াস পায়, ব্যাবিলনীয় বা গ্রীকপূর্ব কোন জাতির জ্যোতিষে তাহার তুলনা নাই। সেইরূপ পর্যবেক্ষণ-জ্যোতিষে আবার গ্রীকরা ছিল দুর্বল। গ্রীকদের সুদীর্ঘ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিহাসে ধারাবাহিক ও একনিষ্ঠভাবে জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণ গ্রহণের নজির বিরল। এসিয়া মাইনরের উপকূলে ঔপনিবেশিক আয়োনীয় গ্রীকরা প্রথম ব্যাবিলনীয় পর্যবেক্ষণের সহিত পরিচিত হয়। কিন্তু পারসিকদের আক্রমণে এসিয়া হইতে বিতাড়িত হইলে গ্রীকদের এই সুযোগ নষ্ট হয়। অধ্যাপক অ্যান্টনি প্যান

* A. Berry, *A Short History of Astronomy*, London, 1898; p. 20.

† G. Maspero, *The Dawn of Civilization, 1910.*

কেয়েক দেখাইয়াছেন, আলেকজান্দারের দিগ্‌বিজয়ের পর পশ্চিম এসিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য আবার গ্রীকদের পদানত হইলে গ্রীক জ্যোতির্বিদেরা ব্যাবিলনীয় জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণের সুবিধা গ্রহণে সমর্থ হয়। ব্যাবিলনীয় পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করিতে পারিবার জন্যই হিপার্কাস্, টলেমীপ্রমুখ পরবর্তী গ্রীক জ্যোতির্বিদগণ ভূকেন্দ্রীয় পরিকল্পনা রচনায় অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন।*

মিশর

সাধারণভাবে জ্যোতিষীয় গবেষণায় প্রাচীন মিশর ব্যাবিলনের মত অগ্রগামী না হইলেও মিশরে জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণ ও পঞ্জিকা রচনার ইতিহাস সুপ্রাচীন। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৪২৩৬ অব্দ হইতে মিশরীয়রা চান্দ্রমাসের ভিত্তিতে বৎসরের হিসাব রাখিতে আরম্ভ করে। চান্দ্রবৎসরের হিসাবে বৎসর নির্ণয় করিবার অসুবিধা সম্বন্ধে প্রাচীন মিশরীয়রা ব্যাবিলনীয়দের অনেক আগে অবহিত হইয়াছিল। নীলনদের নিয়মিত বন্যা হইতে এই অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এই অসঙ্গতির কথা জানা সত্ত্বেও বহুদিন পর্যন্ত মিশরে পঞ্জিকা-সংস্কারের কোনরূপ চেষ্টা দেখা যায় না। সম্ভবতঃ পুরোহিতদের বা রাজন্যবর্গের কুসংস্কারজনিত বিরুদ্ধতার জন্য পঞ্জিকা-সংস্কার সম্ভবপর হয় নাই। খৃীঃ পূঃ ২০০০ অব্দের অনুরূপ সময় হইতে মিশরীয় পঞ্জিকায় সৌর বৎসরের প্রবর্তন পরিলক্ষিত হয়। নীলনদের প্রথম বন্যার আগমনে জুন মাসে আকাশে মিশরীয়দের 'সক্‌টিস' (Soktis) (গ্রীকদের সিরিয়াস (Sirius), আমাদের লুব্ধক) নক্ষত্রের আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহারা বৎসর গণনা আরম্ভ করে। লুব্ধক নক্ষত্রের আবির্ভাবের দিন হইতে নূতন বৎসরের সূচনা নির্ধারিত হয়। এই সংস্কারের পর মিশরীয় সৌর বৎসরে ৩৬৫ দিন ধার্য হয়; কিন্তু ৩০ দিনে এক মাস ও ১২ মাসে এক বৎসর এই ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে। ইহাতে যে পাঁচদিন অতিরিক্ত থাকিয়া যায় তাহা কোন মাস বিশেষের সহিত যুক্ত না করিয়া একেবারে বৎসরের শেষে যুক্ত হয়। এই অতিরিক্ত পাঁচ দিনের নাম 'এপাগোমেনা' (epagomena); মিশরীয় নানা দেবদেবীর পূজা, অর্চনা ও উৎসবের জন্য এই পাঁচ দিন উৎসর্গীকৃত হয়।†

সোথিক পর্যায়-কাল: তথাপি একটু ভুল রহিয়া গেল। প্রকৃত সৌর বৎসর অপেক্ষা ইহা ¼ বা ·২৪২২ দিন কম। প্রতি বৎসরে ১।৪ দিন কম ধরিবার জন্য ১৪৬১ বৎসর পরে পুরা একটি বৎসরের ব্যবধান হইয়া যাইবে; অর্থাৎ লুব্ধক নক্ষত্রের আবির্ভাবের দিন একটু একটু করিয়া পিছাইয়া আবার ১৪৬১ বৎসর পরে নূতন বৎসরের ঠিক প্রথম দিনটিতে ইহা দেখা দিবে। এই পর্যায়-কালের নাম 'সোথিক পর্যায়-কাল' (Sothic Cycle)। মিশরীয়রা সোথিক পর্যায়-কালের কথা আবিষ্কার করে। অবশ্য এই অসঙ্গতি দূর করিবার জন্য তাহারা আর ১৪৬১ বৎসর অপেক্ষা করিত না; ৪ বৎসর অন্তর বৎসরের শেষে পূর্বোক্ত ৫ দিনের পরিবর্তে ৬ দিন যোজনা করিয়া বৎসরের সহিত ঋতুর বা নীলনদের বন্যার সামঞ্জস্য অব্যাহত রাখিত। অর্থাৎ আধুনিক 'লিপ্-ইয়ার' মিশরীয় আবিষ্কার। বলা বাহুল্য, মিশরীয় পঞ্জিকা সহজ ও বিজ্ঞানসম্মত। প্রাচীনকালে প্রায় সকল জাতিই এই পঞ্জিকার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছিল, পারসিকরাজ দরায়ুস খৃীঃ পূঃ ৫২০ অব্দে এই পঞ্জিকা তাঁহার রাজ্যে প্রবর্তন করেন। বর্তমানকালেও কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়া কপ্‌ট্, আর্মেনীয় প্রভৃতি জাতিরা এই পঞ্জিকা ব্যবহার করিতেছে।

রাশিচক্র ও আকাশে বিভিন্ন তারা ও তারামণ্ডল সম্বন্ধে মিশরীয়রা পরিচিত ছিল।

* অধ্যাপক অ্যান্টন প্যানকোয়েক রয়্যাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল সোসাইটির জর্জ ডারউইন বক্তৃতায় এই মত ব্যক্ত করেন। এই বক্তৃতার সারাংশ *Nature*, Vol. 169, April 19, 1952, p. 656-এ দ্রষ্টব্য।

† M. N. Saha, "The Reform of the Indian Calendar', *Science & Culture*, Vol. 18, No. 2, August, 1952.

তাহারা নক্ষত্র-মানচিত্র রচনায় পারদর্শী ছিল। ধ্রুবনক্ষত্রের চারিপার্শ্বস্থ নক্ষত্রদের তাহারা বিশেষ যত্নের সহিত পর্যবেক্ষণ করে। ধ্রুবনক্ষত্র হইতে উত্তরদিক যথাযথরূপে নির্ণয় করিয়া মিশরীয়রা মন্দির স্থাপনা বা পিরামিড নির্মাণের কার্যে অগ্রসর হইত; সম্ভবতঃ ধ্রুবনক্ষত্রের সাহায্যে মধ্যরেখা (meridian) নির্ণয় করিয়া পিরামিডের ভুজ মধ্যরেখার সমান্তরালভাবে সংস্থাপিত হইত। বৃহত্তম পিরামিডের ভুজের সহিত এই মধ্যরেখার কৌণিক পার্থক্য মাত্র ২′ ৩০″।

ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনা : মিশরীয় ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনার সহিত ব্যাবিলনীয় ব্রহ্মাণ্ডের কতকটা সাদৃশ্য আছে। পৃথিবী একটি লম্বা বাক্সের মত; ভূপৃষ্ঠ অবিকল সমতল না হইয়া কতকটা বাটির মত। এই পৃথিবীর মধ্যস্থলে মিশরের অবস্থিতি। চারিপাশে একটি প্রকাণ্ড নদী ভূভাগকে বেষ্টন করিয়া আছে; নদীতে একটি নৌকা সূর্যকে বহন করিয়া বেড়ায়। নীলনদ এই বিরাট নদীর একটি ক্ষুদ্র শাখা। বাক্সের চারি কোণায় চারিটি পাহাড় আকাশকে ধারণ করিয়া আছে।* ব্যাবিলনীয় পরিকল্পনার সহিত ইহার পার্থক্য নাই বলিলেও চলে; শুধু মিশরের ভৌগোলিক বিশেষত্বের ছাপ পড়ায় যা কিছু পার্থক্য ঘটিয়াছে।

ভারতবর্ষ

কৃষির জন্য মাস, ঋতু, বৎসর প্রভৃতির হিসাব রাখিবার প্রয়োজন অন্যান্য প্রাচীন সভ্য জাতির মত বৈদিকযুগের ভারতীয়রাও অনুভব করিয়াছিল। কিন্তু এদেশে কৃষি অপেক্ষা যাগ-যজ্ঞাদি নানা ধর্মানুষ্ঠান জ্যোতির্বিদ্যার বিবর্তনে সহায়ক হইয়াছিল অনেক বেশী। বিভিন্ন ঋতুতে কখনও কখনও সম্বৎসর বৈদিক হিন্দুদের নানা ধর্মানুষ্ঠান পালন করিতে দেখা যায়। এই সব কার্যকলাপের জন্য পঞ্জিকা প্রণয়ন অপরিহার্য। বৈদিকযুগের মাঝামাঝি ব্রাহ্মণ সাহিত্যাদি রচনার যুগে ভারতবর্ষে জ্যোতির্বিদ্যার বিশেষ অগ্রগতি হইয়াছিল। ব্রাহ্মণযুগে জ্যোতিষকে একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা হিসাবে জ্ঞান করিতে দেখা যায়। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে জ্যোতিষকে বলা হইয়াছে 'নক্ষত্র-বিদ্যা', এবং জ্যোতির্বিদ্‌কে "নক্ষত্র-দর্শ" বা 'গণক'। ব্যাবিলনীয়রাও তাহাদের জ্যোতির্বিদ্‌দের নাম দিয়াছিল star-gazer বা নক্ষত্র-দর্শক।

মাস, বৎসর : প্রথম দিকে বৈদিক হিন্দুরা ৩০ দিনে মাস ও ১২ মাস বা ৩৬০ দিনে বৎসর ধরিয়া পঞ্জিকা প্রণয়ন করিত। আবার ১৩ মাসে বৎসর ধরিবারও অনেক নজির আছে। এই ত্রয়োদশ মাসটি মলমাস; চান্দ্রবৎসরের সহিত সৌরবৎসরের সঙ্গতি বিধানের কৌশলমাত্র। চান্দ্র ও সৌর উভয়বিধ মাসের নামই আমরা বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত দেখিতে পাই; যেমন :—

চান্দ্রমাস	সৌরমাস	ঋতু
ফাল্গুন	তপস্	
চৈত্র	তপস্য	শীত
বৈশাখ	মধু	
জ্যৈষ্ঠ	মাধব	বসন্ত
আষাঢ়	শুক্র	
শ্রাবণ	শুচি	গ্রীষ্ম
ভাদ্র	নভস	
আশ্বিন	নভস্য	বর্ষা
কার্তিক	ইষ	
অগ্রহায়ণ	উর্জ	শরৎ

* Maspero, *loc. cit.*

পৌষ	সহস	
মাঘ	সহস্য	হেমন্ত

সাধারণতঃ চান্দ্রমাসই ব্যবহৃত হইত। পূর্ণিমা (এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অমাবস্যা) হইতে মাস আরম্ভ হইত। যে পূর্ণিমার দিনে চন্দ্রের অবস্থান পূর্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রে তাহা বৎসরের শেষ দিন। এই সময় সূর্যের মকর-ক্রান্তিতে (Winter Solstice) অবস্থান। পরদিন হইতে বৎসরের প্রথম মাস ফাল্গুনের আরম্ভ। কোন কোন বৎসর পূর্ব-ফল্গুনী নক্ষত্রে পূর্ণিমার দিনে বৎসর শেষ করিবার প্রয়োজনে ১৩ মাস ধরিতে হইত। বৎসরের আবার দুইটি ভাগ ছিল; প্রথম ভাগের নাম 'উত্তরায়ণ'; ইহা সূর্যের মকর-ক্রান্তিতে অবস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া কর্কট-ক্রান্তিতে পৌঁছানো পর্যন্ত ধার্য হইত; দ্বিতীয় ভাগ 'দক্ষিণায়নে' সূর্য কর্কট হইতে অবশিষ্ট ছয়টি রাশি পরিক্রমণ করিয়া আবার মকর-ক্রান্তিতে ফিরিয়া আসে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে (জ্যাকবি), বৈদিক বৎসর আরম্ভ হইত কর্কট-ক্রান্তি হইতে।* শতপথ ও কৌশিতকি ব্রাহ্মণে ক্রান্তিবিন্দু, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের উল্লেখ ও আলোচনা আছে।

বৈদিক হিন্দুরা নিয়মিতভাবে মকর-ক্রান্তি, কর্কট-ক্রান্তি (Summer Solstice) ও ক্রান্তিবিন্দুদ্বয় (two equinoctial points)—মহাবিষুব ও জলবিষুব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করিত।

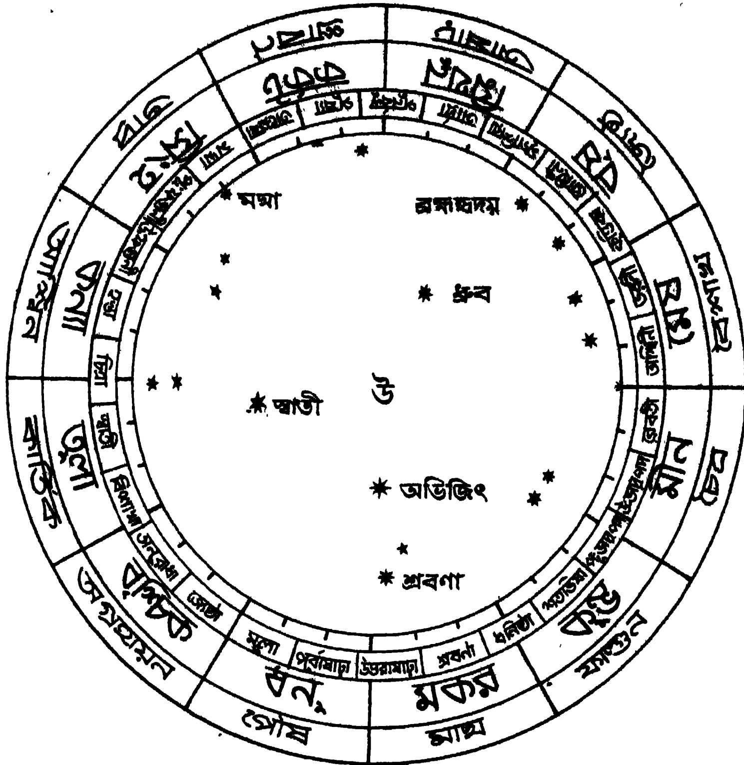
হিন্দুদের রাশিচক্রঃ উপরে মাস, বৎসর সংক্রান্ত যে জ্ঞানের কথা বলা হইল তাহাতে বুঝা যায়, বৈদিক হিন্দুরা রাশিচক্রের সহিত পরিচিত ছিল। ঋগ্বেদের একটি স্তোত্রে আকাশ-পথে সূর্যের আপাত-গতিকে বারটি পাকিযুক্ত চাকার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। আর একটি স্তোত্রে এই চাকার ৩৬০টি দাঁত আছে, এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। টীকাকার সায়নের মতে, চাকার বারটি পাকি রাশিচক্রের বারটি প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নয়। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের দ্বাদশ আদিত্য রবিমার্গের বা ক্রান্তিবৃত্তের (ecliptic) দ্বাদশ বিভক্তি বা দ্বাদশ রাশিকেই নির্দেশ করিতেছে।

প্রাচীন ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় জ্যোতির্বিদেরাও সূর্যের আপাত-গতিপথকে বিশিষ্ট তারা ও তারামণ্ডলের দ্বারা চিহ্নিত করিয়া রাশিচক্র রচনা করিত, বার মাসে বৎসরকে ভাগ করিবার জন্য রাশিচক্রকেও তাহারা বার ভাগে ভাগ করিয়াছিল। প্রাচীন চৈনিক জ্যোতিষেও রাশিচক্রের উল্লেখ আছে। সুতরাং প্রাচীনকালের সকল সভ্যজাতির মধ্যেই রাশিচক্রের অল্পবিস্তর জ্ঞান বিদ্যমান। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ব্যাবিলনীয়েরা রাশিচক্রের আবিষ্কারক। কিন্তু এই আবিষ্কারের অগ্রাধিকার নির্ণয় করা সুকঠিন। সূর্য-সিদ্ধান্তের ইংরেজী অনুবাদক মিঃ ই. বার্গেস্ বলেন, রাশিচক্র সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয়দের জ্ঞান সমসময়ের যে কোন প্রাচীন জাতির অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে; বরং অগ্রাধিকারের প্রশ্নই যদি উঠে, অন্যান্য জাতির অন্ততঃ কয়েক শত বৎসর পূর্বে ভারতীয়রা যে রাশিচক্র সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করিয়াছিল, সন্তোষজনক প্রমাণের অভাব থাকিলেও তাহার সম্ভাবনা রীতিমত প্রবল।†

* Kirpa Shankar Shukla, 'Chronology of Hindu Achievements in Astronomy', (Symposium in History of Science in South Asia, New Delhi, 1950).

† "The use of this division, and the present names of the signs can be proved to have existed in India at as early a period as in any other country; and there is evidence less clear and satisfactory, it is true, yet of such a character as to create a high degree of probability, that this division was known to the Hindus centuries before any traces can be found in existence among any other people"—E. Burgess, *Surya Siddhanta.* (English Translation).

সূর্যের আপাত-গতি অনুসরণের জন্য রাশিচক্র ও তাহার ১২টি বিভাগের পরিকল্পনা; চন্দ্রের আপাত-গতি নির্ধারণের জন্যও সেইরূপ অতি প্রাচীনকাল হইতে জ্যোতির্বিদ্‌দের



৪৫। হিন্দুদের রাশিচক্র — উত্তরাকাশ।

রাশিচক্রের ও ক্রান্তিবৃত্তের শরণাপন্ন হইতে দেখা যায়। খগোলে (celestial sphere) সূর্য ও চন্দ্রের পরিক্রমণ-পথ প্রায় একই বৃত্ত; সুতরাং ক্রান্তিবৃত্তের অর্থাৎ রাশিচক্রের অন্তর্গত নক্ষত্রদের সাহায্যে আকাশপথে চন্দ্রের গতি অতি সহজে নির্ণয় করা যায়। চৈনিকেরা ২৮টি নক্ষত্রের সাহায্যে রাশিচক্রকে ২৮ ভাগে ভাগ করিয়াছিল; বৈদিক হিন্দুরা ইহাকে ২৭টি উজ্জ্বল নক্ষত্রের সাহায্যে ২৭ ভাগে ভাগ করে। এই ২৭টি নক্ষত্র যথাক্রমে —অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব-ফল্গুনী, উত্তর-ফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী। রাশি ও নক্ষত্রের দ্বারা রাশিচক্রকে যথাক্রমে ১২ ও ২৭ ভাগে ভাগ করিয়া হিন্দু জ্যোতির্বিদেরা কিরূপে আকাশে রবিমার্গ ও চন্দ্রমার্গকে চিহ্নিত করিত, তাহা চিত্র (৪৫নং) হইতে অনেক সহজে বুঝা যাইবে।

উপরিউক্ত নক্ষত্রদের নাম বৈদিক যুগেই দেওয়া হইয়াছিল। মঘা ও ফল্গুনীর উল্লেখ ঋগ্বেদে আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় ২৭টি নক্ষত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং পরবর্তী

জ্যোতিষীয় গ্রন্থে সেই নামগুলিই উল্লিখিত হইয়াছে। চন্দ্রচক্র নির্দেশের জন্য অভিজিৎ নক্ষত্রেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়; চন্দ্রের পর্যায়-কাল আরও সঠিকভাবে চিহ্নিত করিবার উদ্দেশ্যে এই নক্ষত্রের অবতারণা করা হইয়াছিল।

হিন্দুরা ব্যাবিলনীয় বা চৈনিক নক্ষত্রদর্শকদের মত আকাশের প্রত্যেকটি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহার খুঁটিনাটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করে নাই। খগোলে ক্রান্তিবৃত্ত-পথে ও তাহার অদূরে উত্তরে ও দক্ষিণে যে সব উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়, তাহাদের প্রতি এবং সেই সঙ্গে অবশ্য উত্তর দিগ্‌দর্শী ধ্রুবনক্ষত্র ও আশেপাশের নক্ষত্রগুলির প্রতি যুগের পর যুগ হিন্দু জ্যোতির্বিদেরা প্রখর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছে। আকাশে সূর্য, চন্দ্র অথবা বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহদের প্রত্যেকের গতি মোটামুটি রবিমার্গকেই অনুসরণ করিয়া থাকে। সুতরাং রবিমার্গের অন্তর্গত নক্ষত্রের অবস্থান একবার ভালভাবে জানা হইয়া গেলে, সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহদের গতি পর্যবেক্ষণ করিবার আর কোন অসুবিধা হয় না। কাল-নির্ণয় ও পঞ্জিকা প্রণয়ন এবং গ্রহ-নক্ষত্রের সমাবেশ হইতে মানুষের ভাগ্যগণনা ছিল হিন্দু জ্যোতিষের প্রধান লক্ষ্য। রাশিচক্র সংক্রান্ত গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে এই দুই ব্যাপারেই হিন্দু জ্যোতির্বিদেরা ও জ্যোতিষীরা বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছিল।*

নক্ষত্র-সংস্থান হইতে হিন্দুরা কিরূপে মাসের নামকরণ করিয়াছিল, তাহা উপরিউক্ত রাশিচক্র হইতে প্রতীয়মান হইবে। আমরা বলিয়াছি, পূর্ণিমার পরের দিন হইতে বৈদিক যুগে এক একটি চান্দ্রমাসের সূচনা ধরা হইত. যে নক্ষত্রে সাধারণতঃ পূর্ণিমান্ত হয়, তাহার নামানুসারে মাসের নাম নির্ধারিত হইত। যেমন বিশাখা নক্ষত্রে পূর্ণিমান্ত হইবার পর যে মাস আরম্ভ হয়, তাহার নাম বৈশাখ; কৃত্তিকা নক্ষত্রে পূর্ণিমান্ত হইলে নূতন মাসের নাম হইবে কার্তিক, ইত্যাদি। পরবর্তীকালে চান্দ্রমাসের পরিবর্তে সৌরমাসের প্রবর্তন হইলে বিভিন্ন রাশিতে সূর্যের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নূতন মাসের গণনা আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু চান্দ্রমাসের নামগুলির আর কোন পরিবর্তন করা হইল না। আমরা জানি, পূর্ণিমার সময়ে সূর্য রাশিচক্রে চন্দ্রের ঠিক বিপরীত দিকে থাকে। সুতরাং বিশাখা নক্ষত্রে যখন পূর্ণিমার উদয় হইতেছে, সূর্য তখন মেষরাশিতে প্রবেশ করিতে উদ্যত। সেই জন্য কৃত্তিকা নক্ষত্রে পূর্ণিমান্তে সূর্যের অবস্থিতি তুলা রাশিতে। তাই যে নক্ষত্র হইতে প্রথমে চান্দ্রমাসের নামকরণ হইয়াছিল, রাশিচক্রে সেই নক্ষত্রের বিপরীত দিকে সেই মাস দেখানো হইয়াছে।

গ্রহ-সংক্রান্ত জ্ঞান: ঋগ্বেদের কাল হইতে ভারতীয়রা ৭টি গ্রহ সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছিল। ইহাদের কোন কোনটির বর্তমান ভারতীয় নাম ঋগ্বেদের আমল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শুক্র ইহাদের মধ্যে অন্যতম। ঋগ্বেদে উল্লিখিত অশ্বের ৩৪টি পঞ্জর ও ৩৪টি জ্যোতিষ্কের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে লুড্‌উইক ও জিমার

---

* The Hindus, unlike the ancient Chinese, had not the ambition of making a catalogue of all the stars which were visible to them. They had a more important object in view, namely, the study of the motions of the sun, the moon and the planets, and other astronomical phenomena, primarily for the purpose of computing time, and of constructing and perfecting their calendars . . . . and they accordingly confined their attention to those stars which lay in the moon's path, immediately North or South of the Ecliptic—stars which are liable to be occultated by the moon, of which might occasionally be in conjunction with it and with the planets."

"By thus confining attention to the stellar spaces in the vicinity of the Ecliptic, their system was rendered, in the main, independent of the use of astronomical instruments, and dependent mostly on calculation for the accuracy of their observations."—W. Brennand, *Hindu Astronomy*, Chas. Straker & Sons., London, 1896.

অনুমান করেন, ইহার দ্বারা সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি পাঁচটি গ্রহ ও ২৭টি নক্ষত্র বুঝাইতেছে। চন্দ্রের যে নিজস্ব দ্যুতি নাই, ইহা সূর্যালোকে ভাস্বর, এই জ্ঞান সম্ভবতঃ বৈদিক যুগে ছিল; অন্ততঃ চন্দ্রকলার সহিত সূর্যের একাধিক সম্পর্কের উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে পৃথিবীকে 'পরিমণ্ডল' বলিয়া বর্ণনা করিতে দেখিয়া অনেকে মনে করেন, বৈদিক হিন্দুরা পৃথিবীকে একটি গোলক হিসাবে জ্ঞান করিত। লুড্‌উইক, তারকেশ্বর ভট্টাচার্য, একেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের অভিমত, প্রাচীন হিন্দুরা পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি অনুমান করিয়াছিল।*

বেদাঙ্গ জ্যোতিষ : বৈদিক যুগের শেষভাগে রচিত বেদাঙ্গ জ্যোতিষ (খৃীঃ পূঃ ৬০০ হইতে ২০০ অব্দের মধ্যে রচিত) প্রাচীন হিন্দুদের জ্যোতিষীয় জ্ঞানের অতি মূল্যবান গ্রন্থ। এই গ্রন্থ বৈদিক যুগের এক পঞ্জিকা বিশেষ। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কালে হিন্দুরা ৩৬০ দিনে বৎসর গণনার অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া ৩৬৬ দিনে বৎসরের হিসাব রাখিতে আরম্ভ করে। ইহাতে একটি পঞ্চবার্ষিক চান্দ্র-সৌর পর্যায়-কালের উল্লেখ আছে। এই পর্যায়-কালের মধ্যে কতগুলি সাবন দিন, নাক্ষত্র দিন, সৌর দিন, চান্দ্র-যুতি, সূর্যের ও চন্দ্রের পূর্ণ পরিক্রমণ সম্পাদিত হয়, তাহার নিম্নোক্ত হিসাব লিপিবদ্ধ হইয়াছে :—

সাবন দিন (Civil days) — ১৮৩০
নাক্ষত্র দিন (Sidereal days) — ১৮৩৫
চান্দ্রযুতি (Synodic month)—৬২
সৌর দিন (Solar days) — ১৮০০
সূর্যের পূর্ণ পরিক্রমণ (Sun's revolution) — ৫
চন্দ্রের পূর্ণ পরিক্রমণ (Moon's revolution) — ৬৭

এই হিসাব হইতে আমরা দেখিতে পাই এক বৎসরে ৩৬৬ দিন (১৮৩০/৫) এবং এক চান্দ্রযুতিতে ২৯+১৬/৩১ দিন (১৮৩০/৬২) হয়। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সময় শীত ও গ্রীষ্মকালীন অয়ন-বিন্দুতে অশ্লেষা ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের অবস্থান ছিল তাহার উল্লেখ আছে। গ্রহদের সম্বন্ধে হিন্দুদের জ্ঞানও এই সময়ে অনেক উন্নত। গ্রহ ও নক্ষত্র যে এক জাতের জ্যোতিষ্ক নয়, ইহা উপলব্ধ হয়। কিন্তু গ্রহদের পর্যায়কাল বা বৎসর সম্বন্ধে বোধ হয় কোন তথ্য আবিষ্কৃত হয় নাই।

ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন-চলন : বৈদিক জ্যোতির্বিদ্‌দের ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন-চলন সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল কিনা, সে সম্বন্ধে অনেক জল্পনা-কল্পনা ও বিতর্ক আছে। ব্যাবিলনীয় কিদিন্নু ও গ্রীক হিপার্কাস্ স্বতন্ত্রভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষীয় আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই দুই বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রে ইহা যেমন নিঃসন্দেহে বলা চলে, বৈদিকযুগের কোন সাহিত্যে বা গ্রন্থে এই তথ্য সম্বন্ধে সেইরূপ কোন উল্লেখ বা আলোচনা অবশ্য পাওয়া যায় না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এক জায়গায় আছে, পুনর্বসু নক্ষত্রে সূর্যদেব অদিতি যেইদিন বিশ্রাম গ্রহণ করেন সেইদিন হইতে যাগ-যজ্ঞাদি সুরু করিবার প্রকৃষ্ট সময়। বলা বাহুল্য, এইদিন মহা-বিষুবের (Vernal equinox) কথাই প্রকাশ করিতেছে, পরবর্তীকালে মহা-বিষুব ক্রমশঃ মৃগশিরা, রোহিণী ও কৃত্তিকা নক্ষত্রের দিকে সরিয়া যায়।

বৈদিক উপাখ্যানে একটি গল্প আছে যে, মহা-বিষুবের অধিষ্ঠাতা দেবতা প্রজাপতি নাকি একবার তাঁহার কন্যা রোহিণীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন এবং এইরূপ অবৈধ আচরণের জন্য দেবতাদের নিকট তাঁহাকে যথেষ্ট নিন্দার্হ ও হেয় হইতে হইয়াছিল।

* Ekendra Nath Ghosh, 'Studies in Rig-Vedic Deities—Astronomical and Meteorological', *Jr. of the Asiatic Society of Bengal*, 1932.

কেহ কেহ বলেন, রূপকের আকারে লিখিত হইলেও ইহার দ্বারা হিন্দুদের অয়ন-চলনের জ্ঞান বুঝাইতেছে। রূপক রূপকই। তাহাকে অবলম্বন করিয়া কোন জাতির বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির বিচার ঐতিহাসিক অবাস্তবতা।

চীন

খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দের কিছু পর হইতেই আমরা চীনদেশে জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণের প্রমাণ পাই। এই সময়ে (খ্রীঃ পূঃ ২৯৫০ অব্দ) আকাশে জ্যোতিষ্কদের গতিবিধি বুঝিবার সুবিধার জন্য চৈনিক জ্যোতির্বিদেরা একটি গোলক নির্মাণ করে। ইহার প্রায় ছয়শত বৎসরের মধ্যে এই ধরনের গোলক নির্মাণের আরও নজির পাওয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সম্রাট হুয়াং তি (Huang Ti) জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণের জন্য এক বিরাট মানমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন (খ্রীঃ পূঃ ২৬৫০ অব্দ)। এই মানমন্দিরে রাজ-জ্যোতিষীরা সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহদের গতি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করিত। নির্ভুল পঞ্জিকা প্রণয়ন এই মানমন্দিরের প্রধান তৎপরতা ছিল। এই ঘটনাগুলি নিঃসন্দেহে চৈনিক জ্যোতিষের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে।

মাস, বৎসর : মিশর, ব্যাবিলন ও ভারতবর্ষের মত চীনদেশেও সম্ভবতঃ প্রথম প্রথম ৩০ দিনে মাস ও ৩৬০ দিনে বৎসর ধার্য হইয়াছিল। চৈনিক ইতিহাসের একটি প্রাচীন বৃত্তান্তে দেখা যায়, আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২৩৬০ অব্দে সম্রাট ইয়াও ক্রান্তিবিন্দু ও অয়ন-বিন্দু নির্ভুলভাবে নির্ণয়ের জন্য রাজ-জ্যোতিষীদের নির্দেশ দেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে, আকাশে বৎসরের কোন্ সময়ে কোন্ নক্ষত্র লক্ষ্য করিলে ক্রান্তিবিন্দু ও অয়ন-বিন্দুতে সূর্যের অবস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া জ্যোতির্বিদেরা সম্রাটের নিকট এক রিপোর্ট দাখিল করে। এই রিপোর্টের তারিখ সত্য হইলে বুঝিতে হইবে, প্রায় চারিহাজার তিনশত বৎসর পূর্বে ক্রান্তিবৃত্তে সূর্যের পরিক্রমণ-ব্যাপার, এই বৃত্তের উপরে বা সন্নিকটে অবস্থিত নক্ষত্রদের কথা এবং দিবাভাগে নক্ষত্রেরা আকাশে বিরাজ করে কিন্তু সূর্যের প্রখর আলোকের জন্য দৃশ্যমান হয় না, ইত্যাদি নানা জ্যোতিষীয় তথ্যের সহিত চৈনিক জ্যোতির্বিদ্‌দের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এই প্রকার জ্যোতিষীয় জ্ঞানের আর একটি প্রমাণ এই যে, সম্রাট ইয়াও-এর রাজত্বকাল হইতেই চৈনিকেরা ৩৬৫¼ দিনে বৎসর গণনা আরম্ভ করে।* বৃত্তকে ৩৬০-এর পরিবর্তে ৩৬৫ ভাগে বা ডিগ্রীতে বিভক্ত করিবার অতি প্রাচীন চৈনিক পদ্ধতিও এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চৈনিক দীর্ঘ বৎসর : ৩৬৫ দিনে বৎসর নির্ধারিত হইবার অল্প পরে চৈনিকেরা এক দীর্ঘ বৎসর আবিষ্কার করিয়াছিল। ১৯ বৎসরে (৩৬৫¼ দিনে বৎসর) এক দীর্ঘ বৎসর এবং এক দীর্ঘ বৎসরে ২৩৫ চান্দ্রযুতি হয়। অতএব এক চান্দ্রযুতিতে ২৯·৫৩ দিন হয়। গ্রীক জ্যোতিষে এই দীর্ঘ বৎসরের নাম মেটন-চক্র (Meton cycle)। তাহাদের এবং আধুনিককাল পর্যন্ত বহু ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের ধারণা ছিল, মেটনই (খ্রীঃ পূঃ ৪৩৩) প্রথম এই চক্রের আবিষ্কর্তা। এখন দেখা যাইতেছে, মেটনের প্রায় দেড় হাজার বৎসর আগে চৈনিকেরা এই চক্রের কথা বলিয়া গিয়াছিল। এই চক্র হইতে চান্দ্রযুতির যে হিসাব পাওয়া যায়, তাহাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আমরা আগেই দেখাইয়াছি, ব্যাবিলনে কিদিন্নু খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দের কাছাকাছি চান্দ্রযুতির কাল নির্ভুলভাবে নিরূপণ করেন। ভারতবর্ষে বেদাঙ্গ জ্যোতিষে চান্দ্রযুতির হিসাব আছে; কিন্তু ৩৬৬ দিনে বৎসর ধার্য

---

* Peter Doig, *A Concise History of Astronomy*, Chapman and Hall, 1950, p. 13.

হওয়ায় ইহা চৈনিক বা ব্যাবিলনীয় হিসাবের মত এত নির্ভুল নহে। চৈনিক তারিখে যদি কোন গলদ না থাকে, তাহা হইলে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় মিলেনিয়মে জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণে ও বৎসরের হিসাব অর্থাৎ পঞ্জিকা প্রণয়নে চৈনিকরা যেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিল, সেইরূপ কৃতিত্ব বোধ হয় আর কোন দেশ দাবী করিতে পারে না।

গ্রহ-জ্ঞান ঃ চীনে গ্রহ-সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের ইতিহাসও সুপ্রাচীন। সম্রাট চৌন্-সু'র (Chaun Hsu—খ্রীঃ পূঃ ২৫১৩-২৪৩৬ অব্দ) রাজত্বকালে একবার বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির সংযোগ (Conjunction) ঘটিয়াছিল, এইরূপ উল্লেখ আছে। পাঁচ গ্রহের সংযোগ অতি বিরল ঘটনা। আধুনিক জ্যোতিষীয় গণনায় দেখা যায়, খ্রীঃ পূঃ ২৪৪৬ অব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী আকাশে একই সঙ্গে উপরিউক্ত পাঁচ গ্রহের দেখা পাইবার কথা, এবং খ্রীঃ পূঃ ২৪৪৯ অব্দের ২৯শে ফেব্রুয়ারী সত্যসত্যই এই প্রকার এক সংযোগের তারিখ। সুতরাং চৈনিক ইতিহাসে উল্লিখিত এই সংযোগের ব্যাপার মিথ্যা নাও হইতে পারে।

তবে সব সময়েই যে এইরূপ উক্তি সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। খ্রীঃ পূঃ ২১৫৯ অব্দে রাজজ্যোতিষী হি ও হো সূর্যগ্রহণ পূর্বাহ্নে ঘোষণা করিতে না পারার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, চীনদেশে এইরূপ একটি ঐতিহাসিক গল্প প্রচলিত আছে। ইহা হইতে অনুমান করা স্বাভাবিক যে, খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় মিলেনিয়মের শেষভাগ হইতে চৈনিক জ্যোতির্বিদেরা গ্রহণ নির্ণয়ের কৌশল অবগত ছিল। গ্রহণ নির্ণয় করিতে হইলে যেরূপ উন্নততর জ্যোতিষীয় জ্ঞানের আবশ্যক, তাহা এত প্রাচীনকালে চৈনিকদের বা অন্য কোন জাতির পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভবপর মনে হয় না। ব্যাবিলনে 'সারোস পর্যায়-কালের' আবিষ্কার অনেক পরে সংঘটিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ পঞ্জিকা প্রণয়নে অবহেলাজনিত কোন ভুল করিবার জন্য জ্যোতির্বিদেরা দণ্ডিত হইয়াছিলেন, ইহাই গল্পের প্রচ্ছন্ন সত্য।

ধূমকেতু ঃ ক্রান্তিবৃত্তের তির্যকতা, অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্তের ও বিষুববৃত্তের অন্তর্বর্তী কোণ, চৈনিক জ্যোতির্বিদেরা অতি নির্ভুলভাবে (মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে) মাপিয়া বাহির করে। ধূমকেতু সম্বন্ধে তাহাদের পর্যবেক্ষণের সূত্রপাত আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৬১১ অব্দ হইতে। দীর্ঘকাল পরে সূর্যের নিকট যেসব ধূমকেতুর ফিরিয়া আসিবার কথা, তাহাদের এই প্রত্যাবর্তনের সত্যতা নিরূপণের উদ্দেশ্যে আধুনিক জ্যোতির্বিদেরা অনেক সময়ে প্রাচীন চৈনিক পর্যবেক্ষণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। হ্যালির ধূমকেতু তাহার একটি দৃষ্টান্ত। এই ধূমকেতুর পর্যায়-কাল প্রায় ৭৬ বৎসর। খ্রীঃ পূঃ ২৪০ ও ৪৬৭ অব্দে আকাশে ইহার আবির্ভাব হইবার কথা। ঐরূপ সময়ে চৈনিক জ্যোতিষীয় তালিকায় যে ধূমকেতুর উল্লেখ আছে, তাহা যে হ্যালির ধূমকেতুকেই বুঝাইতেছে, ইহা সুনিশ্চিত। ধূমকেতুর পুচ্ছ সূর্যের বিপরীত দিকে থাকে, চৈনিক বিবরণে তাহার পরিষ্কার উল্লেখ আছে।

নূতন নক্ষত্র বা নোভা ঃ চৈনিক জ্যোতিষীয় তালিকায় নূতন নক্ষত্র বা নোভার আলোচনাও প্রণিধানযোগ্য। চৈনিক ভাষায় নোভার নাম 'কো'-সিং' (K'o-hsing) বা অতিথি-তারা। ধূমকেতু ও অতিথি-তারার পার্থক্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, আকাশে ধূমকেতুর গতি আছে, কিন্তু অতিথি-তারার সেইরূপ কোন গতি নাই। প্রথম আত্মপ্রকাশের পর অতিথি-তারার ঔজ্জ্বল্য কিরূপে ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তাহার বিশদ বর্ণনা চৈনিক জ্যোতির্বিদেরা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে।

নক্ষত্র-পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে চৈনিকেরা বিশেষ উৎসাহের পরিচয় দিয়াছে। তাহারা আকাশের দৃশ্যমান সমস্ত তারাকে মোট ২৮৪ তারামণ্ডলে ভাগ করে: প্রত্যেকটি তারামণ্ডলে প্রায় ৫টি করিয়া তারা। চন্দ্রের পরিক্রমণ নির্দেশ করিবার উদ্দেশ্যে ক্রান্তিবৃত্তকে তাহারা ২৮

ভাগে বিভক্ত করিয়াছিল, ভারতীয় জ্যোতিষের আলোচনাপ্রসঙ্গে তাহা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

চৈনিকেরা প্রাচীনকালে পর্যবেক্ষণ-জ্যোতিষে যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল, তাহা অনস্বীকার্য। কিন্তু সে কোন্ প্রাচীনকালে? পিটার ডয়েগ তাঁহার জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাসে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার মর্মার্থ এই। প্রাচীন চৈনিক জ্যোতিষীয় আবিষ্কারের অধিকাংশগুলিই খ্রীঃ পূঃ ৪০০ অব্দের পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিছু কিছু আবিষ্কার খ্রীঃ পূঃ ৮০০ অব্দেরও পূর্বে হইয়া থাকিবে; এবং খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দের পূর্বেও যে জ্যোতিষের চর্চা ছিল তাহা সুনিশ্চিত। বৃত্তকে ৩৬৫¼ ভাগে ভাগ করা, অর্থাৎ ৩৬৫¼ দিনে বৎসর নির্ণয়, সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ৩৫০ অব্দের পূর্বে সংঘটিত হয় নাই, ক্রান্তিবিন্দু ও অয়ন-বিন্দুর নির্ণয়কাল খ্রীঃ পূঃ ৪০০ অব্দ। খ্রীষ্টীয় শতকের গোড়ার দিকে চৈনিকেরা সূর্যগ্রহণের কাল পূর্বাহ্নে নির্ণয় করিবার বিদ্যা আয়ত্ত করে, ইত্যাদি। প্রাচীন চৈনিক বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য দেশে সম্প্রতি যে গবেষণা হইয়াছে ও হইতেছে তাহার ভিত্তিতেই ডয়েগ এই মন্তব্য করিয়াছেন।

৩·৫। চিকিৎসাবিদ্যার আদি ইতিহাস

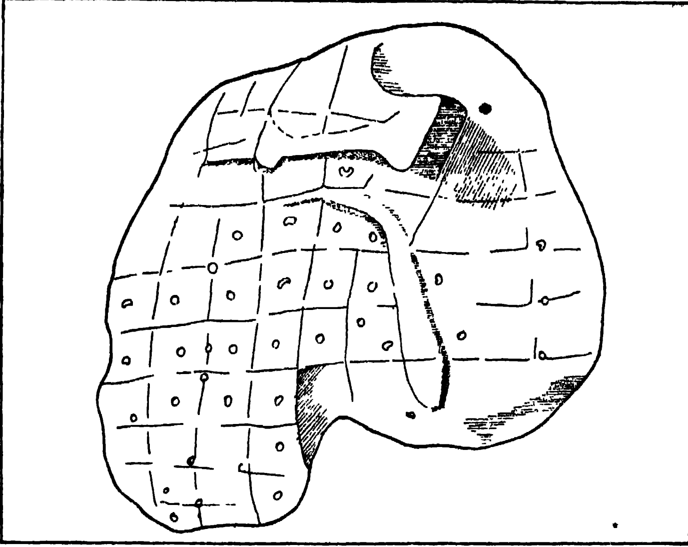
রোগ মানুষের চিরন্তন সঙ্গী। পৃথিবীতে আবির্ভাবের পর হইতেই রোগীর চিকিৎসার প্রশ্ন তাহাকে চিন্তিত, বিব্রত ও হতাশ করিয়া আসিয়াছে। নিজের দেহকে জানিতে, দেহের বিকারের নানা লক্ষণ ও কারণ বুঝিতে তাহাকে বহু লক্ষ বৎসর একান্ত নিরুপায়ভাবে অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। দেহকে সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত করা আজও বহুলাংশে মানুষের সাধ্যাতীত।

দেহ ও রোগ সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞানলাভ করিয়া বাহ্যিক উপায়ে রোগীর চিকিৎসার ব্যাপার অনেক পরের ঘটনা। ইহার পূর্বে রোগী সম্বন্ধে মানুষ কি সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ছিল? এমতাবস্থায় কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব ও স্বাভাবিক তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায় এ-যুগের নানা অসভ্য আদিম অধিবাসীদের যাদুবিদ্যা, সম্মোহনবিদ্যা, তুক্‌তাক্, মন্ত্রোচ্চারণ, মাদুলী, কবচ প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহারের মধ্যে। বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রসারে মানুষের নানা তৎপরতা ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যাদুবিদ্যার ও যাদুকরের প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। বিজ্ঞানী নিজেই এখন এক আশ্চর্য যাদুকর। কিন্তু সভ্যতার উন্মেষের পূর্বে জ্ঞানের অতি শৈশব অবস্থায় হাতুড়ে যাদুকরই ছিল তার নানা যন্ত্রণা ও দুর্বিপাকের একমাত্র আশা, ভরসা ও সান্ত্বনা। যাদুবিদ্যার কাল গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারও এক কাল ছিল। পৃথিবীর সর্বত্র যাদুকর মানুষের আদি চিকিৎসক। রোগ নিরাময়ে যাদুবিদ্যার প্রয়োগের বৃত্তান্ত অবশ্য আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। যাদুবিদ্যার ব্যাপক প্রভাব ও প্রতিপত্তির মধ্যে ধীরে ধীরে সত্যকার চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদ্ভব এবং বিভিন্ন দেশে তাহার বিবর্তনের ইতিহাস জানিতেই আমরা অধিকতর কুতূহলী।

মিশর ও ব্যাবিলন

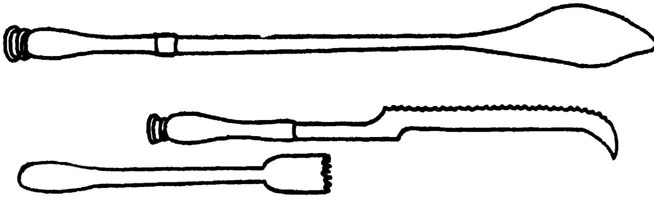
মেসোপোটেমিয়ায় ও মিশরে নদী-উপত্যকা অঞ্চলে নাগরিক সভ্যতা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা একদল চিকিৎসকেরও সাক্ষাৎ পাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নগরে বা রাজ্যের পুরোহিতরাই ছিল একমাত্র চিকিৎসক। পারমার্থিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব একই ব্যক্তির উপর ন্যস্ত। ইহার প্রধান ব্যতিক্রম মিশরের তথা সমগ্র বিশ্বের প্রাচীনতম চিকিৎসক স্বয়ং ইম্‌হোটেপ নিজে। ইম্‌হোটেপ ছিলেন রাজা জোসেরের (Zoser) অধীনে একজন

স্থপতি। পরবর্তীকালে তাঁহার চিকিৎসার খ্যাতি স্মরণ করিয়া গুণমুগ্ধ দেশবাসীরা তাঁহাকে মিশরের চিকিৎসার দেবতা বানাইয়াছিল। মিশরে তৃতীয় রাজবংশের আমল হইতে



৪৬। প্রাচীন ব্যাবিলনে শিক্ষকতার কার্যে ব্যবহৃত ভেড়ার মৃণ্ময় যকৃৎ।

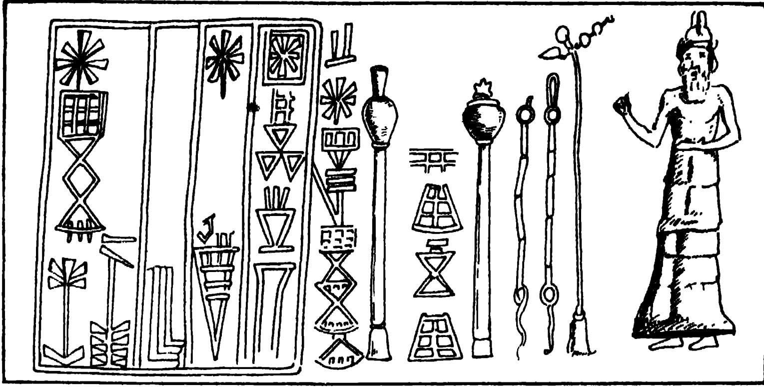
চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থাদি রচনার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং খ্রীঃ পূঃ ২০০০ অব্দের অনুরূপ সময়ে রচিত হইয়াছিল এইরূপ কয়েকটি প্যাপিরাস্ এখনও সংরক্ষিত আছে। ব্যাবিলনে খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দের অধিক পুরাতন চিকিৎসার কোন মৃণ্ময় ফলক আবিষ্কৃত হয়



৪৭। প্রত্নতত্ত্বীয় গবেষণা সম্পর্কে নিনেভেতে প্রাপ্ত অস্ত্রোপচারের উপযোগী নানাবিধ যন্ত্রপাতি; দুই প্রকার ছুরি, একটি করাত ও এক প্রকার বাটালি যন্ত্রপাতির মধ্যে দেখা যাইতেছে। ইয়েনার অধ্যাপক মেয়ার ষ্টাইনেগ্ প্রাচীন মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ এই যন্ত্রগুলি সংগ্রহ করেন।

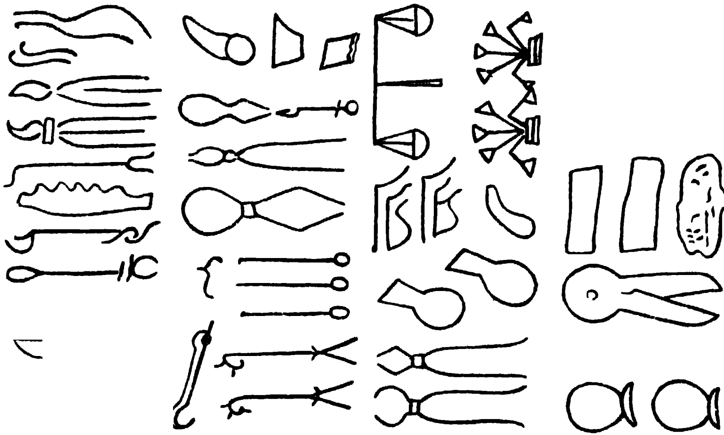
নাই। বৈজ্ঞানিক তথ্যের দিক হইতেও ব্যাবিলনীয়দের চিকিৎসা সম্পর্কিত জ্ঞান প্রাচীন মিশরীয়দের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট।

মিশরে ও ব্যাবিলনে প্রাপ্ত চিকিৎসার প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে বিশেষ করিয়া রোগীর চিকিৎসার বৃত্তান্ত পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র। ইহাদের ঠিক চিকিৎসাবিদ্যার



৪৮। ব্যাবিলনীয় শল্যচিকিৎসকের শীলমোহর
(আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২৩০০)।

গ্রন্থ বলা চলে না। শুধু অ্যানাটমি বা শারীরস্থানের উপর লিখিত কোন প্যাপিরাস্ বা মৃন্ময় ফলক এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। অ্যানাটমি সম্বন্ধে প্রাচীন মিশরীয়দের যথেষ্ট উন্নত জ্ঞান থাকাই স্বাভাবিক। কারণ মৃতদেহকে 'মামি' করিয়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা

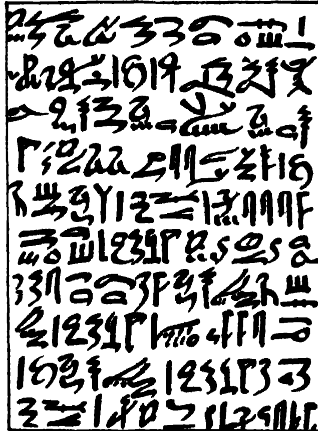


৪৯। মিশরে কোম্ ওম্বোস্ মন্দির-গাত্রে শল্যচিকিৎসার এই যন্ত্রগুলি খোদিত দেখা যায়। ৭ম টলেমী (খৃঃ পূঃ ১৮১-১৪৬) এই মন্দিরটি নির্মাণ করান। আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাধান্যের সময় মিশরে কি ধরনের যন্ত্রপাতি শল্যচিকিৎসায় ব্যবহৃত হইত ইহা তাহার একটি নমুনা।

সেদেশে অতি সুপ্রাচীন। রোগ ও ঔষধ সম্বন্ধে মিশরীয়রা অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছিল কিনা সন্দেহ, ভূতপ্রেত দানব প্রভৃতি নানা অশরীরী জীব মানুষের দেহে ভর করিবার জন্যই

রোগের আবির্ভাব ঘটে এইরূপ ধারণা ব্যাপক ছিল। সুতরাং রোগ আরামের প্রধান উপায় ছিল যাদুবিদ্যা, সম্মোহনী বিদ্যা প্রভৃতি প্রয়োগের দ্বারা এই সব ভূত ছাড়ানো। তজ্জন্য যত রকমের নোঙরা, বিদ্ঘুটে ও অখাদ্য দ্রব্য ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত দেখা যায়। মানুষের দেহে রোগ কিরূপে প্রবেশ করে, কোন্ কোন্ দ্রব্যে ঔষধের গুণাগুণ বর্তমান, তাহা শারীরবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি নানা বিদ্যার প্রভূত উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। ইউরোপীয় রেণেশাঁর পূর্বে প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রোগ ও ঔষধের গুণাগুণ নির্ণয় করিতে চিকিৎসকদের দেখা যায় না।

শল্যবিদ্যা: কিন্তু শল্যবিদ্যা স্বতন্ত্র জাতের। শল্য চিকিৎসকের কার্য আঘাত, ক্ষত প্রভৃতির বাহ্যিক কারণে সংঘটিত দেহের ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নানা বিকৃতির চিকিৎসা করা। অস্ত্রাঘাতে দেহ ক্ষতবিক্ষত হইল, পড়িয়া গিয়া কাহারও হাড় ভাঙ্গিল—এই সব ব্যাপার অলৌকিক দুর্ঘটনা নহে; ইহাদের কারণ বুঝিবার জন্য ভূতপ্রেত যাদুবিদ্যা প্রভৃতির অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। এজন্য শল্য চিকিৎসককে আমরা প্রথম হইতেই দেখি সম্পূর্ণ বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চিকিৎসাকার্যে মনোনিবেশ করিতে। অতি প্রাচীনকাল হইতেই শল্যবিদ্যাকে বিভিন্ন ব্যবহারিক বিদ্যার অন্যতম বলিয়া গণ্য করিতে দেখা যায়। হাম্মুরাবির অনুশাসনে শল্যচিকিৎসকদের ফী বা পারিশ্রমিকের বন্দোবস্ত ছিল।* অস্ত্রোপচারে অকৃতকার্য হইলে তাহাদের শাস্তিভোগ করিতে হইত।



৫০। এবের্স্ প্যাপিরাসের একাংশ। এড্উইন্ স্মিথ প্যাপিরাসের মত ইহাও একটি শল্যচিকিৎসার সুপ্রাচীন মিশরীয় প্যাপিরাস্। এক্ষণে ইহা লাইপ্সিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়মে সংরক্ষিত।

এড্উইন্ স্মিথ প্যাপিরাস্: প্রাচীন মেসোপোটেমিয়ায় শল্য-চিকিৎসার কোন মৃন্ময় ফলক এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কিন্তু মিশরে এড্উইন্ স্মিথ প্যাপিরাস্ নামে শল্য-চিকিৎসার এক বিখ্যাত গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ইহার ইংরেজী অনুবাদক টি. এইচ. ব্রেস্টেড মনে করেন, এড্উইন্ প্যাপিরাসের রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ অব্দ, অর্থাৎ পিরামিডের যুগ। ধারাবাহিকভাবে লিখিত শল্যবিদ্যার গ্রন্থ ইহা ঠিক নহে; চিকিৎসক যখন যেমন রোগীর চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার করিয়াছেন, তখন তাহা লিখিয়া গিয়াছেন কতকটা

* ২ হইতে ১০ শেকেল (Shekel); একজন কর্মকারের বাৎসরিক বেতন ছিল ৮ শেকেল—V. Gordon Childe, *Man Makes Himself*, p. 251.

দিনলিপির ভঙ্গীতে। তবে বিভিন্ন ক্ষত ও আঘাতের এক প্রকার শ্রেণীবিন্যাস দেখা যায়; প্রত্যেকটি ক্ষতর প্রথমে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে; তারপর ইহা কি ধরনের ক্ষত, সে সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য এবং সর্বশেষে চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার-বিধি। এই বিবরণ সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ১৪টি আঘাতের ক্ষেত্রে পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে, ইহারা দুরারোগ্য, চিকিৎসার কোন প্রয়োজন নাই। চিকিৎসার অতীত এই ১৪টি বিশেষ ধরনের আঘাত ও ক্ষতের বর্ণনা সম্বন্ধে গ্রন্থকারকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে দেখা যায়। অস্ত্রোপচারে অকৃতকার্যতার ফল শাস্তিভোগ এইরূপ বিধি সম্ভবতঃ বলবৎ থাকায় এই প্রকার সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল। হাম্মুরাবির অনুশাসনে এইরূপ বিধানের কথা বলা হইয়াছে। মিশরে অনুরূপ কোন বিধান ছিল কি না, তাহার অবশ্য কোন লিপিবন্ধ প্রমাণ নাই। ব্রেস্টেড এই প্যাপিরাস্‌কে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পর্যবেক্ষণের প্রথম লিপিবন্ধ দৃষ্টান্ত ("the earliest known recorded group of observations in natural science.") বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এড্‌উইন্‌ প্যাপিরাসে উল্লিখিত কয়েকটি আঘাতের বর্ণনা ও চিকিৎসা-বিধি দেওয়া যাইতেছে।

"মাথার করোটির নীচের চর্মের আঘাত সম্বন্ধীয় বিধান। এক ব্যক্তির করোটি আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে, তোমাকে ইহা পরীক্ষা করিতে হইবে। গলিত তাম্রের উপর তরঙ্গায়িত যে সব কুঞ্চন দেখা যায়, বিচূর্ণ করোটির তলদেশে তুমি যদি সেইরূপ কুঞ্চন দেখিতে পাও, শিশুর মাথার নরম তালুতে অঙ্গুলি স্পর্শ করিলে তাহা যেমন স্পন্দিত হয়, ক্ষতস্থানে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া তুমি যদি সেইরূপ কোন স্পন্দন অনুভব না কর.........তখন বলিবে, এই রোগী চিকিৎসার অতীত।"*

আর একটি উদাহরণ।

"তোমাকে এক ব্যক্তির আঘাত-বিচূর্ণ নাসারন্ধ্র পরীক্ষা করিতে হইবে। নাসারন্ধ্রের ভাঙ্গা স্থান স্পর্শ কর; অঙ্গুলির দ্বারা তাহা ঈষৎ নাড়াইলে যদি উক্ত স্থান পট্‌ পট্‌ করে এবং সেই সঙ্গে নাসারন্ধ্রপথে ও সেই নাসারন্ধ্রের দিকে অবস্থিত কর্ণ হইতে যদি শোণিত নির্গত হয়; যদি দেখ রোগীর হাঁ করিতে কষ্ট হইতেছে ও তাহার বাক্যস্ফূর্তি হইতেছে না; তখন এই রোগী সম্বন্ধে বলিবে, 'নাসারন্ধ্র বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে; এই রোগের চিকিৎসা অসম্ভব।'"*

প্রায় সাড়ে চার হাজার বৎসর পূর্বে লিখিত এড্‌উইন্‌ প্যাপিরাসে প্রাচীন মিশরীয়দের শল্যবিদ্যার যে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, তাহার পর দুই হাজার বৎসরের মধ্যে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞানের দৃষ্টান্ত আর মিশরীয়দের মধ্যে দেখা গেল না। পরবর্তী চিকিৎসকেরা শুধু এইসব প্রাচীন গ্রন্থ মুখস্থ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিয়াছে; ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই একই প্রাচীন বিদ্যার প্রয়োগ করিয়াছে; তাহার উন্নতির কোন চেষ্টা করে নাই। সুপ্রাচীন অতীতে মিশরে জ্ঞানের আকস্মিক বিকাশ যেমন বিস্ময়কর, তাহার স্থবিরতাও ততোধিক নৈরাশ্যজনক।

ভারতবর্ষ : বৈদিক যুগ

ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের সুমহান প্রাচীনত্বের কিছু কিছু প্রমাণ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন, একথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। সিন্ধু-সভ্যতার আমলে ভারতীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি ও নানা রোগে ঔষধাদির ব্যবহার সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্বীয় গবেষণা হইতে এ পর্যন্ত বিশেষ কিছু জানা যায় নাই সত্য, কিন্তু মহেঞ্জোদড়োর ও হরপ্পার স্থপতিদের নগর পরিকল্পনায় জনস্বাস্থ্যের প্রতি যেরূপ সজাগ দৃষ্টি দেখা যায়, তাহাতে সিন্ধু-সভ্যতার রচয়িতারা যে বিশেষভাবে

* T. H. Breasted, *The Edwin Smith Surgical Papyrus*, Chicago, 1930, Vol. I—এ উল্লিখিত কয়েকটি দৃষ্টান্তের বঙ্গানুবাদ।

স্বাস্থ্য-সচেতন ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এইরূপ স্বাস্থ্য-সচেতন জাতির হাতে সুচিকিৎসার উদ্ভাবন অনুমান করা একান্ত যুক্তিসংগত।

অথর্ববেদে চিকিৎসা, ভেষজ, শারীরস্থান সম্বন্ধে জ্ঞান

সিন্ধু-সভ্যতার অন্তে এদেশে যে আর্য হিন্দুগণ বৈদিক সভ্যতার গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ কোন সংশয় নাই। অথর্ববেদে শারীরবৃত্তের জ্ঞান সুপরিস্ফুট। পরে চিকিৎসাবিদ্যাকে অথর্ববেদ হইতে পৃথক করিয়া আয়ুর্বেদ বা পঞ্চমবেদ রচিত হইয়াছিল। প্রাচীনতম বৈদিক হিন্দুদের চিকিৎসার জ্ঞান জানিবার পক্ষে অথর্ববেদ ও তাহার অনুষঙ্গ আয়ুর্বেদ প্রকৃষ্ট হইলেও এই বিদ্যার আলোচনা ও উল্লেখ অন্যান্য বৈদিক সাহিত্য হইতে একেবারে বাদ পড়ে নাই। আয়ুর্বেদোক্ত রোগের ত্রিদোষবাদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋক্-সংহিতায়। আবার শতপথ ব্রাহ্মণে নরকঙ্কালের অস্থির সংখ্যা ও পরিচয় অতি যথাযথরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। চিকিৎসাশাস্ত্রের ও শারীরবিদ্যার সুশৃংখল আলোচনা অবশ্য আংশিকভাবে অথর্ববেদে ও পরিপূর্ণভাবে আয়ুর্বেদেই পাওয়া যায়। এই জন্য এই দুই গ্রন্থে বর্ণিত শারীরবিদ্যার ও চিকিৎসাবিদ্যার কিছু পরিচয় দিলেই যথেষ্ট হইবে।

অথর্ববেদের নানা মন্ত্রে ও স্তোত্রে শারীরস্থান, শারীরবিদ্যা, ভেষজবিদ্যা, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই বেদের দশম খণ্ডে মানুষের সৃষ্টি সম্বন্ধে একটি স্তোত্র আছে। স্তোত্রের রচয়িতা নাকি নরমেধ যজ্ঞের প্রবর্তক বৈদিক ঋষি নারায়ণ। ঋষি নারায়ণ আয়ুর্বেদোক্ত কতকগুলি প্রাচীনতম ঔষধ প্রস্তুত-প্রণালীর আবিষ্কর্তা।* রুডলফ্ হোয়ের্নলে দেখাইয়াছেন, এই স্তোত্রে মানুষের দেহের বিভিন্ন অস্থির যে সব উল্লেখ ও বর্ণনা আছে, অথর্ববেদের অনেক পরে আত্রেয়-চরক-সুশ্রুত প্রবর্তিত হিন্দু অ্যানাটমিতে উল্লিখিত অস্থি সংস্থানের সহিত তাহার প্রভূত মিল আছে। নিম্নোক্ত তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এই মিল প্রতীয়মান হইবে। শল্যবিদ্যা, নানা সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসা, স্ত্রীরোগ, ঔষধ হিসাবে ভেষজের ব্যবহার, এমন কি গবাদি পশুর কয়েকটি রোগের উল্লেখ অথর্ববেদে পাওয়া যায়।

অথর্ববেদ	**আত্রেয়-চরক**	**সুশ্রুত**
পার্শ্ণি	পার্শ্ণি	পার্শ্ণি
গুল্ফ	গুল্ফ ও মণিক	গুল্ফ
অঙ্গুলি	অঙ্গুলি (নখসমেত)	অঙ্গুলি
উচ্লখ	শলাকা	তল
প্রতিষ্ঠা	অধিষ্ঠান	কূর্চ
অষ্টীবৎ বা জানু	জানু বা কপালিকা	জানু
জঙ্ঘা	জঙ্ঘা	জঙ্ঘা
শ্রোণি	শ্রোণিফলক-ভগসমেত	শ্রোণি
উরু	উরু-নলক ও বাহু-নলক	উরু
উরস	উরস	উরস
গ্রীবা	জত্রু (অথবা গ্রীবা)	কণ্ঠনাড়ী (অথবা জত্রু অথবা গ্রীবা)
স্তন	পার্শ্বক, স্থালক, অর্বুদসমেত	পার্শ্ব

* A. F. Rudolf Hoernle—*Studies in the Medicine of Ancient India*, Part I, Oxford, Clarendon Press, 1907; p. 109-114.

স্কন্ধ	গ্রীবা	গ্রীবা
পৃষ্টি	পৃষ্ঠাস্থি	পৃষ্ঠ
অংস	অক্ষক (অথবা অংস)	অক্ষক (অথবা অংস)
ললাট, ককাটিকা	নাসিকা—গণ্ডকূট—ললাট	নাসা, গণ্ড, অক্ষিকোষ, কর্ণ
কপাল	কপাল, শঙ্খসমেত	কপাল, শঙ্খসমেত

জ্বর বা 'তক্মন' বলিয়া এক প্রকার রোগের যে বর্ণনা আছে, তাহার সহিত আধুনিককালের ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রভূত মিল দেখিয়া মনে হয়, প্রাচীন হিন্দু ভিষকগণ এই রোগের কথা জানিতেন। তক্মন ছাড়া আস্রাব (অতিসার বা পেটের অসুখ), কাসিকা (কাস), বলাস বা যক্ষ্মা, জলোদর, অপচিৎ (ক্ষত), বিদ্রধ (ফোড়া), কিলাস (কুষ্ঠ, চামড়ার রোগ), শীর্ষক্তি (শিরঃপীড়া), বিশল্যক (স্নায়ুবেদনা), অলজী (চক্ষুরোগ), বিলোহিত (রক্তস্রাব), অপস্মার, গ্রাহি (ভূতেধরা), অক্ষত (ব্রণ বা টিউমার) প্রভৃতি বহুবিধ রোগের উল্লেখ দেখা যায়। কোন কোন রোগ যে বংশানুক্রমিক অথর্ববেদের ঋষিগণ তাহা অবগত ছিলেন। এই রোগদের বলা হইত 'ক্ষেত্রীয়।'

অথর্ববেদে ত্রিধাতুর আভাস আছে। অথর্ববেদোক্ত শুষ্ক, সিক্ত ও সঞ্চারী শব্দত্রয় পরবর্তীকালের ত্রিধাতু বায়ু, পিত্ত ও কফকে বুঝায়, সায়নাচার্য এরূপ মনে করেন। তবে শুষ্ক, সিক্ত ও সঞ্চারী নানা প্রকার বিকৃতির ফলেই যে রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে, এইরূপ মত সব সময় গৃহীত হইতে দেখা যায় না। বিভিন্ন জাতীয় ভূতবর্গের আক্রমণে শরীর ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে, সাধারণভাবে অথর্ববেদ এই মতই প্রচার করিয়াছে। এই সকল ভূত ও পিশাচ জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে যাতুবান, কিমীদিন, অমীবা, রক্ষ, অত্রিন, কণ্ব, দয়াবিন্, অলিংস, বৎসক, পলাল, শর্ক, কোক, মলিম্লুচ, পলীজক, বব্রীবাসস্ অশ্রেষ, প্রমালিন ইত্যাদি প্রধান। সময়ে সময়ে দেবগণও মানবদেহে আশ্রয় করিয়া নানা রোগের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যেমন, জলোদরের কারণ স্বয়ং বরুণদেব। সুতরাং দেহকে রোগমুক্ত করিতে হইলে আক্রমণকারী এইসব ভূত, পিশাচ ও দেবতাদের বিতাড়ন করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে অথর্ববেদে নানা প্রকার শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, মন্ত্রপাঠ ও কবচ ধারণের বিশষ ব্যবস্থা বর্ণিত দেখা যায়।

অথর্ববেদে রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে মন্ত্র ও কবচাদির বাহুল্য থাকিলেও নানাবিধ ভেষজের অলৌকিক গুণের কথাও নানা স্থানে বর্ণিত আছে। উদ্ভিদ ও ভেষজের ক্ষমতা সম্বন্ধে বর্ণনাগুলি পাঠ করিলে মনে হয়, অথর্ববেদের সময় গাছ-গাছড়ার সাহায্যে চিকিৎসারও বিশেষ প্রচলন ছিল। এই শেষোক্ত উপায়ে যাঁহারা রোগের চিকিৎসা করিতেন, তাঁহাদের বলা হইত ভিষক। এইরূপ শত শত ভিষক এবং সহস্র সহস্র ভেষজের উল্লেখ আমরা অথর্ববেদে পাই—'শতং হ্যস্য ভিষজঃ সহস্রম্ উত বীরুধঃ'—অথ ২।৯।৩।

মনে হয় অথর্ববেদের আমলে মন্ত্রবাদী ও ভেষজবাদীদের মধ্যে একটা বিরোধ ছিল এবং কালসহকারে শেষোক্ত দলই প্রাধান্য লাভ করে। মানবদেহ ও উদ্ভিদ সম্বন্ধে জ্ঞান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে মন্ত্রবাদীদের প্রভাবও ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হইতে থাকে। কৌশিক-সূত্রে বহুবিধ উদ্ভিজ্জ ঔষধের নাম পাওয়া যায়, যেমন—পলাশ, কাম্পিল, বরণ, জঙ্গির, অর্জুন, বেতস্, শমী, শমকা, দর্ভ, দূর্বা, যব, তিল, ইঙ্গিড় তৈল, বীরিণ, উষীর, ক্ষদির, ত্রপুস, মুঞ্জ, ক্রিমুক, নিতত্নী, জীবী, অলাকা, লাক্ষা, বিস, হরিদ্রা, পিপ্পলী, অলাবু, খলতুল, করীর, শিগ্রু, বিভীতক, শামীবিম্ব, শীর্ণপর্ণা, প্রিয়ঙ্গু, হরিতকী, পূতিকা ইত্যাদি। ক্ষতস্থানে জলৌকা এবং সর্পদষ্ট স্থান অগ্নিকর্ম দ্বারা পোড়াইবার বিধি কৌশিকসূত্রে দেখা যায়। যুদ্ধে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন হইলে ধাতু অথবা কাষ্ঠনির্মিত কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহারের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের অশ্বিনীকুমার বিশ্পলার ছিন্নপদে একটি লৌহপদ জুড়িয়া দেন।

তিনি ঋজাশ্ব, পরাবৃজ, কণ্ব ও কক্ষিবতের অন্ধত্ব দূর করেন; বহু বন্ধ্যা নারীকে সুপ্রজা করেন। এই সব কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি যাহাই হউক, বৈদিক যুগে চিকিৎসা ব্যাপারে প্রাচীন আর্য ঋষিদিগের শিক্ষায় ও লেখনীতে ব্যবহারিক ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের পূর্ণ প্রকাশ যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

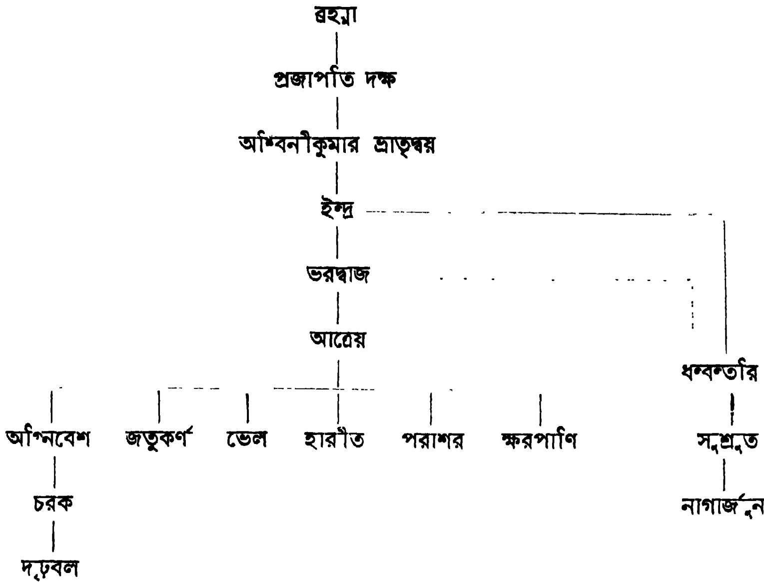
আয়ুর্বেদ ঃ অথর্ববেদের উল্লিখিত শারীরবৃত্ত সম্প্রসারণ করিয়া আয়ুর্বেদ রচিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ আয়ুর্বেদ (আয়ুর্বিদ্যা) অথর্ববেদেরই এক শাখাবিশেষ। সুশ্রুত বলেন, আয়ুর্বেদ অথর্ববেদেরই উপাঙ্গ এবং সহস্র অধ্যায়ে লক্ষ শ্লোকে ইহা ব্রহ্মা কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। বৃদ্ধ বাগ্‌ভট আয়ুর্বেদকে অথর্ববেদের উপবেদ বলিয়াছেন। আবার অনেক মনীষীর মতে আয়ুর্বেদ স্বতন্ত্র বেদ। চরক ও ডহ্লণ এই শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী। লক্ষ শ্লোকাত্মক আয়ুর্বেদ, ডহ্লণের মতে, মাত্র মোট ছয় হাজার মন্ত্রে সমাপ্ত অথর্ববেদের উপাঙ্গ হইতে পারে না। তথাপি অথর্ববেদের সহিত আয়ুর্বেদের নানা মিল ও নিবিড় সম্বন্ধ উপেক্ষণীয় নহে। এই বিশেষ যোগ বহু প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান।

আয়ুর্বেদের আলোচনা আটভাগে বিভক্তঃ (১) কায়তন্ত্র (সাধারণ চিকিৎসাবিদ্যা); (২) শল্যতন্ত্র (শল্যবিদ্যা ও ধাত্রীবিদ্যা); (৩) শালাক্যতন্ত্র (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গলদেশের চিকিৎসা); (৪) ভূতবিদ্যা (মনোবিকার, বাতুলতা প্রভৃতি রোগের আলোচনা ও চিকিৎসা); (৫) কৌমারভৃত্য (শিশু-চিকিৎসা); (৬) অগদতন্ত্র (বিষ ও বিষক্রিয়া প্রভৃতির আলোচনা); (৭) রসায়নতন্ত্র (রসায়ন, বার্ধক্যে স্বাস্থ্যরক্ষাবিধি); এবং (৮) বাজীকরণতন্ত্র (কামজ পুনর্যৌবন প্রদান প্রসঙ্গ)। প্রসঙ্গতঃ 'রসায়ন' শব্দটি অথর্ববেদোক্ত 'আয়ষ্যাণি' শব্দ হইতে উদ্ভূত। 'আয়ষ্যাণি'র অর্থ দীর্ঘ জীবন ও স্বাস্থ্য লাভের উপায়।

এইরূপ প্রাচীনকালে (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দের পূর্বে) সমগ্র শারীরবৃত্তের এত সুন্দর ও প্রণালীবদ্ধ আলোচনার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোন দেশে দেখা যায় না। তথ্যের সমাবেশ ও আলোচনাপদ্ধতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি প্রতিফলিত হইয়াছে। বিশেষতঃ কায়তন্ত্র, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র প্রভৃতি আয়ুর্বিদ্যার কয়েকটি বিভাগের বিষয়বস্তু বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির কথা বলিতে অবশ্য আমরা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির কথা বলিতেছি না। আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে তিন হাজার বৎসর পূর্বের চিকিৎসক ও শারীরবৃত্ত-বিশারদের জ্ঞান যাচাই করিবার চেষ্টা অসঙ্গত। এই সময়ে বিভিন্ন দেশে সভ্য জাতির মধ্যে সাধারণতঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে উন্নতি দেখা যায়, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে আয়ুর্বেদোক্ত জ্ঞান বিচার করিলেই ইহার অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাচীন ভারতীয় বৈদ্য ও ভিষকদিগের আশ্চর্য প্রতিভা আপনা হইতেই প্রকাশ পাইবে।

আয়ুর্বেদের ইতিহাস ঃ আয়ুর্বেদ প্রথমে কে বা কাহারা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নাই। সম্ভবতঃ বহু শতাব্দী ধরিয়া বহু সুচিকিৎসক ও শারীরবিদ্‌দের অভিজ্ঞতা ধীরে ধীরে এই শাস্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর অনুরূপ সময়ে আমরা আত্রেয় ও সুশ্রুতের সাক্ষাৎ পাই। এই দুই চিকিৎসকই ঐতিহাসিক পুরুষ। তাহার পূর্বে যে সকল চিকিৎসক ও শারীরবিদের নাম পাওয়া যায় যেমন—দক্ষ, ইন্দ্র, ভরদ্বাজ, ভৃগু, ধন্বন্তরি, নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্যের অভাবে তাঁহাদের বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ করা কঠিন। এ সম্বন্ধে প্রচলিত নানা কিংবদন্তীর অধিক কিছু বলা সম্ভবপর নহে। চরক-সংহিতায় উল্লিখিত এইরূপ একটি কিংবদন্তী অনুসারে ব্রহ্মা শারীরবৃত্তের জ্ঞান প্রথম দক্ষকে শিখান, দক্ষের নিকট ইহা শিক্ষা করেন অশ্বিনীকুমার ভ্রাতৃদ্বয়। ইন্দ্র অশ্বিনীকুমার ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট এই জ্ঞান অবগত হইয়া তাঁহার প্রিয় শিষ্য ভরদ্বাজের নিকট ইহা প্রকাশ করেন। শেষে আত্রেয় ভরদ্বাজের কাছে এই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। আত্রেয়র ছয়টি সুযোগ্য শিষ্য অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষরপাণি হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। অগ্নিবেশ চরকের গুরু। আর একটি কিংবদন্তী অনুসারে কাশীরাজ ধন্বন্তরি

এই জ্ঞান ইন্দ্রদেবের (বা তাঁর শিষ্য ভরদ্বাজের) নিকট লাভ করিয়া পরে তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য সুশ্রুতকে অর্পণ করেন। ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার উদ্ভব সম্বন্ধে প্রচলিত নানা কিংবদন্তী



ও বৈদিক সাহিত্যের উল্লিখিত নানা ঋষির ও দেববৈদ্যগণের কথা যাহারা জানিতে ইচ্ছুক, ডাঃ গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের *History of Indian Medicine*, Vol. I & II, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত) তাঁহারা পড়িতে পারেন।

আত্রেয় ও সুশ্রুতের কাল হইতেই প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসের সূত্রপাত। ইহার অর্থ এই যে, এখন হইতে কোন ভারতীয় শারীরবিদ্ কখন কি কি গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন ও চিকিৎসাশাস্ত্র ও শারীরবৃত্তের বিবর্তনে কাহার অবদান কতটুকু, তাহা মোটামুটিভাবে বলা চলে। আত্রেয় ও সুশ্রুত হইতে স্বনামধন্য ভারতীয় চিকিৎসকগণ আর বিস্মৃত কিংবদন্তী যুগের মানুষ নহেন, ঐতিহাসিক নানা ঘটনাস্রোতের মধ্য হইতে তাঁহাদের চিনিয়া লইতে অসুবিধা হয় না। ইতিহাসের দিক হইতে তাই আত্রেয় ও সুশ্রুতকে ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জন্মদাতা মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে।

আত্রেয় (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দ)

আত্রেয় ঋষি অত্রির পুত্র। তাঁহার পুরা নাম আত্রেয় পুনর্বসু। পুরা নাম বলা হইল, কারণ, বৈদিক যুগে বা বৌদ্ধযুগে আত্রেয় নামে একাধিক চিকিৎসকের নাম পাওয়া যায়। বৌদ্ধ জাতকের নজির হইতে হোয়ের্নলে মনে করেন, আত্রেয় সম্ভবতঃ তক্ষশীলার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে বা তাহার কিছু আগে তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি চিকিৎসাবিদ্যার বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; তন্মধ্যে আত্রেয়-সংহিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত। নানা প্রকার ব্যাধি, দ্রব্যগুণ, ভেষজ, চিকিৎসাবিধান ইত্যাদি এই গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয়। আত্রেয়চিকিৎসা-পদ্ধতির কথা আরও বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহার শিষ্যগণ। অগ্নিবেশ কর্তৃক রচিত অগ্নিবেশতন্ত্র অবলম্বনেই চরক ও দৃঢ়বল চরক-সংহিতা প্রণয়ন করেন। ভেল ও হারীত-সংহিতাও অতি

মূল্যবান প্রাচীন চিকিৎসার গ্রন্থ। এই সব গ্রন্থ হইতেও আত্রেয়র চিকিৎসা-পদ্ধতির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়।

সুশ্রুত

সুশ্রুত ঋষি বিশ্বামিত্রের পুত্র। কাশীরাজ দিবোদাস বা ধন্বন্তরির নিকট তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করেন, এইরূপ জনশ্রুতি। সম্ভবতঃ কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া থাকিবেন। আত্রেয় ছিলেন প্রধানতঃ চিকিৎসাবিদ্যা বা কায়তন্ত্রে পারদর্শী; সুশ্রুত ছিলেন শল্যবিদ্যাবিশারদ্। সুশ্রুতের কাল বৈদিক যুগের মাঝামাঝি বা শেষভাগ। সুশ্রুত আত্রেয়র উল্লেখ করিয়াছেন, শতপথ ব্রাহ্মণে সুশ্রুতের মতামতের আলোচনা আছে। সুতরাং তিনি আত্রেয়র পরবর্তী এবং ব্রাহ্মণ-সাহিত্যাদি রচনাকালের পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক। হোয়েৰ্নলের ধারণা, সুশ্রুত খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি আত্রেয়র ছোট, সম্ভবতঃ অগ্নিবেশের সমসাময়িক।

আত্রেয়-সংহিতার মত সুশ্রুত-সংহিতার মৌলিক বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয় নাই। সুশ্রুতের শিষ্য ঔপধেনব, ঔরভ্র ও পুষ্কলাবত এবং আরও পরে নাগার্জুন মৌলিক গ্রন্থের পরিবর্তন ও প্রতিসংস্কার করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, প্রাচীনকাল হইতেই এই গ্রন্থের বিশ্বজোড়া খ্যাতির প্রমাণ ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় ইহার অনুবাদ। অষ্টম শতকের শেষে এই গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। ইবন্ আবিল সৈবিয়াল এই গ্রন্থকে "কিতাব-ই-সুস্রুদ" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। আল্‌রাজি সুশ্রুতকে শল্যবিদ্যার প্রামাণিক গ্রন্থ মনে করিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ল্যাটিন, জার্মান, ইংরেজী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় সুশ্রুত অনূদিত হয়।

জীবক কোমারভচ্চ

সুশ্রুতের পর বুদ্ধের সমসাময়িক (খ্রীঃ পূঃ ৫৬৬-৪৮৬) মগধাধিপতি বিম্বিসারের রাজবৈদ্য জীবক কোমারভচ্চের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জীবকের জন্মস্থান রাজগৃহ। চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জনের জন্য সেই সময়ে আয়ুর্বেদ শিক্ষার পীঠস্থান সুদূর তক্ষশীলায় তিনি সাত বৎসর অতিবাহিত করেন। তিনি আত্রেয়র শিষ্য ছিলেন। পুনর্বসু আত্রেয় ছাড়া কৃষ্ণাত্রেয় ও ভিক্ষু আত্রেয় নামে আরও দুইজন আত্রেয়র কথা জানা যায়; জীবক কোন্ আত্রেয়র শিষ্য ছিলেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন।

সমগ্র আয়ুর্বিজ্ঞানে জীবকের কিরূপ গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান ছিল সে সম্বন্ধে জাতকের একটি গল্প বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শিক্ষা সমাপনান্তে তক্ষশীলার এক বিখ্যাত আচার্য জীবক ও অন্যান্য শিষ্যদের প্রত্যেককে একটি খননযন্ত্র দিয়া তক্ষশীলার চতুর্দিকে এক যোজনের মধ্যে নির্গুণ কোন উদ্ভিদ্ বা গুল্ম পাওয়া যায় কিনা তাহা অনুসন্ধান করিতে আদেশ দেন। অন্যান্য শিষ্যদের প্রত্যেকেই একাধিক উদ্ভিদ্ সংগ্রহ করিয়া গুরুর নিকট জানাইলেন যে, ভেষজ হিসাবে ইহারা নির্গুণ। বহু বিলম্বে রিক্ত হস্তে ফিরিলেন জীবক। ভেষজ হিসাবে সম্পূর্ণ নির্গুণ কোন উদ্ভিদই তাঁহার চোখে পড়ে নাই। আচার্য বুঝিলেন উদ্ভিদের গুণাগুণ সম্বন্ধে জীবকের জ্ঞান সম্পূর্ণ হইয়াছে।

আত্রেয়-প্রবর্তিত চিকিৎসা-পদ্ধতিতে কায়চিকিৎসাই প্রধান স্থান অধিকার করে। কিন্তু জীবক শল্যচিকিৎসাতেও অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী পাঠে জানা যায় যে, অনেক স্থলেই তিনি মাথার করোটি কাটিয়া ক্ষতস্থান হইতে ক্রিমি বাহির করিতেন এবং এইভাবে রোগীর শিরঃপীড়া দূর করিতেন। রাজগৃহে এক ধনীর স্ত্রীর উদরে অস্ত্রোপচার করিয়া অন্ত্রগুলি তিনি বাহির করেন এবং তাহাদের মধ্যে যেগুলি গ্রন্থি পাকাইয়া গিয়াছিল সেগুলি উন্মোচন করিয়া পুনরায় তাহাদের যথাস্থানে

সংস্থাপন করেন। জীবকের এইরূপ আশ্চর্য অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে বহু কাহিনী বিবৃত আছে। বুদ্ধকে কয়েকবার তিনি দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে নীরোগ করেন। তাঁহার চিকিৎসায় নৃপতি বিম্বিসারও কঠিন ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ করেন।

জীবকের চিকিৎসা-খ্যাতি সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। বৈশালী, বারাণসী, সাকেত এমন কি সুদূর উজ্জয়িনী হইতে রোগীরা তাঁহার নিকট চিকিৎসিত হইতে মগধে আসিত। চিকিৎসার জন্য তিনি মোটা অর্থ গ্রহণ করিতেন। কথিত আছে, কোন কোন ক্ষেত্রে ১৬,০০০ কার্ষাপণও দর্শনী হিসাবে ধার্য হইত।

শিশু-চিকিৎসায় জীবক সে যুগে অদ্বিতীয় ছিলেন। কাশ্যপ-সংহিতা নামে এক বিরাট চিকিৎসার গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। ইহার নয়টি অধ্যায় হইলঃ (১) সূত্রস্থান, (২) নিদানস্থান, (৩) বিমানস্থান, (৪) শারীরস্থান, (৫) ইন্দ্রিয়স্থান, (৬) চিকিৎসাস্থান, (৭) সিদ্ধিস্থান, (৮) কল্পস্থান ও (৯) খিলস্থান।

চরক

আত্রেয়-প্রবর্তিত চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রধান উদ্যোক্তা চরক। তাঁহার প্রণীত চরক-সংহিতা মুখ্যতঃ অগ্নিবেশ-তন্ত্রের সম্প্রসারিত ও সংশোধিত সংস্করণ। এই সংস্কার সাধন তিনি একা করেন নাই। দৃঢ়বল নামে আর একজন প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসক অগ্নিবেশ-তন্ত্রের পরবর্তী অধ্যায়গুলির সংস্কার সাধন করেন। যাহা হউক, চরক আত্রেয়-অগ্নিবেশের পরবর্তী। প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ 'ত্রিপিটকে' দেখা যায়, চরক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে কনিষ্কের রাজত্বকালে রাজবৈদ্য ছিলেন। কনিষ্কের রাজত্বকাল সম্বন্ধে অবশ্য অনেক মতদ্বৈধ আছে। খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতক হইতে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে ঠিক কখন তিনি রাজত্ব করিতেন তাহা নিশ্চিতরূপে নির্ধারিত হয় নাই। তারপর ত্রিপিটকের উল্লিখিত চরক এবং চরক-সংহিতার প্রণেতা চরক এক ব্যক্তি কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে। গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন পাণিনী (খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী) ও পতঞ্জলি (খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) চরক-সংহিতার উল্লেখ করিয়াছেন।* সুতরাং খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দ হইতে খ্রীষ্টীয় ২০০ অব্দের অর্থাৎ ৮০০ বৎসরের কোনও সময়ে খুব সম্ভব কাশ্মীরে চরক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের তারিখ সম্বন্ধে এই অনিশ্চয়তা বিরক্তিকর। এইজন্য এইসব তারিখ সুনির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক তৎপরতার বিচার-বিশ্লেষণে যে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা বারংবার স্মরণ করাইয়া থাকেন।

সুশ্রুত-চরকের শল্যবিদ্যা ও চিকিৎসা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

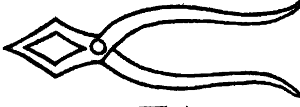
এইত গেল প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসক ও শারীরবিদ্‌দের কথা। সুশ্রুত ও চরক হইতে প্রাচীন ভারতের শল্যবিদ্যা ও চিকিৎসা সম্বন্ধে কিরূপ জ্ঞান ছিল তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

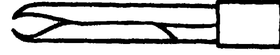
শল্যবিদ্যাঃ অথর্ববেদে ও আয়ুর্বেদে শল্যতন্ত্রের উল্লেখ ও আলোচনা আছে। সুশ্রুতের সময়ে এই বিদ্যার প্রভূত উন্নতি ঘটে। সুশ্রুত ছিলেন অস্ত্রচিকিৎসক; সুতরাং তাঁহার সংহিতায় শল্যবিদ্যাকেই তিনি আলোচনার প্রধান বিষয় করিয়াছেন।

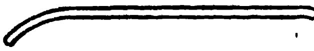
অস্ত্রচিকিৎসার গোড়ার কথা হইল নানাবিধ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার। প্রায় ১২১টি বিবিধ যন্ত্রপাতির উল্লেখ সুশ্রুতে আছে। যন্ত্রগুলি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্তঃ (১) যন্ত্র ও (২) শস্ত্র; প্রথমোক্তগুলির মুখ ভোঁতা, দ্বিতীয়োক্তের তীক্ষ্ণ ও ধারাল।

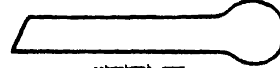
* Girindra Nath Mukhopadhyaya, *The Surgical Instruments of the Hindus*, Calcutta University, 1913, p. 7.

যন্ত্রগুলির সংখ্যা প্রায় ১০১ এবং ইহারা ছয় রকমের: (১) স্বস্তিক—সাঁড়াশি, ফরসেপ ইত্যাদি; (২) সন্দংশ—চিমটা, সাঁড়াশি; (৩) তাল—ইহাও এক প্রকার সাঁড়াশি বা চিমটা বিশেষ; (৪) নাড়ী—ক্যাথিটার, বিভিন্ন আকারের ও দৈর্ঘ্যের নল বিশেষ; (৫) শলাকা—শলাকা, দণ্ড ইত্যাদি; ও (৬) উপযন্ত্র—উপরিউক্ত যন্ত্রের অনুষঙ্গ। তীক্ষ্ণধার শস্ত্র ২০


সন্দংশ


তাল যন্ত্র


নাড়ী যন্ত্র


শলাকা যন্ত্র

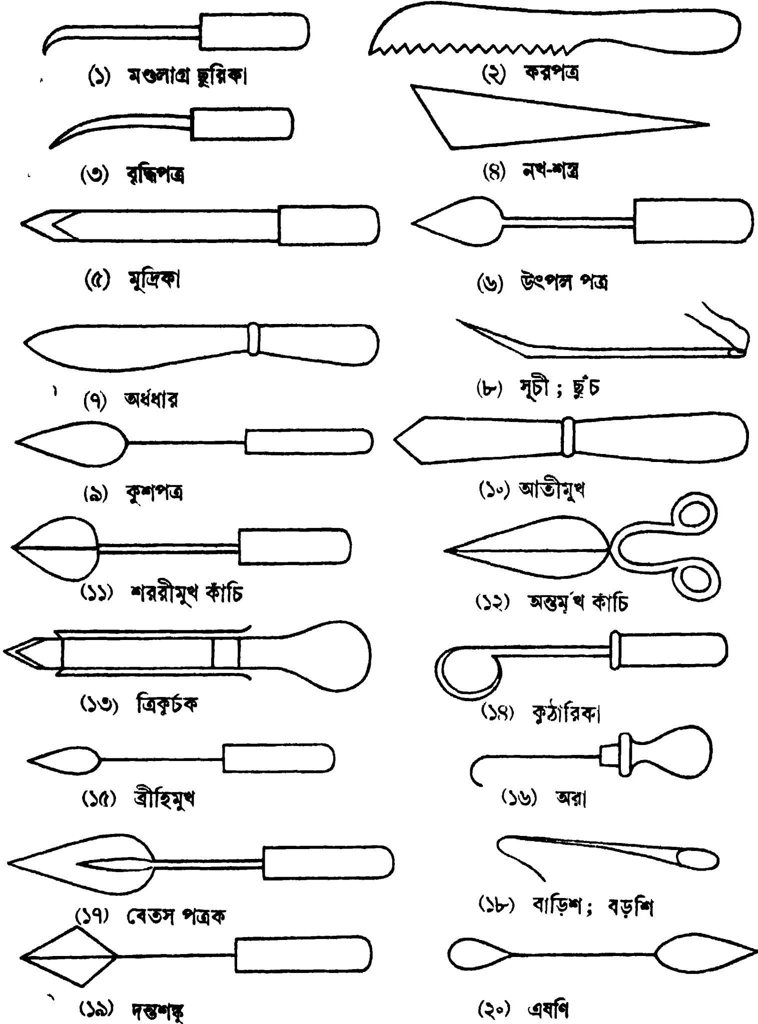
৫১। সুশ্রুতে বর্ণিত কয়েক প্রকার যন্ত্র।

প্রকারের:—(১) মণ্ডলাগ্র—গোলাকার ছুরিকা; (২) করপত্র—হাতের মত দেখিতে করাত; (৩) বৃদ্ধিপত্র—ক্ষুর; (৪) নখ-শস্ত্র—নখের মত শস্ত্র; (৫) মুদ্রিকা—আঙ্গুলের মত ছুরিকা; (৬) উৎপলপত্র—পদ্মপত্রের মত ছুরিকা; (৭) অর্ধধার—ছুরিকা, ইহার ধার একদিকে; (৮) সূচী—ছুঁচ; (৯) কুশপত্র—ছুরিকার ফলা (ঘাসের মত); (১০) আতীমুখ—আতী পক্ষীর চঞ্চুর মত ছুরিকা; (১১) শররীমুখ—কাঁচি, শররী পক্ষীর চঞ্চুর মত; (১২) অন্তর্মুখ—কাঁচি; (১৩) ত্রিকূর্চক—তিন ছুঁচ বিশিষ্ট শস্ত্র; (১৪) কুঠারিকা—ক্ষুদ্র কুঠার; (১৫) ব্রীহিমুখ—ভ্রোকার (ইংরেজী); (১৬) অরা; (১৭) বেতসপত্রক; (১৮) বাড়িশ—বড়শি; (১৯) দন্তশঙ্কু—দন্তোৎপাটনী শস্ত্র; এবং (২০) এষণি—ক্ষতের গভীরতা পরীক্ষার জন্য তীক্ষ্ণাগ্র শলাকা বিশেষ। চিত্রে কয়েকটি যন্ত্র ও শস্ত্রের নমুনা দেওয়া হইল। কি ধরনের অস্ত্রোপচারে কিরূপ যন্ত্র ও শস্ত্র ব্যবহার করিতে হইবে, তাহার বিশদ নির্দেশ আছে। ছাত্রদের চামড়ার থলি অথবা মাছের পটকা জলপূর্ণ করিয়া তাহার উপর অস্ত্রোপচার অভ্যাস করিবার পরামর্শ দেওয়া হইত।

অতি জটিল ও কঠিন নানা ধরনের অস্ত্রোপচারে হিন্দু শল্যবিদ্‌রা যে কুশলী ও পারদর্শী ছিলেন, তাহা উপরিউক্ত যন্ত্র ও শস্ত্রের বহর হইতেই সহজে বুঝা যায়। ভগন্দর (anal fistula), টনসিল, চোখের ছানি, ভ্রূণ, হার্নিয়া ইত্যাদি অস্ত্রোপচারের বিশদ বিবরণ সুশ্রুতে দেওয়া আছে। উদ্ভিদের আঁশ ও পশুর লোমের দ্বারা অস্ত্রোপচারের পর কাটা স্থান সেলাই করা হইত। দেহের বিভিন্ন স্থানে ফোড়ার অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে অতি পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যেমন, ফোড়ার গর্তের অভিমুখে ছুরিকা চালাইতে হইবে; চক্ষু, গণ্ড, অধর, ওষ্ঠ প্রভৃতি দেহের বিশেষ অংশে অস্ত্রোপচার তির্যকভাবে (transverse) করা উচিত; হাত ও পায়ের পাতায় বৃত্তাকারে, ইত্যাদি। অস্ত্রোপচারের পর গরম জলে ক্ষতস্থান ধোওয়া, কাপড়ের গজ ঢুকানো, পুলটিস দেওয়া, পটি বাঁধা প্রভৃতির বিশদ নির্দেশগুলি পড়িলে মনে হইবে ইহা যেন কোন আধুনিক শল্যবিদ্যার গ্রন্থ। হাড় ভাঙিয়া, চিরিয়া বা সরিয়া গেলে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার, তাহা একটি পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে।

রিণোপ্লাস্টি: রিণোপ্লাস্টি (rhinoplasty) বা নবনাসিকা-প্রস্তুত-বিদ্যা প্রথম ভারতবর্ষেই আবিষ্কৃত হয় এবং সেই সঙ্গে প্লাস্টিক সার্জারি। মনু-সংহিতায় ব্যভিচারের শাস্তিস্বরূপ অপরাধীর নাক কান কাটিবার নির্দেশ ছিল। ক্যাস্টিগ্লিওনি দেখাইয়াছেন, অপরাধীর শাস্তিবিধান সম্পর্কে এই প্রকার ব্যবস্থা ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম রিণোপ্লাস্টি

আবিষ্কারের প্রধান কারণ।* নবনাসিকা-প্রস্তুত সম্বন্ধে সুশ্রুতের পরামর্শ অনুসারে গাছের পাতাকে প্রথমে কাটা নাকের সমান করিয়া কাটিয়া সেই পাতার মাপে গন্ডদেশ হইতে কিছুটা



৫২। সুশ্রুতে বর্ণিত শস্ত্র।

চামড়া বা কলা (tissue) কাটিয়া ফেলিতে হইবে। এখন এই কলা নাসিকার কাটা অংশের উপর সযত্নে বসাইয়া সেলাই করিলেই ইহা ধীরে ধীরে দেহের সঙ্গে জুড়িয়া যাইবে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সুবিধার জন্য নূতন নাকের ভিতর আবার দুইটি নল বসাইবার বিধান ছিল। এইভাবে গন্ডদেশ হইতে কিছুটা মাংস কাটিয়া কাটা কানের জায়গায় নূতন কান তৈয়ারী

* Arturo Castiglioni, *A History of Medicine, Alfred* A. Knopf, Inc., 1947, p. 93.

করা হইত। রিণোপ্লাস্টি ভারতবর্ষ হইতে ধীরে ধীরে অন্যান্য দেশে প্রবর্তিত হয়। বার্লিনের ডাঃ হির্শবের্গ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"....The whole plastic surgery in Europe had taken its new flight when these cunning devices of Indian workmen became known to us. The transplanting of sensible skin flaps is also an entirely Indian method."*

ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন গ্রীকদের সহিত এদেশের সম্পর্ক স্থাপনের পর হইতে সুরু হইয়াছিল, এককালে ইউরোপীয় পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকগণ তাহা সদর্পে প্রকাশ করিতে





৫৩। রিণোপ্লাস্টি বা নবনাসিকা-প্রস্তুত-প্রণালী
(*Gentleman's Magazine*, Calcutta, Oct., 1794).

কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। বিজ্ঞানসম্মতভাবে চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা ও অভ্যাসের জন্য তাঁহারা বরাবর গ্রীক হিপোক্রেটিস্ ও তাঁহার শিষ্যগণকেই কৃতিত্ব দিয়া আসিয়াছেন। এখন পাশ্চাত্ত্য

* Bhagvat Sinhjee, *A short History of Aryan Medical Science*, Macmillan & Co. 1896, p. 178.

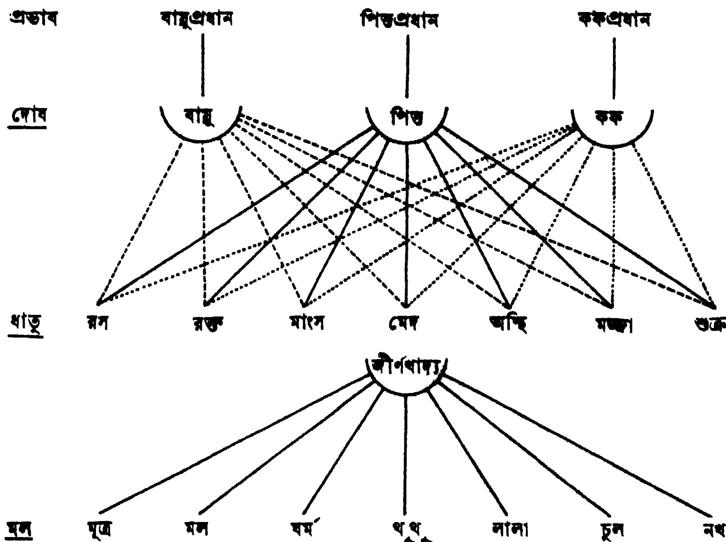
পণ্ডিতগণই স্বীকার করেন, হিপোক্রেটিসের বহু পূর্বে ভারতীয় চিকিৎসকগণই শল্যবিদ্যায় আশ্চর্য উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যে সব দুরূহ অস্ত্রচিকিৎসায় পারদর্শী দেখা যায়, হিপোক্রেটিস্ ও তাঁহার শিষ্যবর্গের তাহা কল্পনাতীত ছিল।

ক্যাস্‌টিগ্‌লিওনি লিখিয়াছেন,—

> "In it (surgery) we find proof of the priority of Indian to Hippocratic medicine. Indeed, operations are described in the Indian texts, such as that of anal fistula, which are not named in the Hippocratic writings."*

বৈদিক যুগে শল্যবিদ্যার আদর ছিল, শল্য-চিকিৎসক ছিলেন সমাজে সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য যুগে নানা কুসংস্কার মাথা চাড়া দিয়া উঠিলে অস্ত্রচিকিৎসা ক্রমশঃ অতি হীন ও ঘৃণ্য ব্যবসায় বলিয়া পরিগণিত হয়। শিক্ষিত ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অবজ্ঞাত ও পরিত্যজ্য হইয়া অশিক্ষিত নীচ সম্প্রদায়ের মধ্যে শল্যবিদ্যা আশ্রয় গ্রহণ করে। বৌদ্ধদিগের অহিংসা ধর্মও শল্যবিদ্যার অগ্রগতির প্রতিকূল হইয়াছিল। বৌদ্ধযুগে চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্যান্য বিভাগে নানা উন্নতি সত্ত্বেও শল্যবিদ্যার দ্রুত অবনতি রোধ করা সম্ভবপর হয় নাই।

ত্রিদোষবাদ ও চিকিৎসা পদ্ধতি: বৈদিক চিকিৎসা পদ্ধতি একটি বিশিষ্ট মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা কেবল অনুমান ও আন্দাজ হইতে উদ্ভূত নহে। এই মতবাদের নাম ত্রিদোষ-বাদ। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, ঋগ্বেদে ও অথর্ববেদে এই ত্রিদোষবাদের আভাস পাওয়া যায়। বায়ু, পিত্ত ও কফ তিন প্রকার দোষের মধ্যে সমতা রক্ষাই স্বাস্থ্যের কারণ। এই সমতা কোনও কারণে ব্যাহত হইলে দেহে রোগের আবির্ভাব ঘটে। নাভি হইতে পদতল পর্যন্ত



৫৪। আয়ুর্বেদোক্ত ত্রিদোষবাদ।

দেহাংশে বায়ুর অবস্থান; নাভি হইতে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পিত্তের; এবং হৃৎপিণ্ড হইতে মস্তক পর্যন্ত অংশে কফের রাজত্ব। এই তিন দোষ দেহকে পরিচালনা করিয়া থাকে এবং তাহাদের তারতম্য হেতু বিভিন্ন আকৃতির, মেজাজের ও ব্যক্তিত্বের মানুষ আমরা দেখিতে পাই।

* Castiglioni, *loc. cit.*, p. 90.

দেহ সাতটি 'ধাতুর' সমন্বয়ে গঠিত—রস (জীর্ণ খাদ্য), রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। সাতটি ধাতু বায়ু, পিত্ত ও কফের দ্বারা প্রভাবিত। রস বা জীর্ণ খাদ্য হইতে নানা প্রকার 'মল' নির্গত হইয়া থাকে, যেমন মূত্র, মল, ঘর্ম, চুল, নখ ইত্যাদি। আয়ুর্বেদ মতে, একমাত্র দোষ, ধাতু ও মল বিচারের দ্বারাই স্বাস্থ্য ও ব্যাধির কারণ নির্ণয় করা সম্ভবপর এবং তাহার বিচার হইতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। দোষ, ধাতু ও মলের পারস্পরিক সম্পর্ক চিত্রে দেখানো হইল।

ব্যাধি দুই প্রকারের—শারীরিক ও মানসিক। ব্যাধির কারণও দুই প্রকার, (১) নিজ বা অন্তর্নিহিত, (২) আগন্তুক বা বহিরাগত। 'পূর্বরূপ' বা প্রাথমিক লক্ষণ, 'লিঙ্গো' বা রোগের আবির্ভাবের পর লক্ষণসমূহ ও 'উপচয়' বা রোগীর উপর খাদ্য ও ঔষধের ক্রিয়া বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাধির স্বরূপ জানিতে হইবে। রোগের লক্ষণসমূহের মধ্যে জ্বরের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। জ্বরের বহু প্রকারভেদ হয়; ত্রিদোষের অল্পবিস্তর বিকৃতি হইতে সাত প্রকার জ্বর ও আঘাত ও ক্ষতজনিত এক প্রকার জ্বর উল্লিখিত হইয়াছে। বায়ু, পিত্ত ও কফ ত্রিদোষের বিকৃতিজনিত জ্বর অতি সাংঘাতিক ও দুরারোগ্য। ক্ষয়রোগ রাজ-রোগরূপে বর্ণিত। বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির জ্ঞান বর্তমান, কারণ বসন্তের গুটির অতি পরিষ্কার বর্ণনা দেখা যায়। এই গুটি হইতে নির্গত রস টীকা হিসাবে ব্যবহার করিয়া বসন্তের প্রতিষেধকের জ্ঞান প্রাচীন ভারতীয়দের ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ভগবৎ সিংজী দেখাইয়াছেন, জেনারের আবিষ্কারের বহু পূর্বে এদেশে একশ্রেণীর মেষ ও গোপালকের মধ্যে বসন্তের টীকার প্রচলন দেখা যায়।* সম্ভবতঃ ইহা অনেক পরবর্তীকালের আবিষ্কার। মশার সহিত ম্যালেরিয়া জ্বরের উল্লেখ সুশ্রুতে আছে। কোনও স্থানে অস্বাভাবিকভাবে ইঁদুর মরিতে দেখিলে সেই স্থান অচিরে পরিত্যাগ করা আবশ্যক, সুশ্রুতের এইরূপ আর একটি উপদেশ হইতে প্রাচীন হিন্দুদের প্লেগ রোগের সহিত পরিচয় অনুমিত হয়।† প্রাচীন হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রে ডায়াবেটিসের নাম 'মধুমেহ'।

অ্যানাটমি, ভ্রূণতত্ত্ব প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্যান্য বিভাগের আলোচনায় আয়ুর্বেদ ও সুশ্রুত সমৃদ্ধ। এই সবের উল্লেখ করিয়া আমাদের বক্তব্য আর দীর্ঘতর করিবার ইচ্ছা নাই। যেটুকু বলা হইল তাহা হইতে প্রাচীন ভারতীয়দের চিকিৎসা সম্বন্ধে যে কিরূপ উন্নত জ্ঞান ছিল, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। মানবদেহ ও তাহার বিকার বুঝিবার চেষ্টায় বৈদিক হিন্দুগণ তিন হাজার বৎসর পূর্বে যেরূপ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অতি অল্প দেশেই দেখা যায়।

চীন

এইবার ভারতবর্ষ হইতে সুদূর প্রাচ্যে মহাচীনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। চৈনিক সভ্যতার সুপ্রাচীনত্ব হইতে সেই দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা সুরু হইয়াছিল, তাহা আশা করাই স্বাভাবিক। চৈনিক কিংবদন্তী অনুসারে সম্রাট শেন্ নুঙ্ সে দেশে চিকিৎসাবিদ্যার প্রবর্তক। শেন্ নুঙ-এর রাজত্বকাল আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২৭০০ অব্দ। রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম কৃষির প্রবর্তন করেন। তিনি প্রায় একশত ভেষজের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

নেই চিঙ্ঃ চীনের প্রাচীনতম চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থ 'নেই চিঙ্' (Nei Ching) বা 'চিকিৎসাশাস্ত্র'। ইহার রচয়িতা সম্রাট হুয়াং-তি (খৃঃ পূঃ ২৬৯৮-২৫৯৯)। হুয়াং-তি'র কাল নিরূপণ সঠিক হইলে 'নেই চিঙ্' শুধু চীনের নহে, সমগ্র পৃথিবীর প্রাচীনতম চিকিৎসার গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অবশ্য সন্দেহ আছে; আধুনিক চৈনিক বিশেষজ্ঞরাই

* Bhagvat Sinhjee, *A short History of Aryan Medical Science*, p. 179.
† Castiglioni, *loc. cit.*, p. 89.

মনে করেন, বর্তমান আকারে এই গ্রন্থ খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতকের পূর্বে লিপিবদ্ধ হয় নাই। প্রাচীনপন্থী চৈনিক চিকিৎসকেরা কেহ কেহ এখনও 'নেই চিঙ্'-এর বিধান অনুযায়ী রোগীর চিকিৎসা করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থ দুইভাগে বিভক্তঃ (১) সু ওয়েন (Su Wen)—ইহা চিকিৎসা সম্পর্কিত সাধারণ বিষয়ের আলোচনা; (২) লিঙ্ সু (Ling Shu)—ইহার আলোচ্য বিষয় শারীরস্থান।

চৈনিক চিকিৎসার দার্শনিক ভিত্তি : 'ইয়াং-ইন্' মতবাদ : প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাবিদ্যা চৈনিক দর্শনের ছাঁচে গড়া। এই দর্শনে ব্রহ্মাণ্ডের সহিত মানুষের সম্পর্ক অভেদ্য। মানুষ বিরাট বহির্ব্রহ্মাণ্ডেরই একটি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি। ব্রহ্মাণ্ড কাষ্ঠ, অগ্নি, মৃত্তিকা, ধাতু ও জলের সমন্বয়ে গঠিত; মানবদেহের উপাদানও এই পাঁচটি দ্রব্য। চৈনিক দর্শনে পাঁচ সংখ্যাটি অতি পবিত্র ও আশ্চর্য গুণসম্পন্ন একটি অলৌকিক সংখ্যা। পাঁচ ধাতু, পাঁচ ইন্দ্রিয়, পাঁচ প্রকার রং, পাঁচ প্রকার স্বাদ, ইত্যাদি এই সংখ্যার বিশেষত্বের একটি নমুনা। চৈনিক সৃষ্টিরহস্যে ও চিকিৎসাবিদ্যায় আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল স্ত্রী ও পুরুষের সম্পর্ক। স্ত্রী ও পুরুষ বিপরীতধর্মী দুই গুণ, প্রথমটির নাম 'ইয়াং' (Yang), দ্বিতীয়টির 'ইন্' (Yin)। ইহাদের সমন্বয়েই বিশ্বজগৎ ও প্রাণিদেহের সংযুতি। আকাশ, সূর্য, আলোক, বল, কাঠিন্য, উত্তাপ, শুষ্কতা প্রভৃতি পুরুষধর্মী; পৃথিবী, চন্দ্র, অন্ধকার, দৌর্বল্য, বাষ্প, শৈত্য প্রভৃতি স্ত্রীধর্মী। 'ইয়াং' ও 'ইন্'-এর সাম্য হইতেই বিশ্বজগতের শৃঙ্খলা, দেহের স্বাস্থ্য; এই দুই ধর্মের সাম্য বিনষ্ট হইলেই বহির্জগতে যেমন অশান্তি ও বিপ্লব দেখা দেয়, মানবদেহও সেইরূপ রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। নদীর জোয়ার-ভাটার মত, সঙ্গীতের উত্থান-পতনের মত 'ইয়াং' ও 'ইন্' মানবদেহে সর্বদা তরঙ্গায়িত হইতেছে। এই তরঙ্গায়িত প্রবাহের গতি রুদ্ধ হইলেই শরীরের বৈকল্য ও ব্যাধি আর রোধ করা যাইবে না। চৈনিক অ্যানাটমি অনুসারে, পাঁচটি প্রধান অঙ্গ দেহের পুষ্টিসাধনের কাজে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই পাঁচটি অঙ্গ হইল : হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ, প্লীহা ও বৃক্ক। এই পাঁচটি প্রধান অঙ্গে আবার পাঁচটি আন্তর যন্ত্র বা ভিসেরা (viscera) সংযুক্ত, যেমন—অন্ত্র, মলাশয়, পিত্তাশয়, বস্তি (bladder) ও পাকস্থলী। পাঁচ প্রকার ধাতু, রং ও ঋতুর এক একটির সহিত এক একটি আন্তর যন্ত্রের সম্বন্ধ। অঙ্গের ও আন্তর যন্ত্রের মধ্যে আবার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা আছে। অঙ্গের মধ্যে হৃৎপিণ্ড শ্রেষ্ঠ। যকৃত ও পাকস্থলী হইল যথাক্রমে হৃৎপিণ্ডের জননী ও পুত্র। বৃক্কের সহিত হৃৎপিণ্ডের শত্রু-সম্বন্ধ, ইত্যাদি।

শোণিত-সংবহন : এক প্রকার শোণিত-সংবহনের (circulation of blood) উল্লেখ দেখা যায়। 'ইয়াং' শোণিত-সংবহন পরিচালনা করে, ঘণ্টায় ৫০ বার শোণিত-সংবহন হইয়া থাকে। এই প্রকার উল্লেখ হইতে অনেকের ধারণা হার্ভির বহু পূর্বে, হয়ত দুই হাজার বৎসর আগে, চৈনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরাই সর্বপ্রথম শোণিত-সংবহন আবিষ্কার করিয়া থাকিবে।* 'ইয়াং' ও 'ইন্'-এর অপূর্ব সমন্বয়ে জড় ও জৈব জগতের সর্বত্র যেখানে তরঙ্গায়িত অনন্ত প্রবাহের কল্পনা, সেখানে মানব দেহাভ্যন্তরেও শোণিতের একপ্রকার সংবহন পরিকল্পনা করা কিছুমাত্র আশ্চর্য নহে। তবে ইহাকে হার্ভির আবিষ্কারের পূর্বাভাস বলা কতদূর সঙ্গত, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

নাড়ী-পরীক্ষা : নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করিয়া রোগীর ব্যাধি নিরূপণ করা হইত। চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে এক অতি জটিল নাড়ী-বিদ্যার উদ্ভব দেখা যায়। এই বিদ্যা অনুসারে

*"On the other hand, even the *Nei Ching* seems to have come close to such an important concept as the circulation of the blood, as may be seen in passages quoted by Wong: 'The heart regulates all the blood in the body. The blood current flows continuously in a circle and never stops'."
—Castiglioni, *loc. cit*, p. 102.

সমগ্র দেহকে একটি বহু-তার-বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা হইত। দেহের এক একটি নাড়ী যেন বাদ্যযন্ত্রের এক একটি তার। বাদ্যযন্ত্রের তারগুলি ঠিক বাঁধা আছে কিনা, তাহা যেমন তারে টঙ্কার দিয়া বুঝিতে হয়, নানাভাবে সযত্নে নাড়ী টিপিয়া সেইরূপ দেহ-যন্ত্রের সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থা নির্ণীত হইত। প্রায় দুইশত বিভিন্ন নাড়ীর বিবরণ ও ব্যাখ্যা চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ ২৬টি নাড়ী মৃত্যু-নির্দেশক। এইরূপ চিকিৎসাবিধিতে রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিতেই চিকিৎসকের কয়েক ঘণ্টা কাটিয়া যাইত।

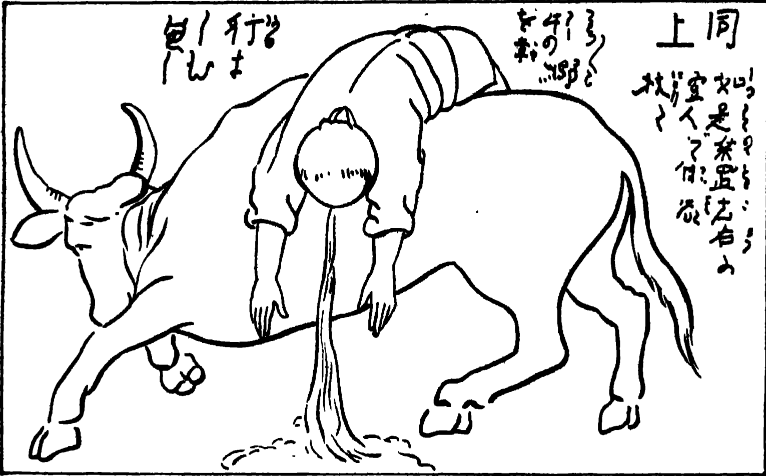


৫৫। শোণিত-সংবহন সম্বন্ধে চৈনিক ধারণার চিত্ররূপ (A. Castiglioni-র *A History of Medicine* গ্রন্থে প্রদত্ত চিত্রাবলম্বনে)।

এইখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসকেরা রোগীর ও তাহার পরিবারের ইতিহাসের উপর কোনরূপ গুরুত্বই অর্পণ করিত না।

রোগের মধ্যে বসন্ত ও সিফিলিসের উল্লেখ প্রাচীনতম। মহামারীর আকারে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব চীনদেশে প্রবল। বসন্তের প্রতিষেধক হিসাবে টীকা দিবার ব্যবস্থার প্রচলন দেখা যায়, কিন্তু এই ব্যবস্থা সম্ভবতঃ চৈনিক আবিষ্কার নহে। বসন্তের গুটি হইতে নির্গত পদার্থ সংগ্রহ ও শুকাইয়া গুঁড়া করিয়া নস্যের মত নাকে গ্রহণ করা হইত। সিফিলিস রোগের তিনটি স্তরের উল্লেখ আছে; এমন কি ইহা যে বংশানুগ, প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসকেরা এইরূপ মনে করিত।

মেটিরিয়া মেডিকায় চৈনিকদের অবদান অতিশয় প্রশংসনীয়। আধুনিককালে 'পেন্ শা'ও ক্যাং মু' (Pen-Ts'ao Kang Mu) নামে যে মেটিরিয়া মেডিকা চৈনিক চিকিৎসকদের প্রামাণিক গ্রন্থ, তাহার রচনাকাল খৃীষ্টাব্দ ষোড়শ শতাব্দী। এই মেটিরিয়া মেডিকা রচনার কার্য সম্রাট শেন্ নুঙ-এর সময় আরম্ভ হয় এবং কাল সহকারে নানা চিকিৎসকের অভিজ্ঞতার দ্বারা ধীরে ধীরে পুষ্ট হইয়া ইহা বর্তমান কলেবর প্রাপ্ত হয়। ৫২ খণ্ডে এই বিরাট মেটিরিয়া মেডিকা সমাপ্ত। ইহাতে দুই হাজার ভেষজ ও ঔষধের বর্ণনা ও গুণাগুণ লিপিবদ্ধ আছে। রক্তাল্পতা রোগে লৌহ, চর্মরোগে আর্সেনিক, সিফিলিসে পারদ প্রভৃতি ঔষধ সেবনের পরামর্শ-দান ইহার বিশেষত্ব।



৫৬। জলমগ্ন ব্যক্তির চিকিৎসা (জাপানী চিত্র হইতে)।

চীনদেশে এই সময়ে শল্যবিদ্যারও প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। হুয়া তো নামে এক প্রাচীন অস্ত্র-চিকিৎসকের কথা জানা যায়। ভারতবর্ষের মত চীনদেশেও শল্যবিদ্যার অবনতি ঘটিয়াছিল। ট্যাং রাজবংশের (খৃীঃ অঃ ৬১৯-৯০৭) পর চীনে শল্যবিদ্যার চর্চা ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। অভিজাত চিকিৎসক-সম্প্রদায় কর্তৃক উপেক্ষিত হওয়ায় ইহার অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়াছিল।

৩·৬। প্রাচীন বিজ্ঞানের অবসান ও তাহার কারণ

নিওলিথিক বিপ্লবের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণের ফলে খৃীঃ পূঃ ৩০০০ অব্দের অনুরূপ সময় হইতে পৃথিবীর কয়েকটি বিশেষ ধরনের নদী-উপত্যকায় যে নগর-সভ্যতার উদ্ভব হয়, সেই সভ্যতার আওতায় বিজ্ঞানের কিরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসাবিদ্যায় স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া প্রাচীন ব্যাবিলন, মিশর, ভারত ও চীন প্রত্যেকেই নিঃসন্দেহে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। তাহাদের নানা মৌলিক আবিষ্কারের গুরুত্বও বড় কম নহে। লিখন, দশমিক বা ষষ্ঠিক পদ্ধতি অনুসারে গণনা, পঞ্জিকা প্রণয়ন ও শল্যবিদ্যার আবিষ্কার ও উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রাথমিক অগ্রগতিটুকুও সম্ভবপর নহে। এইসব

আবিষ্কারের মধ্য দিয়া প্রাচীন ব্যাবিলন, মিশর, ভারত ও চীন যে বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল তাহা অনস্বীকার্য।

এইরূপ ভিত্তি স্থাপনের পর প্রকৃত অট্টালিকা রচনার কার্যও ব্যাবিলনে, মিশরে, ভারতবর্ষে ও চীনে আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপনের কাজ আরম্ভ হইতে না হইতেই প্রাচীন জাতিদের সৃজনী-প্রতিভা অতি রহস্যজনকভাবে অন্তর্হিত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে ছেদ পড়ে। এই সময়ে তথ্য ও অভিজ্ঞতা অনেক সংগৃহীত হইয়াছিল বটে; কিন্তু সেই তথ্য ও অভিজ্ঞতাকে যাচাই করিয়া প্রকৃতি ও বস্তুজগৎ সম্বন্ধে নূতন তত্ত্বের ও সত্যের সন্ধান দেওয়া আর ইহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইল না। প্রথম যুগে প্রাচীন মনীষীরা যে সত্যের বা সত্যসমূহের সন্ধান দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই অভ্রান্ত চরম সত্য মনে করিয়া ও তাহাদের পুঁথিপত্রের প্রতিলিপি বার বার রচনা করিয়া পরবর্তীরা মনে করিল, ইহাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকৃত অনুশীলন। এড্‌উইন স্মিথ্ প্যাপিরাস্ মিশরে যে সময়ে লিখিত হইয়াছিল, তাহার পর দুই হাজার বৎসরের মধ্যে সে দেশে উন্নততর শল্যবিদ্যার আর কোন গ্রন্থ রচিত হইল না। আহ্‌মেস্ প্যাপিরাস্ বহুপূর্বে লিখিত গণিতীয় গ্রন্থের একটি প্রতিলিপি মাত্র। ব্যাবিলনীয় নক্ষত্রদর্শকেরা নক্ষত্রের পর নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করিয়া রাশি রাশি তথ্যই শুধু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে; কিন্তু সেই তথ্যের বেড়াজাল হইতে বাহির হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আবর্তন-রহস্যের কোন কিনারা করিতে পারে নাই। অথচ তাহাদের মূল্যবান পর্যবেক্ষণ অবলম্বন করিয়াই গ্রীকেরা পরবর্তীকালে জ্যোতিষীয় বিপ্লব ঘটাইয়াছিল। এইরূপ স্থবির অবস্থা চিন্তার দারিদ্র্য ও অক্ষমতারই পরিচায়ক। ইহাতে মনে হয়, প্রাচীনেরা হয় স্বভাবতঃই কল্পনা-প্রবণ ছিল না, অথবা বিশেষ ধরনের কতকগুলি প্রতিকূল সামাজিক অবস্থার চাপে পূর্ব-নির্ধারিত পথে বহুদিন চলিবার অভ্যাসবশতঃ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনার প্রয়োজনীয়তাবোধ হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই স্থবিরত্ব ও জড়ত্ব ব্যাবিলনে ও মিশরে যেইরূপ দেখা যায় ভারতবর্ষে ও চীনে তদ্রূপ নহে। বৈদিক যুগের শেষে ব্রাহ্মণ্য কুসংস্কারের আধিক্যে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সাময়িকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও বৌদ্ধযুগের সূচনায় বিজ্ঞানের আবার প্রভূত উন্নতি দেখা যায়। মহাচীনে 'হান্' ও 'চিন্' রাজবংশের পর 'সুই', 'ট্যাং', 'সুং' প্রভৃতি রাজবংশের রাজত্বকালে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পূর্ণোদ্যমে চলিতে দেখা যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে ও চীনের বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশেষত্ব এই যে, অন্যান্য দেশের সহিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়াও তাহারা নিজেদের জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াছে। দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে এই দুই দেশে জ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে নানা উত্থান-পতন পরিলক্ষিত হইলেও একেবারে অচল অবস্থার উদ্ভব কোন সময়েই হয় নাই। খৃীঃ পূঃ প্রথম মিলেনিয়মে পদার্পণ করিবার পর মিশরে বৈজ্ঞানিক তৎপরতার আর কোন নজির পাওয়া যায় না। গ্রীকদের অভ্যুত্থানের পর ব্যাবিলনীয়দের তৎপরতা ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইলেও অ্যাসিরীয়, পারসিক ও ম্যাসিডনীয় গ্রীকদের প্রাধান্যের কালে সাময়িকভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় কিছু কিছু উন্নতি দেখা যায়। প্রাচীন ব্যাবিলনীয় বা মেসোপোটেমীয় বিজ্ঞানের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে লোপ পায় খৃীষ্টীয় প্রথম শতকের প্রারম্ভে।

সভ্যতার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম ভিত্তি স্থাপনের অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব অর্জন সত্ত্বেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র হইতে প্রাচীন মিশর ও মেসোপোটেমিয়ার পশ্চাদপসরণের কারণ প্রণিধানযোগ্য। গর্ডন চাইল্‌ড,* পার্টিংটন,† ফারিংটন§ প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে এই পশ্চাদপ-

* *Man Makes Himself.* † *Origin and Development of Applied Chemistry.*
§ *Greek Science.*

সরণের প্রধান কারণ ফলিত বিজ্ঞানের অবনতি ও সমাজে শ্রেণী-বিভাগের ফলে কৃষক, কর্মকার প্রভৃতি শ্রমজীবী শ্রেণীর দাসত্ব প্রাপ্তি। নিওলিথিক যুগের শেষ দুই হাজার বৎসরে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৫000 হইতে ৩000 অব্দে ফলিত বিজ্ঞানের যে উন্নতি আমরা দেখিয়াছি, সেই তুলনায় মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম দুই হাজার বৎসরের অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ২৬০০ হইতে ৬০০ অব্দের মধ্যে সম্পাদিত ফলিত বিজ্ঞানের উন্নতি অকিঞ্চিৎকর। মৃৎশিল্প, ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহার, কৃত্রিম উপায়ে সেচ ব্যবস্থা ও নদীশাসন, চাকার আবিষ্কার, পাল-তোলা নৌকা, লাঙল, কৃষিকার্যে গবাদি পশুর ব্যবহার, ইটের ব্যবহার রপ্ত করিয়া পাকা ঘরবাড়ী নির্মাণ, লিখনের আবিষ্কার, একপ্রকার প্রাথমিক পঞ্জিকা ও সংখ্যা-লিখন-পদ্ধতি শেষ নিওলিথিক যুগের প্রধান আবিষ্কার। উপরিউক্ত প্রতিটি আবিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাথমিক সভ্যতা রচনার কার্যে অপরিহার্য। ইহাদের সাহায্যে নীলনদের ও তাইগ্রিস-ইউফ্রেতিসের উপত্যকায় সভ্যতার বুনিয়াদ যখন সত্যসত্যই প্রতিষ্ঠিত হইল, বড় বড় নগর ও জনপদ গড়িয়া উঠিল, অভাবের পরিবর্তে সর্বপ্রথম মানুষ প্রাচুর্যের স্বাদ পাইল, তখন ফলিত বিজ্ঞানের আরও উন্নতি হইবে ইহাই হয়ত মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু ইতিহাসের দুর্বোধ্য নিয়মে ইহার ঠিক বিপরীতটিই ঘটিয়াছিল। সভ্যতার প্রারম্ভের দুই হাজার বৎসরের মধ্য হইতে নিওলিথিক যুগের আবিষ্কারের সমকক্ষ মাত্র চার পাঁচটির অধিক আবিষ্কারের নাম করা কঠিন।

গর্ডন চাইল্ড এই যুগের ফলিত বিজ্ঞানের মাত্র চারিটি আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—(১) দশমিক সংখ্যা-পাতন পদ্ধতি (খ্রীঃ পূঃ ২000 অব্দ); (২) খনিজ হইতে সুলভে লৌহ-নিষ্কাশন পদ্ধতি (খ্রীঃ পূঃ ১৪00 অব্দ); (৩) বর্ণমালার লিপি (খ্রীঃ পূঃ ১৩00 অব্দ); এবং (৪) নগর ও জনপদে জল সরবরাহের উপযোগী পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা (খ্রীঃ পূঃ ৭00 অব্দ)। ইহাদের মধ্যে মাত্র দুইটি উন্নত ও সভ্যজাতিদের আবিষ্কার। দশমিকের ব্যবহার ব্যাবিলন, মিশর ও ভারতবর্ষে আমরা প্রায় একই সময়ে দেখিতে পাই। রাজধানীতে পানীয় জল সরবরাহের জন্য অ্যাসিরীয় রাজ সেন্নাচেরিব সর্বপ্রথম পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ করান। বাকী দুইটির আবিষ্কারক নিওলিথিক পর্যায় হইতে সবেমাত্র সভ্যতার পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে এইরূপ দুইটি নূতন জাতি। অনগ্রসর হিট্‌টাইট্‌রা লৌহ-নিষ্কাশন বিদ্যার আবিষ্কারক ও প্রবর্তক, ফিনিশীয় সদ্যজাত সভ্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের হাতে আক্ষরিক লিপির উদ্ভব। সুতরাং সুসভ্য মেসোপোটেমিয়ায় ও মিশরে ফলিত বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও সে উন্নতি সম্ভবপর হইল না। গর্ডন চাইল্ড লিখিয়াছেন:—

> "Viewed in this light the achievements of Egypt, Babylonia, and their immediate cultural dependencies appear disappointing from the standpoint of human progress. Contrasting progress before and after it, the second revolution seems to mark not the dawn of a new era of accelerated advance, but the culmination and arrest of an earlier period of growth. Yet the oriental societies had been equipped by the revolution with unprecedented resources and a new faculty of transmitting and accumulating knowledge."

ফলিত বিজ্ঞানের এবং সাধারণভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মন্দীভূত গতির জন্য বিশেষভাবে দায়ী সমাজের স্তর-বিন্যাস। এই স্তর-বিন্যাসের ফলে সৃষ্টি হইল প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীর—(১) রাজন্যবর্গ, পুরোহিতবর্গ ও শাসনকার্যের সহিত নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ দ্বারা গঠিত উচ্চ শ্রেণী, এবং (২) কৃষক, নানা বিদ্যায় কুশলী কর্মকার ও সাধারণ দিন-মজুর

মিলিয়া নিম্ন শ্রেণী। প্রথমোক্ত শ্রেণী সংখ্যায় নগণ্য, কিন্তু রাজ্যের ঐশ্বর্য ও উদ্বৃত্ত ধনের পূর্ণ কর্তৃত্ব তাহাদের হাতে ন্যস্ত। নিওলিথিক যুগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম হইতে বৃহৎ জনপদ গঠন যখন সম্ভবপর হয় এবং খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির ফলে লোকসংখ্যার এক বৃহৎ অংশ যখন শিল্প, ব্যবসায় ও অন্যান্য গঠনমূলক কাজের জন্য সুলভ হয়, তখন হইতেই এই জটিল ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য,—যেমন প্রত্যেকের মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্য বণ্টন ইত্যাদি, নানা নিয়মকানুন, বিধিনিষেধ, আইন ও শৃঙ্খলার, এক কথায় শাসনকার্যের ও কর্তৃত্বের; প্রয়োজন হইয়াছিল। এইরূপ শাসনকার্য ও কর্তৃত্ব সকলপ্রকার উৎপাদন ও বণ্টনের কার্য সুচারু ও সুশৃঙ্খলরূপে সম্পাদিত হইতে সাহায্য করিয়া জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করিবে, প্রথম সমাজ ব্যবস্থাপকদের ইহাই হয়ত স্বপ্ন ছিল। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে নিওলিথিক কালচার হইতে সোসালিজ্‌মের উদ্ভব হয় নাই; উদ্ভব হইয়াছিল একনায়কত্বের বা ডিক্টেটর-শিপের। অপ্রতিহত একনায়কত্বের ফলে সমাজের এক মেরুতে যেমন ঐশ্বর্যের পর ঐশ্বর্য জমা হইয়াছিল, তেমনি জমা হইয়াছিল দারিদ্র্য, অভাব, অনটন আর এক মেরুতে গিয়া। এই অবস্থায় শ্রমিক যে শুধু নিঃস্ব ও দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিল তাহা নহে, সে কর্মের স্বাধীনতা হারাইয়াছিল এবং ধীরে ধীরে শাসক শ্রেণীর নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল। নিওলিথিক যুগে মানুষ দরিদ্র ছিল বটে, কিন্তু দাস ছিল না। সভ্যতা-স্থাপনের প্রথমার্ধে আমরা দেখি একদল মানুষ সর্বস্ব হারাইয়া জীবনধারণের জন্য দাসত্ব বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। সমাজে যে শ্রেণী বিভাগের কথা বলা হইল, তাহা কোনরূপ কল্পনা নহে। মিশরের পিরামিডের পাশে পিরামিড যুগের দরিদ্রের কবরগুলি মিলাইলেই সেই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে। এই অপদার্থ অকেজো গগনস্পর্শী বিরাট কবরগুলি প্রজা ও দাসদের উপর মিশর সম্রাটদের অপ্রতিহত নির্মম ও নির্লজ্জ ক্ষমতার দম্ভই ঘোষণা করিয়া থাকে। হাজার হাজার নিঃস্ব ক্রীতদাস জীবনধারণের দুর্বার প্রয়োজনে পরিচালক ও ঠিকাদারদের হাতে অশেষ দুর্দশা, লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও দিনের পর দিন অমানুষিক পরিশ্রমে পিপীলিকার মত তিলে তিলে এই পিরামিড গড়িয়া তুলিয়াছে শুধু ক্ষমতাবানের খেয়াল চরিতার্থের জন্য কালের কবল হইতে তাহার নশ্বর অস্তিত্বকে বাঁচাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে। বেল সাহেব পিরামিড সম্বন্ধে মিথ্যা বলেন নাই যে, ইহা হইতেছে, 'another time outlasting monument to the unconquerable spirit of man's temporal rulers and the unbreakable backs of those who do the work.'*

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় ধনবান শ্রেষ্ঠীর বাসস্থানের পাশে দরিদ্র শ্রমিকের অপরিসর কুঁড়ে ঘরগুলি শ্রেণীতে শ্রেণীতে অর্থনৈতিক বৈষম্যের উগ্ররূপই প্রকাশ করিয়া থাকে।

শ্রমিক, কৃষক ও কারিগরশ্রেণী এইভাবে বিকাইয়া গেলে, নূতন ব্যবহারিক আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা ও অনুপ্রেরণাও তাহারা হারাইয়া ফেলে। নিওলিথিক যুগের নানা আবিষ্কারের মূলে ছিল এই কৃষক ও কারিগরশ্রেণী। শ্রম-লাঘবের উদ্দেশ্যে অবস্থার উন্নতির আশায় স্বাধীনভাবে তাহাদের পূর্বার্জিত বিদ্যা লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে নানা পদ্ধতি, নানা টেক্‌নিক তাহারা আবিষ্কার করিয়াছে। সম্ভবতঃ এইরূপ আবিষ্কারের জন্য তাহারা সমাজের সমাদর ও শ্রদ্ধা পাইয়াছে। একনায়কত্বের রাজত্বে এই অবস্থা বিদ্যমান ছিল না। যে সম্রাটের আজ্ঞাধীনে অসংখ্য ক্রীতদাস সর্বদা কঠোর পরিশ্রমের জন্য প্রস্তুত, শ্রম-লাঘবকারী যন্ত্র বা টেক্‌নিক আবিষ্কারের ব্যাপারে তাহার কাছে উৎসাহ বা পৃষ্ঠপোষকতা লাভের আশা করা বৃথা। আর এইরূপ আবিষ্কারের যেখানে মূল্য নাই, অথবা এইরূপ প্রচেষ্টার দ্বারা অবস্থার উন্নতির যেখানে কোন আশা

* *E. T. Bell, The Development of Mathematics*, p-40.

নাই, সেখানে কারিগরের স্বকীয়তা আপনা হইতেই শুকাইয়া যাইতে বাধ্য। এই স্বকীয়তার উৎস যে সত্য সত্যই শুকাইয়া গিয়াছিল, ফলিত বিজ্ঞানের অধঃপতনই তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ।

লিপির ব্যবহারে অভিজ্ঞ মধ্যবিত্ত লেখক সম্প্রদায়ের অবস্থা ইহার মধ্যে অবশ্য অনেকটা ভাল ছিল। শাসনকার্য পরিচালনে লিপিকার অপরিহার্য। রাজস্ব আদায়ে, রাজ্যের ও ধর্মসংস্থার আয়ব্যয়ের হিসাব রাখিতে, নানাবিধ রাজকীয় কার্যে ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপিকারদের বিদ্যার এমন একটি বিশেষ ধরনের চাহিদা ছিল, যাহার ফলে তাহারা আপনা হইতেই উচ্চশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। লিপি ব্যবহারের প্রথম যুগে এই অতি দুরূহ বিদ্যায় যাহারা সুদক্ষ ছিল, বুদ্ধি ও জ্ঞানের দিক হইতেও তাহারা ছিল নিঃসংশয়ে সকল সম্প্রদায়ের অগ্রণী। শাসক শ্রেণীর সহিত ঘনিষ্ঠ যোগের ফলে ও নিজেদের স্বার্থের খাতিরে লিপিকার সম্প্রদায়ের সঙ্গে কৃষক ও কারিগরশ্রেণীর ব্যবধান স্বভাবতঃই আত্মপ্রকাশ করে। মেসোপোটেমিয়া, মিশর, ভারত ও চীন হইতে লিপিকারদের রচিত গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসাবিদ্যার বহু মৃন্ময় ফলক, প্যাপিরাস্ ও পুস্তকাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু কুম্ভকারের মৃৎশিল্প, তাম্রকারের ধাতুবিদ্যা অথবা কৃষকের পশুপালনের নানা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ক্বচিৎ এইরূপ লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কারিগরিবিদ্যার ব্যাপক অনাদরের ইহা আর একটি দৃষ্টান্ত। এই অনাদর ও অবজ্ঞার জন্য শুধু প্রাচীনেরাই অপরাধী নহে; ইউরোপে রেনেশাঁর পূর্বে কারিগরিবিদ্যার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। জর্জ এগ্রিকোলা (১৪৯৪-১৫৫৫), বিরিংগুচ্চিও প্রমুখ ইতালীয় ফলিত বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় কারিগরিবিদ্যা সমাদর লাভ করিলে তবেই বিজ্ঞানের প্রকৃত ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছিল।

সুতরাং লিপি আবিষ্কারের পর জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা-বিদ্যা ও সাহিত্যের মধ্যে রাজরাজড়াদের নানা যুদ্ধবিগ্রহ, বীরত্ব ও ষড়যন্ত্রের কাহিনী যে একমাত্র আলোচ্য বিষয় হইয়াছিল, তাহা আকস্মিক ঘটনা নহে। সম্ভবতঃ এই লিপিকারদের মধ্য হইতেই আবির্ভূত হইয়াছিল শক্তিমান পুরোহিত সম্প্রদায়। প্রাচীন ব্যবস্থার রাজন্যবর্গের পরেই পুরোহিত সম্প্রদায়ের স্থান; কখনও কখনও—যেমন ব্যাবিলনে ও ভারতবর্ষে, পুরোহিত সম্প্রদায়ই ছিল প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের সর্বময় কর্তা; তাহারা শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারক, বাহক ও পরিপোষকই ছিল না, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অজ্ঞ, দরিদ্র জনসাধারণকে বাধ্য ও বশীভূত রাখিবার প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য তাহাদের উপর ন্যস্ত ছিল। বুদ্ধিমান পুরোহিত সম্প্রদায়ের বুঝিতে বেগ পাইতে হয় নাই যে, পুরাবৃত্ত, যাদুবিদ্যা, ফলিত জ্যোতিষ ও নানাবিধ কুসংস্কারের ব্যাপক আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া অজ্ঞতাপ্রসূত স্বাভাবিক অন্ধবিশ্বাসকে চিরস্থায়ী করিবার মধ্যেই অনগ্রসর বিপুলসংখ্যক জনসাধারণকে বাধ্য ও বশীভূত রাখিবার অমোঘ অস্ত্র অন্তর্নিহিত। বলা বাহুল্য, এই অস্ত্র তাহারা অতীব সাফল্যের সহিতই ব্যবহার করিয়াছিল। এই সুপ্রাচীন কৌশল প্রয়োগে মানুষকে বারংবার পশুর পর্যায়ে নামাইয়া মেষপালের মত পরিচালিত করিবার অসংখ্য দৃষ্টান্তে ইতিহাসের পৃষ্ঠা মলিন হইয়া আছে। সেই ঘৃণ্য কৌশল প্রয়োগের অবসান কি আজও হইয়াছে?

যে সমাজে মানুষকে অমানুষ করিয়া শাসন করিবার ব্যবস্থা, সেখানে স্বকীয়তার স্থান নাই। অনগ্রসরতা সেই সমাজের ধর্ম। আবিষ্কার, চিন্তাধারার পরিবর্তন সে ক্ষেত্রে শুধু অনভিপ্রেতই নয়, রীতিমত আশঙ্কার কারণ। পূর্বনির্ধারিত চিরাচরিত পথ ধরিয়া চলাই মানুষের তখন একমাত্র লক্ষ্য। এই অবস্থা প্রাচীন মিশর ও মেসোপোটেমিয়ায় আসিয়াছিল; ইউরোপে অন্ধকার যুগে এই অবস্থারই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; ভারতবর্ষ ও মহাচীনও এই দুর্ভাগ্যের অতল অন্ধকারে তলাইয়া গিয়াছিল।

গ্রীক ও আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞান

চতুর্থ অধ্যায়

৪·১। গ্রীক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য

খ্রীঃ পূর্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে ভূমধ্যসাগরের পূর্বে ইজীয়ান সমুদ্রাঞ্চলে চিওস্, কস্, সামোস্, ক্রীট প্রভৃতি দ্বীপে, মাইলেটাস্, ইফিসাস প্রভৃতি সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থানে ও মূল ভূখণ্ড গ্রীসে সম্পূর্ণ এক নূতন জাতির পরিচালনায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকস্মিক ও অত্যাশ্চর্য বিকাশ লাভের ব্যাপার বিজ্ঞানের ইতিহাসে সুবিদিত। এই নূতন জাতি গ্রীক জাতি এবং তাহাদের তৎপরতায় নূতন রূপ, সজীবতা ও প্রাণচাঞ্চল্য লইয়া যে বিজ্ঞানের জন্ম তাহাই গ্রীক বিজ্ঞান। গ্রীক জাতির রাজনৈতিক প্রাধান্যের ইতিহাস স্বল্পস্থায়ী হইলেও তাহারা সভ্যতা, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনে যে ভাবধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তক, ধারক ও বাহকরূপে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়, একাদিক্রমে সুদীর্ঘ নয় শত বর্ষ তাহা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ও মধ্যপ্রাচ্যে সর্বপ্রকার মননশীলতার অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছিল। রোমক সাম্রাজ্যের পতনের পর এই সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রদীপও নির্বাপিত হয়, কিন্তু তাহা নিতান্তই সাময়িকভাবে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীতে গ্রীকদের প্রদর্শিত পথে ও গ্রীক গ্রন্থাদি অবলম্বনে আরব জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানে আশ্চর্য উন্নতি সাধন করে। আরবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই গ্রীক বিজ্ঞান অবলম্বনেই আবার ল্যাটিন ইউরোপীয় জাতিরা ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে ধীরে ধীরে আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনে যত্নবান হয়। সুতরাং প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে গ্রীকরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে আদর্শ ও নূতন ভাবধারার প্রবর্তন করিয়াছিল, তাহার জের টানিয়াই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎপত্তি—ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের এই মত কিছু অতিরঞ্জিত হইলেও একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

গ্রীকদের পূর্বে প্রাচীন ব্যাবিলনীয়, মিশরীয় ও ভারতীয় জাতিরা অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর ধরিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়া আসিয়াছে। একেবারে প্রথম হইতে গ্রীকদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা আরম্ভ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। প্রাচীন জাতিদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-ভাণ্ডারের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণের সৌভাগ্যের কথা প্রাচীন গ্রীক লেখকগণ নিজেরাই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, ফিনিশীয় এবং সম্ভবতঃ ভারতীয় বিজ্ঞানের বিভিন্ন স্রোতধারা এসিয়া মাইনরের ও ঈজীয়ান সাগরের নানা দ্বীপের গ্রীক উপনিবেশগুলিতে একের পর এক মিলিত হইয়া যে উর্বর ক্ষেত্র রচনা করিয়াছিল, গ্রীক মনীষার স্পর্শে সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভিদ্-শিশু দেখিতে দেখিতে মুকুলিত হইয়া উঠিল।

গ্রীক বিজ্ঞানের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রকৃতির রহস্যপূর্ণ ব্যবহার ও তাহার নিয়মের স্বরূপ বুঝিবার একটি সুস্পষ্ট ও সচেতন প্রয়াস আমরা ইহার মধ্যে দেখিতে পাই। প্রকৃতির ব্যবহার সম্বন্ধে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ও অসংলগ্ন তথ্য আবিষ্কারই যে যথেষ্ট নহে, এই ব্যবহারের পশ্চাতে যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা নেপথ্যে ক্রিয়াশীল এবং তাহার রহস্যভেদই যে বৈজ্ঞানিক সাধনার চরম লক্ষ্য—বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এই আদর্শ গ্রীকরাই প্রথম প্রচার করে। গ্রীকদের বহু পূর্ব হইতে লোকে দাঁড়ি-পাল্লার সাহায্যে জিনিস-পত্রের ওজন করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ওজন করিবার এই পদ্ধতির পশ্চাতে কিরূপ নীতি বর্তমান তাহা ব্যাবিলনীয় বা মিশরীয় পণ্ডিতেরা বুঝিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। গ্রীকদের সময়ে সেই একই পদ্ধতিতে জিনিস-পত্র ওজন করা হইত বটে, কিন্তু আর্কিমিডিস বলিলেন, দাঁড়ির আলম্বের (fulcrum) উভয় দিকে সমান দূরত্বে সমান ওজন ঝুলাইলেই সাম্য স্থাপিত

হইবে; অথবা আলম্বের উভয় দিকে অসমান দূরত্বে যদি অসমান ওজনের বস্তু চাপানো যায় তবে সাম্য রক্ষা করিতে হইলে অধিকতর ভারী বস্তুটিকে আলম্ব হইতে কম দূরত্বে রাখিতে হইবে এবং এই দূরত্বের অনুপাত বস্তুদ্বয়ের ওজনের ব্যস্ত অনুপাত (inversely proportional) হইবে। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হইতে ব্যাবিলনীয়েরা বা মিশরীয়েরা নিশ্চয়ই এই নীতির কথা অস্পষ্টভাবে জানিত; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে তাহাকে বুঝিবার চেষ্টা করে নাই। গ্রীকরা ঠিক এই জিনিসটা করিয়াই আনন্দ পাইয়াছে ও সকল শ্রম সার্থক মনে করিয়াছে। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সহিত তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের এইখানেই পার্থক্য এবং এই পার্থক্যের জন্য ব্যাবিলনীয় বা মিশরীয় বিজ্ঞান ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে নাই। গ্রীকরা সুরু হইতেই তত্ত্বীয় বিজ্ঞানী।

জরিপের কাজে এক প্রকার জ্যামিতির প্রয়োগ অপরিহার্য। সোজা ও বাঁকা রেখার বিচিত্র সমন্বয়ে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বহুভুজ, বৃত্ত, উপবৃত্ত, অধিবৃত্ত, পরাবৃত্ত প্রভৃতি বহুরকম চিত্রেরই উদ্ভব হয়। প্রাচীনেরা এইরূপ নানা রেখাচিত্রের সহিত পরিচিত ছিল। প্রয়োজনমত কতকগুলি চিত্রের নিয়ম-কানুন আবিষ্কারেও তাহারা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে; কিন্তু গ্রীকদের মত রেখার কারসাজি সম্বন্ধে তাহারা কখনও মাতিয়া উঠে নাই। গ্রীকরা পিরামিডও গড়ে নাই, জিগ্‌গুরাটও বানায় নাই। তথাপি অকেজো রেখার যাদু তাহাদের পাইয়া বসিল। রেখাচিত্রের মধ্যে তাহারা অন্তহীন সমস্যার সন্ধান পাইল অথবা কাল্পনিক সমস্যার সৃষ্টি করিল এবং এই সব সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন হইল এক একজন সাধকের সারা জীবনের সাধনা। এই সাধনা হইতেই জ্যামিতির উদ্ভব।

জ্যোতিষে গ্রীকরা ব্যাবিলনীয়দের মত পর্যবেক্ষণ-লব্ধ তথ্যের পাহাড় সৃষ্টি করে নাই বটে, কিন্তু জ্যোতিষীয় পরিকল্পনার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম ও শৃংখলা বুঝিবার চেষ্টায় তাহারাই অগ্রণী। ব্যাবিলনীয়দের নিখুঁত পর্যবেক্ষণের পাশে তাহাদের উদ্ভট ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনা চিন্তাশক্তির শোচনীয় দারিদ্র্যই শুধু ঘোষণা করে। পক্ষান্তরে কল্পনাপ্রবণ আয়োনীয় গ্রীক দার্শনিকেরা ব্যাবিলনীয় পর্যবেক্ষণ অবলম্বনে সুরু হইতেই ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনায় যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে তাহার তুলনা নাই। প্রকৃতিকে সমগ্রভাবে দেখিবার ও বুঝিবার এবং তাহার ঘটনাবলীকে স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই প্রথম। সম্ভবতঃ গ্রীক বিজ্ঞানের এই বিশেষত্ব স্মরণ করিয়াই একদল ঐতিহাসিক গ্রীকদের আমল হইতে বিজ্ঞানের ইতিহাস সুরু করিবার পক্ষপাতী।

গ্রীক বিজ্ঞানের এই বৈশিষ্ট্য সত্যই বিস্ময়কর। সভ্যজাতি হিসাবে গ্রীকদের আবির্ভাবের প্রাথমিক ইতিহাসের মত তাহাদের মননশীলতার এই বিশেষত্বটুকুও রহস্যাবৃত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত প্রাচীন গ্রীকদের আদি ইতিহাস বা প্রাক্-ইতিহাস সম্বন্ধে হিরোডোটাসের (খৃঃ পূঃ ৪৮৪-৪২৫) রচনাবলীতে বা হোমার-হেসিয়ডের পৌরাণিক উপাখ্যানে উল্লিখিত তথ্যের বেশী কিছু জানা ছিল না। বর্তমান শতকের প্রথমভাগে শ্লিম্যান, আর্থার ইভান্স প্রমুখ প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণা হইতে জানা যায় যে, ব্রোঞ্জ যুগে প্রায় সমগ্র ঈজীয়ান অঞ্চলে এক অতি উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল। ক্রীটের নোসস্ নামক স্থানে স্যার আর্থার ইভান্স যে সব প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় ক্রীট ছিল এই সভ্যতার অগ্রদূত ও আদি কেন্দ্র। ক্রীটের সভ্যতা বিকাশে মিশরের প্রভাব সুপরিস্ফুট। ক্রীট হইতে ব্রোঞ্জ-সভ্যতা যে ক্রমে গ্রীসের মূল ভূখণ্ডে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহা মিসিনের প্রত্নতত্ত্বীয় ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। নোসস্ ও মিসিনের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার সহিত পরবর্তীকালের গ্রীক সভ্যতার নানাবিধ মিল লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, ঈজীয়ান অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক ব্রোঞ্জ-সভ্যতা হইতে গ্রীক সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল। মিসিনে অ্যাগামেম্‌ননের রাজপ্রাসাদ, ট্রয়ের নিকট হিসারলিকে ট্রোজান যুদ্ধের প্রত্নতত্ত্বীয় ধ্বংসাবশেষ হইতে এখন জানা গিয়াছে যে, হোমারের মহাকাব্যের

ভিত্তি একটি সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনী। সম্ভবতঃ ব্রোঞ্জ যুগের অবসানে খৃীঃ পূঃ ১৪৫০ অব্দের অনুরূপ সময়ে সমগ্র ঈজীয়ান অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের সহিত সম্পূর্ণ এক নূতন জাতির বিরাট ও ব্যাপক সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। এই সংঘর্ষের ফলে নোসস্, মিসিনে প্রভৃতি বর্ধিষ্ণু জনপদগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এই নবাগত বিজেতা জাতি লৌহের ব্যবহার জানিত। হোমারের মহাকাব্যে এই বিজয়ী জাতি অ্যাকিয়ান নামে পরিচিত। প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার উইলিয়াম রিজওয়ে ও নৃতাত্ত্বিক ডাঃ হ্যাডনের মতে হোমারের অ্যাকিয়ানরা উত্তর হইতে, সম্ভবতঃ দানিয়ুব উপত্যকা হইতে আগত এক দীর্ঘকায় গৌরকেশ, সুদর্শন জাতি। তাহাদের লৌহ অস্ত্রের সঙ্গে ব্রোঞ্জ ব্যবহারকারী নোসস্ ও মিসিনের অধিবাসীরা আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই।

উত্তর হইতে আরও একদল লৌহ ব্যবহারকারী জাতি ডোরিয়ানরা অ্যাকিয়ানদের পরাভূত করিয়া গ্রীসে ও ঈজীয়ান এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করে। সম্ভবতঃ আরও কয়েকটি জাতি প্রাগৈতিহাসিককালের বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হইয়া সমগ্র ঈজীয়ান এলাকাকে বিক্ষুব্ধ ও চঞ্চল করিয়া থাকিবে। ব্রোঞ্জ যুগের স্থানীয় অধিবাসী ও উত্তর-পূর্ব প্রভৃতি নানাদিক হইতে আগত অ্যাকিয়ান, ডোরিয়ান, এড্লিয়ান প্রভৃতি বহু বিচিত্র জাতির সংমিশ্রণে সম্ভবতঃ গ্রীক সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল। সুতরাং গ্রীকরা এক মিশ্র জাতি; গ্রীক সভ্যতা সেই মিশ্র জাতির স্বাভাবিক, সংস্কারমুক্ত প্রবল তৎপরতার প্রকাশ। খৃীঃ পূঃ নবম শতাব্দীতে হোমার যে বিজয়ী গ্রীক জাতির সমাজ ও জীবনযাত্রার চিত্র (সম্ভবতঃ এই চিত্র হোমারের দুই শত বৎসর আগেকার সমাজের চিত্র) অঙ্কন করেন, তাহাতে আমরা এক আনন্দোচ্ছল, সৌন্দর্যপ্রিয়, কর্মপ্রবণ এবং হয়ত কিছু অহঙ্কারী ও উচ্ছৃঙ্খল জাতির পরিচয় পাই—

> "......the picture of a race, false, boastful and licentious perhaps, but with a sense of beauty, a confident joy in life and a warmth of affection that bespeak a gallant, vigorous, open-hearted, conquering people; a people of extraordinarily brilliant intellectual endowment, placed in a land of glorious beauty, where the wine-dark sea brought the trade and knowledge of all the world to their doors."*

ইলিয়ড ও অডিসিতে গ্রীক সভ্যতার প্রথম পর্বে জ্যোতিষ, চিকিৎসাবিদ্যা ও নানা ব্যবহারিক বিদ্যার যে উল্লেখ পাওয়া যায় তাহাতে গ্রীকরা এই সব বিদ্যায় ব্যাবিলন, মিশর, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন সুসভ্যজাতিদের যে বহু পশ্চাতে ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই দুই মহাকাব্যে কতকগুলি নক্ষত্রের নাম, চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যার উল্লেখ, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রায় ১৫০টি বিভিন্ন নাম ইত্যাদি অবশ্য পাওয়া যায়। ধাতুশিল্পী, সূত্রধর, কুম্ভকার, চর্মকার প্রভৃতি কারিগরদের এবং সুতাকাটা ও বয়নশিল্প, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীসক, লৌহ, ইস্পাত, পিতল প্রভৃতি ধাতু ব্যবহারেরও অনেক উল্লেখ আছে। ইহা হইতে ব্যবহারিক-বিদ্যায় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে মিশর বা ব্যাবিলনের তুলনায় এক অনগ্রসর দেশের চিত্রই আমরা পাই। কিন্তু যে জন্য মহাকাব্যটি অতুলনীয় তাহা হইল ইহার মানবতার সুর। এক কল্পনাপ্রবণ তরুণ জাতির মনের সহজ অভিব্যক্তি ইহাতে প্রকাশমান। গ্রীক দৃষ্টিভঙ্গীর ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এই মানবতা ও কল্পনাপ্রবণতা তাহাদের প্রাচীনতম কাব্যগ্রন্থেই মূর্ত হইয়াছে। ইলিয়ডের প্রধান মৌলিকতা এই যে, কাব্যের নায়ক-নায়িকারা ঘটনা-স্রোতের অসহায় ক্রীড়নক নহে। তাহাদের বিবিধ চরিত্রই ঘটনাস্রোতকে নির্ধারিত করিয়াছে। কবির কল্পনায় নায়ক-নায়িকারা সব সময় ভাগ্যের খেলার পুতুল নহে, সময়ে সময়ে নিজের ভাগ্যের বিধাতাও তাহারা বটে। তাই নিজের ভাগ্য সন্ধানেই বাহির

---

* Sir William Cecil Dampier, *A History of Science*, Cambridge, 1948; p. 11.

হইয়াছিল অ্যাকিলিস। সম্মান ও খ্যাতিহীন দীর্ঘ জীবনের চেয়ে স্বল্পমেয়াদী গৌরবের জীবনও শ্রেয়ঃ, ইহাই ছিল তাঁহার আদর্শ। অন্ধ ভাগ্যের পরিবর্তে পুরুষকারে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য মহাকবির নির্দেশ যেন শেক্সপিয়ারের সেই অমর কথাগুলির মধ্যেই পুনর্বার প্রতিধ্বনিত হইয়াছে ঃ

'Men at some time are masters of their fate:
The fault, dear Brutus, is not in our stars,
But in ourselves, that we are underlings.'

(*Julius Caesar*)

যাদুবিদ্যা ও ফলিত জ্যোতিষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অদৃষ্টবাদী মিশরীয় বা ব্যাবিলনীয় কোন কবির পক্ষে এইরূপ চিন্তা অভাবনীয়। সর্বশক্তিমান পুরোহিত ও রাজন্যবর্গ শাসিত সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বাধিকার যেখানে পদে পদে ব্যাহত সেখানে ভাগ্যের বিরুদ্ধাচরণের কথা নিরর্থক। গ্রীকদেরও দেব-দেবী ও মন্দির ছিল; কিন্তু সে দেব-দেবীরা মানুষের মত দোষে গুণে পরিকল্পিত অতিমানুষ মাত্র। মানুষকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাদের সৃষ্টি; মানুষের সুখে তাঁহারা সুখী, দুঃখে তাঁহাদের সমবেদনা। এইরূপ দেব-দেবীর পরিকল্পনায় মানুষের ব্যক্তিত্বকে খর্ব করিবার প্রয়োজন হয় নাই।

হোমারের মানবতার বাণী পরবর্তীযুগের চারণ কবিদের কাব্যে বারংবার প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। আর্কিলোকাস্, স্যাফো, অ্যালকিউস্ প্রমুখ কবিদের গীতিকাব্যে ও চারণ-গাথায় মানুষের নানাবিধ তৎপরতা, তাহাদের বীরত্ব, আশা, আকাঙ্ক্ষা নানাভাবে রূপায়িত হইয়াছে। ইহা দেব-স্তুতি নহে, মানব-বন্দনা। মানুষকে বড় করিয়া দেখিবার এই প্রয়াস হইতেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎপত্তি; কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। 'দিনের আলোকে চারিদিক উদ্ভাসিত কর। আমাদের দেখিতে দাও। আমাদের বিনাশ করাই যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে আলোকের মধ্যে বিনাশ কর।' যুদ্ধক্ষেত্র সহসা গভীর কুয়াশায় ঢাকা পড়িলে বীরশ্রেষ্ঠ অ্যাজাক্স্ এই বলিয়া জিউসের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। অন্ধকারে নয় আলোকে, অজ্ঞানতায় নয় জ্ঞানের প্রদীপ্ত ছটায় আমরা যেন নিঃশেষিত হই। এই আলোকের সন্ধানেই গ্রীক বিজ্ঞানী ও দার্শনিকের অভিযান। ফারিংটন লিখিয়াছেন ঃ

'হোমার মানবতার সৃষ্টি করিল, আর সেই মানবতা হইতে উৎপত্তি হইল বিজ্ঞানের। জাতির শৈশবে যে দেব-দেবীর উৎপীড়নের দুঃস্বপ্ন চাপিয়া বসিয়াছিল, হোমার ইলিয়ডের মধ্য দিয়া মানুষকে সেই দুঃস্বপ্নের হাত হইতে মুক্তি দিল। মানুষকে শিখাইল নিজের দিকে ফিরিয়া দেখিতে, নিজেকে কতকটা ভবিতব্যের নিয়ামকরূপে মনে করিতে। জ্ঞানই ক্ষমতার উৎস, এই সত্য উপলব্ধি করিয়া ও আত্মবিশ্বাসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মানুষ জ্ঞানের পথে আগাইয়া চলিল। কিন্তু দোলকের কাঁটা যখন উল্টামুখে মোড় ফিরিল, মানুষ যখন তাহারই সৃষ্ট মূর্তির কাছে মাথা নত করিতে আরম্ভ করিল এবং তাহা অপেক্ষাও মারাত্মক, নিজের লিখিত গ্রন্থকে স্বয়ং ঈশ্বরের পবিত্র বাণী বলিয়া মনে করিতে শিখিল, তখনই অবসান হইল মানবতার এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের।'*

ফারিংটনের এই উক্তি শুধু গ্রীক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সত্য নহে; বিভিন্ন সভ্যতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উত্থান-পতনের ইহা এক প্রধান কারণ। ইতালীয় রেণেশাঁর সময় চিত্রকর, ভাস্কর ও সাহিত্যিকদের চেষ্টায় এই মানবতার আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেই ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আবার পূর্ণোদ্যমে সুরু হয়। বিগত শতাব্দীতে এদেশে সমাজ সংস্কারকদের প্রচেষ্টার মধ্যে এই মানবতার আহ্বানই ধ্বনিত হইয়াছে; সেই আহ্বানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের মরা গাঙে আবার জোয়ার আসিয়াছে।

---

* **Benjamin Farrington, *Science in Antiquity,* p. 37-38.**

৪·২। মাইলেশীয় ও আয়োনীয় দার্শনিকগণ—জ্যোতিষ, গণিত, ভূগোল, প্রাকৃতিক দর্শন ও বস্তুর গঠন সংক্রান্ত মতবাদ

ইলিয়ড ও অডিসির যুগ গ্রীক সভ্যতার প্রস্তুতির যুগ। এই যুগের অবসানে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে আপাত-দৃষ্টিতে নিতান্ত আকস্মিকভাবেই গ্রীক মনীষার অপূর্ব বিকাশ আমরা লক্ষ্য করি। এই বিকাশের ক্ষেত্র পশ্চিম এসিয়া মাইনরের সমুদ্রোপকূলবর্তী গ্রীক উপনিবেশ আয়োনিয়া এবং ইহার ভারকেন্দ্র আয়োনিয়ার বিখ্যাত নগর মাইলেটাস্। ষষ্ঠ শতাব্দীতে মাইলেটাস্ শুধু আয়োনিয়ার কেন, সমগ্র গ্রীক জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্যিক কেন্দ্র,



৫৭। প্রাচীন গ্রীস ও আয়োনিয়ার মানচিত্র।

সম্ভবতঃ বৃহত্তম নগর (লোকসংখ্যা আনুমানিক ১০,০০০)। এই নগরের আদর্শে অন্ততঃ ষাটটি ক্ষুদ্র-বৃহৎ জনপদ পশ্চিম এসিয়ার উপকূলে দানা বাঁধিয়াছিল। স্থলপথে মেসোপোটেমিয়ার ও জলপথে মিশরের সহিত প্রাচীন মাইলেটাসের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। বাণিজ্যিক সম্পর্কের পথে পণ্য বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাব বিনিময়ও ঘটিয়াছিল প্রচুর। এই যোগাযোগের সূত্রেই গ্রীক বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা ব্যাবিলনীয় জ্যোতিষ এবং মিশরীয় জ্যামিতি ও চিকিৎসাবিদ্যার সহিত পরিচিত হইবার অপূর্ব সুযোগ লাভ করে। এইরূপ অবস্থায় গ্রীক জগতে মাইলেটাস্ই যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদি পীঠস্থানরূপে আত্মপ্রকাশ করিবে তাহা স্বাভাবিক। এবং প্রাচীনতম দার্শনিকত্রয়ী থালেস্, অ্যানাক্সিম্যাণ্ডার ও অ্যানাক্সিমেনেসের জন্মস্থান যে মাইলেটাস্ ইহা কোন অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ নহে।

থালেস্ (খ্রীঃ পূঃ ৬২৪-৫৪৭)

হোমার ও হেসিয়ডের যুগের পৌরাণিক ও কাল্পনিক আখ্যায়িকা ও কিংবদন্তীর প্রভাব কাটাইয়া স্বাধীন ও মুক্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রবর্তক মাইলেটাসের থালেস্ ছিলেন একাধারে বণিক্, রাজনীতিজ্ঞ, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ্, পূর্তবিদ্যাবিদ্ ও দার্শনিক। থালেস্কে তখনকার যুগের সাতজন জ্ঞানী ব্যক্তির অন্যতম জ্ঞান করা হইত। তাঁহার অসামান্য ও

বহুমুখী প্রতিভার স্পর্শে চিন্তাজগতে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা হয়। বিশ্বজগতে নানা রহস্যের পশ্চাতে যে এক প্রাকৃতিক নিয়ম ও শৃঙ্খলা বর্তমান এবং সাধারণ জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির সাহায্যে ঐ সব রহস্যের সমাধান যে সম্ভবপর, তিনিই প্রথম এইরূপ ধারণা প্রচার করেন। এই ধারণাকে কেন্দ্র করিয়াই মাইলেশীয় দর্শনের উদ্ভব।

হিরোডোটাসের মতে থালেসের মাতা ছিলেন গ্রীক এবং পূর্বপুরুষেরা ফিনিশীয়। দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিভাগে তাঁহার যেমন অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাঁহার প্রখর বৈষয়িক বুদ্ধি সম্বন্ধেও সেইরূপ নানা ঐতিহাসিক গল্প প্রচলিত আছে। কোন এক বৎসর আবহাওয়ার গতি লক্ষ্য করিয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে, সেই বৎসর জলপাই ভাল ফলিবে। ইহার পূর্বে কয়েক বৎসর জলপাই তেমন ভাল ফলে নাই। এজন্য জলপাইয়ের তৈল-নিষ্কাশন যন্ত্রগুলির চাহিদা ও ভাড়াও অনেক কমিয়া গিয়াছিল। থালেস্ এই মন্দার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া মাইলেটাস্ ও চিওসের সমস্ত তৈল-নিষ্কাশন কল অল্প হারে ভাড়া করিয়া আটকাইয়া ফেলেন। পরে জলপাই ভাল হওয়ায় তৈল কলগুলির চাহিদা অপ্রত্যাশিতভাবে বাড়িয়া গেলে, উচ্চ হারে ইচ্ছামত মূল্যে কলগুলি ভাড়া খাটাইয়া তিনি প্রচুর লাভ করেন।

থালেস্ খ্রীঃ পূঃ ৫৮৫ অব্দের ২৮শে মে তারিখের (কাহারও কাহারও মতে খ্রীঃ পূঃ ৬১০ অব্দের সূর্যগ্রহণ) পূর্ণ সূর্যগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, ঐতিহাসিকেরা এইরূপ মনে করেন। সূর্যগ্রহণের সময় পূর্বাহ্ণে নির্ণয় করিবার এই দক্ষতার উপর থালেসের বৈজ্ঞানিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বহুলাংশে প্রতিষ্ঠিত। সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর স্বরূপ এবং জ্যোতিষীয় অনেক গূঢ় তথ্য জানা না থাকিলে গ্রহণ সংক্রান্ত এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভবপর নহে। থালেসের এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্বন্ধে বহু বিতর্ক আছে। মার্টিন প্রমুখ কোন কোন ঐতিহাসিকের অভিমত, সূর্যগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী করিতে হইলে লম্বন (parallax) প্রভৃতি নানা জ্যোতিষীয় বিষয়ের যেইরূপ জ্ঞান আবশ্যক সেইরূপ জ্যোতিষীয় জ্ঞান থালেসের ছিল, ইহা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।* এমন কি তাঁহার প্রায় তিনশত বৎসর পরে প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ হিপার্কাসেরও লম্বন সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না। তারপর এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে, থালেসের পরবর্তী আয়োনীয় জ্যোতির্বিদ্‌গণ নিশ্চয়ই এজাতীয় ভবিষ্যদ্বাণী আরও অনেক করিয়া যাইতেন, কিন্তু এইরূপ কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

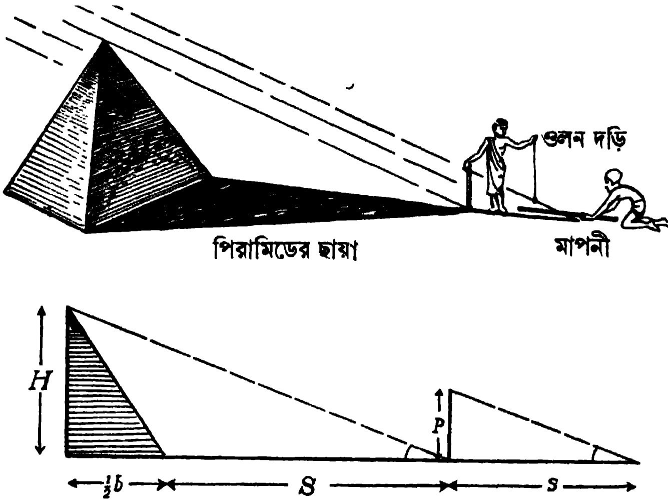
Pour l'histoire de la Science hellene-এর গ্রন্থকার ট্যানারির মতে, থালেসের গ্রহণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর ব্যাপার ঐতিহাসিক সত্য। তাঁহার সমসাময়িক জেনোফোন ও হিরোডোটাস্ উভয়েই থালেসের সূর্যগ্রহণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মিড্‌স্ ও লিডিয়ানদের আত্মঘাতী যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে হিরোডোটাস্ লিখিয়াছেন,—"ছয় বৎসর ইহাদের (মিড্‌স্ ও লিডিয়ানদের) মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ চলিবার পর সপ্তম বৎসরে দুই পক্ষ আবার যখন যুদ্ধার্থ মিলিত হইল, তখন অকস্মাৎ একদিন দিবাভাগেই রাত্রিকাল উপস্থিত হইল। এখন এইরূপ আকস্মিকভাবে দিন থাকিতেই রাত্রির আবির্ভাবের ব্যাপার সম্বন্ধে মাইলেটাসের থালেস্ তাঁহার দেশবাসী আয়োনীয়দের নিকট বহু পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং এই ঘটনা যে এই বৎসরেই ঘটিবে তিনি তাহাও বলিয়া দিয়াছিলেন।" †

সম্ভবতঃ থালেস্ সূর্যগ্রহণের কারণ অবগত ছিলেন এবং মোটামুটি একটা সময়ের মধ্যে গ্রহণের পুনরাবৃত্তি যে সম্ভবপর, এইরূপ কথা তিনি বলিয়াছিলেন। তাঁহার বহু পূর্বে

* *Revue Archeologique,* 1864; p. 181.
† Sir Thomas Heath, *Aristarchus of Samos,* Oxford, 1913; p. 15.

ব্যাবিলনীয় জ্যোতির্বিদেরা সারোণিক পর্যায়-কালের সাহায্যে সূর্যগ্রহণের সময় নির্ণয় করিতে জানিত, একথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। থালেস্‌ ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় বিজ্ঞানের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি সারোণিক পর্যায়-কালের কথা অবগত ছিলেন এবং তাহার সাহায্যেই এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া থাকিবেন।

জ্যামিতিতে থালেসের বিশেষ কৃতিত্বের ও মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বৃত্তের ব্যাস বৃত্তকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে: সমবাহু ত্রিভুজের ভূমিসংলগ্ন কোণ দুইটি সমান; দুইটি সরলরেখা পরস্পর পরস্পরকে ছেদ করিলে বিপরীত কোণ দুইটি সমান হয়; ত্রিভুজের ভূমি ও তৎসংলগ্ন কোণদ্বয় জানা থাকিলে ত্রিভুজটিকে সম্যকরূপে জানা যায়, ইত্যাদি প্রতিপাদ্যের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। জ্যামিতির সাহায্যে পিরামিডের উচ্চতা তিনি নির্ণয় করিতেন। প্রখর রৌদ্রে একটি যষ্টিদণ্ডের ছায়ার সহিত পিরামিডের ছায়ার তুলনা করিয়া এই উচ্চতা নির্ণীত হইত। প্লুটার্কের লেখায় জানা যায়, কোন এক পিরামিডের উচ্চতা নির্ণয়ের সময় মিশররাজ আমাশিস্‌ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং থালেসের এই দক্ষতায় তিনি বিশেষ আশ্চর্যান্বিত ও প্রীত হন।



৫৮। পিরামিডের উচ্চতা নির্ণয়।

[H—পিরামিডের উচ্চতা; b—পিরামিডের ভূমি; S—পিরামিডের ছায়ার দৈর্ঘ্য; p—যষ্টিদণ্ডের উচ্চতা; s—যষ্টিদণ্ডের ছায়ার দৈর্ঘ্য। পিরামিডের উচ্চতা বাহির করিতে হইলে, নিম্নলিখিত সমীকরণটি ব্যবহার করা আবশ্যক:

$$H=\frac{p}{s}\left(\tfrac{1}{2}b+S\right)$$]

এই ধরনের মাপ-জোখের কাজে জ্যামিতিক সমানুপাতিক (proportionality) নিয়মের আশ্রয় লইতে হয়। ইহাতে মনে হয়, থালেস্‌ এই জ্যামিতিক সমানুপাতিক নিয়মের কথা জানিতেন। কেহ কেহ বলেন, যে সময়ে ছায়ার দৈর্ঘ্য দণ্ডায়মান যষ্টির দৈর্ঘ্যের সমান হয়, ঠিক সেই সময় নির্বাচন করিয়া তিনি সম্ভবতঃ পিরামিডের উচ্চতা মাপিয়াছিলেন, কারণ এইরূপ অবস্থায় পিরামিডের উচ্চতা তাহার ছায়ার দৈর্ঘ্যের সমান হইবে। প্রোক্লাস্‌

লিখিয়াছেন, পিরামিড ছাড়া সমুদ্রে অবস্থিত দূরবর্তী জাহাজের দূরত্বও থালেস্ নির্ণয় করিতে পারিতেন। সমানুপাতিক নিয়মের জ্ঞান ছাড়া এই ধরনের দূরত্ব নির্ণয় সম্ভব নয়।

বিশ্বলোক ও পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে থালেসের চিন্তাসূত্রের স্বকীয়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি দেখিলেন, জল বাতাস হইতে মৃত্তিকায় পৌঁছিয়া এবং মৃত্তিকা হইতে উদ্ভিদ্ ও প্রাণিদেহে সঞ্চারিত হইয়া আবার বাতাসে বিলীন হইতেছে। তারপর উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর খাদ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জলীয়। ইহাতে তিনি জলকে কেন্দ্র করিয়া এক আবর্তনমান পরিবর্তনশীল জগতের সন্ধান পাইলেন। এই জলই যখন নানাভাবে দৃশ্য অথবা অদৃশ্য নানা বস্তুর মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া বিশ্বের সংহতি রক্ষা করিতেছে, তখন বিশ্ব-সৃষ্টিতে এই জলই যে মৌলিক উপাদান, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই জল হইতেই পৃথিবীর উৎপত্তি, এই জলেই পৃথিবী ভাসিতেছে এবং হয়ত এই জলেই তাহার লয়। থালেসের এই দর্শন তাঁহার পরবর্তী আয়োনীয় দার্শনিক অ্যানাক্সিম্যাণ্ডার আরও অনেক সম্প্রসারণ ও উন্নীত করেন।

থালেসের ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনায় ঈশ্বরের স্থান নাই। পৃথিবী ও ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে প্রাকৃতিক নিয়মে। যে যুগে সমস্ত বিদ্যার অধিকারী ধর্মযাজকেরা ঈশ্বরকে বাদ দিয়া বিশ্ব-সৃষ্টির কল্পনা করিতে পারিত না, ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা ও অনুগ্রহ ব্যতীত কোন নূতন মতবাদ বা ধারণার উদ্ভব অসম্ভব ইহাই ছিল যে যুগের সাধারণ বিশ্বাস, সেই যুগে ঈশ্বরকে বাদ দিয়া তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনার চেষ্টা রীতিমত বৈপ্লবাত্মক।

থালেস্ ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় বিজ্ঞানের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। আয়োনিয়ার কাছে কস্ নামক দ্বীপে সেকালে ব্যাবিলনীয় ধর্মযাজক ও পণ্ডিতদের যাতায়াত ছিল। এইখানে জনৈক ধর্মযাজক একটি শিক্ষাকেন্দ্রও স্থাপন করিয়াছিলেন, এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকের অনুমান, এই ধর্মযাজকের কাছেই ব্যাবিলনীয় শাস্ত্র ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিবার সুযোগ থালেসের ঘটিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত লিডিয়া ছিল তখনকার দিনে অ্যাসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক অন্যতম বিশিষ্ট কেন্দ্র। লিডিয়ার রাজধানী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সার্দিসে অনুসন্ধিৎসু আয়োনীয় গ্রীকদের যাতায়াত ছিল এবং এইরূপ যোগাযোগের মাধ্যমে থালেস্ ও আয়োনীয় পণ্ডিতদের অনেকে ব্যাবিলনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার যে প্রভূত সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা মনে করা খুবই স্বাভাবিক।*

থালেস্ মিশরেও পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যামিতি মিশরীয় জ্যামিতি ও জমির মাপ-জোখ সংক্রান্ত ব্যবহারিক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু থালেসের জ্যামিতি মিশরীয় জ্যামিতির নিছক অনুকরণ নহে। তিনি এক নূতন নিগমনাত্মক জ্যামিতি (deductive geometry) সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই জ্যামিতির প্রয়োগেই পরবর্তীকালের বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল।

অ্যানাক্সিম্যাণ্ডার (খ্রীঃ পূঃ ৬১০-৫৪৫)

থালেস্ যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও গবেষণার প্রবর্তন করেন, তাঁহার সমসাময়িক ও বিশিষ্ট বন্ধু অ্যানাক্সিম্যাণ্ডার সেই চিন্তাধারার আরও অনেক উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। চিন্তার মৌলিকতায় অ্যানাক্সিম্যাণ্ডার থালেস্‌কেও অতিক্রম করিয়াছিলেন, এবং অনেকের মতে তিনিই গ্রীক ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রথম স্রষ্টা। থিওফ্রেস্টাস্ অ্যানাক্সিম্যাণ্ডারের জীবনী ও দর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার অসাধারণ মননশীলতা, বিশ্লেষণ-ক্ষমতা ও বহুমুখী প্রতিভার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ভূগোল, জ্যোতিষ, জ্যামিতি, সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে আমরা তাঁহার স্বকীয়তার পরিচয় পাই।

* Gomperz, *Griechische Denker;* p. 421,

অ্যানাক্সিম্যান্ডারই প্রথম সমগ্র পৃথিবীর এক সম্পূর্ণ মানচিত্র অঙ্কন করেন। তাঁহার পূর্বে মানচিত্রাঙ্কনে মিশরীয়দেরও যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু মিশরীয়দের মানচিত্রে মিশরের কয়েকটি জেলা ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন স্থান বা দেশের উল্লেখ থাকিত না। অ্যানাক্সিম্যান্ডারের মানচিত্রে সমগ্র পৃথিবীর সীমানা নির্দিষ্ট হইল। তিনি দেখাইলেন, বৃত্তাকার সীমান্তদেশে পৃথিবীকে ঘিরিয়া রহিয়াছে এক মহাসমুদ্র। পরিব্রাজক, পর্যটক, নাবিক প্রভৃতি বহুবিধ লোকের মুখে গল্প শুনিয়া পৃথিবীর ব্যাপ্তি সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা হইয়াছিল, মানচিত্রে তাহাই তিনি রূপায়িত করেন। বহুকাল পর্যন্ত নাবিক ও পর্যটক মহলে এই মানচিত্রের বিশেষ খ্যাতি ছিল।

৫৯। পৃথিবীর মানচিত্র—অ্যানাক্সিম্যান্ডার।

পৃথিবী ও ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে অ্যানাক্সিম্যান্ডারের মতবাদ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিতেন, পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত; জ্যোতিষ্করা ধ্রুব নক্ষত্রের চতুর্দিকে আবর্তিত হইতেছে; পৃথিবীর আকৃতি চ্যাপ্টা নিরেট চোঙের মত, এবং ইহা আকাশ হইতে বাতাসের সাহায্যে ঝুলিয়া রহিয়াছে। তারপর পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে মহাসমুদ্র। গম্বুজ বা গোলছাদের মত আকাশ প্রকৃতপক্ষে একটি গোলার্ধ বিশেষ, ইত্যাদি।

অনেকে মনে করেন, অ্যানাক্সিম্যান্ডার সময় নির্ণয়ের জন্য শঙ্কু (gnomon) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সত্য নহে। তাঁহার বহু পূর্বে ব্যাবিলনে ও মিশরে শঙ্কুর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ গ্রীসে শঙ্কুর ব্যবহার তিনিই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করিয়া থাকিবেন। সময়, ঋতুপরিবর্তন, উত্তরায়ণ ও ক্রান্তিপাত নির্ণয়ের জন্য স্পার্টায় তিনি এক শঙ্কু সংস্থাপন করেন।

অ্যানাক্সিম্যান্ডার ক্রমবিকাশে বিশ্বাস করিতেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ছিল, প্রাণীর তিনটি ক্রম আছে,—জন্ম, জীবন ও মৃত্যু। প্রাণী মাত্রেরই প্রথম জন্ম হইয়াছিল সূর্যতাপে বিশোষিত তরল শিলাজতু হইতে এবং মানুষের জন্ম হইয়াছিল মৎস্যের অভ্যন্তরে। ক্রমবিকাশের প্রথম পর্যায়ে মানুষের আকৃতিও ছিল অনেকটা মৎস্যের মত।

অ্যানাক্সিম্যান্ডার তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ফল *About*

Nature নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রায় ৬৪ বৎসর বয়সে তিনি এই গ্রন্থ *রচনায় প্রবৃত্ত হন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার মূল গ্রন্থটি নিখোঁজ হইয়া যায়; রচনার কিছু কিছু অংশ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু পংক্তির সন্ধান বহু গবেষণার ফলে পরবর্তী-কালে পাওয়া গিয়াছে।*

অ্যানাক্সিম্যাণ্ডারের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে মাইলেশীয় বিজ্ঞানের অবনতি ঘটে। মাইলেটাসের আর এক উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানী অ্যানাক্সিমেনেস্ কিছুদিন এই প্রভাব বজায় রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃই জ্ঞানচর্চার ভারকেন্দ্র বিজ্ঞান হইতে দর্শনে স্থানান্তরিত হয়।

অ্যানাক্সিমেনেস্ (খ্রীঃ পূঃ ৫৮৫-৫২৮)

অ্যানাক্সিমেনেস্ মাইলেটাসের তৃতীয় বিখ্যাত দার্শনিক। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গবেষণায় তিনি প্রধানতঃ থালেস্ ও অ্যানাক্সিম্যাণ্ডারের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। একটি বিশেষ উপাদানে যে জড়জগৎ ও ব্রহ্মাণ্ড গঠিত, মাইলেশীয় দর্শনের এই মূল নীতি তিনি স্বীকার করিয়া প্রচার করেন যে, এই মৌলিক উপাদান জল নহে বায়ু। এই বায়ু অল্প চাপে স্ফীত হইয়া অগ্নির আকার ধারণ করে এবং জমাট বাঁধিয়া প্রথমে জল ও পরে মৃত্তিকায় পর্যবসিত হয়। তাঁহার জ্যোতিষীয় তত্ত্বের মূল কথা হইল, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র এই বায়ু-সমুদ্রে ভাসমান থাকে; সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররা এক একটি আগুনের চাক্তি-বিশেষ; সূর্য গাছের পাতার মত চ্যাপ্টা। অপেক্ষাকৃত নিকটে থাকিবার জন্য সূর্যের উত্তাপ অনুভূত হয়, দূরত্বের জন্য নক্ষত্রের উত্তাপ অনুভূত হয় না। তিনি আরও বলেন, নক্ষত্ররা স্ফটিক-স্বচ্ছ এক বিরাট গোলকের গায়ে পেরেকের মত সংলগ্ন থাকে, তাহারা কদাচ পৃথিবীর নীচে যায় না বা আবর্তিত হয় না। সূর্য অদৃশ্য হয় পৃথিবীর উপরিভাগে অবস্থিত দিগন্তবর্তী পর্বতমালার অন্তরালে দৃষ্টির অগোচরে আত্মগোপন করে বলিয়া।

অ্যানাক্সিমেনেসের মতবাদের বিশেষত্ব এই যে, সর্বপ্রথম সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহের সহিত স্থির নক্ষত্রের পার্থক্য দেখানো হইয়াছে এবং সূর্য ও চন্দ্র হইতে নক্ষত্রদের দূরত্ব যে অনেক বেশী তাহারও ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অ্যানাক্সিম্যাণ্ডাব বিশ্বাস করিতেন, পৃথিবী হইতে সূর্য সর্বাপেক্ষা দূরে অবস্থিত, তারপর চন্দ্র এবং পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে তারকারা। অ্যানাক্সিমেনেসের স্ফটিক গোলকের ধারণাও মৌলিক। তাঁহার প্রায় দুই শত বৎসর পরে ইউডক্সাস্ এইরূপ স্ফটিক গোলকের ধারণা অবতারণা করেন। ট্যানারি লিখিয়াছেন যে,

> 'The only feature of Anaximenes' system that was destined to an enduring triumph is the conception of the stars being fixed on a crystal sphere as in a rigid frame.'*

চন্দ্রের নিজস্ব কোন দ্যুতি নাই, ইহা সূর্যালোকের প্রতিফলনের ফল, অ্যানাক্সিমেনেস্ এইরূপ ধারণা পোষণ করিতেন বলিয়া অনেকের অভিমত। ইউডিমাসের *History of Astronomy*তে এই তথ্য আবিষ্কার সম্পর্কে অ্যানাক্সিমেনেসের নাম উল্লিখিত দেখা যায়। অন্যান্য ঐতিহাসিকের মতে, এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব প্রকৃতপক্ষে অ্যানাক্সাগোরাসের প্রাপ্য। এই সম্বন্ধে আমরা আরও পরে বিশদভাবে আলোচনা করিব।

চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের কারণ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে অ্যানাক্সিমেনেস্ এই দুই জ্যোতিষ্কের সহিত অস্বচ্ছ ও বৃহদাকার মৃত্তিকাখণ্ডের পরিকল্পনা করেন। এই মৃত্তিকাখণ্ডগুলির ব্যাখ্যা লইয়া প্রচুর মতদ্বৈধ আছে। মৃত্তিকাখণ্ডগুলি কি সূর্য বা চন্দ্রের সহিত সংলগ্ন অবস্থায় থাকে, না ইহারা একটা বিশেষ দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলে? শেষোক্তটি হইলে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের ব্যাখ্যা সহজ হইয়া পড়ে। অস্বচ্ছ মৃত্তিকাখণ্ডগুলি সূর্য বা চন্দ্রের সম্মুখে

* **Tannery,** ***Pour l'histoire de la Science hellene;*** **p. 154.**

আসিয়া আমাদের দৃষ্টি অবরোধ করিলেই হইল। পিথাগোরীয় অ্যানাক্সাগোরাস্ গ্রহণের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া এইরূপ অস্বচ্ছ বস্তুর অবতারণা করিয়াছেন এবং মনে হয়, এইরূপ ধারণার জন্য তিনি অ্যানাক্সিমেনেসের কাছে ঋণী। পিথাগোরীয় বিশ্ব-পরিকল্পনায় বিপরীত পৃথিবীর ধারণার সহিতও ইহার বহুলাংশে মিল আছে।

৪·৩। পিথাগোরীয় বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানিগণ

পিথাগোরাস্ (খ্রীঃ পূঃ ৫৭২-৪৯৭)

মাইলেটাসের অনতিদূরে উত্তর-পশ্চিমে সামোস্ দ্বীপ। বিখ্যাত আয়োনীয় গ্রীক দার্শনিক, গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্ পিথাগোরাস্ এই সামোস্ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। থালেস্ ও ইউক্লিডের মত তাঁহার পূর্বপুরুষেরা সম্ভবতঃ ফিনিশীয় ছিলেন। পিথাগোরাসের জন্মসন অনিশ্চিত; ইহা খ্রীষ্টীয় ৫৭২-৭০ পূর্বাব্দ বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি দীর্ঘ-জীবন লাভ করিয়াছিলেন; কাহারও মতে ৭৫, কাহারও মতে ৮০ বৎসর বয়সে মেটাপণ্টিয়াসে তিনি দেহত্যাগ করেন (৪৯৭ ?)।

পিথাগোরীয় ভ্রাতৃসংঘ: পিথাগোরাসের জীবনের তারিখ সম্বন্ধে সঠিকভাবে কেবল এইটুকু জানা যায় যে, ৫৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি সামোস্ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ ইতালীতে ডোরিয়ানদের উপনিবেশ ক্রোটনের অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখানে এক গুপ্ত ভ্রাতৃসংঘ স্থাপন করেন। ধর্ম, দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করাই এই সংঘের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সংঘের সদস্যদের সরল, অনাড়ম্বর সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিতে হইত এবং তাঁহাদের কার্যাবলী ও আলোচনার ফলাফল বাহিরে প্রকাশ করা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ ছিল। পিথাগোরীয়েরা বিশ্বাস করিতেন, আত্মা সাময়িকভাবে দেহপিঞ্জরে বাঁধা পড়ে এবং বার বার আত্মার এইরূপ বন্দীদশা হইতে মুক্তি পাইবার একমাত্র উপায় হইল স্বেচ্ছায় সন্ন্যাস-জীবনের কৃচ্ছ্র বরণ করা। এই ভ্রাতৃসংঘ সমাজ সংস্কারমূলক কার্যেও নিজেদের উৎসর্গ করিয়াছিল। ব্যক্তিগত কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা সমাজের নৈতিক মান উন্নয়ন এবং ক্ষমতালোভী দলের পরিবর্তে প্রকৃত জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা রাজ্য পরিচালনের আদর্শ প্রচার করা তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রচারকার্য সম্পর্কে ভ্রাতৃসংঘকে নানারূপ রাজনৈতিক বিপাকে পড়িতে হয়। কথিত আছে, আনুমানিক ৫০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভ্রাতৃসংঘের বিরুদ্ধে প্ররোচিত হইয়া এক উন্মত্ত জনতা সংঘের বহু ভ্রাতাকে নির্মমভাবে হত্যা ও তাঁহাদের গৃহ-সম্পত্তি অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে। দলের নেতা পিথাগোরাস্ ট্যারেণ্টামে পলায়ন করিয়া কোনক্রমে প্রাণরক্ষা করেন। পিথাগোরাসের জীবদ্দশাতেই ভাঙনের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইলেও খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সংঘের শেষ অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

পিথাগোরাসের বিদ্যোৎসাহিতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অনুপ্রেরণার মূল উৎস সম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা কঠিন। সম্ভবতঃ তিনি থালেসের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা এই প্রখ্যাত দার্শনিকের শিক্ষা ও রচনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিকদের অভিমত, থালেস্ তাঁহার নিজস্ব সঞ্চিত গ্রন্থাদি ও জ্ঞান-ভাণ্ডার পিথাগোরাস্‌কে অর্পণ করিয়া যান এবং থালেসের পরামর্শেই তিনি যৌবনে দীর্ঘকাল মিশর ও ব্যাবিলনে জ্যামিতি ও জ্যোতিষ অধ্যয়ন করেন। তাঁহার ভারতবর্ষ পরিভ্রমণের উল্লেখও হয়ত অমূলক নহে। পিথাগোরীয় দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও গণিতে ভারতীয় চিন্তাধারা ও বৈশিষ্ট্যের ছাপ একান্ত লক্ষণীয়।

পিথাগোরাস্ তাঁহার সুদীর্ঘ গবেষণার ফল ও নানা মতবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই।

বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা ও শিক্ষা বহু বৎসর পিথাগোরীয় শিষ্যদের মধ্যে মুখে মুখে আলোচিত, সংশোধিত ও সম্প্রসারিত হইয়া আসিয়াছিল। ভ্রাতৃসংঘের কার্যকলাপ গোপন রাখিবার প্রয়োজন হইতেই পিথাগোরীয়েরা ছাত্র পরম্পরায় এইরূপ মৌখিক শিক্ষা ও আলোচনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। গবেষণার ফল লিখিয়া প্রকাশ করার অপরাধে সংঘের কোন কোন শিষ্যকে বিশেষ শাস্তি, এমন কি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত ভোগ করিবার উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি গোলকের অভ্যন্তরে একটি ডোডেকাহেড্রনের অংকনকৌশল প্রকাশ করিবার অপরাধে একজন ছাত্র হিপ্পাসাস্‌কে, কেহ বলেন ডুবাইয়া মারা হইয়াছিল, কেহ বলেন সংঘ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল। সক্রেটিস ও ডিমোক্রিটাসের সমসাময়িক থিব্‌স্‌-এর পিথাগোরীয় বিজ্ঞানী ফিলোলাউস্‌ (খৃষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দী) সর্বপ্রথম ভ্রাতৃসংঘের গবেষণা ও মতবাদ সম্পর্কে গ্রন্থাদি রচনা করেন। ফিলোলাউস্‌ নিজেও বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্‌ ছিলেন এবং ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে এক সুসম্বন্ধ পরিকল্পনা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই ফিলোলাউসের রচনাবলীই পিথাগোরাস্‌ ও তাঁহার সহকর্মী ও শিষ্যদের গবেষণা সম্বন্ধে জানিবার একমাত্র নির্ভরযোগ্য সূত্র। দুর্ভাগ্যক্রমে এই রচনাবলীর মূল সংস্করণ বহুদিন পূর্বেই নিখোঁজ হইয়াছে। ইউডিমাস্‌, প্রোক্লাস্‌ প্রমুখ প্রাচীন গ্রীক লেখকদের রচনায় ইহার কিছু কিছু অংশ সংরক্ষিত হইয়াছে। প্লেটো তাঁহার *Timaeus* গ্রন্থের অনেক স্থানে ফিলোলাউসের মতবাদ আলোচনা করিয়াছেন। এইভাবে নানা হাত ঘুরিয়া ও নানাভাবে সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হইয়া পরবর্তীকালে পিথাগোরাসের আবিষ্কার ও মতবাদ বলিয়া যাহা স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে তাহার কতটুকু পিথাগোরাসের নিজস্ব অবদান আর কতটুকু তাঁহার শিষ্যবর্গের সম্মিলিত সাধনার ফল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। অ্যারিস্টট্‌ল্‌ও এই ধাঁধায় বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন; তাই পিথাগোরীয় দর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের নামোল্লেখের পরিবর্তে তিনি বহুবচনে 'পিথাগোরীয়েরা' শব্দটি বরাবর ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

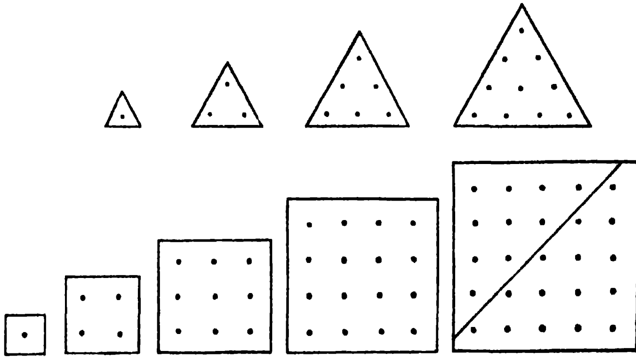
এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও পিথাগোরাস্‌ সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে তাহাতে এই রহস্যময় বিজ্ঞানীর অদ্ভুত প্রতিভা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। এই প্রতিভার স্পর্শে সংখ্যাতত্ত্ব, গণিত, জ্যামিতি, শব্দবিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও দর্শন নূতন অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা লাভ করে। ব্যবহারিক বিদ্যার পর্যায় অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞানের এই বিভাগগুলি শুদ্ধ মননশীলতার বিষয় হইয়া উঠে। বিশেষতঃ গণিতে পিথাগোরীয়েরা যে উচ্চ মান ও আদর্শ স্থাপন করেন তাহা পরবর্তী গ্রীক গণিতজ্ঞদের গবেষণার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিল।

সংখ্যাতত্ত্ব ও গণিতঃ প্রথমে গণিত ও সংখ্যাতত্ত্ব সম্বন্ধে পিথাগোরীয়দের গবেষণার কথা আলোচনা করা যাক। পিথাগোরীয়েরা সংখ্যাকে বস্তু-নিরপেক্ষ মনে করিতেন না। সংখ্যা নিরালম্ব, অমূর্ত, কাল্পনিক কোন জিনিস নহে, বস্তুজগতের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে; এমন কি নানা বাস্তব গুণাগুণের অধিকারীও ইহারা বটে। পূর্ণ সংখ্যার আপাত রহস্যজনক নানা অর্থ আছে। সংখ্যা ১-এর অর্থ বিন্দু, ২-এর রেখা, ৩-এর ক্ষেত্র, ৪-এর দেশ (space)। এতদ্ব্যতীত ২-এ স্ত্রীজাতির গুণ বিদ্যমান, ৩-এ পুরুষ জাতির এবং ৫-এ বিবাহের; কারণ ২ (স্ত্রীজাতি)+৩ (পুরুষ)=৫ (বিবাহ)। ৪ হইল ন্যায়ের প্রতীক; যেহেতু এই সংখ্যা দুইটি সমান গুণকের গুণফল (২×২)। যুগ্ম ও অযুগ্ম সংখ্যার সহিত পিথাগোরীয়েরা দক্ষিণ ও বাম, অসীম ও সসীম প্রভৃতি নানা ধারণার অবতারণা করিতেন।

সংগীতের সুরলহরী তারা, উদারা, মুদারার (octaves) সহিত সংখ্যার সম্বন্ধ নির্ণয় পিথাগোরাস্‌ ও তাঁহার শিষ্যবর্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। তারের যন্ত্রে যে বিবিধ সুরের সঞ্চার হয় তাহার প্রভেদ নির্ভর করে তারের দৈর্ঘ্যের উপর। তাঁহারা দেখান যে, প্রথম, পঞ্চম ও অক্‌টেভ সুর সৃষ্টির জন্য তারের দৈর্ঘ্যের অনুপাত সব সময় ৬ : ৪ : ৩

হইয়া থাকে। সঙ্গীত ও ধ্বনিবিজ্ঞানে ইহা এক মৌলিক আবিষ্কার। সংখ্যার আশ্চর্য মহিমার ইহা একটি দৃষ্টান্তও বটে।

পিথাগোরীয়েরা জ্যামিতিক ধারণার সাহায্যেও সংখ্যার মর্মোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ১, ৩, ৬, ১০, ১৫ ইত্যাদি সংখ্যার নাম দিয়াছিলেন 'ত্রিভুজ সংখ্যা'; কারণ এইরূপ সংখ্যক বিন্দুর সাহায্যে যে কোন সমবাহু ত্রিভুজ আঁকিতে পারা যায় (৬০নং চিত্র)। সেইরূপ ১, ৪, ৯, ১৬, ২৫ ইত্যাদি হইল 'বর্গ সংখ্যা'। যে কোন বর্গ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত বিন্দুর সাহায্যে একটি বর্গ রচনা সম্ভবপর (৬০নং চিত্র)। তারপর তাঁহারা দেখান যে, পরপর যে কোন দুইটি ত্রিভুজ সংখ্যার যোগফল একটি বর্গ সংখ্যা। ৬০নং চিত্রের নীচের পঞ্চম নক্সাটি দেখিলে তাহা বুঝা যাইবে।



৬০। 'ত্রিভুজ সংখ্যা' ও 'বর্গ সংখ্যা'র জ্যামিতিক রূপ।

সংখ্যার এই প্রকার মরমীবাদী ও জ্যামিতিক ব্যাখ্যা আধুনিক বিজ্ঞানের বিচারে সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও নিরর্থক মনে হইবে। কিন্তু পিথাগোরীয়দের কাছে সংখ্যার গুরুত্ব ছিল অন্য প্রকার; সংখ্যা-রহস্যের সহিত প্রকৃতি, ব্রহ্মাণ্ড ও সৃষ্টি-রহস্যের সম্বন্ধ যে অতি নিবিড় এবং প্রকৃতি ও ব্রহ্মাণ্ডকে বুঝিতে হইলে যে সংখ্যা-রহস্যের কিনারা হওয়া দরকার, পিথাগোরীয়দের ইহাই ছিল ধ্রুব বিশ্বাস। প্লেটো যেমন অনুভব করিয়াছিলেন, মনই হইল সৃষ্টির গোড়ার কথা এবং বিশ্ব-প্রকৃতি এই মন দ্বারাই গঠিত, অথবা ডিমোক্রিটাস্ প্রমুখ আণবিক দার্শনিকেরা যেমন বুঝিয়াছিলেন, প্রকৃতিতে অণু-পরমাণুরাই একমাত্র সত্য এবং নানাভাবে ইহাদের বিচিত্র খেলাই আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ করি, সেইরূপ পিথাগোরীয়দের প্রত্যয় হইয়াছিল যে, জগৎ সংখ্যাময়। অসংখ্য 'মোনাড' বা ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সমন্বয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রচিত হইয়াছে, অতএব সংখ্যার অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি হইতেই বিশ্ব-রহস্যের কিনারা করা সম্ভব হইবে।

সংখ্যার গবেষণা সম্পর্কে পিথাগোরীয়দের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হইল ২-এর বর্গমূলের ($\sqrt{2}$) অমেয়ত্ব উপলব্ধি করা। $\sqrt{2}$ একটি অমেয় বা অমূলদ রাশি; অর্থাৎ এই বর্গমূলকে পূর্ণ সংখ্যা বা ভগ্নাংশে প্রকাশ করা অসম্ভব। ইহার প্রমাণ খুব সহজ। মনে করা যাক, $\sqrt{2}$-কে ভগ্নাংশে প্রকাশ করা সম্ভবপর এবং এই ভগ্নাংশের লঘিষ্ঠ আকার হইল $m|n$। তাহা হইলে m ও n উভয়েই এক সঙ্গে যুগ্ম সংখ্যা হইতে পারে না। আমরা লিখিতে পারি ঃ

$$2=\frac{m^2}{n^2}\ ;\ m^2=2n^2\ ;$$

অর্থাৎ m একটি যুগ্ম সংখ্যা। ধরা যাক,

$$m = 2p \; ; \; m^2 = 4p^2 \; ;$$

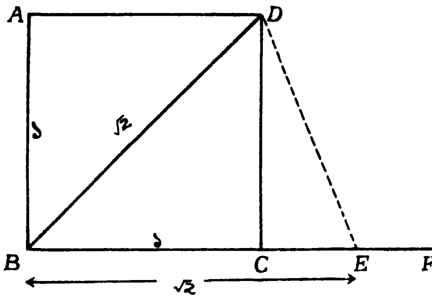
সুতরাং,

$$4p^2 = 2n^2 \; ; \; n^2 = 2p^2 \; ;$$

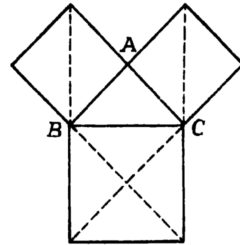
অতএব দেখা যাইতেছে n একটি যুগ্ম সংখ্যা।

কিন্তু আমরা বলিয়াছি একইকালে m ও n যুগ্ম সংখ্যা হইতে পারে না। সুতরাং $\sqrt{২}$ -কে ভগ্নাংশে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ইহা হইতে পিথাগোরীয়েরা উপসংহার করেন যে, $\sqrt{২}$ একটি অমেয় রাশি।

সংখ্যার জ্যামিতিক ব্যাখায় পিথাগোরীয়দের প্রচেষ্টার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। পিথাগোরীয় উপপাদ্যের সহিত এই আবিষ্কারের তাৎপর্য যাচাই করিতে গিয়া তাঁহারা সমূহ বিপদে পড়িয়াছিলেন। $\sqrt{২}$ -এর মান হইল ১·৪১৪২...। এই মানের অর্থ এই যে, ইহা ১·৪ অপেক্ষা বড় কিন্তু ১·৫ হইতে ছোট। দশমিকের দ্বিতীয় ঘর পর্যন্ত ধরিলে ইহা ১·৪১ হইতে বড়, কিন্তু ১·৪২ হইতে ছোট, ইত্যাদি। জ্যামিতির সাহায্যে এই ব্যাপার আমরা এইভাবে প্রকাশ করিতে পারিঃ—



৬১।



৬২।

মনে করা যাক A B C D একটি বর্গ এবং B D কর্ণ। বর্গের যে কোন বাহুর দৈর্ঘ্য ১ ধরিলে কর্ণের দৈর্ঘ্য হইবে $\sqrt{২}$। B D কর্ণকে B F-এর উপর ন্যাস্ত করিতে হইলে কর্ণের D প্রান্তভাগ B F-এর উপর E বিন্দুর কাছাকাছি পড়িবে; কিন্তু ঠিক কোন্ বিন্দুতে? স্থূলভাবে দেখিতে গেলে B E-এর দূরত্ব হইবে ১·৪ ও ১·৫-এর মধ্যে। আরও নিখুঁত মাপ গ্রহণ করিতে গেলে B E-এর দূরত্ব হওয়া উচিত ১·৪১ ও ১·৪২-এর মধ্যে। ইহাকে আরও নির্ভুল করিতে হইলে B E-এর দূরত্ব ১·৪১৪ ও ১·৪১৫-এর মধ্যে হইতে হইবে। এইভাবে আমরা B E-এর যতই নিখুঁত মাপ লইবার চেষ্টা করি না কেন, যত সামান্যই হউক, প্রত্যেক বারে কিছুটা তফাৎ থাকিয়া যাইবে। অর্থাৎ ১·৪ ও ১·৫-এর দৈর্ঘ্যের মধ্যে অসংখ্য বিন্দুর সমাবেশ সম্ভবপর।

পূর্ণ সংখ্যার উপর পিথাগোরীয়দের গোড়া হইতেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপের কথা বলিয়াছি। পূর্ণ সংখ্যার ধারণা হইতে তাঁহাদের মনে হয় যে, রেখা মাত্রই শেষ পর্যন্ত অতি ক্ষুদ্র অথচ সসীম আয়তনের কতকগুলি অংশের সমষ্টি। এই ক্ষুদ্র অংশগুলিকে যদি বিন্দু বলা হয়, তবে ক্ষুদ্র হইলেও বিন্দুরও একটি নির্দিষ্ট আয়তন আছে। এইরূপ ক্ষুদ্র সসীম বিন্দু বা মোনাডের সাহায্যে তাঁহারা শুধু গণিতরাজ্যের কেন, সমগ্র প্রকৃতি-রাজ্যের এক প্রণালীবদ্ধ ব্যাখ্যা তৈয়ারী করিয়াছিলেন। কিন্তু উপরিউক্ত আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে

যে, বিন্দুর ক্ষুদ্রায়তনের কোন নিম্নতম সীমা নাই। ইহাকে যত ইচ্ছা ক্ষুদ্র ভাবা যায়। এইরূপ ভাবিতে গেলে তো বিন্দুর অস্তিত্বই লোপ পাইবার কথা। তবে কি ব্রহ্মাণ্ডের এই বিন্দুতত্ত্ব মিথ্যা, গোটা ব্রহ্মাণ্ডটাই কি অলীক ও মায়া? পিথাগোরীয়দের পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া গেল, সন্ত্রস্ত হইয়া অমেয় রাশির আবিষ্কারের কথা তাঁহারা বহুকাল গোপন রাখিয়াছিলেন।

অমেয় রাশির জ্যামিতিক ব্যাখায় যে অসঙ্গতির কথা বলা হইল তাহাকে আশ্রয় করিয়া আর একজন বিখ্যাত গ্রীক গণিতজ্ঞ জেনো (খৃঃ পূঃ ৪৯৫-৪৩৫) একটি চমৎকার উপমা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। গণিতের ইতিহাসে ইহা অ্যাকিলিস্ ও কচ্ছপের দৌড় নামে প্রসিদ্ধ। এই দৌড় প্রতিযোগিতার প্রারম্ভে কচ্ছপ অ্যাকিলিস্ হইতে ১০০০ গজ অগ্রগামীঃ অ্যাকিলিসের পক্ষে এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া কি সম্ভব? জেনো দেখাইলেন, পিথাগোরীয়দের দৈর্ঘ্যের ধারণা স্বীকার করিলে অ্যাকিলিস্ কখনই কচ্ছপকে ধরিতে পারিবে না। মনে করা যাক, অ্যাকিলিস্ যে সময়ে ১০০০ গজ অতিক্রম করিয়াছে সেই সময়ে কচ্ছপটি অগ্রসর হইয়াছে মাত্র ১০০ গজ। সুতরাং এখনও কচ্ছপটি ১০০ গজ অগ্রগামী। দৌড়ের দ্বিতীয় পর্যায়ে অ্যাকিলিস্ ১০০ গজ অতিক্রম করিলে কচ্ছপটি এবারেও ১০ গজ আগাইয়া থাকিবে; পরবর্তী বারে অ্যাকিলিস্ এই ১০ গজ অতিক্রম করিলে কচ্ছপটি ১ গজ আগাইয়া থাকিবে। এইভাবে অ্যাকিলিস্ কচ্ছপের যতই নিকটবর্তী হইবার চেষ্টা করিবে প্রতিবারেই কচ্ছপটি অ্যাকিলিস্ হইতে কিছুটা অগ্রগামী থাকিবে এবং অনন্তবার চেষ্টা করিয়াও অ্যাকিলিস্ কচ্ছপটিকে ধরিতে পারিবে না!

জ্যামিতি ঃ সংখ্যাতত্ত্বের পর পিথাগোরীয়দের জ্যামিতিক গবেষণা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। রেখা, কোণ, তল প্রভৃতি নানা মৌলিক জ্যামিতিক বিষয়ের সংজ্ঞা তাঁহারাই প্রথম প্রদান করেন। ত্রিভুজের নানা গুণাগুণ সম্পর্কে তাঁহারাই প্রতিজ্ঞাদি রচনা করেন। ত্রিভুজের তিন কোণ একত্রে দুই সমকোণের সমান—ইহা তাঁহাদেরই আবিষ্কার। সমান্তরাল রেখার ধর্ম সম্বন্ধেও তাঁহারা কয়েকটি প্রতিজ্ঞা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল আবিষ্কারকেই ম্লান করিয়া দিয়াছে পিথাগোরাসের নামে সুপরিচিত সমকোণী ত্রিভুজের উপপাদ্য।

ইউক্লিড তাঁহার জ্যামিতির ৪৭নং উপপাদ্যে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উপপাদ্যটি হইল, এক সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গের ক্ষেত্রফল অপর বাহুদ্বয়ের উপর অঙ্কিত বর্গদ্বয়ের ক্ষেত্রফলের সমান। পিথাগোরাসের নাম জড়িত থাকিলেও তিনিই যে ইহার প্রথম আবিষ্কর্তা তাহাতে সন্দেহ আছে। প্রাচীন ব্যাবিলনীয়, মিশরীয়, ভারতীয় ও চৈনিকেরাও সম্ভবতঃ এই উপপাদ্যের কথা অস্পষ্টভাবে জানিতেন। আপস্তম্ব, বৌধায়ন, কাত্যায়ন প্রমুখ বৈদিক শুল্বকারগণ এই উপপাদ্যকে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—একটি আয়তক্ষেত্রের কর্ণ যে বর্গক্ষেত্র উৎপন্ন করে তাহার ক্ষেত্রফল আয়তক্ষেত্রের বাহুদ্বয়ের উপর উৎপন্ন বর্গক্ষেত্রের মিলিত ক্ষেত্রফলের সমান। হ্যাঙ্কেল, ইয়ুঙ্গে প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মতে পিথাগোরাস্ তাঁহার নামে প্রচলিত উপপাদ্যের প্রথম আবিষ্কর্তা নহেন। স্যার টমাস্ হীথ এই উপপাদ্য আবিষ্কার সম্পর্কে বিভিন্ন জাতির দাবীর চুলচেরা আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পিথাগোরাস্‌কে ইহার আবিষ্কর্তারূপে মনে করিবার কোন কারণ নাই; পক্ষান্তরে তাঁহার অভিমত এই যে, ভারতবর্ষে এই উপপাদ্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবার সম্ভাবনাই প্রবল। যাহা হউক এই আবিষ্কারের আদি ইতিহাসের প্রশ্ন এখন পর্যন্ত অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে।

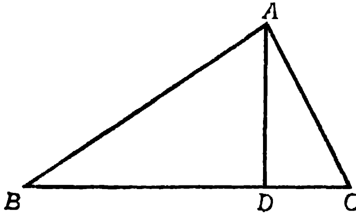
ইউক্লিডের জ্যামিতেতে আমরা যে প্রমাণ পাই তাহা পিথাগোরাসের নহে: পরবর্তী গণিতজ্ঞেরা এই প্রমাণ উদ্ভাবন করেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজের বেলায়, সহজ অঙ্কনের সাহায্যে এই উপপাদ্য প্রমাণ করা যায়। ৬২নং চিত্রে A B C একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজ। বাহুত্রয়ের উপরে অঙ্কিত বর্গের কর্ণগুলি টানিয়া

আমরা যে ক্ষুদ্র ত্রিভুজগুলি দেখাইয়াছি তাহারা প্রত্যেকেই আয়তনে সমান। অতিভুজ B C-এর উপর অঙ্কিত বর্গের মধ্যে এইরূপ চারিটি ত্রিভুজ ও অপর বাহুর উপর বর্গের মধ্যে দুইটি করিয়া ত্রিভুজ আছে। পিথাগোরাস্ সম্ভবতঃ এই জাতীয় অঙ্কনের দ্বারা উপপাদ্যের যাথার্থ্য প্রমাণ করেন। বর্গ-সংখ্যা লইয়া গবেষণা প্রসঙ্গে পিথাগোরাস্ এই উপপাদ্যের তাৎপর্য হয়ত আবিষ্কার করিয়া থাকিবেন। কেহ কেহ বলেন, মিশরীয় রজ্জু-সম্প্রসারকেরা ৩, ৪ ও ৫ অনুপাতের রজ্জুকে বাঁকাইয়া যে ভাবে সমকোণী ত্রিভুজ উৎপন্ন করিত তাহা লক্ষ্য করিয়া এইরূপ উপপাদ্যের সম্ভাবনা পিথাগোরাসের মাথায় প্রথম উদিত হয়। সে যাহাই হউক, তিনি এই আবিষ্কারকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করেন। অ্যাপোলোডোরাস্ নামে জনৈক কবির বর্ণনায় জানা যায় যে, পিথাগোরাস্ এই আবিষ্কার উপলক্ষ্য করিয়া বিশেষ জাঁকজমক সহকারে বৃষবলির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

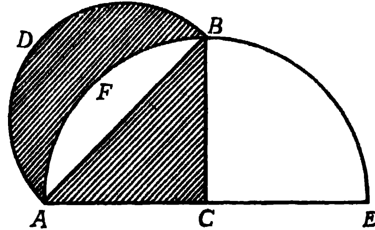
যে কোন একটি আয়তক্ষেত্র (rectangle) দেওয়া থাকিলে ইহার ক্ষেত্রফলের সমান একটি বর্গ কিরূপে আঁকিতে পারা যায় পিথাগোরাস্ নাকি এই সমস্যারও সমাধান করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীক পূর্তবিদ্যায় আয়তক্ষেত্রের সমান বর্গক্ষেত্র রচনার বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। সমকোণী ত্রিভুজের ধর্ম হইতে অবশ্য ইহা অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়। A B C ত্রিভুজের A সমকোণ (৬৩নং চিত্র)। A D লম্ব টানিলে A B C ও A B D ত্রিভুজদ্বয় সদৃশ হইবে। অর্থাৎ—

$$\frac{BC}{AB} = \frac{AB}{BD}$$

$$AB^2 = BC \times BD$$



৬৩।



৬৪।

অতএব AB×AB বর্গক্ষেত্র BC×BD আয়তক্ষেত্রের সমান। পিথাগোরাস্ ঠিক এইভাবে সমস্যাটির সমাধান করিয়াছিলেন কিনা তাহা বলা যায় না। করিয়া থাকিলে এই একই পদ্ধতিতে পূর্বোক্ত উপপাদ্যটি তাঁহার প্রমাণ করিবার কথা। কারণ তিনি নিশ্চয়ই দেখিয়া থাকিবেন যে, এই অঙ্কনে (৬৩নং চিত্র) A B C, A B D ও A C D তিনটি ত্রিভুজই সদৃশ। সদৃশ ত্রিভুজের বাহুগুলির পারস্পরিক অনুপাত হইতে সহজেই দেখান যায় যে—

$$AB^2 = BC \times BD\,;$$
$$AC^2 = BC \times DC\,;$$
$$AB^2 + AC^2 = BC\,(BD + DC)$$
$$= BC^2.$$

এই সম্পর্কে গ্রীকদের আর একটি বিখ্যাত জ্যামিতিক সমস্যার কথা উল্লেখযোগ্য। ইহা হইল বৃত্তের বর্গকরণ (squaring the circle); অর্থাৎ একটি বৃত্ত দেওয়া থাকিলে

তাহার সমান করিয়া একটি বর্গক্ষেত্র রচনা করা। গ্রীকরা এই সমস্যার সমাধান দুঃসাধ্য বলিয়া জানিত। ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে এই সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নহে। তবে হিপোক্রেটিস্ অব চিওস্ একটি বৃত্তাংশের সমান করিয়া কি ভাবে বর্গক্ষেত্র রচনা করা যায় তাহা প্রমাণ করিয়াছিলেন। ৬৪নং চিত্রে A B E একটি অর্ধবৃত্ত, A B C সমকোণী ত্রিভুজ এবং A D B আর একটি ক্ষুদ্র অর্ধবৃত্ত। হিপোক্রেটিস্ দেখান যে, বক্র চন্দ্রাকৃতি বৃত্তাংশ A D B F-এর ক্ষেত্রফল A B C ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সমান। পিথাগোরীয়েরাও নাকি এইভাবে সমস্যাটির আংশিক সমাধান করিয়াছিলেন।

জ্যোতিষ : জ্যোতির্বিদ্যায়ও পিথাগোরাস্ ও তাঁহার শিষ্যবর্গের অনেক অবদান আছে। পৃথিবী, গ্রহ ও জ্যোতিষ্কদের আকার গোল—পিথাগোরীয়েরা এইরূপ মত পোষণ করিতেন। পৃথিবী ও জ্যোতিষ্কদের গোলাকৃতির কথা গ্রীক বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের মধ্যে পিথাগোরীয়েরাই প্রথম উপলব্ধি করেন। আকাশ ও ব্রহ্মাণ্ড গোল—সম্ভবতঃ এইরূপ ধারণা হইতে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত জ্যোতিষ্কেরাও যে গোল, তাঁহাদের এইরূপ প্রতীতি জন্মিয়া থাকিবে। বিবিধ জ্যামিতিক রেখার মধ্যে বৃত্ত বা গোল রেখা এবং ঘন বস্তুর মধ্যে গোলকই যে সর্বাপেক্ষা সহজ ও সুন্দর এইরূপ যুক্তি হইতেও পৃথিবী ও গ্রহদের গোলাকৃতির কথা তাঁহাদের মনে হইতে পারে। অনেকে বলেন, চন্দ্রগ্রহণের সময় চন্দ্রের উপর পৃথিবীর যে গোল ছায়া পড়ে তাহা লক্ষ্য করিয়া পিথাগোরীয়েরা উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন। ইহা সত্য হইলে এই আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

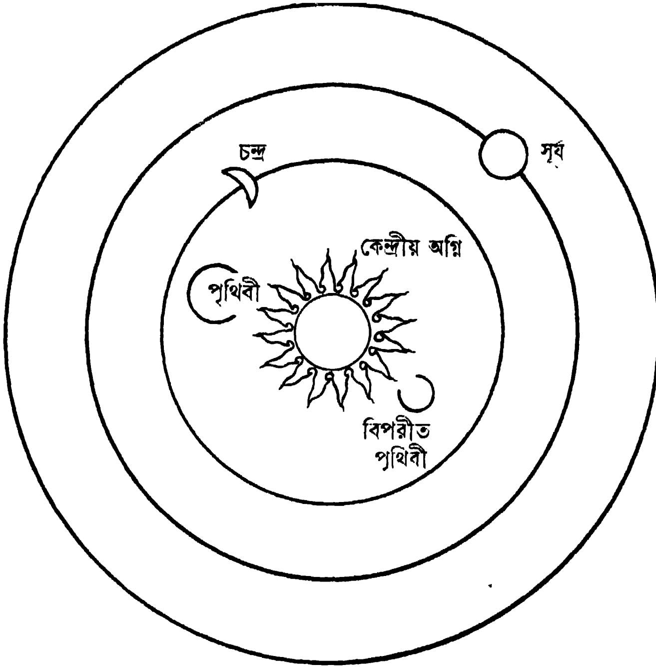
পিথাগোরীয় ফিলোলাউস্ ও অগ্নি-কেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনা

জ্যোতিষে পিথাগোরীয়দের প্রধান অবদান—আকাশে পৃথিবীর গতি কল্পনা করা। অগ্নিকে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে সংস্থাপিত করিয়া তথাকথিত অগ্নি-কেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ডের পরিকল্পনা পিথাগোরীয়েরাই প্রথম উদ্ভাবন করেন। অনেকে অবশ্য এই পরিকল্পনাকে সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার এক অস্পষ্ট সংস্করণ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। সে কথা পরে বলিতেছি। সাধারণভাবে পিথাগোরীয়দের নামে চলিয়া আসিলেও প্রকৃতপক্ষে ফিলোলাউস্ ছিলেন এই ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনার উদ্যোক্তা। পিথাগোরীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রচারক ও লিপিকার হিসাবে ফিলোলাউসের নাম আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তিনি পিথাগোরীয় বিজ্ঞানের কেবল একজন সামান্য লিপিকার বা টীকাকারই ছিলেন না; নিজেও ছিলেন একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। তিনি পিথাগোরীয় ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনার নানা মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন। ভিট্রুভিয়াস্ তাঁহাকে আরিস্টার্কাস্, আর্কিমিডিস্, ইরাটোস্থেনিস্ প্রমুখ প্রাচীন মনীষীদের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ফিলোলাউস্ সক্রেটিস্ ও ডিমোক্রিটাসের সমসাময়িক এবং দুইজনের অপেক্ষাই বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। খৃষ্ট পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে থিব্সে তাঁহার কর্মজীবনের আভাস পাওয়া যায়।

অ্যারিষ্টট্ল্, সিম্প্লিসিয়াস্, এটিয়াস্, শিয়াপ্যারেলি প্রমুখ গ্রীক পণ্ডিত ও লেখকগণ ফিলোলাউসের অগ্নি-কেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনার বিবরণ ও সমালোচনা লিখিয়া গিয়াছেন। এই সব বিবরণ হইতে পরিকল্পনাটি সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহা সংক্ষেপে এইরূপ। ব্রহ্মাণ্ডের আকার গোল ও ইহা সসীম। ব্রহ্মাণ্ডের সীমান্ত দেশের বাহিরে অসীম শূন্যতা; এই শূন্যতার জন্য ব্রহ্মাণ্ড শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে সক্ষম। ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থান অধিকার করিয়া আছে এক বিরাট অগ্নিকুণ্ড। এই কেন্দ্রীয় অগ্নিই ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ, বহন ও পরিচালন করিয়া থাকে; ইহাই প্রাকৃতিক শক্তির উৎস। কেন্দ্রীয় অগ্নির সবচেয়ে নিকটবর্তী কক্ষায় বিপরীত পৃথিবী পরিক্রমণ করে। পরবর্তী বিভিন্ন কক্ষায় যথাক্রমে পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, পাঁচ গ্রহ ও সর্বশেষে স্থির নক্ষত্রেরা কেন্দ্রীয় অগ্নিকে নিয়মিতরূপে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে

(৬৫নং চিত্র)। অগ্নিকে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে বসাইবার কারণ এই যে, কেন্দ্রে যোগ্যতম বস্তুরই স্থান হওয়া উচিত এবং মৃত্তিকাময় পৃথিবী অপেক্ষা হুতাশনই এই যোগ্যতার অনেক বেশী অধিকারী।

"....for they (Pythagorians) considered that the worthiest place is appropriate to the worthiest occupant and fire is worthier than earth."*



৬৫। ফিলোলাউসের অগ্নি-কেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনা।

কেন্দ্রীয় অগ্নি ও সূর্য কি এক? পিথাগোরীয়েরা সে কথা কোথাও বলেন নাই; বরং এই পরিকল্পনায় অগ্নিকে কেন্দ্র করিয়া সূর্যের জন্য একটি স্বতন্ত্র কক্ষার (orbit) ব্যবস্থা আমরা দেখিতে পাই। অগ্নির পরিবর্তে সূর্যকে যদি কেন্দ্রে বসানো হইত তবে সূর্য-কেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনার প্রথম রচয়িতা হিসাবে পিথাগোরীয়েরা বিজ্ঞানের ইতিহাসে অন্যরূপ সম্মান পাইতেন। কেহ কেহ অবশ্য মনে করেন, পিথাগোরীয়েরা কেন্দ্রীয় অগ্নি বলিতে আসলে সূর্যকেই বুঝাইয়াছিলেন। কিন্তু বিরুদ্ধ সমালোচনা ও ধর্ম সংক্রান্ত জটিলতার আশঙ্কায় প্রকাশ্যে এইরূপ কথা বলিতে সাহস পান নাই।

পিথাগোরীয়েরা বলিতেন, পৃথিবী-পৃষ্ঠের যে অংশে মানুষের বাস (অর্থাৎ গ্রীক ও গ্রীকদের প্রতিবেশী জাতিদের বাস) সেই অংশ কেন্দ্রীয় অগ্নির বিপরীত দিকে থাকায় এই অগ্নিকে দেখিবার কোন উপায় নাই। নাবিকেরা কিন্তু একথা বহুদিন মনে রাখিল এবং ভূমধ্য সাগর পার হইয়া দক্ষিণে বহুদূরে সমুদ্রপথে পাড়ি দিবার সময় তাহারা অনেকদিন

* **Aristotle, *Dc Caelo*, ii, 13, 293 a; 18-b 30.**

ভাবিয়াছে—এইবার হয়ত কেন্দ্রীয় অগ্নিকুণ্ডের সাক্ষাৎ মিলিবে। দুস্তর সমুদ্র ও নানা অচেনা দেশে অভিযানের সময় বহু আশ্চর্য জিনিস প্রত্যক্ষ করিবার অভিজ্ঞতা হইলেও কোন নাবিকের মুখে পিথাগোরীয় অগ্নিকুণ্ড দেখিবার গল্প শোনা গেল না।

তারপর পিথাগোরীয়দের বিপরীত পৃথিবী কল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতে পারে। অনেকের মতে, গ্রহণের ব্যাখ্যাকল্পে অদৃশ্য ও অস্বচ্ছ বিপরীত পৃথিবী পরিকল্পনার প্রয়োজন হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ মনে করেন, সংখ্যা সামঞ্জস্য বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে পিথাগোরীয়েরা আর একটি অদৃশ্য গ্রহের অস্তিত্ব কল্পনা করেন। তাঁহারা দশ সংখ্যাটিকে সম্পূর্ণ ও নিখুঁত সংখ্যা মনে করিতেন। কিন্তু পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র, পাঁচ গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলকে ধরিয়া মোট সংখ্যা দাঁড়ায়—নয়। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনায় নিশ্চয়ই এত বড় খুঁত ইচ্ছা করিয়া রাখেন নাই! তাই দৃষ্টিগোচর না হইলেও এই দশম গ্রহটি হইল বিপরীত পৃথিবী। পিথাগোরীয়দের বিপরীত পৃথিবীর যুক্তি সম্বন্ধে অ্যারিস্টট্ল্ লিখিয়াছেনঃ

> "....They (Pythagorians) conceived that the whole heaven is harmony and number....For example, regarding as they do the number ten as perfect and embracing the whole nature of numbers, they say that the bodies moving in the heaven are also ten in number, and as those, which we see are only nine, they make the counter-earth a tenth."*

পিথাগোরীয়েরা শুধু বিপরীত পৃথিবীর কল্পনা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। তাঁহারা সংগীতের সুরের সহিত চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কদের তুলনা করেন। সংগীতের সুর লহরীতে যেমন সংখ্যার অনুপাত পরিলক্ষিত হয়, কেন্দ্র হইতে গ্রহদের দূরত্বও সেইরূপ একটি বিশিষ্ট আনুপাতিক নিয়মের বশীভূত। এমন কি, গ্রহ ও জ্যোতিষ্কের অবিশ্রান্ত আকাশ-পরিক্রমার ফলে (তাঁহারা ইহাকে বলিয়াছেন গ্রহের নৃত্য) সংগীত ও শব্দ ঝংকারের সৃষ্টি হয়; অতি ক্ষীণ ও মৃদু বলিয়া এই সংগীত অশ্রুত থাকিয়া যায়।

কেন্দ্রীয় অগ্নিকে পৃথিবী একদিনে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। পৃথিবীর এক গোলার্ধ সব সময় কেন্দ্রের বিপরীত দিকে থাকিবার জন্য আবর্তনের অর্ধেক সময় সূর্যালোক পাইয়া থাকে, অবশিষ্ট অর্ধেক সময় সূর্যালোক পায় না। ফিলোলাউস্ এইভাবে দিন রাত্রির ব্যাখ্যা

গ্রহের নাম	কালচক্র (ফিলোলাউস্)	কালচক্র (আধুনিক)
শনি	১০৭৫২·৭৫ দিন	১০৭৫৯·২২ দিন
বৃহস্পতি	৪৩০১·১০ „	৪৩৩২·৫৮ „
মঙ্গল	৬৯৩·৭১ „	৬৮৬·৯৮ „
শুক্র	৩৬৪·৫০ „	৩৬৫·২৬ „
বুধ	.. ..	.. ..
সূর্য	.. ..	.. ..
চন্দ্র	২৯·৫০ „	২৯·৫৩ „

করেন। কেন্দ্রকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহদের কিরূপ সময় লাগে, তিনি তাহাও কষিয়া বাহির করিয়াছিলেন। শিয়াপ্যারেলি ফিলোলাউসের নির্ধারিত কালচক্রের সহিত আধুনিক হিসাবের তুলনা করিয়াছেন।†

* Aristotle, ***Metaphysics***, **A. 5; 986 *a* 2-12.** † ***Aristarchus of Samos***, p. 102.

ফিলোলাউস্ চন্দ্রকে পৃথিবীর ন্যায় মৃত্তিকা নির্মিত মনে করিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, চন্দ্রে উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর বাস আছে এবং চন্দ্রবাসীরা পৃথিবীবাসীদের অপেক্ষা অনেক সুন্দর ও শক্তিশালী।

বিপরীত পৃথিবীর পরিকল্পনা, গ্রহদের নৃত্য ও সংগীত সৃষ্টির ব্যাপারে যত অসংগতিই থাকুক না কেন, পৃথিবীর কেন্দ্রত্ব অস্বীকার করিয়া ও তাহার গতিতে আস্থা স্থাপন করিয়া পিথাগোরীয়েরা স্বল্প কালের জন্য হইলেও সমগ্র জ্যোতিষে এক বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। প্লেটো, অ্যারিস্টট্ল্, ইউডক্সাস্ ও অন্যান্য গ্রীক পণ্ডিতদের জোরালো ভূকেন্দ্রীয় মতবাদের চাপে পিথাগোরীয়দের পরিকল্পনা আর মাথা তুলিতে পারে নাই এবং অল্পকালের মধ্যে সাধারণভাবে ইহা বিদ্বজ্জন সমাজের সমর্থন হারাইয়া ফেলে। দুই একজন জ্যোতির্বিদের রচনায় ইহার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি যে একেবারেই পাওয়া যায় নাই তাহা নহে; কিন্তু তাহা নেপথ্যে উঠিয়া নেপথ্যেই মিলাইয়া গিয়াছে। যেমন, সিসেরোর লেখা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সাইরাকিউজের এক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক হিসেটাস্ মনে করিতেন, ব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র পৃথিবীই গতিশীল। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রগুলি সব নিশ্চল--যে যার স্থানে দাঁড়াইয়া আছে; কেবল পৃথিবী কক্ষে আবর্তিত হইয়া ক্রমাগত আকাশ-পথে পরিভ্রমণ করে। আমরা সে গতি বুঝিতে পারি না বলিয়া মনে হয় পৃথিবী ছাড়া আর সব কিছুই গতিশীল ও ভ্রাম্যমান। এই হিসেটাসের কথা কোপার্নিকাসও উল্লেখ করিয়াছেন।

পিথাগোরীয় ভ্রাতৃসংঘ ও বিদ্যাপীঠের তৎপরতার পরিসমাপ্তির কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। প্লেটোর সময় পর্যন্ত পিথাগোরীয় বিদ্যাপীঠের কর্মীদের বিজ্ঞানচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। ডিয়ডোরাসের মতে, খ্রীষ্ট পূর্ব ৩৬৬ অব্দেও পিথাগোরীয়েরা সক্রিয় ছিলেন। আলেকজান্দারের সাম্রাজ্য বিস্তার ও চিন্তাজগতে অ্যারিস্টটলের অধিনায়কত্ব সুরু হইবার পর হইতে পিথাগোরীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের দ্রুত পতন ঘটে।

পার্মেনিডিস্ (জন্ম : খ্রীঃ পূঃ ৫১৬ (?); ৫৪০ (?))

ইলিয়েটিক দর্শনের প্রধান উদ্যোক্তা পার্মেনিডিস্ বিজ্ঞানী অপেক্ষা দার্শনিক হিসাবেই বিশেষ প্রসিদ্ধ। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাঁহার অবদান উপেক্ষণীয় নয়। সে যুগে দর্শন ও বিজ্ঞান এরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল যে, একেকে বাদ দিয়া অন্যের চিন্তা অসম্ভব ছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই বিজ্ঞানী মাত্রই দার্শনিক, দার্শনিক মাত্রই বিজ্ঞানী।

পর্মেনিডিসের জন্মসন সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে। প্লেটোর এক লেখায় দেখা যায়, পার্মেনিডিসের সহিত সক্রেটিসের একবার সাক্ষাৎকার ও দর্শন সম্বন্ধীয় আলোচনা হইয়াছিল। এই সময় সক্রেটিসের বয়স ছিল ১৮।২০ বৎসর এবং পার্মেনিডিসের ৬৫। সাক্ষাৎকারের তারিখ আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৪৫০ পূর্বাব্দ। তাহা হইলে খ্রীঃ পূঃ ৫১৪ কি ৫১৬ অব্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। ডিওজেনিস্ লের্টিয়াসের অভিমত, খ্রীঃ পূঃ ৫৪০ অব্দে পার্মেনিডিস্ জন্মগ্রহণ করেন।

দক্ষিণ ইতালীর ইলিয়া নামক স্থানে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন ও চর্চার জন্য পার্মেনিডিস্ এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এইখান হইতে তিনি ও তাঁহার মতাবলম্বীরা বস্তু-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার যে দর্শনের চর্চা ও প্রচার সুরু করেন, তাহাই পরবর্তীকালের গ্রীক দর্শনের মূল উপাদান যোগাইয়াছিল। প্লেটো ও অ্যারিস্টট্ল এই দর্শনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। পার্মেনিডিসের দর্শনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব ও স্বরূপ বাস্তব নয়; চিন্তা ও বুদ্ধির সাহায্যে যে সত্য উপলব্ধ হয়, তাহাই শাশ্বত সত্য এবং অন্য উপায়ে প্রাপ্ত জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের বিভ্রম মাত্র। তাঁহার দর্শনে সৃষ্টি অসম্ভব, কারণ 'কিছু না' হইতে 'কিছু'র

উদ্ভব বুদ্ধির বিচারে কল্পনাতীত। পক্ষান্তরে বিনাশও অসম্ভব, কারণ 'কিছু' 'কিছু' না'তে পর্যবসিত হইতে পারে না। এমন কি পরিবর্তনও অসম্ভব, কারণ এক প্রকার গুণসম্পন্ন বস্তু ভিন্ন গুণসম্পন্ন অন্য প্রকার বস্তু হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না। আমরা যে সব আপাত-পরিবর্তন দেখি, অথবা মনে করি দেখি, তাহা চেতনার বিভ্রম মাত্র। অতএব চেতনার সাহায্যে সত্যে পৌঁছানো যায় না; অবচেতন মনে শুদ্ধ চিন্তার সাহায্যে প্রকৃত সত্য লাভ করিতে হয়। ইহার তাৎপর্য সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য তিনি দুইটি কথার অবতারণা করেন—Being বা সৎ, Not being বা অসৎ। অতীন্দ্রিয় অবচেতন মনের চিন্তাই হইল সৎ ও সত্য; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চেতনালব্ধ বাস্তব হইল অসৎ। বলা বাহুল্য, হিন্দু দর্শনের মায়াবাদ বা অদ্বৈতমূলক ভাববাদের সহিত ইহার অনেকাংশে মিল আছে।

জ্যোতিষে সাধারণভাবে পার্মেনিডিস্ পিথাগোরীয় মতবাদই গ্রহণ ও প্রচার করেন। তিনি পিথাগোরীয় ভ্রাতৃসঙ্ঘের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। আর্মিনিয়াস্ ডায়োকাইটিস্ নামে এক পিথাগোরীয়কে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার রচনায় পৃথিবীর গোলাকৃতির উল্লেখ দেখিয়া থিওফ্রেস্টাস্ প্রমুখ পরবর্তীকালের পণ্ডিতদের ধারণা হইয়াছিল, পার্মেনিডিসই এই তথ্যের আবিষ্কারক। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, পিথাগোরাস্ স্বয়ং এই ধারণার প্রবর্তক। শুকতারা ও সন্ধ্যাতারা যে একই জ্যোতিষ্ক, পার্মেনিডিস্ ইহা লক্ষ্য করেন। পিথাগোরীয়রাও এই তথ্য অবগত ছিলেন। তবে এই জ্ঞান পিথাগোরীয়দের অপেক্ষাও প্রাচীনতর; মিশর ও ক্যাল্ডিয়ার জ্যোতির্বিদ্‌রা এই তথ্য প্রথম আবিষ্কার করেন।

পৃথিবীর উপরিভাগে লোক বসতির যোগ্য অঞ্চলগুলিকে পার্মেনিডিস্ দুইটি ক্রান্তীয় অঞ্চলে ভাগ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই প্রচেষ্টা হইতেই প্রাকৃতিক ভূগোলের সৃষ্টি হইয়াছিল।

অ্যানাক্সাগোরাস্ (খ্রীঃ পূঃ ৫০০-৪২৮)

প্রখ্যাত গ্রীক বিজ্ঞানীদের অন্যতম অ্যানাক্সাগোরাসের প্রসিদ্ধি প্রধানতঃ চন্দ্রগ্রহণের কারণ আবিষ্কারের জন্য। জ্যোতিষ ছিল তাঁহার জীবনের মূল সাধনা। কেহ তাঁহাকে একবার প্রশ্ন করিয়াছিল, "মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য কি?" তিনি উত্তর দেন, "চন্দ্র, সূর্য ও আকাশ সম্বন্ধে গবেষণা।"

স্মার্ণার নিকটবর্তী ক্লাজোমেনে নামক স্থানে অ্যানাক্সাগোরাসের জন্ম হয় খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দে। পেরিক্লিসের আহ্বানে তিনি এথেন্সে আসেন এবং এই মহানগরীতে দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা ও অধ্যাপনা করেন। পেরিক্লিসের আনুকূল্যে ও সহায়তায় এথেন্সে প্রথম দিকে বিজ্ঞান-চর্চায় তাঁহার যেরূপ সুযোগ সুবিধা হইয়াছিল, তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। পেলোপোনেশীয় যুদ্ধ বাঁধিবার পর পেরিক্লিসের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইলে, তিনি এই সব সুবিধা হইতে যে শুধু বঞ্চিত হন তাহাই নহে, তাঁহাকে বহু দুর্ভোগ ও নির্যাতন সহ্য করিতে হয়। কুসংস্কারাচ্ছন্ন এথেন্সবাসীরা তাঁহার নির্ভীক জ্যোতিষীয় মতবাদকে ধর্মবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য করে এবং তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া প্রথমে বন্দী ও পরে এথেন্স হইতে নির্বাসিত হন। অ্যানাক্সাগোরাস্ সম্বন্ধে প্লুটার্ক লিখিয়াছেন ঃ

"....For Anaxagorus, who was the first to put in writing, most clearly and most courageously of all men, the explanation of the moon's illumination and darkness, did not belong to ancient times, and even his account was not common property but was still a secret current only among a few and received by them with caution or simply on trust. For in those days they refused to tolerate the physicists and star-

gazers as they were called, who presumed to fritter away the deity into unreasoning causes, blind forces and necessary properties. Thus Protagorus was exiled, and Anaxagorus was imprisoned and with difficulty saved by Pericles."*

ধর্মবিরুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মতবাদ পোষণ ও প্রচারের অপরাধে নির্যাতন ও দণ্ডভোগের ইহাই বোধ হয় প্রথম লিপিবদ্ধ নিদর্শন। এই ঘটনার কিছু পরে খ্রীঃ পূঃ ৩৯৯ অব্দে এথেন্স-বাসীরা সক্রেটিস্‌কে হেমলক পানে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। চিন্তার স্বাধীনতার সহিত ধর্ম ও অন্ধবিশ্বাসের বিরোধ খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী হইতেই সুরু হইতে আমরা দেখি। ঘুরিয়া ফিরিয়া এই পুরাতন বিরোধ বিভিন্ন শতাব্দীতে প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে এবং চিন্তা ও গবেষণার মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গিয়া বহু নির্ভীক মনীষীকে অশেষ নির্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করিতে হইয়াছে।

চন্দ্রগ্রহণের ব্যাখ্যা: আমরা দেখিয়াছি, অ্যানাক্সিমেনেসের সময় হইতে চন্দ্রগ্রহণের কারণ সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা ও জল্পনা চলিতেছিল। একাধিক পরিকল্পনাও প্রস্তাবিত হইয়াছিল। অ্যানাক্সাগোরাস্ পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের এই সব পরিকল্পনার সহিত সম্যকরূপে পরিচিত ছিলেন। বিশেষতঃ অ্যানাক্সিমেনেসের প্রভাব তাঁহার উপর সুপরিস্ফুট। চন্দ্রের স্বরূপ ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল চিন্তা ও গবেষণার ফলে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহা মোটামুটি এই:

চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলোক নাই, ইহা সূর্যালোকের প্রতিফলন। পৃথিবী অথবা কখনও কখনও অন্যান্য বস্তু চন্দ্রের নীচে আসিয়া আমাদের দৃষ্টিপথ অবরোধ করিলে চন্দ্রগ্রহণ হয়। এই সব বস্তু অদৃশ্য, নক্ষত্রমণ্ডলের নিম্নে ইহাদের অবস্থিতি এবং সূর্য ও চন্দ্রের সহিত একই সঙ্গে ইহারা আবর্তিত হয়। অ্যানাক্সাগোরাস্ আরও বলেন, চন্দ্র সূর্যের পথ অনুসরণ করিয়া থাকে এবং সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবী আসিয়া পড়ায় যে ছায়ার সৃষ্টি হয়, চন্দ্র সেই ছায়ার মধ্যে পড়িয়া প্রতিমাসে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়। ইহা চন্দ্রকলার এক সহজ ব্যাখ্যা।

ছায়াপথ সম্বন্ধে অ্যানাক্সাগোরাসের মতবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাত্রিকালে সূর্য পৃথিবীর অপর দিকে আত্মগোপন করিলে নক্ষত্রখচিত আকাশে পৃথিবীর যে ছায়া পড়ে, তাহাই ছায়াপথ। তিনি সূর্যকে পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর মনে করিতেন, এজন্যই ছায়াপথের এইরূপ বিস্তৃতি। এই ছায়ার আওতার ভিতর যে সব তারকা অবস্থিত, সূর্যালোক তাহাদের নিষ্প্রভ করিতে পারে না; তাই তাহারা রাত্রিকালে দৃশ্যমান। কিন্তু ছায়াপথের বাহিরের তারকাগুলি সূর্যালোকে নিষ্প্রভ হয় বলিয়া আমরা তাহাদের দেখিতে পাই না।

আপাত-দৃষ্টিতে ছায়াপথের এইরূপ ব্যাখ্যা নিপুণ বোধ হইলেও ইহাতে বহু গলদ থাকিয়া গিয়াছে। এই মত স্বীকার করিলে ছায়াপথ ক্রান্তিবৃত্তের উপর গিয়া মিশিবে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ছায়াপথ ও ক্রান্তিবৃত্তের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট কৌণিক দূরত্ব থাকে। ছায়াপথ অতিক্রম করিবার সময় প্রতিবারই চন্দ্রের অদৃশ্য হইবার কথা; কিন্তু তাহা হয় না। অ্যারিস্টট্‌ল্ প্রথম অ্যানাক্সাগোরাসের এই ব্যাখ্যার অসঙ্গতি ও অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন।

ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি: ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি সম্বন্ধে অ্যানাক্সাগোরাসের পরিকল্পনা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির আদিতে জড় পদার্থের কোনরূপ প্রকারভেদ ছিল না। কালক্রমে এই জড়ের ভিতর এক অতি ক্ষুদ্র ঘূর্ণি বা আবর্তের সৃষ্টি হয়। এই ঘূর্ণি

* *Aristarchus of Samos;* p. 79.

ক্রমশঃ স্ফীত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া এইরূপ প্রবল হইয়া উঠে যে, ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র জড় পদার্থ দুইটি বৃহৎ অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। প্রথম অংশটি হইল উত্তপ্ত, হাল্কা, শুষ্ক ও স্ফীত 'ঈথর'; দ্বিতীয়টি বিপরীত গুণসম্পন্ন 'বায়ু'। তারপর বায়ু অধিকার করিল ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থল এবং বায়ুকে আচ্ছাদন করিয়া রহিল উক্ত ঈথর। সৃষ্টির পরের ধাপে বায়ু হইতে ধীরে ধীরে ও বিভিন্ন পর্যায়ে উৎপন্ন হয় মেঘ, জল, মৃত্তিকা ও প্রস্তর। মেঘ, জল, মৃত্তিকা ও প্রস্তর লইয়াই পৃথিবী গঠিত। এই সময় পৃথিবীও দ্রুত আবর্তনশীল। এই ভীষণ আবর্তন বেগ প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড পৃথিবী হইতে ছিট্কাইয়া পড়িল এবং উপরিস্থিত জ্বলন্ত ঈথরের সংস্পর্শে আসিয়া ভাস্বর নক্ষত্রে পরিণত হইল। পরবর্তীকালে সৌরজগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে ক্যাণ্ট ও লাপ্লাস্ যে মতবাদ প্রস্তাব করেন, অ্যানাক্সাগোরাসের এই মতবাদের সহিত তাহার আশ্চর্য মিল আছে।

উপরিউক্ত যুক্তি আরও সম্প্রসারণ করিয়া অ্যানাক্সাগোরাস্ ব্রহ্মাণ্ডে একাধিক পৃথিবীর অস্তিত্বের সম্ভাবনার কথাও বলিয়াছিলেন। আমাদের পৃথিবীর ন্যায় সেই সব পৃথিবীরও নিজস্ব চন্দ্র, সূর্য ও জ্যোতিষ্করা আছে, সেখানেও মনুষ্য, প্রাণী ও উদ্ভিদ্ বর্তমান এবং মনুষ্য ও প্রাণীর জন্য আছে খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা।* বর্তমানকালে স্যার জেম্স্ জিন্স্ প্রমুখ বহু বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ একাধিক সৌরজগতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

এম্পিডক্লেস (খৃঃ পূঃ ৪৯৪-৪৩৪)

পিথাগোরীয় বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের অন্যতম সিসিলীয় দার্শনিক এম্পিডক্লেস্ সৃষ্টি-রহস্যের অপেক্ষা বস্তুর স্বরূপ ও গঠন-রহস্যের প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও অগ্নি—এই চারি মৌলিক পদার্থের সাহায্যে পদার্থ গঠিত, পিথাগোরীয়দের এই মতবাদ তিনি বিশেষভাবে সম্প্রসারণ ও প্রচার করেন। এছাড়া তিনি এক বিশিষ্ট শারীরবিদ্ ছিলেন। গ্যালেনের মতে, এম্পিডক্লেস্ আয়োনীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তার দিক হইতে তাঁহার চিকিৎসাশাস্ত্র কস্ ও স্নাইডাসের (হিপোক্রেটিক) চিকিৎসাশাস্ত্রের সমকক্ষ হইয়া উঠে। ধর্মশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র ও রাজনীতিতেও তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। অনেকের মতে, এম্পিডক্লেসই গ্রীক অলঙ্কারশাস্ত্রের জন্মদাতা।

বস্তুর গঠন : মাইলেশীয় দর্শন অনুযায়ী পৃথিবী ও জড়জগৎ একটিমাত্র মৌলিক উপাদানে গঠিত। এই মৌলিক উপাদান কেহ বলিয়াছেন জল, কেহ বায়ু, কেহ অগ্নি। এম্পিডক্লেস্ বলিলেন, জড়জগৎ মাত্র একটি নহে, চারি প্রকার মৌলিক উপাদানে গঠিত; এই মৌলিক উপাদানগুলি হইল মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও অগ্নি। চিত্রকর যেমন চারিটি মূল রং-এর সাহায্যে চিত্রপটে বহু রং-এর খেলা দেখাইয়া থাকে, সেইরূপ চারি মৌলিক উপাদানের বিভিন্ন সমন্বয়ে বিভিন্ন বস্তু গঠিত হয়। মনে হয়, অগ্নির দহন-শক্তির ভুল ব্যাখ্যার ফলে চারি মৌলিক উপাদানের প্রতীতি জন্মে। দাহ্য পদার্থকে পিথাগোরীয়রা জটিল ও যৌগিক পদার্থ গণ্য করিতেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল, দহনক্রিয়ার সময় দাহ্য পদার্থ মৌলিক উপাদানে ভাঙিয়া পড়ে। যেমন, কাঁচা কাঠ পুড়িবার সময় আগুন নির্গত হয়; ধোঁয়া উপরে উঠিয়া বাতাসে মিলিত হয়; কাঠের প্রান্তভাগে বিন্দু বিন্দু জল বাহির হইতে দেখা যায়: এবং পরিশেষে যে ছাই অবশিষ্ট থাকে তাহাতে মৃত্তিকার গুণাগুণ বর্তমান।

* "Men were formed and the other animals which have life; the men too have inhabited cities and cultivated fields as with us; they have also a sun and moon and the rest as with us, and their earth produces for them many things of various kinds, the best of which they gather together into their dwellings and live upon".—Burnett, *Early Greek Philosophy*.

এম্পিডক্লেস্ আরও বলেন, চারি মৌলিক পদার্থের পরস্পরের মধ্যে একপ্রকার আকর্ষণী ও বিকর্ষণী শক্তি কাজ করে। ইহার ফলে মৌলিক পদার্থরা বিভিন্ন পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া বিভিন্ন বস্তু সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, এম্পিডক্লেস্ জড় ও প্রাণীর মধ্যে কোন পার্থক্যে বিশ্বাস করিতেন না। একান্ত জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য তাঁহার ধারণা জন্মে যে, প্রীতির বন্ধন, ঘৃণাজনিত বিচ্ছেদ প্রভৃতি যে সব ভাব ও ব্যাপার মানুষের মধ্যে দেখা যায় তাহা বস্তুর অন্তর্নিহিত আকর্ষণ ও বিকর্ষণের বাহ্য প্রকাশ।

মৌলিক উপাদানের উৎপত্তি সম্বন্ধে এম্পিডক্লেস্ বলেন, বিপরীতধর্মী দুই প্রকার গুণের সমন্বয়ে মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও অগ্নি উদ্ভূত। এইরূপ বিপরীতধর্মী গুণ হইল উত্তাপ ও শীতলতা, শুষ্কতা ও সিক্ততা। উদাহরণস্বরূপ, বিপরীতধর্মী গুণদ্বয় শীতলতা ও সিক্ততার সমন্বয়ে জলের উৎপত্তি, অগ্নির উৎপত্তি উত্তাপ ও শুষ্কতার সমন্বয়ে।

	শুষ্কতা	আদ্রতা
শীতলতা	মৃত্তিকা	জল
উষ্ণতা	অগ্নি	বায়ু

চারি মৌলিক উপাদানের তত্ত্ব হইতে এম্পিডক্লেস্ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির এক অভিনব পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে সৃষ্টির আদিতে জড়বস্তু ছিল জল, বায়ু, অগ্নি ও মৃত্তিকার এক বিশৃঙ্খল মিশ্রণ বা খিচুড়ি। এই মিশ্রণ হইতে প্রথমে বায়ু ও পরে অগ্নি পৃথক হইয়া পড়ে। তারপর পৃথক হয় মৃত্তিকা এবং মৃত্তিকা নিঙড়াইয়া বাহির হয় জল। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির শেষ পর্যায়ে বায়ু হইতে আকাশ, অগ্নি হইতে সূর্য এবং মৃত্তিকা ও জল হইতে অন্যান্য বস্তুর উদ্ভব হয়।

পদার্থবিদ্যা : পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত তাঁহার কয়েকটি আবিষ্কার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তন্মধ্যে আলোকের বেগ উপলব্ধি উল্লেখযোগ্য। আলোকের বেগ আছে এবং একস্থান হইতে আর একস্থানে পৌঁছিতে ইহার একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয়, এম্পিডক্লেস্ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। অ্যারিস্টট্‌ল্ *De Sensu* গ্রন্থে এম্পিডক্লেস্ কর্তৃক আলোচিত আলোকের বেগ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

"Empedocles, for instance, says that the light from the sun reaches the intervening space before it reaches the eye or the path."

De Anima-তে অ্যারিস্টট্‌ল্ এই মতবাদ সম্বন্ধে আরও পরিষ্কার আলোচনা করিয়াছেন ঃ—

"Empedocles represented light as moving in space and arriving at a given point of time between the earth and that which surrounds it, without our perceiving its motion."

বায়ুর অস্তিত্ব ও শূন্যতা হইতে ইহার পার্থক্য প্রমাণের উদ্দেশ্যে এম্পিডক্লেস্ জল-ঘড়ির সাহায্যে এক পরীক্ষা করেন। জল-ঘড়িতে একটি নল থাকে; নলের একদিকে থাকে একটি ছোট ছিদ্র ও অপরদিকে বহু ছিদ্রবিশিষ্ট একটি ঝাঁজ্‌রি। তিনি এই নল জলে সম্পূর্ণ

ডুবাইয়া ভর্তি করিলেন, পরে ঝাজ্‌রির দিক তলায় রাখিয়া ও উপরের ছিদ্রমুখ আঙ্গুলে চাপিয়া নলটিকে জল হইতে তুলিলেন। দেখা গেল ঝাজ্‌রির ছিদ্রপথে জল বাহির হইতেছে না। ইহাতে এম্পিডক্‌লেস্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, বায়ুর বাস্তব অস্তিত্ব আছে, ইহাকে স্পর্শ করা যায় এবং ইহার চাপও আছে। একটি পাত্র যতক্ষণ বায়ুপূর্ণ থাকে ততক্ষণ ইহার মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে না; পাত্রটি বায়ুশূন্য হইলেই জল প্রবেশ করিতে পারে।

পরীক্ষা ও পরীক্ষালব্ধ সত্যের উপর এম্পিডক্‌লেসের এইরূপ গুরুত্ব আরোপ লক্ষণীয়। পিথাগোরাস্, পার্মেনিডিস্ প্রমুখ বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণের শিক্ষার ফলে বস্তু-নিরপেক্ষ শুদ্ধবুদ্ধির দর্শন ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে এবং সেই সঙ্গে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তাবোধ ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। বস্তুবাদী এম্পিডক্‌লেস্ বিজ্ঞান সাধনায় পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ইহার অনাদরের বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। তাঁহার পরবর্তী লিউসিপ্‌পাস্, ডিমোক্রিটাস্ প্রমুখ কণিকাবাদীরা ও হিপোক্রেটিস্‌পন্থী চিকিৎসকেরা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা-বোধ কিছুদিন বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্লেটোর আবির্ভাবের পর ঐ আদর্শ রক্ষা করা আর সম্ভবপর হয় নাই।

আর্কিটাস্

পিথাগোরাস্ ও পিথাগোরীয় ভ্রাতৃসঙ্ঘের সভ্যগণ গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় গবেষণার যে উচ্চ মান নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন সেই মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পরবর্তী আয়োনীয় গ্রীকদের মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞানের এই সব বিভাগে আরও অনেক নূতন অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ট্যারেণ্টামের আর্কিটাস্, স্নাইডাসের ইউডক্‌সাস্ এবং ক্যালিপ্‌পাস্ ও মেনেক্‌মাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আর্কিটাস্ জ্যামিতিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। প্রদত্ত একটি ঘনর আয়তনের দ্বিগুণ আর একটি ঘনর রচনা-পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া তিনি খ্যাতিলাভ করেন। আর্কিটাসের বহু পূর্ব হইতে ইহা 'ডেলিয়ান সমস্যা' নামে সুপরিচিত ছিল। তাঁহার পূর্বে বহু প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় বিফল হইয়াছিলেন। সমস্যাটি সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। খ্রীঃ পূঃ ৪৩০ অব্দে বা অনুরূপ সময়ে এথেন্সে এক ভীষণ মড়ক দেখা দেয়। এথেন্সবাসীরা এই মড়কের হাত হইতে উদ্ধারলাভের আশায় ডেলস্-এর বিখ্যাত অ্যাপোলোর মন্দিরে সমবেত হইয়া প্রার্থনা জানাইলে দৈববাণী হইল যে, এথেন্সের অ্যাপোলো মন্দিরের বেদীর ঘন আয়তনে দ্বিগুণ করিয়া নির্মাণ করিবার ব্যবস্থা করিলেই মহামারীর উপশম হইবে। এথেন্সবাসীরা ফিরিয়া আসিয়া বেদীর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সবই দ্বিগুণ করিয়া বাড়াইল, কিন্তু মড়ক কমিল না। আবার ডেলস্-এর অ্যাপোলোর মন্দিরে শরণাপন্ন হইতে হইল। দৈববাণীতে শুনা গেল, "মূর্খরা, বেদীর আয়তন দ্বিগুণের পরিবর্তে আট গুণ বাড়াইয়াছে, মড়ক কমিবে কিরূপে?"

আর্কিটাস্ 'ডেলিয়ান সমস্যা'র যে জ্যামিতিক সমাধান আবিষ্কার করেন তাহা সমধিক জটিল। জ্যামিতিতে ইহা 'দুই মধ্যক আনুপাতিকের সম্পাদ্য' (the problem of two mean proportionals) নামে খ্যাত। এই সমস্যা সমাধানের মধ্যে আর্কিটাসের তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও গভীর জ্যামিতিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানের যান্ত্রিক প্রয়োগ সম্বন্ধেও আর্কিটাস্ অনেক গবেষণা করেন। স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক লাট্টু, উড্ডীয়মান পক্ষী প্রভৃতি তিনি উদ্ভাবন করেন। যন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার এইরূপ উৎসাহ অন্যান্য পিথাগোরীয়েরা অত্যন্ত নিন্দা ও অবজ্ঞার চোখে দেখিত; এই সব প্রচেষ্টার

দ্বারা বিজ্ঞানকে কারিগরি বিদ্যার স্তরে নামানো হইতেছে এবং ইহাতে বিজ্ঞানের মর্যাদা ক্ষুন্ন হইতেছে, ইহাই ছিল তাহাদের অভিযোগ।

এক দুর্ঘটনায় আর্কিটাসের মৃত্যু হয়। পিথাগোরীয়রা প্রচার করিয়াছিল, বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ ও উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইবার শাস্তিস্বরূপ তাঁহার এইরূপ অপমৃত্যু ঘটে!

৪·৪। আণবিক তত্ত্ব—লিউসিপ্‌পাস্‌ ও ডিমোক্রিটাস্‌

লিউসিপ্‌পাস্‌ ও ডিমোক্রিটাস্‌ গ্রীক আণবিক তত্ত্বের উদ্ভাবক। লিউসিপ্‌পাসের বৈজ্ঞানিক রচনার কয়েকটি লাইন এবং ডিমোক্রিটাসের রচনার কিছু কিছু অংশ সংরক্ষিত হইয়াছে। ইঁহাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও মতবাদের কথা প্রধানতঃ জানা যায় অ্যারিস্টট্‌ল্‌, এপিকিউরাস্‌ ও রোমক দার্শনিক লুক্রেটিয়াসের লেখা হইতে। এপিকিউরাস্‌ (খ্রীঃ পূঃ ৩৪১-২৭০) এথেন্সে আণবিক তত্ত্ব অধ্যাপনা করিতেন, লুক্রেটিয়াস্‌ (খ্রীঃ পূঃ ৯৮-৫৫) রোমে কবিতার মধ্য দিয়া এই তত্ত্ব ও দর্শনের ব্যাখ্যা করেন।

লিউসিপ্‌পাস্‌ সম্ভবতঃ ইলিয়েটিক অথবা মাইলেশীয় ছিলেন। আব্‌ডেরাতে তিনি এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ডিমোক্রিটাসের জন্মস্থান ও সন সম্বন্ধে সেইরূপ কোন অনিশ্চয়তা নাই। তিনি আব্‌ডেরাতে খ্রীঃ পূঃ ৪৬০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। উভয়েই অ্যানাক্সাগোরাসের সমসাময়িক ছিলেন। ডিমোক্রিটাস্‌ লিউসিপ্‌পাস্‌ অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁহার কাছে দর্শন অধ্যয়ন করেন। দুইজনের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদে এইরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় যে, আণবিক তত্ত্ব উদ্ভাবনে কাহার কতটুকু নিজস্ব অবদান তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভবপর হয় নাই।

গ্রীক আণবিক তত্ত্বের মূল কথা হইল, জড়জগৎ অতি ক্ষুদ্র, অপরিবর্তনশীল, অসংখ্য বস্তুকণা বা পরমাণুর সাহায্যে গঠিত। পরমাণুরা অনন্তকাল হইতে বিদ্যমান; ইহাদের উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। আকৃতিগত পার্থক্য থাকিলেও প্রত্যেক পরমাণুর প্রকৃতি ও সারবস্তু এক। বাহ্যিক গুণাগুণের যে প্রভেদ দেখা যায় তাহা পরমাণুর আকৃতি, আয়তন, অবস্থান ও গতির উপর নির্ভর করে। প্রস্তর, লৌহ প্রভৃতি কঠিন বস্তুর ভিতর পরমাণুরা কেবল ক্রমাগত স্পন্দিত হইয়াই চলে, কিন্তু বায়ু বা অগ্নির মধ্যে ইহারা স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে এবং মাঝে মাঝে পরস্পরের সহিত সংঘর্ষের ফলে প্রতিক্ষিপ্ত হয়।

পরমাণুরা অনন্ত মহাশূন্যে ও নানাদিকে ইতস্ততঃ লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই অবস্থায় মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে এবং তাহার ফলে সৃষ্টি হয় নানারূপ জটিল গতির ও আবর্তের। এই আবর্তে সমগুণসম্পন্ন পরমাণুরা মিলিত হইয়া মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি করে; এইরূপ বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের মিশ্রণে বস্তুনিচয় ও শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি। এইভাবে একাধিক ব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব কিছুমাত্র আশ্চর্য নহে। স্বাভাবিক কারণে ব্রহ্মাণ্ডের বৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনাশ আছে। শুধু যে সব ব্রহ্মাণ্ড পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজেদের মানাইয়া লইতে পারে তাহারাই শেষ পর্যন্ত টিকিয়া যায়। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, এই তত্ত্বের মধ্যে লাপ্‌লাসের নীহারিকাবাদ ও ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদের আভাস অন্তর্নিহিত।

পরমাণবিক তত্ত্ব অনুসারে ব্রহ্মাণ্ড ও পৃথিবীর উৎপত্তি, বস্তুর গঠন, তাহার বিচিত্র গুণাবলী ও ব্যবহার এক সুসম্বদ্ধ ও সুশৃঙ্খল প্রাকৃতিক কার্য-কারণ নিয়মের অধীন। লিউসিপ্‌পাস্‌ এই কার্য-কারণবাদের প্রথম উদ্যোক্তা। তিনি বলেন, 'বিনা কারণে কিছুই ঘটে না, যাহা কিছু ঘটে তাহার পশ্চাতে কারণ ও প্রয়োজন বিদ্যমান।' এই মতবাদ আত্মগত বা বিষয়ীগত (subjective) অনুভূতি ও উচ্ছ্বাসের ভিত্তিতে রচিত সকল প্রকার ব্রহ্মাণ্ড

পরিকল্পনার মূলে কুঠারাঘাত করিল। বস্তুর ইন্দ্রিয়লব্ধ বাহ্যিক গুণাগুণের স্থূল ভিত্তিতে পৃথিবী ও ব্রহ্মাণ্ডের একজাতীয় পরিচয় পাওয়া যায়। সেই পরিচয় রূপ-রস-গন্ধময় সূর্য-চন্দ্রালোকোদ্ভাসিত উদার পৃথিবীর পরিচয়। মানবশিশুর ক্রীড়াক্ষেত্র দেবতাদের স্নেহের দান সেই পৃথিবী মানুষের অনুভূতি, উচ্ছ্বাস, ভাল মন্দ দিয়া গড়া। পরমাণুবাদীরা পৃথিবীর ও ব্রহ্মাণ্ডের এই জাতীয় পরিচয় মিথ্যা ও অবাস্তব প্রমাণ করিতে চাহিল। তাহাদের মতে, কার্য-কারণের নিয়মে উদ্ভূত এই ব্রহ্মাণ্ড মানুষের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন



৬৬। ডিমোক্রিটাস্ (১৮শ শতাব্দীতে খোদিত একটি কাল্পনিক চিত্র)।

ও নিরপেক্ষ। অন্ধ অণু-পরমাণুর গতি, আবর্ত ও সমন্বয়ের ফলে তাহার সৃষ্টি, এই সমন্বয় শিথিল হইলেই তাহার বিনাশ ও লয়। মানুষ বা জীবের অস্তিত্বে অথবা অনস্তিত্বে তাহার কিছু আসে যায় না। ব্রহ্মাণ্ডে পরমাণু ও শূন্যতাই একমাত্র শাশ্বত সত্য। ডিমোক্রিটাস্ বলিতেন,

> "According to convention there is a sweet and a bitter, a hot and a cold, and according to convention there is colour. In truth there are atoms and a void."*

* Dampier, *A History of Science;* p. 23.

আধুনিক আণবিক মতবাদ ও বস্তুবাদী দর্শনের সহিত লিউসিপ্পাস্ ও ডিমোক্রিটাসের শিক্ষার প্রভূত মিল আছে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন ডাল্টন, আভোগেদ্রো, ক্যানিজারো প্রমুখ বিজ্ঞানিগণ যে আণবিক মতবাদের গোড়াপত্তন করেন, তাহার সহিত প্রাচীন গ্রীক আণবিক তত্ত্বের প্রধান পার্থক্য এই যে, প্রথমোক্ত বিজ্ঞানীদের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের উপরে প্রতিষ্ঠিত, শেষোক্তদিগের মতবাদ মুখ্যতঃ কল্পনা ও শুদ্ধবুদ্ধি-প্রসূত। ডাল্টন রাসায়নিক পরীক্ষালব্ধ যে সব অমূল্য তথ্য হাতে পাইয়াছিলেন, লিউসিপ্পাস্ ও ডিমোক্রিটাসের নিকট তাহা কল্পনাতীত ছিল। তারপর সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিছক অন্তর্দৃষ্টিবলে লিউসিপ্পাস্ ও ডিমোক্রিটাস্ এই প্রকার একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদের সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহাও ঠিক নহে। থালেস্, অ্যানাক্সিমেনেস্, হেরাক্লিটাস্ প্রমুখ পূর্বগামী মাইলেশীয় ও আয়োনীয় দার্শনিকগণের চিন্তাধারার মধ্যেই এই মতবাদ আংশিকভাবে প্রচ্ছন্ন। মাইলেশীয় দার্শনিকদের ধারণা ছিল, পদার্থ একটি মাত্র আদিম ও মৌলিক উপাদানে গঠিত। থালেসের মতে এই উপাদান জল, অ্যানাক্সিমেনেসের মতে বায়ু এবং হেরাক্লিটাসের মতে অগ্নি। জলের বাষ্পীভবন ও গন্ধের ব্যাপ্তি লক্ষ্য করিয়া হেরাক্লিটাস্ এক অন্তহীন প্রবাহের (flux) কল্পনা করিয়াছিলেন; এমন কি তিনি বলেন যে, এই প্রবাহের মধ্যে আছে অসংখ্য অদৃশ্য গতিশীল কণিকা। পিথাগোরীয়রা শূন্যস্থানের পরিকল্পনা করিয়াছিল এবং ব্রহ্মাণ্ডকে তাহারা পূর্ণসংখ্যাময় মনে করিত। পিথাগোরীয় শূন্যতাকে অনেকে বায়ু বলিয়া ভুল করিয়াছেন। পার্মেনিডিস্ জল-ঘড়ির পরীক্ষার দ্বারা বায়ুর বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া এই ভুল ভাঙিগয়া দেন। সম্ভবতঃ এই প্রকার চিন্তাধারার বিচার-বিশ্লেষণের ফলে শূন্যে লক্ষ্যহীনভাবে ভ্রাম্যমান অতি ক্ষুদ্র ও অদৃশ্য বস্তুকণার ধারণা জন্মলাভ করে এবং এইরূপ কণাই যে বস্তুর প্রাথমিক উপাদান, লিউসিপ্পাস্ ও ডিমোক্রিটাস্ তাহা প্রথম উপলব্ধি করেন।

বস্তুর পরমাণুবাদ স্বল্পকালস্থায়ী হইয়াছিল। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্য এই মতবাদের আর কোন উন্নতি বা সম্প্রসারণ হয় নাই এবং ইহা বিশ্বজ্জন সমাজে উল্লেখযোগ্য কোন সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই। রেণেশাঁর সময়ে, বিশেষতঃ গ্যালিলিওর পর হইতে এই মতবাদের উপর বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আবার আকৃষ্ট হয়। প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের আক্রমণাত্মক সমালোচনায় পরমাণুবাদের অকালমৃত্যু না ঘটিলে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার গতি দ্রুততর হইত কিনা তাহা কে বলিতে পারে?

জ্যামিতি, গণিত ও জ্যোতিষে ডিমোক্রিটাসের গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। জ্যামিতি ও গণিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। একটি পিরামিড বা শঙ্কুর ঘন সেই পিরামিড বা শঙ্কুর ভূমির উপর কল্পিত সমান উচ্চতার প্রিজ্ম্ বা সিলিণ্ডারের ঘনর এক-তৃতীয়াংশ, ডিমোক্রিটাস্ এইরূপ এক প্রতিপাদ্য প্রস্তাব করেন। আর্কিমিডিস্ স্বয়ং ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। ইউডক্সাসের পূর্বে এই প্রতিপাদ্যের নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ কেহ দিয়াছিলেন কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। ডিমোক্রিটাস্ নাকি ইহার এক প্রমাণ বাহির করিয়াছিলেন, কিন্তু আর্কিমিডিসের মতে তাহা যথেষ্ট নয়।

জ্যোতিষে ডিমোক্রিটাস্ পুরাপুরি অ্যানাক্সাগোরাস্-পন্থী ছিলেন। নক্ষত্ররা প্রস্তরখণ্ড বিশেষ; সূর্য প্রজ্বলিত প্রস্তর; চন্দ্রে পাহাড়, উপত্যকা, গহ্বর প্রভৃতি আছে; সূর্য পৃথিবীর অপর গোলার্ধের নীচে অস্ত গেলে নক্ষত্রমণ্ডলে পৃথিবীর যে ছায়া পড়ে তাহাই ছায়াপথ, ইত্যাদি অ্যানাক্সাগোরাসের নানা জ্যোতিষীয় শিক্ষায় ও মতবাদে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন।

৪·৫। গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গোড়ার কথা — আল্‌ক্‌মাওন, এম্পিডক্লেস্ ও হিপোক্রেটিস্

জ্যামিতি, অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতিষের ন্যায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসও অতি প্রাচীন। দেহের বিকার, রোগজনিত যন্ত্রণা, জরা ও মৃত্যুর সহিত মানুষের পরিচয় পৃথিবীতে তাহার আবির্ভাবের পর হইতেই। জৈবধর্মের প্রেরণায় ব্যাধিমুক্ত হইবার ইচ্ছা তাহার স্বাভাবিক। কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের উপর এরূপ একান্তভাবে নির্ভরশীল যে, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদ্ ও জীববিদ্যার উন্নতি একটা বিশেষ স্তরে না পৌঁছান পর্যন্ত এই বিজ্ঞানের প্রাথমিক উন্নতিও সম্ভবপর নয়। অথচ ব্যাধির যন্ত্রণা আজও যেমন, প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষেরও তেমনই প্রবল ছিল। অসহায় মানুষ রোগের যন্ত্রণায় অগত্যা বাধ্য হইয়া দেব-দেবী, মন্ত্র ও যাদুবিদ্যার শরণাপন্ন হইয়াছে। তাই প্রাচীন চিকিৎসা-পদ্ধতিতে তুক্‌তাক্, মন্ত্র-তন্ত্র, যাগ-যজ্ঞ, যাদুবিদ্যা, কবচ, মাদুলী প্রভৃতির প্রাধান্যই আমরা দেখিতে পাই। জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনগ্রসর মানবগোষ্ঠীর মধ্যে আজও এই প্রাধান্য অনেকাংশে বর্তমান।

তবু তাহারই মধ্যে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা কতকগুলি সাধারণ রোগের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করে, তাহাদের লক্ষণগুলি বুঝিতে ও চিনিতে শিখে এবং এইসব রোগে বিবিধ উদ্ভিদের গুণ ও কার্যকারিতা কাজে লাগাইবার উপায় অল্প-বিস্তর আয়ত্ত করে। বহু বৎসরের এই জাতীয় অভিজ্ঞতার ফলে ধীরে ধীরে আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল এক প্রকার চিকিৎসা-শাস্ত্র। প্রাচীন সভ্যতার কয়েকটি আদি কেন্দ্রে, যেমন ব্যাবিলন, মিশর, ভারতবর্ষ ও মহাচীনে চিকিৎসাশাস্ত্রের অঙ্কুরোদ্গমের প্রথম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সে কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

চিকিৎসাবিদ্যায় গ্রীকপূর্ব জাতিদের নিকট গ্রীকদের ঋণ

জ্যামিতি, জ্যোতিষ ও গণিতের ন্যায় চিকিৎসাবিদ্যাও গ্রীকরা অর্জন করে গ্রীকপূর্ব প্রাচীন সভ্যজাতির কাছে। খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া খ্রীষ্টাব্দের দুই শতক পর্যন্ত একটানা আট শত বৎসর গ্রীকরা এই বিদ্যার চর্চা ও নানাভাবে ইহার প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অভিমত, গ্রীকদের পূর্বে চিকিৎসাবিদ্যার অস্তিত্বের নজির থাকিলেও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গ্রীকদের আমল হইতেই এই বিদ্যার আলোচনা ও চর্চার প্রথম সূত্রপাত হয় এবং আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ভিত্তি গ্রীকরাই স্থাপন করে।* চিকিৎসা-বিজ্ঞানে গ্রীক অবদানের উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য। কিন্তু তাই বলিয়া এই বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব গ্রীকজাতির উপর অর্পণ করিবার চেষ্টা ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নহে। অন্ততঃ ভারতবর্ষ ও মহাচীনে গ্রীকদের পূর্বে ও গ্রীক প্রাধান্যের কালে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চিকিৎসাবিদ্যার যে প্রভূত উন্নতি ঘটিয়াছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক হিপোক্রেটিসের বহু পূর্বে ভারতীয় চিকিৎসকগণ শল্যবিদ্যার যে আশ্চর্য উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, সেকথা পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই এখন স্বীকার করেন।

গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যার এই সুনামের প্রধান কারণ এই যে, পরবর্তীকালে, বিশেষতঃ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর পর হইতে, ইউরোপে নূতন করিয়া এই বিদ্যার চর্চা যখন আরম্ভ হইল তখন ইহা প্রধানতঃ গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যাকে অবলম্বন করিয়াই সংঘটিত হয়। ইউরোপীয় মনীষীরা আরবদের মধ্যস্থতায় প্রথম উপকরণ হিসাবে গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যাকেই হাতের কাছে

* Charles Singer, *A Short History of Medicine;* Oxford; p. 1-2.

পাইয়াছিলেন। ইউরোপের মত ভারতবর্ষে ও মহাচীনে রেনেশাঁ আসে নাই। তাই নিজেদের প্রাচীন বিদ্যাকে ভিত্তি করিয়া তাহার উন্নতি বিধানে আর কোন সুযোগ তাহার উপস্থিত হয় নাই। যদি হইত, অথবা ইউরোপীয় মনীষীরাই গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পরিবর্তে যদি ভারতীয় অথবা চৈনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলি হাতে পাইতেন, তাহা হইলে গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে উক্তি আজ সচরাচর করা হয়, ভারতীয় ও চৈনিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে ঠিক সেই উক্তিই ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা করিতেন। প্রাচীন কালে বিভিন্ন সভ্যতার আওতায় স্বাধীনভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে উন্নতি ঘটিয়াছিল তাহার নিরপেক্ষ বিচার করিতে হইলে এই কথা মনে রাখা একান্ত আবশ্যক।

যাহা হউক, আপাততঃ গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যার উৎপত্তি ও ক্রম বিকাশের ইতিহাস আমাদের আলোচনার বিষয়। ১০০০ খৃীঃ পূর্বাব্দ পর্যন্ত সমগ্র ভূমধ্য সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে মিনোয়ান নামে এক সভ্য জাতির বাস ছিল। প্রত্নতত্ত্বীয় গবেষণার ফলে এই মিনোয়ান সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং হোমারের ইলিয়ডের নূতন ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা সম্ভবপর হইয়াছে। ট্রয় অবরোধের বৃত্তান্ত গ্রীকদের দ্বারা মিনোয়ানদের এক সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত ঘাঁটি আক্রমণ বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন। নবাগত গ্রীক জাতির মধ্যে দুইটি শাখার প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায়; —প্রথমতঃ ডোরিক গ্রীক—ইহারা মূল ইউরোপীয় ভূখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ক্রীট, কস্, স্নাইডাস্ প্রভৃতি ভূমধ্য সাগরীয় দ্বীপগুলিতে গিয়া বসতি স্থাপন করে; দ্বিতীয় শাখা—আয়োনীয় গ্রীকরা এসিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে বসতি স্থাপন করে। এই ডোরিক ও আয়োনীয় গ্রীক সম্প্রদায় শুধু চিকিৎসা-বিদ্যার জন্য নহে, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার উন্নতি বিধানের জন্যও দায়ী। কস্, স্নাইডাস্ ও এসিয়া মাইনরে গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যার যে বীজ প্রথম অঙ্কুরিত হয় তাহাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ও ক্রমশঃ ছড়াইয়া পড়িয়া সমগ্র গ্রীক জগতে ও পরবর্তীকালে অপরাপর সভ্যতার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

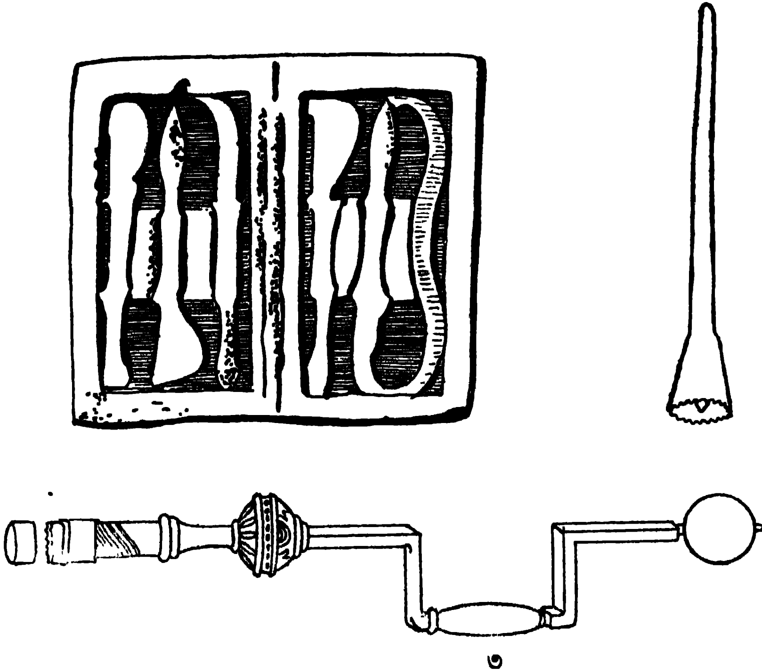
বিজিত মিনোয়ান সভ্যতার নিকট গ্রীকরা তাহাদের চিকিৎসাবিদ্যার জন্য অনেকাংশে ঋণী। এই বিদ্যার প্রথম অবস্থায় সর্পকে চিকিৎসার প্রতীক হিসাবে বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। মিনোয়ান ধর্মে সর্পের এক বিশেষ স্থান ছিল। তাহাদের মধ্যে সর্পপূজার বহু নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আবিষ্কার করিয়াছেন। সুতরাং গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যার আদি পর্বে সর্পের সহিত চিকিৎসার যে নানা যোগ দৃষ্ট হয় তাহা গ্রীকদের উপর মিনোয়ান সভ্যতার প্রভাবের পরিচায়ক। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে নানারূপ জ্ঞান ও ধারণা গ্রীকরা মিনোয়ানদের নিকট অর্জন করে। সহরের আবর্জনা ও ময়লা জল নিকাশের জন্য মিনোয়ানদের অতি চমৎকার ব্যবস্থা ছিল।

গ্রীক সভ্যতার উপর অ্যাসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার ছাপও সুপরিস্ফুট। পশ্চিম এসিয়া মাইনরের ঔপনিবেশিক আয়োনীয় গ্রীকদের সহিত প্রাচীন অ্যাসিরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে। তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস উপত্যকার সভ্যজাতিদের পর্যবেক্ষণ-খ্যাতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। বহু বৎসর ধরিয়া আশ্চর্য ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত ইহারা নানা বিষয়ে, বিশেষতঃ জ্যোতিষ ও চিকিৎসাশাস্ত্রে, বহু মূল্যবান তথ্যাদি আবিষ্কার করে। প্রত্ন-তত্ত্বীয় গবেষণার ফলে অ্যাসিরীয় ও ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা উদ্ভাবিত অস্ত্রোপচারের উপযোগী নানা যন্ত্রপাতির কথা জানা গিয়াছে। প্রাণিদেহের আভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কেও ব্যাবিলনীয়দের অনেক গবেষণা আছে। ভেড়ার যকৃতকে নকল করিয়া নির্মিত ২০০০ বছরের পুরাতন এক মৃত্তিকার ছাঁচ পাওয়া গিয়াছে, বৃটিশ মিউজিয়ামে এই ছাঁচ এক্ষণে সংরক্ষিত আছে। অ্যাসিরীয় ও ব্যাবিলনীয়দের এইরূপ উন্নত চিকিৎসাবিদ্যা স্বভাবতঃই আয়োনীয় গ্রীকদের প্রভাবান্বিত করে। ইহাদের কাছ হইতে গ্রীকরা যেমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও তথ্যরাজি শিক্ষা করিয়াছিল, সেই সঙ্গে ইহাদের নানারূপ ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারের ছোঁয়াচ হইতেও গ্রীকরা পরিত্রাণ

পায় নাই। গ্রীক বিজ্ঞানে ব্যাবিলনীয় বিজ্ঞানের সহিত ব্যাবিলনীয় কুসংস্কারও একত্রে স্থান পাইয়াছে।

মিনোয়ান ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ছাড়া মিশরীয় সভ্যতার নিকটও গ্রীকরা তাহাদের চিকিৎসাবিদ্যার জন্য ঋণী। নানাবিধ ঔষধ ও ভেষজের জ্ঞান গ্রীকরা মিশরীয়দের নিকট আয়ত্ত করে। চিকিৎসা সম্পর্কিত নীতিজ্ঞানও তাহাদের মিশর হইতে ধার করা। গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যার উপর মিশরীয় চিকিৎসাবিদ্যার প্রভাবের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ এই যে, মিশরীয়েরা ইম্‌হোটেপ্‌ নামক চিকিৎসককে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করিয়াছিল। গ্রীকরাও তাহাদের পৌরাণিক চিকিৎসক এস্‌কুলাপিয়াস্‌কে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত। ইম্‌হোটেপ্‌ ও এস্‌কুলাপিয়াস্‌ উভয়েই ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন এবং উভয়েরই দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠা গ্রীকদের উপর মিশরীয় সভ্যতার প্রভাবের এক নিদর্শন।

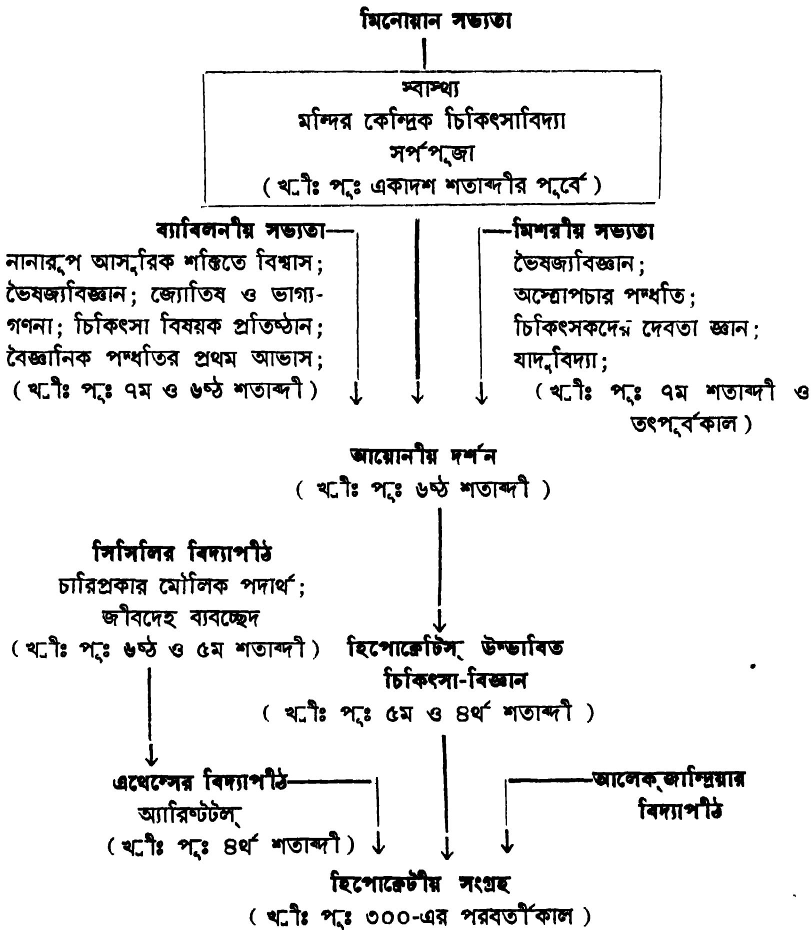
গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর পারসিক ও ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের অল্প বিস্তর প্রভাবের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এই প্রভাবের স্বরূপ ও মাত্রা কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। হিপোক্রেটিসের বায়ু সম্বন্ধীয় একটি পুস্তিকায় (*Treatise on Winds*) হিন্দু চিকিৎসাবিদ্যার কিছু আভাস পাওয়া যায়।



৬৭। (১) এথেন্সে এস্‌কুলাপিয়াসের মন্দিরে প্রাচীর গাত্রে এই যন্ত্রপাতির খোদাই চিত্রটি পাওয়া গিয়াছে; গ্রীক আমলে ব্যবহৃত অস্ত্রোপচারের উপযোগী কয়েকটি যন্ত্রপাতির নমুনা এই চিত্র হইতে পাওয়া যায়। (২) সাধারণ একটি ট্রিফিন-যন্ত্র। (৩) একটি উন্নত ট্রিফিন-যন্ত্র।

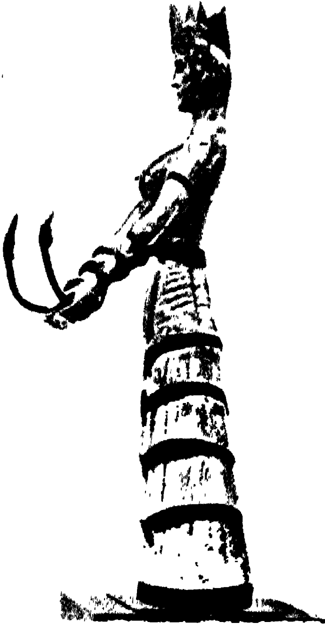
এই ভাবে মিনোয়ান, ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া এসিয়া মাইনরের আয়োনীয় গ্রীকরা এবং ভূমধ্যসাগরীয় কস্‌, স্নাইডাস্‌ প্রভৃতি দ্বীপের ডোরিক গ্রীকরা

তাহাদের পূর্ববর্তী প্রাচীন সভ্যজাতিদের চিকিৎসা বিষয়ক বিবিধ তথ্য ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এই সব বিক্ষিপ্ত তথ্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে একত্র গ্রথিত ও সঙ্কলিত করিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ এক বিদ্যায় রূপায়িত করিয়া তুলিবার কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে গ্রীকদের প্রাপ্য। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে কস্ ও স্নাইডাসে গ্রীকদের আমরা দর্শন ও শাস্ত্র হিসাবে চিকিৎসা বিষয়ক ব্যাপারের আলোচনা করিতে দেখি। ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীতে এই বিদ্যা রীতিমত উন্নত এবং সমগ্র গ্রীক চিন্তা ও জ্ঞানজগতে ইহা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ধারা ইতিহাসে অক্ষুণ্ন দেখা যায়। গ্রীক চিকিৎসার উপর অন্যান্য সভ্যতার প্রভাব ও এই বিদ্যার ক্রমবিকাশের ধারা নক্সার আকারে দেখানো হইল।



৬৮। হিপোক্রেটীয় চিকিৎসাবিদ্যার ঐতিহাসিক বিবর্তনের নক্সা।

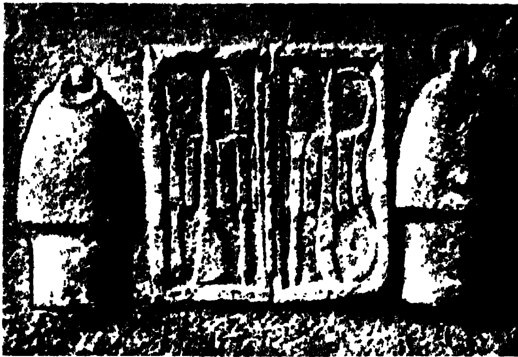
সুতরাং দেখা যাইতেছে, গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যা বহু শতবর্ষব্যাপী বহু গ্রীক মনীষীর



মিনোয়ান সর্পদেবী
(নোসোসের রাজপ্রাসাদে প্রাপ্ত)।

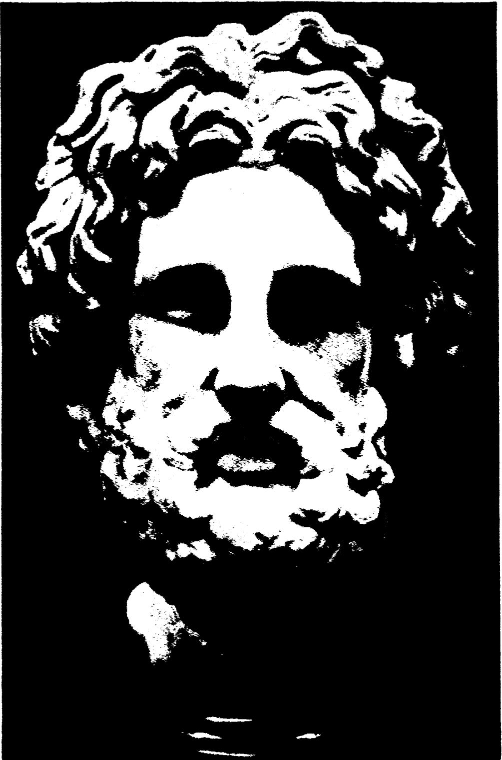


মিশরীয় চিকিৎসার দেবতা
ইম্‌হোটেপ্‌
(কাইরো মিউজিয়মে সংরক্ষিত)।

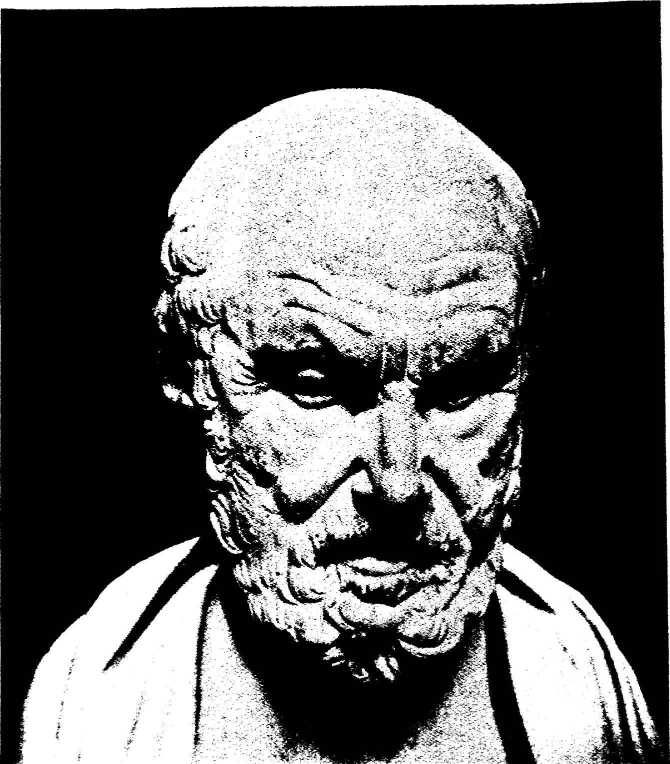


শল্যচিকিৎসার যন্ত্রপাতি ও তাহার বাক্স এথেন্সে এস্‌কুলাপিয়াসের মন্দিরে প্রাচীর গাত্রে ইহা খোদিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে; ১৬১ পৃষ্ঠায় ইহার একটি রেখাঙ্কন দ্রষ্টব্য।

PLATE X



এস্কুলাপিয়াস্



হিপোক্রেটিস্ (খ্রীঃ পূঃ ৪৬০-৩৭৭)

অক্লান্ত সাধনার ফল। এই সকল মনীষীর অনেকের কথাই বিস্মৃতির অতলগর্ভে বিলীন হইয়াছে। আমরা যে অল্প কয়েকজনের কথা জানি তাহাও নানাদিক দিয়া অসম্পূর্ণ। এই অল্প কয়েকজনের মধ্যে আল্‌ক্‌মাওন, এম্‌পিডক্লেস ও হিপোক্রেটিসের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলিতে গেলে এই ত্রয়ীই গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যার স্থাপয়িতা।

আল্‌ক্‌মাওন ও এম্‌পিডক্লেস্

ক্রোটনের আল্‌ক্‌মাওন (খ্রীঃ পূঃ ৫০০) ভ্রূণতত্ত্ববিদ্ ছিলেন। অস্ত্রোপচার ও জীবদেহ ব্যবচ্ছেদ কার্যে তাঁহার নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অপ্‌টিক্ নার্ভ বা দৃষ্টি-কেন্দ্রে প্রসারিত স্নায়ু তিনি আবিষ্কার করেন। মস্তিষ্কই সমস্ত অনুভূতি ও মননশক্তির কেন্দ্র, তিনি এইরূপ মনে করিতেন।

শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে এম্‌পিডক্লেসের কয়েকটি গবেষণা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। রক্ত হৃৎপিন্ড হইতে ও হৃৎপিন্ডের অভিমুখে প্রবাহিত হয়, তিনি এইরূপ শিক্ষা দিতেন। পদার্থ মাত্রেই জল, বায়ু, অগ্নি ও মৃত্তিকা এই চারি মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত—এই সুপ্রাচীন গ্রীক মতবাদ এম্‌পিডক্লেস্ প্রথমে উদ্ভাবন করেন। চিকিৎসাবিদ্যায় এই মতবাদ প্রয়োগ করিয়া তিনি বলেন যে, দেহে এই চারি মৌলিক উপাদানের সামঞ্জস্য যথাযথ রক্ষিত হইলে তবেই স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে; যে কোন কারণে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলেই ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করে। এই মতবাদ দীর্ঘকাল গ্রীক চিকিৎসাবিদ্যাকে প্রভাবান্বিত রাখিয়াছিল।

হিপোক্রেটিস্ ও হিপোক্রেটীয় সংগ্রহ

হিপোক্রেটিস্ গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গুরু ও পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জনক। তাঁহার প্রদর্শিত নীতি ও পদ্ধতি সর্বকালের জন্য এই বিজ্ঞানের এক অতি উচ্চ মান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। শুধু চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে নহে, সমগ্রভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রেও এই মহামনীষী যে আদর্শ ও বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা পাওয়া ভার।

হিপোক্রেটিসের রচনা সম্বন্ধে কিছু অনিশ্চয়তা আছে। তাঁহার নামে প্রচলিত বহু গ্রন্থ ও রচনার সন্ধান পাওয়া গেলেও কোন্ গ্রন্থগুলি হিপোক্রেটিসের রচিত আর কোন্‌গুলিই বা হিপোক্রেটিস্-পন্থী অন্যান্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের রচিত, তাহা ঐতিহাসিকেরা বহু গবেষণা ও পরিশ্রম সত্ত্বেও এ পর্যন্ত নিশ্চিতরূপে বলিতে সমর্থ হন নাই। হিপোক্রেটীয় চিকিৎসা-সংগ্রহ নামে যে বিপুল গ্রন্থরাজি আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা মূলতঃ বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন দেশের হিপোক্রেটিস্-পন্থী চিকিৎসকদিগের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ফল। এই সংগ্রহ যে নানা হাতের রচনা, গ্রন্থের বিপরীতাত্মক মতবাদ ও অসংলগ্ন আলোচনা তাহার অকাট্য প্রমাণ। তথাপি আশ্চর্য এই যে, এই সব রচনার অন্তর্নিহিত বাণী, নীতি ও উপদেশ এক ; আদর্শও এক। প্রত্যেক গ্রন্থই এক অভিন্ন নীতি, আদর্শ ও পদ্ধতির ইংগিত দিয়াছে এবং এই মূল বিষয়ে হিপোক্রেটীয় সংগ্রহের সংহতি কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই। এই নীতি, আদর্শ ও পদ্ধতির সহিতই হিপোক্রেটিসের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হিপোক্রেটিসের স্বরচিত গ্রন্থ বা রচনা সম্বন্ধে যত অনিশ্চয়তাই থাকুক না কেন, তিনিই যে এই সংগ্রহের মূল ও প্রাথমিক অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

সংক্ষিপ্ত জীবনী : হিপোক্রেটীয় রচনার এই অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও হিপোক্রেটিস্ ঐতিহাসিক পুরুষ। ৪৬০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের অনুরূপ সময়ে তিনি কস্ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুকাল ধার্য হইয়াছে খ্রীঃ পূঃ ৩৭৭ হইতে ৩৫৯ অব্দের মধ্যে। শেষোক্ত অব্দ সত্য হইলে হিপোক্রেটিসের মৃত্যু ঘটে ১০১ বৎসর বয়সে। চিকিৎসকের পক্ষে এরূপ দীর্ঘজীবন লাভ অবশ্য অসম্ভব নহে। হিপোক্রেটিস্ ভ্রাম্যমান জীবন যাপন করিতেন। কস্, থিব্‌স্,

এথেন্স, থ্রেস, থেসালি প্রভৃতি নানাস্থানে তাঁহার কর্মময় জীবনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার সমসাময়িক ও বয়ঃকনিষ্ঠ প্লেটো নিজের রচনায় শ্রদ্ধার সহিত হিপোক্রেটিসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। হিপোক্রেটিসের শিষ্যদের মধ্যে তাঁহার দুই পুত্র ও জামাতার নাম পাওয়া যায়। অ্যারিস্টট্‌ল্‌ এই জামাতার কাজের কথা উল্লেখ করেন। থেসালিতে হিপোক্রেটিসের কবরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

হিপোক্রেটিসের জীবিতাবস্থায় রচিত কোন চিত্র বা মর্মর মূর্তি সংরক্ষিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর বহু পরে গ্রীকরা তাহাদের এই প্রাচীন প্রিয় চিকিৎসকের এক কল্পিত মর্মর মূর্তি নির্মাণ করিয়াছিল। আসল হিপোক্রেটিসের সহিত এই কল্পিত মূর্তির কোন সাদৃশ্য থাকুক বা না থাকুক, গ্রীকরা তাহাদের প্রিয় ও আদর্শ চিকিৎসককে কিরূপ মূর্তিতে দেখিতে চাহিয়াছিল, ইহা তাহার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ধীর, স্থির, সৌম্যদর্শন এবং ন্যায়পরায়ণতা ও জ্ঞানের প্রতীক এই প্রস্তর মূর্তিটি হিপোক্রেটীয় সংগ্রহের মধ্য দিয়া হিপোক্রেটিস্‌ নামক যে মনুষ্য-চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই চরিত্রের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছে। মানুষ যুগে যুগে এই মূর্তিটির উদ্দেশ্যেই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিবে।

হিপোক্রেটিস্‌ কর্তৃক প্রদর্শিত চিকিৎসা-পদ্ধতির সার কথা হইল পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা। চিকিৎসা-ব্যবস্থায় পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের আদর্শ প্রবর্তন করিয়া তিনি যুগান্তর আনয়ন করেন। যাদু ও মন্ত্রের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া চিকিৎসাবিদ্যাকে তিনি প্রকৃত বিজ্ঞানের আদর্শে ঢালিয়া সাজাইলেন। মত ও তত্ত্বের সহিত পর্যবেক্ষণ ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মিলন ঘটাইলেন। তিনি বলিলেন, শুধু অলীক কল্পনা ও প্রজ্ঞার দ্বারা চিকিৎসা-সমস্যার সমাধান অসম্ভব; তাহার জন্য প্রয়োজন—প্রতিনিয়ত পরীক্ষা ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা। 'কেন হইতেছে'-এর পরিবর্তে 'কিরূপে হইতেছে'—এই প্রশ্নের মীমাংসার উপর চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবে, তিনি এই মত প্রচার করিতেন। যাহারা 'কেন'র প্রশ্ন লইয়া মাথা ঘামাইতে চায় তাহাদের তিনি অনধিগম্য নভোমণ্ডল ও ভূগর্ভের জটিল রহস্য সম্বন্ধে গবেষণা করিবার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণায় সফলকাম হইতে হইলে বহুদিনের ও বহু লোকের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ফলে এই বিদ্যায় যে নির্ভরযোগ্য প্রচুর তথ্যের সমাবেশ হইয়াছে ও অনেক প্রয়োজনীয় নীতি ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানীকে সেই তথ্য ও নীতির ভিত্তিতে অগ্রসর হইতে হইবে। হিপোক্রেটিস্‌ তাঁহার নিজের গবেষণা ও রচনায় পরম নিষ্ঠার সহিত এই আদর্শ পালন করিয়া চলিয়াছেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ একটানাভাবে তিনি বহু রোগের গতি, পরিবর্তন ও পরিণতি পর্যবেক্ষণ করিয়া পরে তাহা নিখুঁতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অতিশয়োক্তি ও কুসংস্কারজনিত মন্তব্যবর্জিত রোগের এই বর্ণনাগুলি হিপোক্রেটিসের বৈজ্ঞানিক মনের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। শুধু তাহাই নহে, এইরূপ নিখুঁত ও নির্ভুল বর্ণনা দুই হাজার বৎসরের চিকিৎসা-শাস্ত্রের ইতিহাসেও বিরল। এইরূপ বর্ণনার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

"আরিস্টিয়নের সহিত যে মহিলাটি বাস করিত, তাহার গলার প্রদাহ হইয়াছিল। প্রথমে তাহার জিহ্বার পীড়া দেখা দেয়; স্বর অসংলগ্ন, জিহ্বা রক্তিমবর্ণ ও শুষ্ক। প্রথম দিবস—কম্পন ও দেহে জ্বরের আবির্ভাব। তৃতীয় দিবস—শৈত্য, ভীষণ জ্বর; গলার ও বক্ষের দুই পাশ কঠিন এবং রক্তিম-বর্ণ ধারণ করিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে; অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রান্তদেশ ঠাণ্ডা ও বিবর্ণ; শ্বাস উঠিতেছে; পানীয় নাসারন্ধ্রপথে বাহির হইয়া যাইতেছে, মহিলা গলাধঃকরণে অসমর্থ; অন্ত্র ও মূত্রাশয়ের নিঃসরণক্রিয়া বন্ধ। চতুর্থ দিবস—সমস্ত লক্ষণগুলির প্রবলতর আকার ধারণ। পঞ্চম দিবস—মহিলার মৃত্যু হইল।" *

উপরিউক্ত বর্ণনা ডিপথিরিয়া রোগের একটি উদাহরণ। একালের কোন চিকিৎসকের পক্ষেও এই রোগের সংক্ষিপ্ততর ও উৎকৃষ্টতর বর্ণনা দেওয়া কঠিন।

* Charles Singer, *A Short History of Medicine;* p. 24.

শল্য-চিকিৎসা সম্বন্ধে হিপোক্রেটীয় সংগ্রহে বিশদ বিবরণ আছে। *Concerning the Things in Surgery* শীর্ষক একটি ছোট নোট বই-এ অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে যে সব ব্যবস্থা ও উপদেশের বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এইসব ব্যবস্থায় ও উপদেশে রীতিমত আধুনিকতার ছাপ আছে। অস্ত্রোপচারের গৃহ কিরূপ হওয়া উচিত, সেখানে কি কি ব্যবস্থা অপরিহার্য, শল্য-চিকিৎসকের কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিবরণের (বঙ্গানুবাদ) কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।

'অস্ত্র-চিকিৎসার কাজে প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক হইল—রোগী, শল্য-চিকিৎসক, সহকারিগণ, যন্ত্রপাতি, আলো এবং কোথায় কিভাবে তাহা স্থাপিত হইবে তাহার ব্যবস্থা, রোগীর দেহ ও যন্ত্রপাতির সরঞ্জাম। উপবিষ্ট অথবা দণ্ডায়মান অবস্থায় অস্ত্র-চিকিৎসককে এরূপ স্থান গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে রোগীর দেহের অস্ত্রোপচারের স্থান আলোর ব্যবস্থার দিক হইতে চিকিৎসকের অবস্থান সুবিধাজনক হয়। স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম উভয়বিধ আলো সোজা অথবা তীর্যকভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে।'

অস্ত্র-চিকিৎসকের উপরও অনেক মূল্যবান নির্দেশ আছে।

'(চিকিৎসকের) নখ অঙ্গুলী হইতে খুব বেশী বাহির হইয়া থাকা অথবা খুব ছোট থাকাও উচিত নহে। অঙ্গুলীর অগ্রভাগ ব্যবহার করিতে অভ্যাস কর। অস্ত্রোপচার সংক্রান্ত সকল রকম ক্রিয়া একহাতে ও একসঙ্গে দুই হাতে সম্পাদন করিতে অভ্যাস কর। তোমার উদ্দেশ্য হইবে দক্ষতা, দ্রুততা, বেদনাহীনতা, সৌষ্ঠব ও তৎপরতা আয়ত্ত করা। যাহারা রোগীর তত্ত্বাবধানের কাজে নিযুক্ত আছে, চাহিবামাত্র তাহারা যেন অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম তোমার কাছে পোঁছাইয়া দেয় এবং একই কালে রোগীর দেহ শক্ত অথচ স্থিরভাবে ধরিয়া রাখে, মৌনতা রক্ষা করে ও উর্ধ্বতন কর্মচারীদের আজ্ঞানুবর্তী থাকে।'

ইহার মধ্যে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার নির্দেশ বর্তমান। আধুনিককালের অস্ত্রোপচার গৃহের ব্যবস্থা ও নিয়মকানুনের সহিত ইহার কিরূপ ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার মত।

মাথার খুলি বা করোটিতে আঘাতজনিত ক্ষতস্থান অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে *On the Wounds of the Head* নামক গ্রন্থে নানা নির্দেশ পাওয়া যায়। গুরুতর আঘাতের ফলে খুলির হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে ভাঙ্গা হাড় খুঁড়িয়া বাহির করিতে হয়। এইরূপ অস্ত্রোপচারের নাম 'ট্রিফাইনিং' এবং এই কার্যে ব্যবহৃত অস্ত্রের নাম 'ট্রিফিন'। ইহা একটি গোলাকৃতি করাত বিশেষ। ইহার মধ্যদেশে একটি তীক্ষ্ণাগ্র কাঁটা সংলগ্ন থাকে। করোটির ক্ষতস্থানে ট্রিফিন স্থাপন করিয়া হাতল ঘুরাইলে করাত গোলভাবে অস্থি কাটিয়া বাহির করিয়া অনিবে। এই কার্যে বিশেষ দক্ষতা ও সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন। ট্রিফিনের সাহায্যে অস্ত্রোপচারের সময় শল্য-চিকিৎসকের কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত *On the Wounds of the Head* নামক গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

হিপোক্রেটিসের বচন : হিপোক্রেটীয় সংগ্রহের মধ্যে হিপোক্রেটিসের বচন বা Aphorisms বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই বচনগুলি স্বয়ং হিপোক্রেটিস কর্তৃক লিখিত বলিয়া অনুমিত হয়। প্রবীণ চিকিৎসকের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল এই বচনগুলি। অতি সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে ইহা লিখিত এবং সম্ভবতঃ হিপোক্রেটিসের বৃদ্ধ-বয়সের রচনা। নিম্নে এই বচনগুলির কয়েকটি নমুনা দেওয়া হইল।

"জীবন স্বল্পমেয়াদী এবং কলাকৌশল অর্জনের কাল দীর্ঘ; বিপদ ক্ষণিকের; পরীক্ষার দায় আছে; কর্তব্য নির্ধারণ সুকঠিন। চিকিৎসককে কর্তব্য পালনের জন্যই যে শুধু প্রস্তুত থাকিতে হইবে তাহা নহে—রোগী, সহকারিবৃন্দ ও বাহ্যিক অবস্থা সব কিছুর উপরেই আরোগ্যলাভ নির্ভর করে।"

"কারণ ছাড়া ক্লান্তি রোগের নির্দেশক।"

"কৃশকায় অপেক্ষা অতিশয় স্থূলকায় ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যুর সম্ভাবনা অধিকতর প্রবল।"

"রোগে নিদ্রা ক্ষতিকর হইলে ইহা অতি মারাত্মক লক্ষণ বুঝিতে হইবে।"

"দীর্ঘ রোগভোগের পর উত্তমরূপে আহারাদি সত্ত্বেও পুষ্টিসাধন না হওয়া দুর্লক্ষণ।"

"অধিকাংশ ক্ষেত্রে আঠারো হইতে পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের মধ্যে যক্ষ্মা রোগের আক্রমণ ঘটে।"

"ধনুষ্টংকার রোগাক্রান্ত ব্যক্তির হয় চারদিনের মধ্যে মৃত্যু হইবে, অথবা এই চার দিন টিকিয়া থাকিলে সে সুস্থ হইয়া উঠিবে।"

"চল্লিশ হইতে ষাট বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে সন্ন্যাস রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়।"

হিপোক্রেটীয় শপথ ঃ সর্বশেষে হিপোক্রেটীয় শপথ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। চিকিৎসা-বৃত্তিতে প্রবেশ করিবার প্রাক্কালে প্রত্যেক শিক্ষানবীসকে এই শপথ গ্রহণ করিতে হয়। অদ্যাপি এই শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা সর্বদেশে বলবৎ আছে। হিপোক্রেটীয় শপথ রচনার কাল ঠিক করিয়া বলা যায় না। বর্তমানে যে আকারে এই শপথটি পাওয়া যায় তাহা নিঃসংশয়ে হিপোক্রেটিসের বহু পরবর্তী কালের রচনা। আবার এই শপথের কিছু কিছু অংশ যে হিপোক্রেটিসেরও পূর্বে রচিত হইয়াছিল, পণ্ডিতেরা এইরূপ অভিমতও পোষণ করেন। খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় মিলেনিয়মে মিশরীয় প্যাপিরাসে এই শপথের কিয়দংশ পাওয়া যায়। যে সময়েই রচিত হউক না কেন, হিপোক্রেটিস্-পন্থী চিকিৎসকেরা যে কিরূপ সুমহান আদর্শ ও সেবাব্রতের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, এই শপথ তাহার একটি প্রমাণ এবং তাহাতেই ইহার গুরুত্ব। চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষানবীস হইবার পূর্বে ছাত্র বলিতেছে ঃ—

'সমস্ত দেবদেবীকে সাক্ষী মানিয়া সর্বরোগহর অ্যাপোলোর নামে আমি শপথ করিতেছি যে, এই শপথ ও ইহার লিখিত সর্তগুলি আমি আমার বিচারবুদ্ধি অনুসারে যথাসাধ্য পালন করিব।

'যিনি আমাকে এই বিদ্যা শিক্ষাদান করিয়াছেন তাঁহাকে আমার নিজ পিতামাতার ন্যায় গণ্য করিব। যদি প্রয়োজন হয় আমার সারবস্তু তাঁহার সহিত ভাগ করিয়া লইব এবং তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিব। তাঁহার সন্তানসন্ততিদের আমি নিজ ভ্রাতৃবৎ দেখিব এবং তাহারা এই বিদ্যা অধ্যয়নে অভিলাষী হইলে বিনা বেতনে বা বিনা সর্তে আমি এই বিদ্যা তাহাদের শিখাইব।' অনুশাসন, বক্তৃতা ও সর্বপ্রকার অধ্যাপনার সাহায্যে আমার নিজ সন্তানদেরই শুধু নহে, আমার শিক্ষকের সন্তানদের এবং এইরূপ শপথ ও চুক্তিতে আবদ্ধ শিশুদের চিকিৎসা সংক্রান্ত আইন অনুসারে আমি এই বিদ্যা শিক্ষা দিব।

'আমি যে পথ্যাপথ্য বিধির নির্দেশ দিব তাহা আমার যোগ্যতা ও বিচারবুদ্ধি অনুসারে রোগীদের উপকারার্থেই নির্ধারিত হইবে, তাহাদের অপকার বা ক্ষতির নিমিত্ত নহে। আমার কাছে চাহিলেও কাহাকেও আমি কোন মারাত্মক ঔষধ বা ঔষধের পরামর্শ দিব না, বিশেষতঃ কোন স্ত্রীলোককে ভ্রূণ হত্যায় সাহায্য করিব না। যে গৃহেই আমি প্রবেশ করি না কেন, সেখানে রোগীর উপকারার্থে আমি যাইব এবং সর্বপ্রকার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা বা ভ্রষ্টতা হইতে, বিশেষতঃ স্বাধীন অথবা ক্রীতদাস পুরুষ বা স্ত্রীলোককে প্রলুব্ধ করিবার অপচেষ্টা হইতে বিরত থাকিব। রোগীর শুশ্রূষার ব্যাপারে অথবা তাহা ছাড়াও মানুষের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমি যদি এমন কিছু দেখি বা শুনি যাহা প্রকাশ করা অনুচিত, আমি তাহা গোপন রাখিব এবং এইরূপ বিষয়কে পবিত্র গুপ্ত তত্ত্ব হিসাবে গণ্য করিব। আমার জীবন ও শাস্ত্রকে আমি বিশুদ্ধ ও পবিত্র রাখিব।

'এই শপথ যদি পালন করিতে পারি ও ইহাতে ভ্রষ্ট না হই, তবে সর্বকালে ও সকল লোকের প্রশংসার পাত্র হইয়া আমি যেন আমার জীবন ও শাস্ত্র সমভাবে উপভোগ করিতে পারি। ইহা লঙ্ঘন করিয়া শপথভ্রষ্ট হইলে আমার ভাগ্যে যেন ইহার বিপরীতটি ঘটে।'

চিকিৎসকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা উন্নততর আদর্শ আর কি হইতে পারে? যুগে যুগে এই আদর্শ চিকিৎসককে ন্যায়, সত্য ও সেবার পথে অবিচলিত রাখিয়াছে।

পরীক্ষিত সত্যের উপর হিপোক্রেটিসের ও হিপোক্রেটিস্-পন্থী অন্যান্য চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীর গুরুত্ব আরোপের কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এই সত্য উপলব্ধি করিয়া হিপোক্রেটিস্ বিজ্ঞানের প্রকৃত রাজপথের সন্ধান দিয়াছিলেন। নির্ভুল পরীক্ষালব্ধ তথ্যের আবিষ্কার ছাড়া বিজ্ঞানের অগ্রগতি যে সম্ভব নহে হিপোক্রেটিসের এই বাণী ও উপদেশ পরবর্তী বিজ্ঞানীরা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। প্রজ্ঞাবাদের মোহে গ্রীক বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা এরূপ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, যন্ত্রপাতির সাহায্যে হাতেকলমে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের

কাজকে তাঁহারা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতে শিখিয়াছিলেন। ইহাতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়া পড়ে। তথাপি চিন্তাজগতে গ্রীকদের আধিপত্য যতদিন বজায় ছিল এই আদর্শ ততদিন একেবারে ম্লান হইতে পারে নাই। রোমক সাম্রাজ্যের ভাঙনের পর এই আদর্শের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে এবং বিজ্ঞানের স্থান অধিকার করে যাদুবিদ্যা, প্রেততত্ত্ব ইত্যাদি। ইউরোপে অন্ধকার যুগের সূত্রপাতও তখন হইতে। রজার বেকন ও রেণেশাঁয় বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় হিপোক্রেটিসের আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে বিজ্ঞান আবার নবজীবন লাভ করে এবং অপ্রতিহত গতিতে আবার সুরু হয় তাহার জয়যাত্রা।

৪·৬। আয়োনীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের উত্থান ও পতন এবং প্লেটো-অ্যারিস্টটলের বিজ্ঞান ও দর্শনের উদ্ভবের সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ

থালেস্ প্রমুখ মাইলেশীয় বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের গবেষণা ও চিন্তাধারা হইতে সুরু করিয়া লিউসিপ্পাস ও ডিমোক্রিটাসের আণবিক মতবাদ এবং হিপোক্রেটিস্ ও হিপোক্রেটিস-পন্থীদের চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার কাল পর্যন্ত এই দুইশত বৎসরের (খৃঃ পূঃ ৬০০-৪০০) বিজ্ঞান-চর্চার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ইতিহাসের এক অতি গৌরবময় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে। মাইলেটাস্, কস্, ইফীসাস্, ক্রোটন, ইলিয়া, আক্রাগাস্ প্রভৃতি ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী ও দ্বীপবর্তী আয়োনীয় গ্রীকদের বিখ্যাত উপনিবেশগুলিকে কেন্দ্র করিয়া যে বিজ্ঞান ও দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছিল, ঐতিহাসিকগণ তাহাকে আয়োনীয় বিজ্ঞান ও দর্শন নামে অভিহিত করিয়াছেন। শুধু ভৌগোলিক কারণেই আয়োনীয় বিজ্ঞানের বিশেষত্ব নহে। প্রাচীন মিশর ও ব্যাবিলনের দুই সহস্র বৎসরের জ্যামিতি, গণিত, জ্যোতিষ ও রসায়নের ক্ষীণ ও মন্থর স্রোতস্বিনীকে আয়োনীয় গ্রীকরা স্বকীয় চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তিবলে বিপুল বেগে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত ও পরিচালিত করিয়া বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করিল। পুরোহিত-কবলিত বিভিন্ন বিদ্যাকে একত্র গ্রথিত করিয়া সেই বিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এক নূতন জগত ও পৃথিবী পরিকল্পনায় তাহারা উদ্যোগী হইল। সংস্কারমুক্ত স্বাধীন চিন্তাধারার সুস্থ পরিবেশে যে বিজ্ঞান ও দর্শনের জন্ম হইল, তাহাই আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আদি জননী।

আয়োনীয় বিজ্ঞানে বস্তুবাদ—শ্রমের মর্যাদা

আয়োনীয় বিজ্ঞানের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা বস্তুবাদী। পৃথিবী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও তাহার অন্তর্ভুক্ত দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান যাবতীয় বস্তু যে প্রাকৃতিক কারণে উদ্ভূত হইয়াছে এবং প্রত্যেক ঘটনার পশ্চাতে যে একটি সহজ সরল কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে, এই বিশ্বাস আয়োনীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের মূলতত্ত্ব; বিজ্ঞানে ইহাই তাহার নূতন অন্তর্দৃষ্টি। এই অন্তর্দৃষ্টিবলেই ব্রহ্মাণ্ড যে একটি প্রাথমিক মৌলিক উপাদান হইতে উদ্ভূত, এইরূপ পরিকল্পনা। থালেসের মনে হইল, এই প্রাথমিক উপাদান জল; অ্যানাক্সিমেনেস্ বলিলেন, ইহা বায়ু; হেরাক্লিটাসের প্রত্যয় হইল অগ্নি ছাড়া এই উপাদান আর কিছুই হইতে পারে না। সংখ্যাতত্ত্ব-বিশারদ্ পিথাগোরীয়দের পরিকল্পনায় পূর্ণ সংখ্যা বা 'মোনাড' সৃষ্টি-রহস্যের মূলাধার; পরমাণুবাদীরা জাহির করিলেন, অদৃশ্য অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণিকা বা পরমাণুই আদিম উপাদান এবং এই পরমাণুদের সমন্বয়েই বস্তু, পৃথিবী ও জ্যোতিষ্কদের উৎপত্তি। পৌরাণিক উপাখ্যান, অন্ধ ধর্ম ও সংস্কারের ভিত্তিতে রচিত এক কাল্পনিক, অতিপ্রাকৃত ও উদ্ভট পৃথিবী ও ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনার পরিবর্তে দৈনন্দিন সাধারণ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে পৃথিবী ও নৈসর্গিক পরিবেশকে বুঝিবার চেষ্টা চিন্তাজগতের এক অতি অভিনব ও

বৈপ্লবিক ঘটনা। আয়োনীয় গ্রীকরা ব্যাবিলন ও মিশরের পুরোহিতদের নিকট ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতিষ, ভেষজবিদ্যা, জ্যামিতি ও গণিত সম্বন্ধীয় শিক্ষার জন্য পুরাপুরি ঋণী। কিন্তু পর্যবেক্ষণমূলক বিদ্যার সহিত যুক্তিমূলক চিন্তার সংযোজনার ফলে এই যে নূতন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম হইল, মানুষের চিন্তাধারায় ইহা এক অভূতপূর্ব বিপ্লবের জন্য দায়ী।

এই বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী কেবল চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহদের স্বরূপ, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি প্রভৃতি নৈসর্গিক প্রশ্নের সমাধানেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা সমস্যা সমাধানের কার্যেও এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রয়োগের ফলে নানাবিধ যান্ত্রিক উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছিল। স্কাইদীয় অ্যানাকার্সিস্ (খৃীঃ পূঃ ৫৯২) কুমোরের চাকা এবং চিওসের গ্লাউকাস্ (খৃী পূঃ ৫৫০) ঝালা দিয়া লোহা জুড়িবার নূতন কৌশল আবিষ্কার করেন। সামোসের থিওডোরাস্ (খৃীঃ পূঃ ৫৩২) লেদ্, চাবি, সমতলদর্শক যন্ত্র, স্কেল্, রুল, পিতল ঢালাই করিবার উন্নততর পদ্ধতি, নানারূপ যন্ত্র ও শিল্প-পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য প্রসিদ্ধ। থালেসের জ্যামিতিক ও গাণিতিক গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচল নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য করা। নাবিকদের সুবিধার জন্যই অ্যানাক্সিম্যাণ্ডার পৃথিবীর মানচিত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

এই সব যান্ত্রিক আবিষ্কারকদের মর্যাদাও বড় কম ছিল না। অ্যানাকার্সিস্, গ্লাউকাস্ ও থিওডোরাস্ প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন; দেশের লোকেরা তাঁহাদের বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখিত। তখন শ্রমের মর্যাদা ছিল এবং ব্যবসায়ী ও বণিক্ সম্প্রদায় প্রায় ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিল। খৃীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে সোলন এথেন্সের নাগরিক জীবনযাত্রার সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে শ্রম-মর্যাদা আদর্শের প্রচারে উদ্যোগী হন। তিনি এক আইন প্রণয়নের দ্বারা পিতার পক্ষে সন্তানকে পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কারিগরি অথবা ব্যবসায়-সংক্রান্ত যে কোন একটি বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিধিবদ্ধ করেন। পিতা এই দায়িত্ব পালনে অক্ষম হইলে বা অবহেলা করিলে বৃদ্ধ বয়সে তাহার ভরণপোষণের কোন দায়িত্ব সন্তানের থাকিবে না। প্লুটার্ক আয়োনীয় গ্রীকদের এই শ্রম-মর্যাদা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"সে সময় কাজ করায় কোন লজ্জা ছিল না এবং ব্যবসায় ও বাণিজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবার জন্য কাহাকেও সমাজে নিকৃষ্ট গণ্য করা হইত না।" গ্রীক শব্দ Sophia বা জ্ঞানের অর্থ ছিল শিল্প ও যন্ত্র সম্পর্কিত দক্ষতা, নিছক অপার্থিব জল্পনা-কল্পনা নহে। *

শ্রমের মর্যাদাবোধ, শিল্পোন্নতি ও উন্নততর উৎপাদন-ব্যবস্থার মূলে যে টেক্‌নিক্ বা কারিগরি বিদ্যা রহিয়াছে, তাহার প্রতি চিন্তাশীল বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের সুস্থ ও সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবের ফলে আয়োনীয়রা বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার আদর্শ স্থাপন করিতে সক্ষম হয়। হিপোক্রেটিসের চিকিৎসা-পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ এবং লিউসিপ্পাস-ডিমোক্রিটাসের আণবিক তত্ত্ব শ্রম-মর্যাদাহীন পরিবেশে সম্ভবপর হইত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

আয়োনীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত সক্রেটিস্-প্লেটোর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভেদ

সক্রেটিস্, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের আবির্ভাবের পর এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ভারকেন্দ্র এসিয়া মাইনর ও দক্ষিণ ইতালীর উপকূলবর্তী ও ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপবর্তী আয়োনীয় উপনিবেশ হইতে গ্রীসের নূতন রাজধানী এথেন্সে স্থানান্তরিত হইলে বিজ্ঞান ও দর্শনের আবার দিক পরিবর্তন ঘটে। সক্রেটিস্ ও প্লেটো বস্তুবাদী দর্শন পরিত্যাগ করিয়া

* Benjamin Farrington, *Greek Science,* I; p. 78.

অধ্যাত্মবাদী প্রজ্ঞার দর্শন সৃষ্টি করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, সমস্ত জ্ঞানের উৎস মননশক্তি ও চিন্তাশক্তি। মননশক্তি ও চিন্তাশক্তির দ্বারাই মানুষের ও বস্তুজগতের সর্বপ্রকার সমস্যার ও রহস্যের সমাধান সম্ভবপর এবং এই শক্তির অধিকারী হইবার পক্ষে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ নিষ্প্রয়োজন। সক্রেটিস্ ও প্লেটোর জোরালো অধ্যাত্মবাদী, ভাববাদী ও মায়াবাদী দর্শনের চাপে আয়োনীয়দের বস্তুবাদ, প্রকৃতিবাদ, পরমাণুবাদ ও সর্বোপরি পর্যবেক্ষণের আদর্শ একে একে তলাইয়া গেল।

আয়োনীয়রা ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির মূলে ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য করিয়াছিল; প্লেটোর মতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। অ্যারিস্টটলের ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্বের মূলে রহিয়াছে 'Unmoved Mover', অর্থাৎ অচল চালক, স্বয়ং ভগবান যিনি ঐশ্বরিক নিয়মে গ্রহ ও জ্যোতিষ্কদের চালনা করিয়া থাকেন। প্লেটোর ব্রহ্মাণ্ডের সারবস্তু 'কস্‌মস্' সজীব,—মানবদেহ ও আত্মার সহিত তাহার প্রত্যক্ষ যোগ আছে। বস্তুজগৎ প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত নহে; ইহা প্রকৃতপক্ষে এক অদৃশ্য, দুর্জ্ঞেয়, অলৌকিক, অশরীরী আদ্যাশক্তির দ্বারা চালিত হইতেছে। তারপর ইন্দ্রিয়লব্ধ সত্য যে প্রকৃত সত্য নহে, প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করিতে হইলে যে চিন্তা, শুদ্ধবুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টির আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য, সে সম্বন্ধে প্লেটো বলেন,

> "If we are ever to know anything absolutely, we must be free from the body and behold the actual realities with the eye of the soul alone....while we live we shall be nearest to knowledge when we avoid, as far as possible, intercourse and communion with the body, except what is absolutely necessary, and are not infected by its nature, but keep ourselves free from it until God himself sets us free"—
>
> *Phaedo.*

অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, স্পর্শজনিত সর্বপ্রকার দেহানুভূতির উর্ধ্বে উঠিয়া একমাত্র আত্মার ঐশ্বরিক অন্তর্দৃষ্টিবলে যে কোন জিনিস সম্বন্ধে চরম ও সম্যক্ জ্ঞানলাভ সম্ভব। তাহা হইলে নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিয়া, রাত্রির পর রাত্রি গ্রহ-নক্ষত্রের গতি পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদের বিচিত্র ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা যে জ্ঞানলাভ করি, তাহার কি কোন মূল্য আছে? *Republic*-এ প্লেটো লিখিয়াছেন, এই উপায়ে লব্ধ জ্ঞান নিশ্চয়ই অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। জ্যোতিষ্কদের স্বরূপ, গতি, ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় একমাত্র বুদ্ধি ও ধীশক্তির দ্বারা বুঝিতে হইবে, পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নহে। জ্যামিতিতে যেমন প্রতিপাদ্যের অবতারণা করা হয়, জ্যোতিষেও সেইরূপ প্রতিপাদ্যের অবতারণা করিতে হইবে এবং বিশ্লেষণ ও বুদ্ধির দ্বারা সেই সব প্রতিপাদ্যের সমাধান নির্ণয় করিতে হইবে। দৃশ্যমান নক্ষত্র-জগৎ যেমন আছে থাকুক, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই।

ধ্বনি-বিজ্ঞানে ধ্বনির স্বরূপ ও সম্বন্ধ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে একদল বিজ্ঞানী তারের যন্ত্র লইয়া তাহাতে আঘাত করে, আর তারের কাছে কান পাতিয়া সেই ধ্বনি শোনে, প্লেটোর কাছে এই ব্যাপার নিতান্তই হাস্যকর। সক্রেটিসের মুখে তিনি বলাইলেন,—

> "You mean these gentlemen who tease and torture the strings and rack them on the pegs of the instrument.... they too are in error, like the astronomers; they investigate the numbers of the harmonies which are heard, but they never attain to problems."

আয়োনীয়রা অ্যানাকার্সিস্, গ্লাউকাস্, থিওডোরাস্ প্রমুখ কারিগরি শিল্পীর আবিষ্কারের উচ্চ মূল্য দিতেন। কারিগরিবিদ্যার প্রতি প্লেটোর যে শুধু অপরিসীম

অবজ্ঞাই ছিল তাহা নহে, কারিগর শ্রেণীর লোকের দ্বারা কোন কিছুর আবিষ্কার যে আদৌ সম্ভবপর তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। মাঝে মাঝে এই শ্রেণীর লোকেদেরও অবশ্য নূতন পদ্ধতি বা নূতন দ্রব্য-সামগ্রী আবিষ্কার করিতে দেখা যায়; প্লেটোর ধারণা ছিল, ঈশ্বরের কৃপায় ও অনুগ্রহে কখনও কখনও এইরূপ অঘটন সম্ভবপর হয়। সূত্রধর ভগবৎ কৃপায় মানসচক্ষে একদিন ঈশ্বর-নির্মিত একটি পালঙ্ক দেখিতে পাইয়াছিল বলিয়া সে ইহা নির্মাণে সফলকাম হইয়াছে। প্লেটো এইখানেই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি বস্তু ব্যবহার করে এবং বস্তু সম্বন্ধে যাহার প্রকৃত জ্ঞান আছে, আসলে সেই ব্যক্তিই এই বস্তুর নির্মাতা; যে কারিগর যন্ত্রপাতির সাহায্যে হাতে কলমে বস্তুটিকে তৈয়ারী করে, সে নয়।

বলা বাহুল্য, এই প্রকার মনোভাব বিজ্ঞানের অগ্রগতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। জ্যামিতি, গণিত এবং আংশিকভাবে জ্যোতিষ ছাড়া বিজ্ঞানের অন্য কোন বিভাগের গবেষণা প্লেটো আদৌ অনুমোদন করিতেন না। জ্যামিতি তাঁহার অতি প্রিয় গবেষণার বিষয় ছিল। তাঁহার একাডেমীর দ্বারদেশে লেখা থাকিত,—'জ্যামিতি না জানিলে এই পথে প্রবেশ নিষেধ।' প্লেটোর মতে আয়োনীয় গ্রীকদের প্রদর্শিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের আদর্শ অধার্মিক ও হীন, ইহা কারিগর, শ্রমিক প্রভৃতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকেদের আদর্শ। সভ্য ও শিক্ষিত গ্রীক নাগরিকের পক্ষে ইহা অশোভন।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, প্লেটো এইরূপ মনোভাব প্রচারে কেন উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার মত প্রতিভাবান ব্যক্তি এ পর্যন্ত পৃথিবীতে কয় জন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? ইহা কি সত্যই তাঁহার অন্তরের বিশ্বাস ছিল, না তৎকালীন সমাজ ও রাজনীতির অনিবার্য প্রয়োজনে তাঁহাকে এইরূপ মত ও দৃষ্টিভঙ্গী উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল? এই প্রশ্ন লইয়া বহু আলোচনা ও বিতর্ক আছে, তবে ইহার এক অন্যতম কারণ যে সামাজিক ও রাজনৈতিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা বুঝিতে হইলে তৎকালীন গ্রীক সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক ঘটনার সহিত অল্প-বিস্তর পরিচয় থাকা আবশ্যক।

সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ

মিশর ও ব্যাবিলনের প্রাচীন সভ্যতার আওতায় নানা বিদ্যা ও এক প্রকার বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার উৎপত্তির কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। প্রয়োজনের তাগিদে সেই বিদ্যার উদ্ভব এবং প্রধানতঃ কারিগরিবিদ্যার স্তরেই তাহা সীমাবদ্ধ। জ্যামিতি, গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসাবিদ্যা, জীববিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যার উদ্ভবও এই প্রেরণা হইতে। এই সব বিদ্যার চর্চা প্রধানতঃ নিবদ্ধ ছিল পুরোহিত সম্প্রদায়ের লোকেদের মধ্যে। সভ্যতা উন্মেষের এই প্রথম পর্বে জ্ঞান অপেক্ষা অজ্ঞানতাই ছিল সাধারণ ও ব্যাপক। কুশলী ও বুদ্ধিমান পুরোহিত সম্প্রদায় এই অজ্ঞানতাকে নানারূপ পৌরাণিক গল্প ও উপাখ্যানের অন্তরালে ঢাকিবার চেষ্টা করে। ইহার একটা বড় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। সমাজ জীবনের শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিবার গুরু দায়িত্ব পুরোহিত সম্প্রদায়ের উপর ক্রমশঃ ন্যস্ত হওয়ায়, ইহাদের অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বশে রাখিবার প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয়। পুরাণ ও কুসংস্কারের ব্যাপক আবহাওয়ার সৃষ্টির দ্বারা অজ্ঞতা-প্রসূত অন্ধ বিশ্বাসকে জিয়াইয়া রাখিতে না পারিলে এ কাজ যে তাহাদের সহজ হইবে না, বুদ্ধিমান পুরোহিতদের তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় নাই।

ব্যাবিলনে ও মিশরে এই নীতির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু কালসহকারে কুসংস্কারের বোঝা বাড়িয়া চিন্তাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং সকল প্রকার উদ্ভাবনী শক্তি লোপ পায়।

খৃঃ পূঃ ৭ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আয়োনীয় গ্রীকদের সমাজ ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। সভ্য পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে গ্রীকদের সবেমাত্র আবির্ভাব ঘটিয়াছে। নূতন জাতির

স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উপর তাহারা নূতন সমাজ ও সভ্যতা গড়িতে ব্যস্ত। মন্দির-প্রধান পুরোহিত-রাজ-শাসিত সমাজের দুষ্ট ব্রণ তখন পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করে নাই; সভ্যতার কুসংস্কার দানা বাঁধিবার অবসর পায় নাই।

আয়োনীয় উপনিবেশগুলির প্রাধান্যের মূলে ছিল ব্যবসায় ও বাণিজ্য। এজন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল বণিক সম্প্রদায়ের। বণিক সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের পূর্বে ধনী ভূমিদারদের সহিত ভূমিচ্যুত দরিদ্র কৃষকদের একটানা সংঘর্ষ লাগিয়াই ছিল। ব্যবসায় ও বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বহু লোকের জীবিকা সংস্থান হইলে এই সংঘর্ষের তীব্রতা হ্রাস পায় এবং শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যবসায় ও বাণিজ্যের সহিত দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির অঙ্গাঙ্গী যোগ লক্ষ্য করিয়া সোলন বাণিজ্যের ভিত্তিতে এথেন্সের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করিতে মনস্থ করেন। ইহার পূর্বে (ষষ্ঠ শতাব্দী) এথেন্সের উল্লেখযোগ্য কোন গুরুত্ব ছিল না, এবং সোলনের প্রচেষ্টার পর হইতেই এই নগরের প্রাধান্য সূচিত হয়। পঞ্চম শতাব্দীতে গণতান্ত্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত হইবার পূর্বেই আমরা দেখি, এথেন্স শিল্পে ও বাণিজ্যে গ্রীক-জগতের প্রধান নগর হিসাবে খ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। দরায়ুস ও জেরেক্সাস্-পরিচালিত দুর্ধর্ষ পারসিক বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করিতে এই শিল্পশক্তির অংশ বড় কম ছিল না।

দ্বিতীয় কারণ—এবং ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রধান, দাসপ্রথা গ্রীক সমাজ জীবনে তখন পর্যন্ত উগ্র আকারে আত্মপ্রকাশ করে নাই। সমাজে দাসশ্রেণী ছিল; কিন্তু এই শ্রেণীর সঙ্গে গ্রীক অভিজাত ও বণিক শ্রেণীর সহানুভূতির সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্কের জন্য দাসশ্রেণী হইতে উল্লেখযোগ্য কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয় নাই। সুতরাং ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উপর গুরুত্ব দান, সাধারণভাবে বণিক সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, দাসশ্রেণীর আনুগত্য এবং সব মিলিয়া শান্তি ও শ্রীবৃদ্ধির আবহাওয়া এমন একটি সহজ, সরল ও প্রগতিশীল সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল যাহা স্বভাবতঃই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির অনুকূল।

এই সামাজিক পরিবেশ দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। পারসিক আক্রমণের ফলে এসিয়া মাইনরের উপকূলবর্তী আয়োনীয় গ্রীকদের উপনিবেশগুলিতে নানারূপ রাজনৈতিক গোলযোগ ও বিশৃংখলা দেখা দেয়। বহু বিশিষ্ট আয়োনীয় দার্শনিক ও বিজ্ঞানী জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া গ্রীসের মূল ভূখণ্ডে অথবা দক্ষিণ ইতালীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ম্যারাথন, থার্মোপাইলি, স্যালামিস্ ও প্ল্যাটির পরে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও উপদ্রবের আশংকা কমিল বটে, কিন্তু আত্মঘাতী পেলোপোনেশীয় গৃহযুদ্ধের অনিবার্য কারণে গ্রীক সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অবসন্নতা আসিয়া পড়িল। ষড়যন্ত্র, চাতুরী, বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তহত্যা ইত্যাদি ঘৃণ্য উপায়ে ক্ষমতা হস্তগত করিবার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে রাজনৈতিক আবহাওয়া দূষিত ও কলুষিত হইল এবং সমাজের যত ক্লেদ ও গ্লানি একে একে মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। ন্যায়পরায়ণতা, নীতিবোধ, সত্যানুরাগ প্রভৃতি সদ্‌গুণে সাধারণ মানুষের সংশয় উপস্থিত হইল। ঐতিহাসিক থুসিডাইডস্ (খৃঃ পূঃ ৪৬০-৪০০) পেলোপোনেশীয় যুদ্ধের সময় গ্রীক সমাজের অধঃপতনের কথা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

এইরূপ অবস্থায় নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি-সাধনের মাধ্যমে সমাজে শৃংখলা ফিরাইয়া আনিবার সমস্যা যে সক্রেটিসের নিকট সর্বাপেক্ষা জরুরী বলিয়া প্রতিভাত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। তিনি বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, ইহার কল্পনামূলক চিন্তাধারার মধ্যে সামাজিক সমস্যা সমাধানের কোনরূপ ইঙ্গিত বা আভাস নাই। আয়োনীয় গণিত, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, সৃষ্টিতত্ত্বের প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা ও পরমাণু-বাদের মধ্যে সমাজ-সংস্কারের কোন উপায়ের নির্দেশ ত নাই-ই, বরং এই জাতীয় শিক্ষার মধ্যে অধিকতর সংশয় ও বিভ্রান্তির বীজ প্রচ্ছন্ন আছে। সক্রেটিসের যুক্তি হইল, বিশুদ্ধ

সমাজ-সৃষ্টি শুদ্ধচেতা ব্যক্তির সমন্বয় ছাড়া সম্ভবপর নয়। ব্যক্তি ভাল হইলে সমাজও ভাল হইবে। সুতরাং ভাল মন্দ, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যাসত্য প্রভৃতি বিষয়ের চরম মান নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। বাহ্য অনুভূতির সাহায্যে এই মান নিরূপণ সম্ভব নহে; শুদ্ধবুদ্ধি ও আত্মদর্শন এই প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভের একমাত্র উপায়। তাই তিনি মনের ও আত্মার প্রাধান্য প্রচারে যত্নবান হইলেন, বহির্জগৎ হইতে অন্তর্জগতে মানুষের মনকে সমাহিত করিবার চেষ্টা করিলেন।

রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃংখলা ছাড়া এই সময়ের আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হইল দাসপ্রথার ব্যাপক প্রসার। প্রথমযুগে ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল অল্প; রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতদাসের সংখ্যাও দ্রুতগতিতে বাড়িয়া যায়। তারপর কর্ম ও জীবিকার সন্ধানে বহু বিদেশীর আমদানি হইল। কিন্তু কর্ম সবার মিলিল না। বহুসংখ্যক বেকার বিদেশী ও ক্রীতদাস বাধ্য হইয়া ভবঘুরেবৃত্তি অবলম্বন করিল। এইভাবে ক্রমবর্ধমান ভবঘুরেদের সংখ্যা চিন্তাশীল ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের রীতিমত শিরঃপীড়ার ও শংকার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। প্লেটোর সমসাময়িক আইসোক্রেটিস্ এই ভবঘুরে ভিক্ষুকদের সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করেন এবং স্পষ্ট উপলব্ধি করেন যে, ভবঘুরে ভিক্ষুকদের কাজে নিয়োজিত করিয়া জীবনধারণের একটা সন্তোষজনক ব্যবস্থা করিতে না পারিলে ইহাদের হাতে গ্রীক সমাজ ও রাষ্ট্রিক জীবন বিপন্ন হইবার যথেষ্ট আশংকা আছে। তিনি লিখিয়াছেন:

> "If we cannot check the growing strength of these vagabonds by providing them with a satisfactory life, before we know where we are they will be so numerous that they will constitute as great a danger to the Greeks as to the barbarians."

প্লেটো ক্রীতদাস-সমস্যার তীব্রতা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন। তিনি ক্রীতদাস-প্রথার শুধু সমর্থকই ছিলেন না, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে স্বাভাবিক নিয়মে এই প্রথার উদ্ভব হইয়াছে। *Republic* ও *Laws*-এ আদর্শ রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনে তিনি যেসব পরামর্শ দেন, তাহাতে ক্রীতদাস-প্রথাকে কায়েম করিবার চেষ্টাই দেখা যায়। ক্রীতদাস-শ্রেণী হইতে শাসক সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে সর্বগুণসম্পন্ন গ্রীক নাগরিকের পরিকল্পনা। কায়িক শ্রমসাধ্য সকল রকম কাজের বোঝা ক্রীতদাসের উপর চাপানো হইল, আর এই বোঝা হইতে মুক্ত অবসরভোগী নাগরিকদের দায়িত্ব হইল শাসনকার্য পরিচালনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন চর্চা।

অ্যারিস্টট্‌ল্ ক্রীতদাস-প্রথাকে আরও সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা করেন। এমন কি তিনি এই প্রথার সমর্থনে প্রাণিজগৎ হইতে নজির টানিয়া একপ্রকার বৈজ্ঞানিক যুক্তি পর্যন্ত প্রদর্শন করেন। প্রাণিজগতে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের প্রভেদ আছে, এই প্রভেদ প্রকৃতিগত। মানুষ ও জন্তুর মধ্যে প্রভেদ বর্তমান; মানুষের মধ্যে আবার পুরুষজাতি হইতে স্ত্রীজাতি ভিন্ন। সেইরূপ একই মনুষ্য-জাতির মধ্যে আবার স্বাধীন নাগরিক ও পরাধীন ক্রীতদাসের মধ্যে প্রভেদ আছে। এই প্রভেদের জন্য যখন এক শ্রেণী উৎকৃষ্ট ও অপর শ্রেণী নিকৃষ্ট হইতে দেখা যায়, তখন উভয়ের কল্যাণের জন্যই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর উপর নিকৃষ্ট শ্রেণীর শাসনভার ন্যস্ত থাকা উচিত।*

* ". . . . . .the antithesis of superior and inferior is found everywhere in nature—between soul and body, between intellect and appetite, between man and the animals, between male and female, and that where such a difference between two things exists it is to the advantage of both that one should rule the other. Nature tends to produce such a distinction between men—to make

কায়িক শ্রমসাধ্য কাজ হইতে নাগরিকদের ত নিষ্কৃতি দেওয়া হইল; কিন্তু এইবার তাহাদের জীবনকে সুষ্ঠুভাবে বিধিবদ্ধ করা যায় কিরূপে? জীবনের আসল উদ্দেশ্য কি হইবে? *Laws*-এর এক জায়গায় প্লেটো এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"আমাদের নাগরিকদের কায়িক পরিশ্রমের দায় হইতে অব্যাহতি দিবার চমৎকার ব্যবস্থা আমরা এখন করিয়াছি, কারিগরি ও শিল্প সম্বন্ধীয় কাজ অন্যের উপর চাপানো হইয়াছে, কৃষিকার্য চাপানো হইয়াছে ক্রীতদাসদের উপর। এইসব কাজের বিনিময়ে তাহাদের নিকট হইতে আমরা যাহা পাইব তাহাতে উপযুক্তভাবে ও স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত আমাদের দিন কাটিবার কথা। কিন্তু সমস্যা হইতেছে, আমাদের জীবনকে আমরা সুনিয়ন্ত্রিত করিব কি প্রকারে।"

এই সমস্যার সমাধান সহজে হইল না। সমগ্র গ্রীস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য কিছুদিনের জন্য বজায় রাখিতে কৃতকার্য হইয়াছিল বটে; কিন্তু ক্রীতদাস-প্রথা ক্ষয়রোগের মত ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া রাষ্ট্রশক্তিকে পঙ্গু করিয়া ফেলে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ইহার ফল অনুভূত হইয়াছিল।

some strong to work and others fit for political life. Thus some men are by nature free, and others slaves". W. D. Ross, *Aristotle,* Methuen & Co., London, 1923; p. 241.

পঞ্চম অধ্যায়

৫·১। জ্ঞান-বিজ্ঞানে এথেন্স—প্লেটো ও অ্যারিস্টট্‌লের কাজ

রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অন্যবিধ কারণে সমগ্র আয়োনিয়ার বিশেষতঃ পিথাগোরীয় ভ্রাতৃসঙ্ঘের জ্ঞান-চর্চা যখন মহা সঙ্কট ও অবনতির মুখে, নূতন নগর-রাষ্ট্র এথেন্স তখন বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর আসন প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যস্ত। ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা উঠিলে ভূমধ্য-সাগরীয় জগৎ মাইলেটাস্, কস্, ইলিয়া, ক্রোটন, ট্যারেণ্টাম প্রভৃতি জনপদের বিখ্যাত বিদ্যাপীঠগুলি ও তৎসংশ্লিষ্ট দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের স্মরণ করিত। চতুর্থ শতাব্দীতে এথেন্স ও তাহার সুযোগ্য দার্শনিক ও বিজ্ঞানিগণ এই মর্যাদার অধিকারী হয়। সক্রেটিস, প্লেটো, ইউডক্সাস্, অ্যারিস্টট্‌ল্, হেরাক্লিডিস্, থিওফ্রেস্টাস্ প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের কর্মভূমি এবং একাডেমী ও লাইসিয়ামের মত সর্বকালের দুই শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তনের আবাসভূমি এথেন্স যে এই সময়ে জ্ঞান-গরিমার পুরোভাগে অবস্থান করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

জ্ঞান-জগতে এথেন্সের এই প্রতিষ্ঠার মূলে রহিয়াছে তাহার রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ও প্রতিপত্তি। পূর্বে পারস্য সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান প্রতাপ, গ্রীসের মূল ভূখণ্ডের প্রতি তাহার লোলুপ দৃষ্টি, ম্যারাথন, থার্মোপাইলি ও স্যালামিসের যুদ্ধে পারসিকদের অপ্রত্যাশিত ভাগ্য-বিপর্যয় প্রভৃতি ঘটনাস্রোতের মধ্য দিয়া গ্রীকরা রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনের যে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, এথেন্সের অভ্যুত্থান তাহার এক প্রধান কারণ। ডেলস্ দ্বীপের এক আন্তঃরাষ্ট্রীয় সভায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কালসহকারে এথেন্সবাসীদের তৎপরতায় এই সব ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রের প্রতিপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি ধীরে ধীরে কেন্দ্রীভূত হয় এথেন্সে। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাধনা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্যের অনুগামী, এই সত্য ইতিহাসে বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে। এথেন্স এই সত্যের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৫·২। গণিত ও জ্যোতিষ

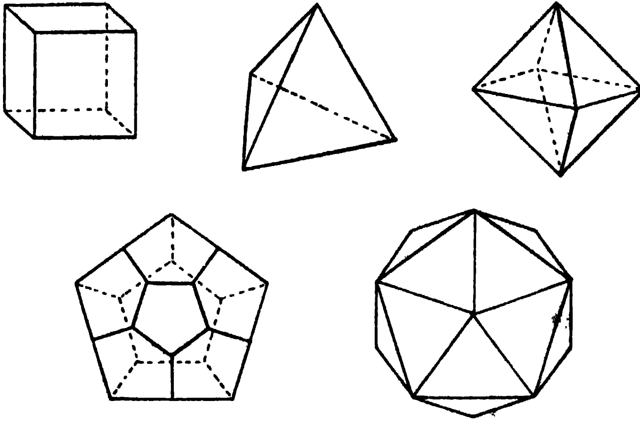
প্লেটো (খ্রীঃ পূঃ ৪২৮-৩৪৮)

গ্রীক বিজ্ঞানের উপর প্লেটোর প্রভাব সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিয়াছি। সাধারণভাবে তাঁহার প্রভাব বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে বিশেষ শুভ হয় নাই, সে কথা অত্যুক্তি নহে। তৎসত্ত্বেও প্লেটোর বৈজ্ঞানিক অবদান উপেক্ষণীয় নহে। তিনি নিজে একজন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ ছিলেন। গণিতে তাঁহার গভীর অনুরাগ এবং গাণিতিক গবেষণার উন্নতি-কল্পে তাঁহার প্রচেষ্টা নানাভাবে ফলপ্রসূ হইয়াছিল। তাঁহার সমসময়ের বা অব্যবহিত পরবর্তীকালের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই ছিলেন তাঁহার বিদ্যাপীঠের ছাত্র।

আনুমানিক খ্রীঃ ৪২৮ পূর্বাব্দে এথেন্সে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সক্রেটিসের প্রিয় শিষ্য ও বন্ধু। দর্শনে সক্রেটিসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেও গণিতে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য তিনি পিথাগোরীয়দের নিকট ঋণী। সক্রেটিসের মৃত্যুর পর কিছুকাল দেশভ্রমণে অতিবাহিত করিবার সময় সাইরেনে থিওডোরাস্ নামক জনৈক গণিতজ্ঞের নিকট তিনি গণিত অধ্যয়ন করেন। কিছুকাল দক্ষিণ ইতালী ও সিসিলিতেও তাঁহার অবস্থানের কথা জানা যায় এবং সম্ভবতঃ এই সময়ে পিথাগোরীয়দের সহিত গণিত অধ্যয়ন ও আলোচনার বিশেষ সুযোগ লাভ তাঁহার ঘটিয়াছিল। ট্যারেণ্টামের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ আর্কিটাসের সহিত

পরিচয় তাঁহার এই সময়ে। প্লেটোর গণিত যে মূলতঃ পিথাগোরীয় গণিতের সম্প্রসারণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

জ্যামিতিঃ নূতন প্রতিপাদ্য বা দুরূহ গাণিতিক প্রশ্নের সমাধান আবিষ্কারের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে অবশ্য সেইরূপ কোন মৌলিক অবদানের পরিচয় প্লেটোর গবেষণায় পাওয়া যায় না। তিনি বিন্দু, রেখা, তল, ঘন প্রভৃতি জ্যামিতিক ধারণার নিখুঁত ও নির্ভুল সংজ্ঞা প্রদান করেন। পিথাগোরীয়রা বিন্দুকে 'অবস্থানের একক' (unity of position) বলিয়া মনে করিত; প্লেটো বলেন, বিন্দুতে রেখার আরম্ভ, বিন্দু বাস্তবিক পক্ষে একটি অদৃশ্য রেখা। সেইরূপ রেখা হইল প্রস্থহীন দৈর্ঘ্য। ইউক্লিডের জ্যামিতিতে প্লেটোর এইরূপ সংজ্ঞারই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়।



৬৯। প্লেটোর পাঁচ প্রকার সমঘন।

প্লেটো পাঁচ প্রকার সমঘনর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অনেকের ধারণা, ইহা তাঁহারই আবিষ্কার। অন্ততঃ পাঁচ প্রকার সমঘনকে বহুদিন পর্যন্ত 'প্লেটোর সমঘন' নামে অভিহিত করা হইত। জ্যামিতিতে তাঁহার আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান বিশ্লেষণ-পদ্ধতির প্রয়োগ। বিশ্লেষণের সাহায্যে বহু জ্যামিতিক সমস্যার সমাধান যে সম্ভবপর ইহা তিনি দেখান। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ চিওসের হিপোক্রেটিস্ (চিকিৎসক হিপোক্রেটিস্ নহেন; ইঁহার কার্যকাল আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৪৩০ অব্দ) অজ্ঞাতসারে প্লেটোর বিশ্লেষণ-পদ্ধতি তাঁহার বহু সমাধানে প্রয়োগ করেন।

একটি ঘনর দ্বিগুণ আয়তনের আর একটি ঘন রচনা করিবার কঠিন জ্যামিতিক সমস্যাটি নাকি প্লেটো সমাধান করেন। গ্রীক জ্যামিতিতে ইহা 'Duplicating the Cube' বা 'ঘনর দ্বিগুণীকরণ' সমস্যা নামে খ্যাত। বহু গণিতজ্ঞ সমস্যাটির সমাধানে নাজেহাল হইয়াছেন। সম্ভবতঃ নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে তিনি ইহার সমাধানে অগ্রসর হন।

৭০নং চিত্রে ABC, BCD, APB, BPC ও CPD সমকোণ। ১, ২ ও ৩ চিহ্নিত কোণগুলি যথাক্রমে সমান। সুতরাং APB, BPC ও CPD ত্রিভুজত্রয় সদৃশ। এখন সদৃশ ত্রিভুজের ধর্ম হইতে আমরা অনায়াসে দেখাইতে পারি যে,

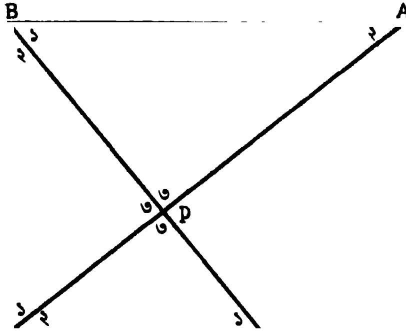
$$\frac{PA}{PB}=\frac{PB}{PC}=\frac{PC}{PD};$$

$$\left(\frac{PA}{PB}\right)^{৩}=\frac{PA}{PB}\times\frac{PB}{PC}\times\frac{PC}{PD}=\frac{PA}{PD}$$

এখন PA যাহাতে PDর দ্বিগুণ হয়, এইরূপভাবে অঙ্কনটি করিতে পারিলে,

$$\left(\frac{PA}{PB}\right)^3=2\,;\ PA^3=2PB^3$$

অর্থাৎ PA বাহুর সমান করিয়া অঙ্কিত ঘনর আয়তন PB বাহুর সমান করিয়া অঙ্কিত ঘনর আয়তনের দ্বিগুণ। কম্পাস ও মাপনীর সাহায্যে এইরূপ অঙ্কন অবশ্য সম্ভবপর নয়; প্রায়োগিক পদ্ধতিতে PD ও PA-এর দৈর্ঘ্য স্থির করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।



৭০।

জ্যোতিষঃ প্লেটোর জ্যোতিষ ও ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনা অনেক নিম্নস্তরের। ইহার কারণ জ্যোতিষ-চর্চার উপর তিনি কখনও তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তিনি পৃথিবীর গোলাকৃতি ও ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে ইহার অবস্থান স্বীকার করেন। গ্রহ-নক্ষত্রদের লইয়া গোটা নভোমণ্ডল একসঙ্গে পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইয়া থাকে। পৃথিবী হইতে চন্দ্র, সূর্য, শুক্র, বুধ, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির দূরত্বের অনুপাত হইল ১, ২, ৩, ৪, ৮, ৯ ও ২৭।

প্রাকৃতিক দর্শনঃ প্লেটো মনোজগৎ লইয়াই বিভোর ছিলেন বেশী, বস্তুজগৎ সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। যেসব বিচিত্র অনুভূতি আমাদের মনে রেখাপাত করে তাহা হইতেই প্রকৃত জ্ঞানলাভ সম্ভবপর, তিনি এইরূপ মনে করিতেন। এই মনই একমাত্র সত্য। বাহ্যজগৎ মনের এক প্রতিবিম্বস্বরূপ। মানুষ কতকগুলি অন্তর্জাত ধারণা লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। বস্তুর কাঠিন্য, বর্ণ, গোলাকৃতি ইত্যাদি এই জাতীয় ধারণা। অন্তর্জাত এই সব ধারণাকে প্লেটো বলেন 'আকৃতি' বা 'Form'। আমরা বলি, একটি কঠিন লাল বল দেখিতেছি। ইহার অর্থ এই যে, কাঠিন্য, লোহিত বর্ণ, গোলাকৃতি প্রভৃতি যে সব ধারণা বা আকৃতি পূর্ব হইতেই আমাদের মনে বিরাজ করিতেছে, বাহিরের বস্তুটিকে দেখিবামাত্র এই সব ধারণার সহিত খাপ খাওয়াইবার চেষ্টায় মনের মধ্যে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয় তাহাই আমরা মুখে এইভাবে প্রকাশ করি। বাহিরের বস্তু মানসপটে বিরাজমান এই নিখুঁত আকৃতির সহিত কখনও সম্পূর্ণভাবে মিলিতে পারে না, কারণ বস্তুজগৎ অসম্পূর্ণ ও ত্রুটীবহুল। কাগজের উপর অঙ্কিত বৃত্ত যেমন কখনই মানসপটে অঙ্কিত নিখুঁত বৃত্তের মত হইতে পারে না, ইহাও অনেকটা সেইরূপ। প্লেটো মনে করিতেন, সত্য সম্পূর্ণভাবে নিখুঁত ও ত্রুটীহীন। সুতরাং মনের এই আকৃতিগুলিই শাশ্বত সত্য। ত্রুটীবহুল অনিত্য বস্তুজগৎ শাশ্বত সত্য নহে।

প্লেটোর আকৃতিবাদের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা এই যে, মানুষের মনে বস্তু সম্বন্ধীয় ধারণা স্বভাবজ, এই সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য নহে। মানুষ অভিজ্ঞতার দ্বারা এইরূপ ধারণা

লাভ করে। যে ব্যক্তি জন্মান্ধ বস্তুর রং সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণা থাকে না। বধির সেইরূপ ধ্বনিবৈচিত্র্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্বিকার। যাহা হউক, সে আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

অনিত্য ত্রুটীবহুল বস্তুজগৎ হইতে মনোজগতে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিবার ফলে প্লেটো উপলব্ধি করেন, সত্য, শিব ও সুন্দরের অনুসন্ধানই জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই মানুষের মনের নানা গুণ ও ধর্ম বুঝিবার দিকে তিনি বিশেষ মনোযোগী হন। উচ্চতর মননশীলতার সহায়ক হিসাবে তিনি গাণিতিক গবেষণায় আকৃষ্ট হন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, তিনি বস্তুবাদী আণবিক তত্ত্বের সমর্থকদের একেবারেই সহ্য করিতে পারিতেন না। তাহাদের তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। অণু-পরমাণুর সাহায্যে বস্তুজগতের ব্যাখ্যা-প্রদানের চেষ্টা কোন মতে বরদাস্ত করিলেও মানুষের মনের নানা গুণ,—যেমন মনুষ্যত্ব, সৌন্দর্যবোধ, স্নেহ, মমতা ইত্যাদি, সেই একই পরমাণুর সাহায্যে ব্যাখ্যা করিবার স্পর্ধাকে তিনি ক্ষমা করিতে পারেন নাই। প্লেটো তাঁহার ভুরি ভুরি রচনার কোথাও ডিমোক্রিটাসের নাম উল্লেখ করেন নাই। শুধু একবার ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। সে ক্ষেত্রে তিনি লেখেন যে, ডিমোক্রিটাসের সমস্ত গ্রন্থ অবিলম্বে পোড়াইয়া ফেলা উচিত।

ইউডক্সাস্ (খ্রীঃ পূঃ ৪০৮-৩৫৫)

ইউডক্সাসের জন্মস্থান স্নাইডাস। তিনি আর্কিটাসের নিকট জ্যামিতি ও প্লেটোর নিকট দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করেন। ডিয়োজেনিস্ লের্টিয়াস্ লিখিয়াছেন, জ্যামিতি, জ্যোতিষ, ভূগোল ও চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও খ্যাতি ছিল। মৌলিকতার দিক দিয়া বিচার করিলে, জ্যামিতিতে একমাত্র আর্কিমিডিস্ ছাড়া আর কোন প্রাচীন গণিতজ্ঞ তাঁহার সহিত তুলনীয় নহেন। জ্যামিতির সাহায্যে তিনি যে ভূকেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনা রচনা করেন পরবর্তীকালে তাহাকে ভিত্তি করিয়াই হিপার্কাস্-টলেমীর ভূকেন্দ্রীয় জ্যোতিষ উদ্ভূত হয়। জর্জ সার্টন ইউডক্সাস্‌কে 'the greatest mathematician and astronomer of his time; one of the greatest of all times' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।*

বিদ্যাচর্চার উদ্দেশ্যে ইউডক্সাস্ বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি ২৩ বৎসর বয়সে এথেন্সে আসেন এবং এই সময় প্লেটোর দর্শন সম্বন্ধীয় বক্তৃতা ও আলোচনায় নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকিতেন। এথেন্সে আসিবার পূর্বে তিনি ইতালী ও সিসিলিতে আর্কিটাসের নিকট জ্যামিতি এবং ফিলিষ্টিওনের নিকট চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। আনুমানিক খ্রীঃ ৩৮১-৮০ পূর্বাব্দে তিনি মিশর পরিভ্রমণ করেন। নীলনদের দেশে প্রায় দেড় বৎসর তিনি মিশরীয় পুরোহিতদের সহিত বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র আলোচনায় অতিবাহিত করেন। মিশর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর সাইজিকাস নামে এক স্থানে তাঁহার এক চতুষ্পাঠী স্থাপনের কথা জানা যায়। খ্রীঃ ৩৬৮ পূর্বাব্দে এথেন্সে তিনি এই চতুষ্পাঠী স্থানান্তরিত করেন।

মিশরে অবস্থানকালে পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতিষ-চর্চায় তিনি উৎসাহী হন। হেলিওপোলিসের নিকট এক মানমন্দিরে তিনি নিজেও কিছুকাল জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণে ব্যাপৃত থাকেন। ইউডক্সাসের সময় এই মানমন্দিরটির বিশেষ সুনাম ছিল। পরে এই মানমন্দিরের অনুকরণে স্নাইডাসে তিনি একটি মানমন্দির স্থাপন করেন। অগস্ত্য নক্ষত্র সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি পর্যবেক্ষণ এই মানমন্দিরে গৃহীত হয়।

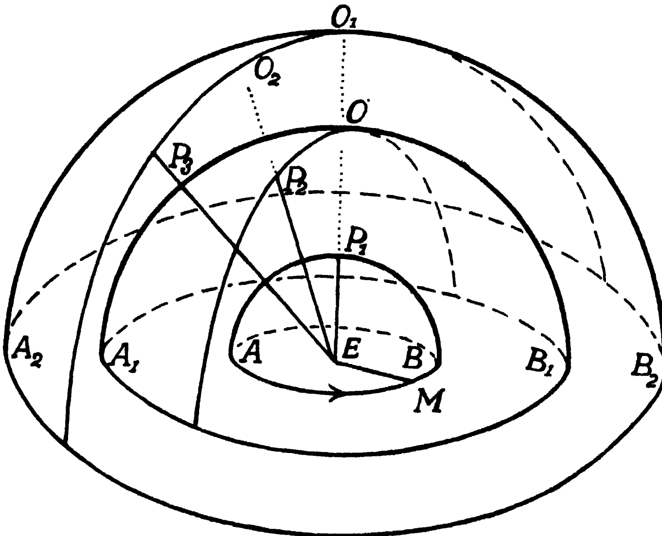
জ্যামিতিঃ ইউডক্সাস্-রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে *Mirror* ও *Phaenomena* বিশেষ

* G. Sarton, *Introduction to the History of Science*, Vol. 1; p. 117.

উল্লেখযোগ্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ জ্যামিতির উপর রচিত তাঁহার কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পরবর্তীকালের গণিতজ্ঞদের রচনায় তাঁহার উল্লেখ হইতে জ্যামিতিতে তাঁহার জ্ঞান যে কিরূপ গভীর ছিল তাহা বুঝা যায়। ইউক্লিডের *Elements*-এর পঞ্চম খণ্ডে ইউডক্সাসের জ্যামিতিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সমানুপাতের নিয়ম (theory of proportion) ও নিঃশেষীকরণ পদ্ধতি (method of exhaustion) আবিষ্কার করেন। এই শেষোক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া তিনি বৃত্তের ক্ষেত্র, পিরামিড, শঙ্কু ও গোলকের আয়তন ও বহির্ভাগের ক্ষেত্র নির্ণয় করিতে সমর্থ হন। আর্কিমিডিস্ এই পদ্ধতির আরও পরিবর্ধন ও সম্প্রসারণ সাধন করিয়া নানাবিধ ঘনবস্তুর আয়তন নির্ণয় করেন।

জ্যোতিষ: গ্রহদের আপাত-আবর্তন সম্বন্ধে ইউডক্সাসের জ্যামিতিক ব্যাখ্যা সুপ্রসিদ্ধ। এই ব্যাখ্যার মূল কথাকে অব্যাহত রাখিয়া হিপার্কাস্ ও টলেমী ব্রহ্মাণ্ডের যে পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন, কোপার্নিকাসের সময় পর্যন্ত তাহাতে কেহ সন্দেহ প্রকাশ করে নাই। অ্যারিস্টট্লের *Metaphysics* গ্রন্থ, তাঁহার *De caelo*-র উপর সিম্প্লিসিয়াসের টীকা ও শিয়াপারেলির নিজস্ব গবেষণা ও রচনাদি হইতে ইউডক্সাসের জ্যোতিষীয় পরিকল্পনা ও ধারণার কথা জানা যায়। বস্তুতপক্ষে, প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে ইউডক্সাসের বিক্ষিপ্ত গবেষণা উদ্ধার করিয়া সুসম্বদ্ধ রূপ প্রদান করিবার কৃতিত্ব সম্পূর্ণ শিয়াপারেলির।*

এককেন্দ্রীয় স্ফটিক-গোলক, ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনা: গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তনের জন্য ইউডক্সাস্ বৃত্তাকারের গতিই যথেষ্ট মনে করেন। তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে এককেন্দ্রীয়



৭১। ইউডক্সাস্-পরিকল্পিত এককেন্দ্রীয় স্ফটিক-গোলকের সাহায্যে গ্রহ-গতির ব্যাখ্যা।

অনেকগুলি স্ফটিক-গোলকে (concentric crystal spheres) ভাগ করেন। পৃথিবী এই সব গোলকের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। স্ফটিক-গোলকেরা যে কোন একটি ব্যাসকে অক্ষ

* Schiaparelli, 'Le sfere Omocentriche di Eudosso, di Callippo e di Aristotele', *Pubblicazioni del R. Osservatorio di Brera,* Milan, 1875,

করিয়া আবর্তিত হইতেছে। গ্রহরা এক একটি গোলকের নিরক্ষ বৃত্তের একটি বিন্দুর সহিত সংলগ্ন থাকে; সুতরাং নিজ নিজ গোলকের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা পৃথিবীকেও বৃত্তাকারে পরিক্রমণ করিয়া বেড়ায়। এইরূপ হইলে গ্রহদের গতি অতি সহজ ও সরল হইবার কথা। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, গ্রহদের গতি আদৌ এইরূপ সহজ-সরল নহে, ইহা রীতিমত জটিল ও খাপ্ছাড়া। এই জটিল ও খাপ্ছাড়া গতি বুঝাইবার জন্য ইউডক্সাস্ বলেন, নিজ নিজ গোলকের আবর্তন-গতি ছাড়া গ্রহদের উপর একাধিক অন্যান্য গোলকের আবর্তন-গতির প্রতিক্রিয়াও হইয়া থাকে। বিভিন্নভাবে আবর্তনশীল একাধিক গোলকের আবর্তন-গতি একই কালে গ্রহদের গতি নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকিলে তাহাদের গতি যে অতিশয় জটিল হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এখন প্রশ্ন হইল, কিভাবে এই প্রতিক্রিয়া ঘটিয়া থাকে।

এই প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ বুঝানো খুবই কঠিন। চিত্রের সাহায্যে ইহা কতকটা সহজসাধ্য হইতে পারে। মনে করা যাক M গ্রহটি P1AB গোলকের নিরক্ষবৃত্তের একটি বিন্দুর সহিত সংলগ্ন। EP1 এই গোলকের অক্ষ এবং P1 হইল একটি মেরু। ইউডক্সাস্ বলেন EP1 অক্ষটি স্থির থাকে না, ইহা আর একটি এককেন্দ্রীয় গোলক OA1B1-এর সহিত সংযুক্ত। ৭১নং চিত্রে আমরা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, এই দ্বিতীয় গোলক OA1B1 আবর্তিত হইতেছে অপর একটি অক্ষ EP2-র চতুর্দিকে। এইরূপ আবর্তনের ফলে প্রথম গোলকটির অক্ষও আবর্তিত হইবে এবং সেই আবর্তনের গতি M গ্রহের গতিকেও প্রভাবান্বিত করিবে। তারপর দ্বিতীয় গোলক OA1B1-এর অক্ষ EP2-ও স্থির নহে; ইহা আবার আর একটি গোলক O1A2B2-এর সহিত সংযুক্ত। এই তৃতীয় গোলকের অক্ষ হইতেছে EP3। সুতরাং এই তৃতীয় গোলকের আবর্তন প্রথমে দ্বিতীয় গোলকের ও তাহার মারফত প্রথম গোলকের আবর্তন-গতিকে প্রভাবান্বিত করিবে। এইরূপ তিন ধরনের গতির সমন্বয়ে গ্রহের গতি হইবে অতিশয় জটিল। পর্যবেক্ষণের সময় গ্রহদের এইরূপ জটিল গতিই আমরা লক্ষ্য করি।

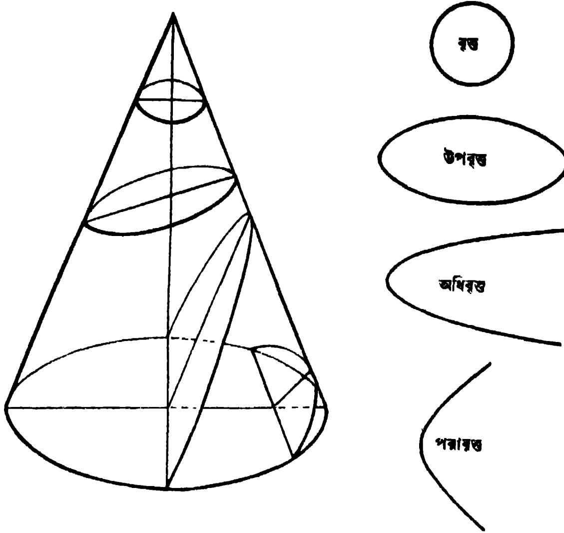
ইউডক্সাস্ চন্দ্রের গতি বুঝাইতে তিনটি গোলকের, সূর্যের ক্ষেত্রে তিনটি এবং অবশিষ্ট প্রত্যেক গ্রহের ক্ষেত্রে চারিটি করিয়া গোলকের অবতারণা করেন। স্থির নক্ষত্রের গতি বুঝাইতে অবশ্য একটি গোলকই যথেষ্ট। অর্থাৎ তাঁহার মতে ২৭টি স্ফটিক-গোলকের সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় গ্রহ ও জ্যোতিষ্কের সকল প্রকার গতির ব্যাখ্যা সম্ভবপর।

সমগ্র পরিকল্পনাটি একটি বিশুদ্ধ জ্যামিতিক সমস্যা-সমাধানের প্রচেষ্টা বিশেষ। সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যামিতিবিশারদ ব্রহ্মাণ্ডকে একটি জ্যামিতিক ছকে সাজাইয়াই যে পরিতৃপ্ত হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্যের কি? আবর্তন-গতির কারণ কি, এই গতি এক গোলক হইতে আর এক গোলকের উপর কিরূপে কার্য করে, স্ফটিক-গোলকেরই বা স্বরূপ কি ইত্যাদি নানা মৌলিক প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি নির্বাক রহিলেন।

খৃঃ ৩৫৫ পূর্বাব্দে ইউডক্সাসের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর মেনেক্মাস্, কালিপ্পাস্, পলিমার্কাস্ প্রমুখ কয়েকজন গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্ ইউডক্সাসের জ্যোতিষীয় পরিকল্পনার অল্প বিস্তর পরিবর্তন সাধন করেন। এ সম্বন্ধে কালিপ্পাসের (খৃঃ পূঃ ৩৭০-৩০০) নাম উল্লেখযোগ্য। গ্রহ-নক্ষত্রের গতি সম্বন্ধে তিনি উন্নত ধরনের কয়েকটি পর্যবেক্ষণ গ্রহণ করেন। এই পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেল, গ্রহদের গতির সকল জটিলতা ২৭টি স্ফটিক-গোলকের সাহায্যে সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না, আরও কয়েকটি গোলকের অবতারণা করা প্রয়োজন। তিনি যে ব্যাখ্যা প্রস্তাব করেন তাহাতে মোট ৩৪টি গোলকের আবশ্যক হইয়াছিল।

মেনেক্‌মাস্‌ (খ্রীঃ পূঃ ৩৭৫-৩২৫)

কনিক জ্যামিতিঃ কনিক জ্যামিতির আবিষ্কারক হিসাবে বিজ্ঞানের ইতিহাসে মেনেক্‌-মাসের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। একটি শঙ্কুকে বিভিন্নভাবে ছেদ করিলে ছিন্নস্থানে বিভিন্ন আকারের ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়। ছেদনের পার্থক্য হেতু এই ক্ষেত্র বৃত্ত, উপবৃত্ত (ellipse), অধিবৃত্ত (parabola) অথবা পরাবৃত্তের (hyperbola) আকার ধারণ করিয়া থাকে। অক্ষের লম্বভাবে শঙ্কুকে ছেদন করিলে বৃত্তের উদ্ভব হইবে; অক্ষের ঠিক লম্বভাবে না হইয়া যদি একটু বাঁকাভাবে শঙ্কুকে ছেদন করা যায় তবে একটি উপবৃত্তের উদ্ভব হইবে; শঙ্কুর বাহুর সমান্তরালভাবে ছেদন করিলে অধিবৃত্তের সৃষ্টি হইবে, ইত্যাদি। চিত্রে ইহা দেখানো হইল।



৭২।

মেনেক্‌মাস্‌ কনিক রেখার গুণাগুণ আলোচনা করেন। এই গবেষণা ও আলোচনা হইতে যে নূতন কনিক জ্যামিতির উদ্ভব হইল তাহার মূল্য বিজ্ঞানীরা বহুদিন পর্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই। পরবর্তীকালে গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় গবেষণায় এই নূতন জ্যামিতি বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

পণ্টুসের হেরাক্লিডিস্‌ (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৮-৩১৫)

পণ্টুসের হেরাক্লিডিস্‌ অ্যারিস্টট্‌লের সমসাময়িক ছিলেন। প্লেটো ও অ্যারিস্টট্‌লের প্রভাব সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও বিশ্বপরিকল্পনার দিক হইতে পিথাগোরীয়দের ভাবধারাই তাঁহার গবেষণাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। পৃথিবীর আহ্নিক গতি, পৃথিবীর পরিবর্তে সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া বুধ ও শুক্রের পরিক্রমণ, ভূকেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনায় পরিবৃত্তের প্রয়োগ প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য হেরাক্লিডিস্‌ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

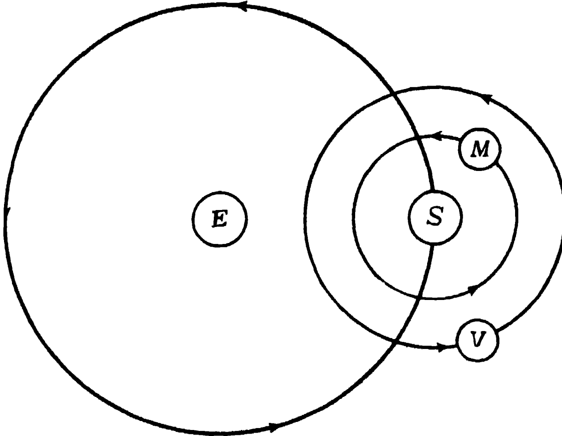
পণ্টুসে হেরাক্লিয়া নামক স্থানে ধনীবংশে আনুমানিক খ্রীঃ ৩৮৮ পূর্বাব্দে

হেরাক্লিডিসের জন্ম। খৃঃ পূঃ ৩৬৪ অব্দে তিনি এথেন্সে আসেন এবং প্লেটোর বিদ্যাপীঠের সদস্য হন। কথিত আছে, বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষপদের জন্য নির্বাচনে তিনি একবার জেনোক্রেটিসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং কয়েক ভোটে পরাজিত হন। তিনি সুসাহিত্যিক ছিলেন। ভারো ও সিসেরো তাঁহার রচনার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার জ্যোতিষীয় গবেষণা ও আবিষ্কার *On Nature* ও *On the Heavens* নামক দুইখানি গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

আহ্নিক গতিঃ হেরাক্লিডিসের প্রথম ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হইল পৃথিবীর আহ্নিক গতি। ইউডক্সাস্, প্লেটো ও অ্যারিষ্টটলের মত পৃথিবী যে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থিত ইহা স্বীকার করিলেও, ইহা যে সম্পূর্ণ নিশ্চল, পূর্বগামীদের এই মত তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তৎপরিবর্তে তিনি বলেন, পৃথিবী তাহার অক্ষরেখার চতুর্দিকে লাটিমের মত আবর্তিত হইতেছে। *De Caelo*-র টীকাকার সিম্প্লিসিয়াস্ লিখিয়াছেনঃ—

> "But Heraclides of Pontus supposed that the earth is in the centre and rotates while the heaven is at rest."

বুধ ও শুক্রের সূর্য-পরিক্রমণঃ তাঁহার দ্বিতীয় ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হইল, পৃথিবীর পরিবর্তে সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া বুধ ও শুক্রগ্রহের পরিক্রমণ-তত্ত্ব। ইউডক্সাস্ ও অ্যারিষ্টটল্ এক একটি এককেন্দ্রীয় গোলকের সঙ্গে একটি করিয়া গ্রহ জুড়িয়া দিয়াছিলেন। এই গোলকদের আবর্তনের দ্বারা তাঁহারা গ্রহদের পৃথিবী-পরিক্রমা বুঝাইবার চেষ্টা করেন। এই পরিকল্পনার প্রধান অসুবিধা এই যে, পৃথিবী হইতে গ্রহের দূরত্ব সব সময়ে অপরিবর্তিত থাকিবার জন্য তাহার ঔজ্জ্বল্যের প্রভেদ ব্যাখ্যা করা যায় না। অথচ এই ঔজ্জ্বল্যের প্রভেদ, অন্ততঃ বুধ ও শুক্রের বেলায়, এতই বেশী যে ইহাকে অবহেলা করা যায় না। বুধ ও শুক্রের ঔজ্জ্বল্যের হ্রাসবৃদ্ধি বহু পূর্ব হইতে একাধিক জ্যোতির্বিদ্ লক্ষ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু কেহই প্রশ্নটির সদুত্তর দিতে পারেন নাই।



৭৩। বুধ ও শুক্রের পরিক্রমণ সম্বন্ধে হেরাক্লিডিসের পরিকল্পনা;
E—পৃথিবী; S—সূর্য; M—বুধ; V—শুক্র।

হেরাক্লিডিস্ দেখাইলেন, সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া বুধ ও শুক্রকে যদি বৃত্তাকারে পরিভ্রমণ-রত মনে করা যায় তবে পৃথিবী হইতে এই দুই গ্রহের দূরত্বের তারতম্য ঘটিবে এবং ঔজ্জ্বল্যের যে আপাত হ্রাসবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় তাহার একটা সহজ কারণ নির্দেশ করা

যাইবে। এই পরিকল্পনায় সূর্য অবশ্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়াই আপন বৃত্তপথ রক্ষা করিয়া চলিবে (৭৩নং চিত্র)। বুধ ও শুক্র যে বৃত্তে সূর্যকে পরিক্রমণ করে জ্যামিতিতে সেই বৃত্তের নাম পরিবৃত্ত হয়। ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনায় পরিবৃত্তের ধারণা প্রয়োগ করিয়া হেরাক্লিডিস্ বিশেষ স্বকীয়তার পরিচয় দেন। হিপার্কাস্ ও টলেমী পরিবৃত্তের আরও ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভব করিয়া ভূকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।

একবার যখন বুধ ও শুক্রকে সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করানো হইল তখন অন্যান্য গ্রহদেরও এইভাবে ঘুরাইতে বাধা কি? পৃথিবীকে যদি কেন্দ্রে রাখিতে হয় ত তাহাই করা হউক। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে টাইকো ব্রাহে (১৫৪৬-১৬০১) ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন। তাঁহার প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকে হেরাক্লিডিস্ এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন কিনা, সে বিষয়ে অবশ্য যথেষ্ট অনিশ্চয়তা আছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, অন্যান্য গ্রহদের ত বটেই এমন কি পৃথিবীকে পর্যন্ত সূর্যের চারিদিকে পরিক্রমণ-রত কল্পনা করিয়া তিনি আরিস্টার্কাসেরও পূর্বে সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আভাস দেন। অন্যান্য পণ্ডিতদের মতে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ দাবী ভিত্তিহীন; পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বুধ-শুক্রের সূর্য-পরিক্রমা আবিষ্কারের অধিক কৃতিত্ব তাঁহার প্রাপ্য নহে।

এক্ফ্যাণ্টাস্

হেরাক্লিডিসের প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্বে তাঁহার সমসাময়িক এক্ফ্যাণ্টাস্ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। হেরাক্লিডিসের জ্যোতিষীয় মতবাদের সহিত এক্ফ্যাণ্টাসের মতবাদের আশ্চর্য মিল দেখা যায়। পৃথিবীর আহ্নিক গতির কথা তিনিও আলোচনা করেন। এই আহ্নিক গতির আবিষ্কারের সঙ্গে উভয় বিজ্ঞানীর নাম এরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, কে এই তথ্য প্রথম আবিষ্কার করেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। এটিয়াস্ দুজনেরই নাম বরাবর একসঙ্গে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেনঃ

> "....Heraclides of Pontus and Ecphantus the Pythagorean make the earth move, not in the sense of translation, but by way of turning as on an axle."

এটিয়াস্ আর এক জায়গায় এক্ফ্যাণ্টাস্কে সাইরাকিউজবাসী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এক্ফ্যাণ্টাস্ পরমাণুবাদী ছিলেন। পরমাণুদের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণায় যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় আছে। তিনি মনে করিতেন, ব্রহ্মাণ্ড অবিভাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণার সমন্বয়ে গঠিত। বস্তুকণার অন্তর্বর্তী স্থান শূন্য। ইহারা (পরমাণু) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটি গোলক বিশেষ এবং এক প্রকার ঐশ্বরিক শক্তিবলে ইহারা গতিশীল হয়।

৫·৩। জীববিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা

অ্যারিস্টট্ল্ (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২)

প্রাচীন জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ অ্যারিস্টট্ল্ সর্বদেশের ও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও চিন্তানায়কদের অন্যতম। বিজ্ঞানের কোন কোন বিভাগে, বিশেষতঃ জ্যোতিষে ও পদার্থ বিজ্ঞানে, অ্যারিস্টট্লের রক্ষণশীল মতবাদ পরবর্তী বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও চিন্তাধারার স্বতঃস্ফূর্ত অগ্রগতিকে ব্যাহত করিয়াছিল, এই অভিযোগ বহুলাংশে সত্য হইলেও তাঁহার বহুমুখী প্রতিভা ও বিশ্বকোষসদৃশ অপরিসীম জ্ঞানের তুলনা অল্পই মিলে।

প্রাচীনকালের বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের জ্যোতিষ্ক-সমাজে তিনি ছিলেন সূর্যের মত ভাস্বর। তাঁহার সময় পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমগ্র বিভাগে এমন কোন নূতন তথ্য, মতবাদ বা দর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই যাহার সহিত তাঁহার সম্যক পরিচয় ছিল না। কিন্তু এই সব তথ্য ও জ্ঞান প্রায় ক্ষেত্রেই ছিল খাপছাড়া, বিশৃঙ্খল ও অসংলগ্ন। অ্যারিস্টট্‌ল্‌ এই অসংলগ্ন জ্ঞানকে সুবিন্যস্ত ও সুসম্বন্ধ করিয়া পরিপূর্ণতা ও সমগ্রতা দান করেন এবং স্বকীয় গবেষণার দ্বারা সেই জ্ঞানকে নানাভাবে পরিপুষ্ট করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রেণেশাঁর পূর্ব পর্যন্ত দুই হাজার বৎসরের মধ্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পৃথক পৃথক ভাবে বিজ্ঞানী বিশেষের উচ্চাঙ্গের গবেষণার অনেক নজির আছে বটে, কিন্তু সকল বিদ্যার উপর এইরূপ সমান ও সম্পূর্ণ অধিকার সম্ভবতঃ আর কোন বিজ্ঞানীর মধ্যে দেখা যায় না।

সংক্ষিপ্ত জীবনী : মাসিডোনিয়ার অন্তর্গত ষ্টাজিরা নামক স্থানে অ্যারিস্টট্‌লের জন্ম হয় খৃীঃ পূঃ ৩৮৪ অব্দে। মাসিডোনীয় আলেকজান্দার তরবারির সাহায্যে পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন; মাসিডোনীয় অ্যারিস্টট্‌ল্‌ লেখনীর জোরে সমগ্র চিন্তা জগতের একাধিপত্য লাভ করেন। দুই-এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, আলেকজান্দারের সাম্রাজ্য তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল; আরিস্টট্‌লের চিন্তা-সাম্রাজ্যে দুই হাজার বৎসরেও ভাঙ্গন ধরে নাই।

অ্যারিস্টট্‌লের পিতা নিকোমেকাস্‌ ছিলেন সুচিকিৎসক ও মাসিডনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপের সভাসদ। পিতার ব্যবহারিক চিকিৎসা-বিদ্যার প্রভাব পুত্রের উপর সুপরিস্ফুট। গ্যালেনের লেখায় জানা যায়, পিতার নিকট তিনি শল্যবিদ্যা শিক্ষা করেন। সম্ভবতঃ অস্ত্রোপচার কার্যে পিতাকে তিনি মাঝে মাঝে সহকারীরূপে সাহায্যও করিয়া থাকিবেন। প্লেটোর নিকট বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি ১৭ বৎসর বয়সে এথেন্সে আসেন এবং দীর্ঘ বিশ বৎসর তাঁহার একাডেমী বা বিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন। প্লেটোর মৃত্যুর পর খৃীঃ পূঃ ৩৪৭-৪৮ অব্দে স্পিউসিপাস্‌ একাডেমী পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলে বিদ্যা-পীঠের সর্বপ্রকার আলোচনা, গবেষণা ও অধ্যাপনায়, এমন কি গাণিতিক গবেষণায়ও দর্শনের ক্রমবর্ধমান আতিশয্য লক্ষ্য করিয়া অ্যারিস্টট্‌ল্‌ বুঝিতে পারেন যে, একাডেমী হইতে এইবার তাঁহার বিদায় লইবার সময় হইয়াছে। ইহা ছাড়া রাজনৈতিক কারণও অবশ্য ছিল। দ্বিতীয় ফিলিপের দিগ্‌বিজয়ের বাসনা ও অভিসন্ধি এথেন্সবাসীদের ক্রমশঃ মাসিডনবাসীদের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় ফিলিপের সভাসদ নিকোমেকাসের পুত্রকে এথেন্সে যে কেহ প্রীতির চক্ষে দেখিবে না তাহা বলা বাহুল্য। যে কারণেই হউক, অ্যারিস্টট্‌ল্‌ এথেন্স পরিত্যাগ করিয়া মিসিয়ার অন্তর্গত আসোস্‌ নামক স্থানে একাডেমীর আদর্শে একটি ছোট বিদ্যাপীঠ ও আলোচনাচক্র স্থাপন করেন। আসোসে তিনি তিন বৎসর অতিবাহিত করেন। ইহার পর তাঁহার সহকর্মী ও বিশিষ্ট বন্ধু থিওফ্রেস্‌টাসের আহ্বানে লেস্‌বস্‌ দ্বীপের নিকটবর্তী মিটিলিন নামক স্থানে আসেন। আসোস্‌ ও মিটিলিনে অবস্থান কালেই তাঁহার জীববিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা সম্পাদিত হয়। এথেন্সের অধ্যাত্ম-মূলক দর্শন ও পাণ্ডিত্যের আবহাওয়া হইতে দূরে থাকিয়া আয়োনীয় দ্বীপগুলির মুক্ত পরিবেশে নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে তিনি প্রাকৃতিক জগতকে বুঝিবার চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টার ফলেই তিনি জীববিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হন। বিজ্ঞানে ইহা তাঁহার অক্ষয় ও অতুলনীয় অবদান।

এথেন্স পরিত্যাগ করিয়া পাঁচ বৎসর নানাস্থানে কাটাইবার পর তরুণ আলেকজান্দারের শিক্ষকতার ভারপ্রাপ্ত হইয়া অ্যারিস্টট্‌ল্‌ আবার মাসিডনে আসেন খৃীঃ পূঃ ৩৪২-৩ অব্দে। এই সময় রাজনীতি চর্চা ও আলোচনা করিবার সুবর্ণ সুযোগ তাঁহার উপস্থিত হয়। তিনি আলেকজান্দারকে দার্শনিক, পণ্ডিত অথবা বিজ্ঞানী করিয়া তুলিবার পরিবর্তে বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে গড়িয়া তুলিবার সংকল্প করিলেন। আলেকজান্দারের জন্য তিনি রচনা

করিলেন তাঁহার দুই বিখ্যাত গ্রন্থ *Monarchy* ও *Colonies*।* এই গ্রন্থদ্বয়ে রাজতন্ত্র ও ঔপনিবেশিক শাসন-পদ্ধতি তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেন। পৃথিবীর নানা দেশের শাসনতন্ত্র সংগ্রহ করিয়া তিনি শাসনতন্ত্র বিবর্তনের এক ইতিহাস ও আদর্শ শাসনতন্ত্রের এক খসড়া রচনা করিবার পরিকল্পনা করেন। আলেকজান্দারের সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে এই তথ্য সংগ্রহের কাজ তাঁহার অনেক সহজ হইয়াছিল।

খ্রীঃ পূঃ ৩৩৪-৫ অব্দে ফিলিপের মৃত্যুর অল্প পরে অ্যারিস্টট্ল্ আবার এথেন্সে আসিয়া সাধারণভাবে অধ্যাপনা ও গবেষণার কাজে মনোনিবেশ করেন। এই সময়ে তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার আর এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আরম্ভ হয়। সহরের উপকণ্ঠে ছোট ছোট কয়েকটি উদ্যান-বাটী ভাড়া করিয়া তাঁহার বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ 'লাইসিয়াম' স্থাপন করেন। উদ্যানে পায়চারি করিতে করিতে গুরুশিষ্যের মধ্যে আলোচনা চালাইবার প্রথা হইতে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হইয়াছিল 'লাইসিয়াম' বা 'পেরিপ্যাটেটিক' বিদ্যাপীঠ। লাইসিয়ামে ন্যায়শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, দর্শন, রাজনীতি, অলংকার শাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। প্রায় শতাধিক মৌলিক পাণ্ডুলিপি ও বহু দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি যে গ্রন্থাগার স্থাপন করেন, পরবর্তীকালে তাহারই আদর্শে আলেক্-জান্দ্রিয়ার ও পার্গামামের বিরাট গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠিয়াছিল। কয়েকটি মানচিত্র ও ছোট একটি যাদুঘরও এই বিদ্যাপীঠের বিশেষ অঙ্গ ছিল।

খ্রীঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে আলেকজান্দারের মৃত্যু হইলে এথেন্সে মাসিডন-বিরোধী মনোভাব আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠে এবং রাজনৈতিক কারণে অ্যারিস্টট্লের জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হইতে আরম্ভ করে। এই সময়ে অনেকে বিদ্যাপীঠ উঠাইয়া অন্যত্র স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাবও করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবে তিনি সম্মত হন নাই। তাঁহার সুযোগ্য বন্ধু ও সহকর্মী থিওফ্রেস্টাসের হাতে লাইসিয়াম পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়া মাসিডনীয়দের সুরক্ষিত কেন্দ্র ক্যালসিসে জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইবার জন্য চলিয়া যান। পর বৎসর (খ্রীঃ পূঃ ৩২২) এইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

রচনাঃ অ্যারিস্টট্লের স্বরচিত গ্রন্থরাজির কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তিনি দুই প্রকার গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন—প্রথম জাতের গ্রন্থগুলি সাধারণের বোধগম্য অতি সহজ ও সরল ভাষায় রচিত (এইগুলি অধিকাংশই লাইসিয়ামে প্রদত্ত সান্ধ্য বক্তৃতার সংকলন); দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ, রচনা-ভঙ্গী সুসংযত ও সংক্ষিপ্ত, এবং বিশেষ করিয়া বিদ্বৎসমাজের জন্য লিখিত। প্রথমোক্ত গ্রন্থের প্রায় সবগুলিই বিনষ্ট ও নিখোঁজ হইয়াছে; সৌভাগ্যবশতঃ শেষোক্ত শ্রেণীর অধিকাংশ গ্রন্থই সংরক্ষিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কিত গ্রন্থের মধ্যে *Physics, De Caelo, De Generatione et Corruptione,* ও *Meteorologica* বিশেষ উল্লেখযোগ্য। *Physics* গ্রন্থটি আট-খণ্ডে বিভক্ত—প্রথম চারি খণ্ডে পদার্থ-বিদ্যার নানা বিষয় এবং অবশিষ্ট চারি খণ্ডে গতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। *De Anima* ও *Parva Naturalia* মনস্তত্ত্বের উপর লিখিত তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। *Parva Naturalia* আবার *De Sensu et Sensibili, De Memoria et Reminiscentia, De Somno, De Somniis, De Divinatione per Somnum, De Longitudine et Brevitate Vitae, De Vita et Morte* ও *De Respiratione* নামক আটটি পুস্তকের সমন্বয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিক হইতে বিচার করিতে গেলে তাঁহার জীববিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থগুলিই সর্বশ্রেষ্ঠ। *Historia Animalium* তথ্যবহুল, জীবজন্তুর বিচিত্র ব্যবহার, গুণাগুণ, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ গঠনবৈচিত্র্য প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁহার সুদীর্ঘ পর্যবেক্ষণের ফল এই গ্রন্থে

* W. D. Ross, *Aristotle;* p. 4.



অ্যারিস্টট্ল্ (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২)



থিওফ্রেস্টাস্ (খ্রীঃ পূঃ ৩৭৩-২৮৮)

লিপিবন্ধ। এই সব পর্যবেক্ষণ হইতে তিনি যে সব মতবাদ ও সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে *De Partibus Animalium, De Incessu Animalium, De Generatione Animalium* প্রভৃতি গ্রন্থে। অ্যারিস্টট্‌লের *Metaphysics* গ্রন্থেরও উল্লেখ করা উচিত। দর্শনের ছাঁচে ঢালিয়া লিখিত হইলেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ও বিজ্ঞানের দার্শনিক ভিত্তির আলোচনার জন্য এই গ্রন্থের এক বিশেষ গুরুত্ব আছে।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। প্রথম জীবনে তাঁহার রচনায় ও চিন্তাধারায় প্লেটোর শিক্ষার দুর্নিবার প্রভাব এবং পরবর্তী জীবনে এই প্রভাব কাটাইয়া নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচনার চেষ্টা তাঁহার প্রথম ও শেষজীবনের গ্রন্থগুলি একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলেই ধরা পড়ে। প্লেটোর অনুকরণে কথোপকথনের ভঙ্গীতে তিনি গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। পরে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ সমালোচনামূলক গদ্যে বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করেন। বিষয়বস্তুর দিক হইতেও শেষের দিকে অবাস্তব, অলৌকিক তত্ত্বের পরিবর্তে বাস্তব, পার্থিব ও জাগতিক ব্যাপারের আলোচনায় তিনি অধিকতর আকৃষ্ট হন। রস্‌ লিখিয়াছেনঃ—

> "....The general movement, we may say, was from other worldliness towards an intense interest in the concrete facts both of nature and of history, and a conviction that the 'form' and meaning of the world is to be found not apart from but embedded in its 'matter' and actual 'structure'."*

একাডেমীর সর্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র অ্যারিস্টট্‌লের চিন্তাধারা ও গবেষণার উপর প্লেটোর শিক্ষা ও আদর্শ যে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিবে ইহা স্বাভাবিক। পরবর্তীকালে স্বকীয় গবেষণা ও বিচার-বুদ্ধিবলে তিনি এই প্রভাব যে কতখানি কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ প্রাণিবিদ্যা ও জীববিদ্যা সম্পর্কিত তাঁহার যুগান্তকারী গবেষণা। এই গবেষণায় যুক্তি অপেক্ষা পরীক্ষার মূল্য এবং বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টিলব্ধ জ্ঞানের পরিবর্তে পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন। জীববিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন:—

> "....The facts have not yet been sufficiently grasped; if ever they are, then credit must be given rather to observation than to theories, and to theories only if what they affirm agrees with the observed facts."†

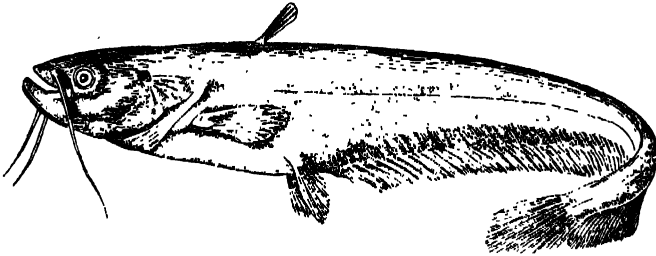
শুধু তাহাই নহে, সঙ্ঘবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত গবেষণার তিনিই প্রথম প্রবর্তক। বিদ্যোৎসাহী আলেকজান্দারের পৃষ্ঠপোষকতায় ও উদার অর্থসাহায্যে এককালে বহুশত গ্রীক মুদ্রা (গ্রীক মুদ্রা ১ ট্যালেণ্ট (talent) = ২৪০ বৃটিশ পাউণ্ডের কাছাকাছি) তিনি ব্যয় করিতেন। গ্রীস ও এসিয়ার নানাস্থান হইতে প্রাণিবিদ্যা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কার্যে তিনি দুই সহস্র লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।§ ইহারা কেহই অবশ্য নিপুণ পর্যবেক্ষক ছিল না; তথাপি এ-জাতীয় ব্যাপক উদ্যমের ফলে বিভিন্ন বিষয়ে তিনি যে পরিমাণ তথ্য সংগ্রহে কৃতকার্য হইয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত আধুনিক কালের রাষ্ট্র-সাহায্য-পরিপুষ্ট সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্ভবের পূর্বে আর দেখা যায় না।

প্রাণিবিদ্যা ও জীববিদ্যাঃ প্রাণিবিদ্যা ও জীববিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা অ্যারিস্টট্‌লের

* Ross, *Aristotle.*
† তাঁহার *About the Generation of Bees* গ্রন্থে এই মন্তব্যটি দ্রষ্টব্য।
§ Crowther, *The Social Relations of Science;* p. 73.

শেষ বয়সের গবেষণা হইলেও আমরা প্রথমে ইহারই আলোচনা করিব। জীববিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার মধ্যেই তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণা পূর্ণভাবে বিকশিত। গণিতে, জ্যোতিষে ও পদার্থ-বিজ্ঞানে তাঁহার জ্ঞান অপরিসীম হইলেও নূতন আবিষ্কারের দ্বারা এই জ্ঞানের অধিকতর উন্নতি সাধনে তিনি অসমর্থ হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, জীববিদ্যা বলিতে গেলে একরূপ তাঁহারই সৃষ্টি। প্রাচীনকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জীববিজ্ঞানী সম্বন্ধে আধুনিককালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ডারউইন লিখিয়াছিলেন, "বিভিন্নভাবে হইলেও লিনিয়াস ও কুভিয়ে ছিলেন আমার দুই দেবতা; কিন্তু বৃদ্ধ অ্যারিষ্টট্লের কাছে তাঁহারা স্কুলের ছাত্র মাত্র।"*

অ্যারিষ্টট্‌ল্ প্রায় পাঁচশত বিভিন্ন প্রাণীর নিখুঁত ও বিশদ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে পঞ্চাশটি প্রাণীকে তিনি স্বহস্তে ব্যবচ্ছেদ করেন এবং আভ্যন্তরীণ জটিল গঠনবৈচিত্র্য অঙ্কিত করেন। ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা ছাড়া এইরূপ বর্ণনা ও অঙ্কন সম্ভবপর নয়।



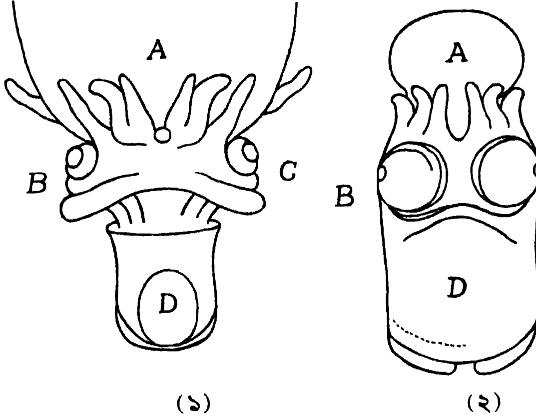
৭৪। অ্যারিষ্টট্‌ল্ বর্ণিত মার্জার-মৎস্য—(Cat fish)
Parasilurus Aristotelis.

সমগ্র প্রাণিবিদ্যাকে তিনি তিনভাগে ভাগ করেন ঃ—(১) প্রাণিবৃত্তান্ত—ইহা প্রাণি-জীবনের সাধারণ ঘটনা, অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারের ইতিবৃত্ত; (২) শারীরস্থান ও শারীরবৃত্ত—প্রাণিদেহের বিভিন্ন অংশের ও তাহাদের ক্রিয়ার বর্ণনা এবং দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রসমূহের নানাবিধ ব্যবহার ও ক্রিয়ার আলোচনা; এবং (৩) প্রজনন ও ভ্রূণতত্ত্ব। আপনা হইতেই পুষ্টিলাভ, বৃদ্ধি ও ক্ষয়ের ক্ষমতাকে তিনি 'জীবন' আখ্যা দিয়াছেন। তিনি অস্থি ও উপাস্থিবহুল মৎস্যের পার্থক্য নির্ণয় করেন, তিমি মাছের ছানা প্রসবের কথা উল্লেখ করেন, মুরগির ডিমের ভ্রূণের ক্রমিক উন্নতি বর্ণনা করেন এবং ডিম্বাবস্থাতেই হৃৎপিণ্ডের আকৃতি লাভ ও স্পন্দনের সূচনা লক্ষ্য করেন। মৌমাছির স্বভাব সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণনা অতি চমৎকার। এছাড়া প্রাণিজগতের বহু তথ্য তিনি আবিষ্কার ও লিপিবদ্ধ করেন। ইহার অনেকগুলির গুরুত্বই তাঁহার সমসময়ের বা কিছু পরবর্তীকালের প্রাণিবিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, বহু শতাব্দী পরে আবার নূতন করিয়া এই সব তথ্য আবিষ্কৃত হয়।

অ্যারিষ্টট্লের নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। ভূমধ্যসাগরে Cuttle-fish (*Sepia*) নামে একপ্রকার সামুদ্রিক কম্বুজ পাওয়া যায়। অ্যারিষ্টট্‌ল্ লিখিয়াছেন, ডিমের শ্বেতবস্তু হইতে এই কম্বুজের ছানা ধীরে ধীরে আকার প্রাপ্ত হয়। তারপর ডিম ফাটিয়া ইহা অনেকটা পাখীর ছানার মত নির্গত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাণিবিদ্ উইলিয়ম রোঁদ্‌লে (১৫০৭-৬৬) অ্যারিষ্টট্লের বর্ণনা অনুযায়ী এই সামুদ্রিক কম্বুজের ডিম হইতে ছানা প্রসবের যে চিত্র অঙ্কন করেন তাহা ৭৫নং চিত্রে দেখানো হইল।

* "Linnaeus and Cuvier have been my two Gods, though in very different ways, but they were mere school boys to old Aristotle."—*Darwin's Life and Letters*, III; p. 252.

অ্যারিস্টটল্-বর্ণিত টর্পেডো (*Torpedo Ocellata*) ও বড়শি মৎস্যের (Angler fish) কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ধীবররা অতি প্রাচীনকাল হইতেই এই দুইপ্রকার মৎস্যের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিল। অ্যারিস্টটল্ লিখিয়াছেন, ইহাদের সম্মুখভাগ অন্যান্য মৎস্যের তুলনায় অস্বাভাবিক চওড়া। টর্পেডো মৎস্যে শ্রোণী-পাখনাদ্বয় (pelvic fin) লেজের দিকে থাকে; সম্মুখভাগের বিস্তৃত দেহাংশ কিছুটা পাখনার কাজ করে। টর্পেডো মৎস্য নিজ দেহ হইতে বিচ্ছুরিত বৈদ্যুতিক শক্তির



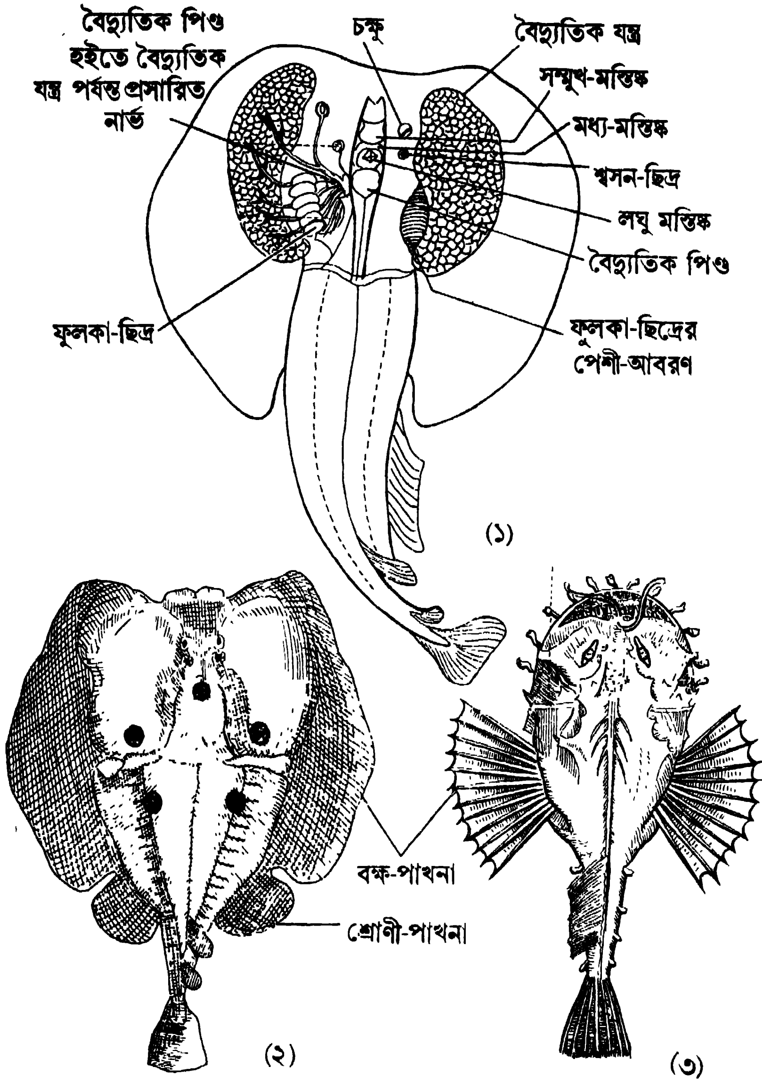
৭৫। অ্যারিস্টটল্ বর্ণিত Cuttle fish (*Sepia*) বা এক প্রকার সামুদ্রিক কম্বুজের পরিণতি-লাভের চিত্র : (১) চিত্রে শৈশবাবস্থা ও (২) চিত্রে পরিণত অবস্থা দেখানো হইয়াছে। A—ডিম্ব; B ও C—চক্ষু; D—কম্বুজের দেহ।

দ্বারা অন্যান্য মৎস্য বা জলজ প্রাণীকে তড়িতাহত করিয়া শিকার করে। সমুদ্রতীরে বালু ও কর্দমের মধ্যে ইহারা আত্মগোপন করিয়া থাকে এবং নাগালের মধ্যে পাইলেই মৎস্যদের তড়িতাহত করে। ইহাদের তীব্র বৈদ্যুতিক শক মানুষ পর্যন্ত অনুভব করিয়াছে। বড়শি মৎস্যের চক্ষুর নিকট সুতার মত লম্বা, সরু ও মসৃণ একটি বস্তু থাকে। ক্ষুদ্র মৎস্যেরা সুতার মত এই জিনিসকে সামুদ্রিক শৈবাল ভ্রমে খাইতে আসিলে নিজেরাই ইহাতে বিদ্ধ হয়। রোঁদ্লে টর্পেডো ও বড়শি মৎস্যের যে সব চিত্র আঁকিয়াছেন, (৭৬নং চিত্র) তাহার সহিত অ্যারিস্টটলের বর্ণনার হুবহু মিল পরিলক্ষিত হয়।

তিমি মাছ, হাঙ্গর প্রভৃতি এক জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণী যে সাধারণ মৎস্যের মত অণ্ডজ নহে, পক্ষান্তরে স্থলজ স্তন্যপায়ীদের মত জরায়ুজ, অ্যারিস্টটল্ ইহা আবিষ্কার করেন। *Mustelus laevis* ও *Mustelus vulgaris* নামক ক্ষুদ্র হাঙ্গরের ভ্রূণ মাতৃগর্ভে কিরূপে অবস্থান করে এবং নাভিরজ্জুর দ্বারা জরায়ু ও অমরার সহিত সংলগ্ন থাকে, অ্যারিস্টটল্ তাহার উল্লেখ করেন। বহুদিন পর্যন্ত প্রাণিবিদ্‌গণ এই আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং ইহা যে অ্যারিস্টটলের আবিষ্কার সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান জীববিদ্যাবিদ্ জোহানেস্ মুলার (১৮০১-৫৮) ইহা চূড়ান্তরূপে প্রমাণ করেন। অ্যারিস্টটলের বর্ণনা অনুযায়ী *Mustelus*-এর ভ্রূণের তিনি যে চিত্র অংকন করেন তাহার কয়েকটি নমুনা দেখানো হইল (৭৭, ৭৮নং চিত্র)।

শ্রেণী বিভাগ: অ্যারিস্টটল্ প্রাণীদের সম্পূর্ণ নূতন পদ্ধতিতে শ্রেণীবদ্ধ করেন। তাঁহার পূর্বে প্রাণিবিদ্‌রা বিপরীত গুণাত্মক শ্রেণীতে (contrasted group) প্রাণীদের ভাগ করিতেন, যেমন স্থলজ ও জলজ; পক্ষবিশিষ্ট ও পক্ষহীন ইত্যাদি। এই প্রকার শ্রেণী বিভাগের ফলে বহু বিষয়ে প্রভূত মিল থাকা সত্ত্বেও প্রাণীরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া

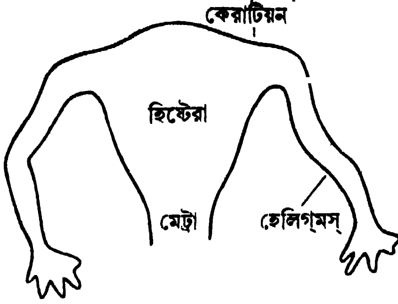
পড়ে। পক্ষবিশিষ্ট ও পক্ষহীন পিপীলিকা এইরূপ শ্রেণী বিভাগের অসারতার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

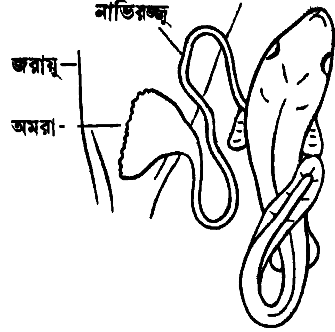


৭৬। টর্পেডো মৎস্য ও বড়শি মৎস্য। (১) টর্পেডো মৎস্যের আভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক যন্ত্রের চিত্র; (২) রোঁদ্‌লে (১৫০৭-৬৬) কর্তৃক অঙ্কিত *Torpedo Ocellata*-র আভ্যন্তরীণ চিত্র; (৩) রোঁদ্‌লে কর্তৃক অঙ্কিত বড়শি মৎস্য (Angler fish)।

অ্যারিস্টট্‌ল্‌ প্রাণিজগতে তিন প্রকার মিল লক্ষ্য করেন। একই জাতের প্রাণীদের মধ্যে স্বভাব ও আকৃতির সামান্য তারতম্য লক্ষ্য করিয়া যে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর কথা বলা হয়,

গঠনবৈচিত্র্যে ও অন্যান্য বহু ব্যাপারে এই সব প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে প্রভূত মিল দেখা যায়। বিভিন্ন প্রজাতির সমন্বয়ে 'গণ'; এক একটি গণের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে

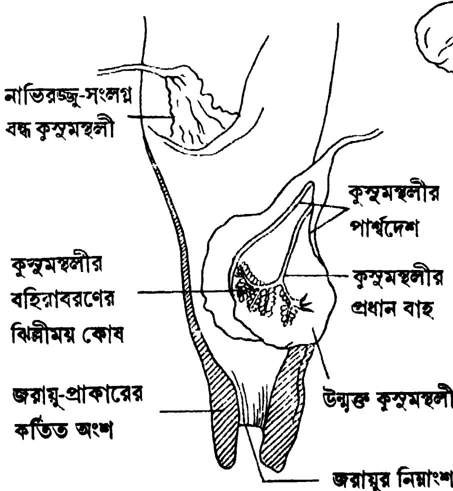


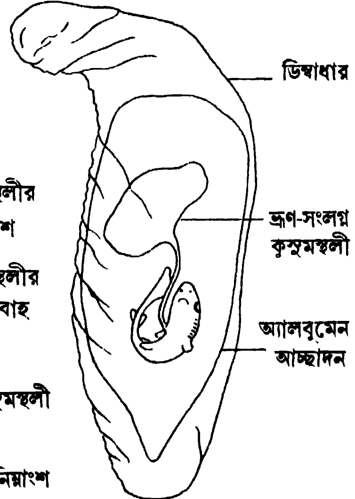


(১) (২)

৭৭। (১) কর্তৃক প্রদত্ত স্ত্রী-হাঙগরের জঠরের বিভিন্ন অংশের নাম; আধুনিক শারীরস্থানেও এই নামগুলি বহুলাংশে অপরিবর্তিত রহিয়াছে।
(২) *Mustelus laevis* নামক এক জাতীয় ক্ষুদ্র-হাঙগরের ভ্রূণাবস্থা; অনেকটা স্তন্যপায়ী প্রাণীর মত হাঙগর-শিশু মাতৃ-জঠরের প্রাকারের সহিত সংলগ্ন থাকে। জোহানেস্ মুলার (১৮৪২) কর্তৃক প্রদত্ত অ্যারিস্টটলের ধারণার চিত্ররূপ।

অনেক মিল আছে। তারপর বিভিন্ন গণের অন্তর্ভুক্ত প্রাণীদের মধ্যেও নানা বিষয়ে স্থূল মিল ও সামঞ্জস্য লক্ষণীয়। এতদ্ব্যতীত সৃষ্টিছাড়া এমন কতকগুলি প্রাণী আছে যাহাদের





(১) (২)

৭৮। (১) *Mustelus laevis* জাতীয় ক্ষুদ্র-হাঙগরের জরায়ুর নিম্নাংশের আভ্যন্তরীণ গঠন-বৈচিত্র্য। অ্যারিস্টটলের বর্ণনা অনুযায়ী জোহানেস্ মুলার (১৮৪২) কর্তৃক ইহা অঙ্কিত।
(২) *Mustelus vulgaris* নামক আর এক জাতীয় ক্ষুদ্র-হাঙগরের ডিম্ব। ডিম্বের অভ্যন্তরে হাঙগর-শিশু অমরা বা ফুলের সহিত কিভাবে সংলগ্ন থাকে তাহা দেখানো হইয়াছে। অ্যারিস্টটলের বর্ণনা অনুযায়ী জোহানেস্ মুলার কর্তৃক অঙ্কিত।

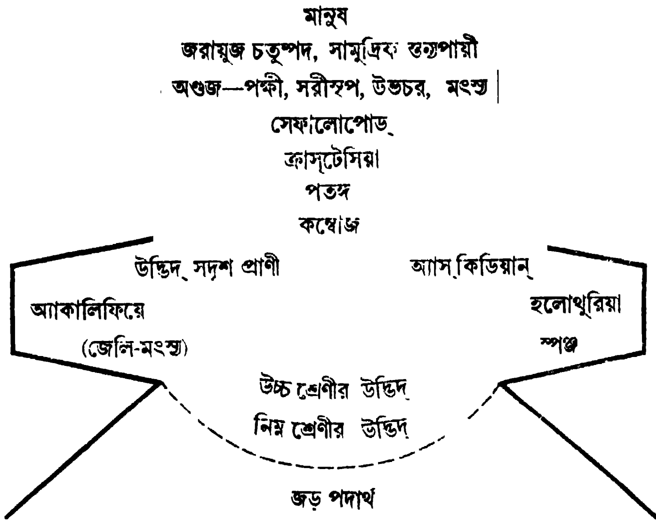
কোনও প্রজাতি বা গণের অন্তর্ভুক্ত একেবারেই করা যায় না। এরূপ অবস্থায় চুল চেরা শ্রেণী বিভাগের কাজ যে রীতিমত কঠিন ব্যাপার অ্যারিস্টটল্ তাহা উপলব্ধি করেন। এই সব বিচার করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, শ্রেণী বিভাগের কার্যে প্রভেদ-জ্ঞাপক যত বেশী গুণ ধরা যাইবে শ্রেণী বিভাগ ততই নির্ভুল হইবে। এই নিয়ম অনুযায়ী প্রাণীদের শ্রেণীবদ্ধ করিয়া অ্যারিস্টটল্ যে তালিকা প্রস্তুত করিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিনিয়াসের পূর্বে ইহা অপেক্ষা উন্নততর তালিকা আর কেহ প্রণয়ন করিতে পারেন নাই।

অ্যারিস্টটল্ প্রাণীদের প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করেন—(১) রক্তবহুল ও (২) রক্তহীন। আধুনিক শ্রেণী বিভাগে ইহা মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের সহিত তুলনীয়। রক্তবহুল প্রাণীদের প্রধান গণ-বিভাগ হইল এইরূপঃ জরায়ুজ চতুষ্পদ (viviparous quadrupeds), সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী (cetacea), পক্ষী, অণ্ডজ চতুষ্পদ (oviparous quadrupeds) ও সরীসৃপ এবং মৎস্য। রক্তবহুল প্রাণীদের মধ্যে মানুষ বিশেষ জাতের প্রাণী। রক্তহীন প্রাণীদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দেহাংশের নানারূপ পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া তাহাদের বিভিন্ন গণে ভাগ করা হইয়াছে। অ্যারিস্টটলের শ্রেণী বিভাগের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে দেখানো হইল।

		রক্তবহুল
জরায়ুজ		১। মানুষ
		২। জরায়ুজ চতুষ্পদ (স্থল স্তন্যপায়ী)
		৩। সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী
অণ্ডজ	ইহাদের ডিম নিখুঁত ও সম্পূর্ণ হয়	৪। পক্ষী
		৫। অণ্ডজ চতুষ্পদ—সরীসৃপ, উভচর
		৬। মৎস্য
	ইহাদের ডিম অসম্পূর্ণ ও ত্রুটীবহুল হয়	**রক্তহীন**
		৭। সেফালোপোড্ (cephalopod)
		৮। ক্রাস্টেসিয়া (crustacea)
ইহাদের ডিম বিশেষ ধরনের		৯। পতঙ্গ
একপ্রকার পিচ্ছিল জননপদার্থ হইতে বা স্বতঃজনন পদ্ধতিতে ইহারা উদ্ভূত হয়		১০। কম্বোজ (mollusc)
স্বতঃজনন পদ্ধতিতে ইহারা উদ্ভূত হয়		১১। উদ্ভিদ্ সদৃশ প্রাণী; স্পঞ্জ

মৎস্যরা কানকোর সাহায্যে এবং অন্যান্য প্রাণী ফুস্ফুসের সাহায্যে নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকে, এ সম্বন্ধে অ্যারিস্টটল্ অনেক পরীক্ষা করেন। নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের প্রকৃত প্রণালী অবগত হইবার জন্য তিনি জীবন্ত পশুপক্ষীর দেহব্যবচ্ছেদ করিতেন। তিনি বহু পশুপক্ষীর ফুস্ফুসের বর্ণনা দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ববর্তী বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদিগের মতের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় এইরূপ মন্তব্য করেন, "(শ্বাস-প্রশ্বাস সম্বন্ধে) পূর্ববর্তী প্রাণিবিজ্ঞানীরা যে ভাল বর্ণনা বা আলোচনা করিতে পারেন নাই তাহার কারণ প্রাণীদের আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধে তাহাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব; তদুপরি প্রকৃতির প্রত্যেক কার্যের পিছনে যে একটি কারণ আছে, তাহা তাহারা স্বীকার করিতেন না। প্রাণীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহারা যদি প্রশ্ন

তুলিতেন এবং কানকো, ফুস্ফুস প্রভৃতি দেহাংশের কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে যদি এই প্রশ্নের বিচার ও আলোচনা করিবার চেষ্টা করিতেন, তবে বহু পূর্বেই শ্বাস-প্রশ্বাসের কারণ তাঁহারা আবিষ্কার করিতে পারিতেন।" এই উক্তির মধ্যে, অন্ততঃ জীববিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে অ্যারিস্টটলের খাঁটী বৈজ্ঞানিক মনোভাব সুপরিস্ফুট। শ্বাস-প্রশ্বাস 'কি ভাবে' সংঘটিত হয় তাহার সদুত্তর দিতে পারিলেও, 'কেন হয়' সে প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা ছিল, বাতাসের সংস্পর্শে রক্তকে শীতল করাই হইল শ্বাস-প্রশ্বাস-প্রক্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা অপেক্ষা উন্নততর ও অধিকতর সন্তোষজনক কারণ নির্দেশ অবশ্য অ্যারিস্টটলের সময় সম্ভবপর ছিল না। বায়ু ও গ্যাসের মধ্যে পার্থক্য তখন পর্যন্ত অজ্ঞাত; রসায়নের তখনও অতি শৈশব অবস্থা।



৭৯। অ্যারিস্টটলের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাণিজগতের বিভিন্ন ধাপ।

এইরূপ আরও কতকগুলি বিষয়ে অ্যারিস্টটল্ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেন। তন্মধ্যে উদ্ভিদ্জীবনে যৌন-প্রক্রিয়ার অনস্তিত্ব এবং মস্তিষ্কের পরিবর্তে হৃৎপিণ্ডে বুদ্ধিবৃত্তির স্থিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত বিষয় সম্বন্ধে আলক্‌মাওন ও হিপোক্রেটিস্ সঠিক মত পোষণ করিতেন। যে কোন কারণেই হউক, অ্যারিস্টটল্ তাঁহাদের মত গ্রহণ করেন নাই।

জননতত্ত্ব : জননতত্ত্বে অ্যারিস্টটলের মতবাদ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। পিতাই সন্তানের প্রকৃত জনক, মাতৃগর্ভের সঞ্চার শুধু আশ্রয় ও পুষ্টি যোগাইবার জন্য,—মিশরীয় আমল হইতে প্রচলিত এই ধারণা তখন বিশেষ ব্যাপক ছিল। যতদূর মনে হয়, এইপ্রকার ধারণা হইতেই পুরুষ-প্রধান সমাজ-ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। জনন-ক্রিয়ায় মাতার প্রকৃত অংশ অ্যারিস্টটল্ প্রথম ব্যাখ্যা করেন।

প্রাণীদের জন্মরহস্য সম্বন্ধে তিনি তিন প্রকার জন্মের বিবরণ দিয়াছেন,—(১) কোন কোন প্রাণী আপনা হইতেই জন্মাইয়া থাকে; (২) এক শ্রেণীর প্রাণীর জন্ম হয় একক পিতা হইতে; এবং (৩) অবশিষ্ট প্রাণীদের ক্ষেত্রে পিতা ও মাতার যৌন-সম্বন্ধের ফলে সন্তান সৃষ্টি হয়। এই শেষোক্ত উপায়ে জন্মের কারণ সম্বন্ধে অ্যারিস্টটল্ গভীরভাবে চিন্তা

করেন। পূর্বে ধারণা ছিল,—এবং হিপোক্রেটিসও এইরূপ মনে করিতেন যে, পিতার দেহ হইতে নির্গত শুক্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য লইয়া উৎসারিত হয়। এজন্যই পিতার দেহাবয়বের সহিত সন্তানের দেহের অঙ্গাঙ্গী মিল দৃষ্ট হয়। ইংরেজীতে ইহা pangenesis মতবাদ নামে খ্যাত। অ্যারিস্টট্‌ল্‌ এইরূপ মতবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক প্রমাণ করেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাদৃশ্য ছাড়াও কণ্ঠস্বর, চুল, নখ, চলন-পদ্ধতি কতকগুলি বিষয়ে পিতামাতা উভয়ের সহিত সন্তানের সাদৃশ্য দেখা যায়। জন্মদানের সময় তরুণ পিতার হয়ত দাড়িও হয় নাই অথবা চুলও পাকে নাই, কিন্তু বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে সন্তানের দাড়িও গজায় এবং চুলেও পাক ধরে। Pangenesis মতানুসারে এইরূপ অসামঞ্জস্যর ব্যাখ্যা অসম্ভব।

অ্যারিস্টট্‌ল্‌ বলিলেন, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিবর্তে জীবকোষের সমষ্টি সূক্ষ্ম দেহতন্তু হইতে শুক্রের উৎপত্তি। খাদ্য হইতে রক্ত এবং রক্ত হইতে দেহতন্তুর উৎপত্তি হয়। রক্তের সবটুকুই অবশ্য দেহতন্তুতে পর্যবসিত হয় না; অবশিষ্ট বাড়তির ভাগ হইতে উৎপন্ন হয় শুক্র। সুতরাং যে খাদ্যবস্তু হইতে পিতার দেহাবয়বের উৎপত্তি সেই বস্তু হইতে শুক্র-সঞ্চারের জন্য পিতা ও সন্তানের আকৃতিগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই শুক্রের মধ্যেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও পূর্ণ দেহাবয়বের সকল উপাদান প্রচ্ছন্ন থাকে। এ সম্বন্ধে রস্‌ লিখিয়াছেন,—

> "It is, in fact, the surplus of useful nutriment in its final form, that in which it goes directly to build up tissue. This final form assumed by nutriment is in sanguineous animals blood, and in bloodless animals an analogous fluid. Semen is obviously not blood, and must therefore be supposed to be a direct product of blood. The bulk of the blood in an animal goes to form its tissues; what is not needed for this goes to make semen. And offspring resemble their parents simply because the surplus resembles the bulk. 'The semen which is to form the hand or the face or the whole animal is already the hand or face or whole animal undifferentiated, and what each of them is actually such is the semen potentially'."*

সন্তান সৃষ্টিতে মাতার অংশ কি? এ সম্বন্ধে অ্যারিস্টট্‌ল্‌ বলেন, সন্তানের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য সারবস্তু সরবরাহ করা মাতার দায়িত্ব। এই সারবস্তুকেই শুক্র যথাযোগ্য আকার প্রদান করে। সন্তান সৃষ্টির ব্যাপারে পিতা ও মাতার সম্বন্ধে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার উদ্দেশ্যে তিনি সূত্রধরের আসবাবপত্র নির্মাণের উদাহরণ দিয়াছেন। আসবাবপত্র নির্মাণের জন্য কাষ্ঠখণ্ডেরও যেমন প্রয়োজন আছে, সূত্রধরের দক্ষতারও সেইরূপ প্রয়োজন আছে। এই দক্ষতা ও কাষ্ঠের সমন্বয়ে আত্মপ্রকাশ করে আসবাবপত্র। পিতার শুক্র সূত্রধরের দক্ষতার সামিল; শুক্রের অন্তর্নিহিত শক্তি, গতি ও কার্যক্ষমতা মাতার সারবস্তুকে (Substance) ধীরে ধীরে আকার দিয়া পূর্ণাবয়ব প্রাণীতে রূপান্তরিত করে।

পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সোনার কাঠির স্পর্শে জীববিদ্যার বিভিন্ন শাখায় যে প্রতিভা যুগান্তকারী আবিষ্কারসমূহ সম্ভব করিল, পদার্থবিজ্ঞানে ও জ্যোতিষে পর্যবেক্ষণ সম্পর্ক-হীন নিছক দর্শনের আদর্শ অনুসরণ করিতে গিয়া সেই একই প্রতিভা বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত

* Ross, *Aristotle;* p. 119-20.

হইল এবং নূতন কিছুই সৃষ্টি করিতে পারিল না। পদার্থবিজ্ঞানে ও জ্যোতিষে অ্যারিস্টট্‌লের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশ্লেষণ-প্রণালীই ছিল সম্পূর্ণ অন্যরূপ। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ডিমোক্রিটাস্‌ মনে করিতেন, শূন্য স্থানে ভারী পরমাণুরা হাল্‌কা পরমাণুদের অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতবেগে নীচে পড়িবে। এই মতের সমালোচনা প্রসঙ্গে অ্যারিস্টট্‌ল্‌ বলিলেন, শূন্য স্থানে ভারী ও লঘু সব বস্তুর সমান বেগে পড়িবার কথা, কিন্তু যেহেতু এরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত, অযৌক্তিক ও দুর্বোধ্য, শূন্য স্থানের অস্তিত্ব অসম্ভব। চন্দ্রগ্রহণ হয় কারণ ইহাই চন্দ্রের স্বভাব ও রীতি। পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতিষ সংক্রান্ত নানা প্রশ্নের সমাধানকল্পে তিনি বরাবর এই ধরনের যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

জ্যোতিষ ও ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনা ঃ অ্যারিস্টট্‌লের বিশ্বপরিকল্পনায় ব্রহ্মাণ্ড একক, সম্পূর্ণ ও সসীম। যাবতীয় বস্তু এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অসীম বস্তু কল্পনাতীত। কারণ অসীম বস্তু হয় অতি সহজ ও সাধারণ হইবে, নয় বহু জিনিসের সংমিশ্রণে উহা হইবে অতি জটিল। যদি সহজ ও সাধারণ হয় তবে সেই বস্তু মৌলিক উপাদান ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না, এবং যেহেতু মৌলিক উপাদান অসীম নয় সেই হেতু অসীম বস্তু সহজ ও সাধারণ হইতে পারে না। পক্ষান্তরে অসীম বস্তু জটিল হইলে তাহা মূলতঃ মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রণ হইতে বাধ্য। পদার্থের মৌলিক উপাদানগুলি সংখ্যায় পরিমিত —মাত্র চারিটি; সুতরাং জটিল বস্তুকে অসীম হইতে হইলে অন্ততঃ কোনও একটি মৌলিক উপাদানকে অসীম হইতে হইবে। কিন্তু অসীম মৌলিক উপাদানের অস্তিত্ব অসম্ভব, কারণ যে কোন একটি মৌলিক পদার্থকে অসীম মনে করিলে উহা একাই সমস্ত শূন্য স্থান জুড়িয়া থাকিবে, অন্যান্য মৌলিক পদার্থের অস্তিত্বের আর অবকাশ থাকিবে না। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড অসীম হইতে পারে না। ইহা অ্যারিস্টটলীয় সিলজিস্‌ম্‌ বা যুক্তির একটি দৃষ্টান্ত। *Physics* গ্রন্থে এই যুক্তিটি প্রদর্শিত হইয়াছে।

De Caelo পুস্তকে গতির আলোচনা হইতে অ্যারিস্টট্‌ল্‌ ব্রহ্মাণ্ডের সসীমত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন। যে বস্তুর গতি বৃত্তাকার তাহা অসীম হইতে পারে না; কারণ, যদি সেই বস্তু অসীম হয় তবে কেন্দ্র হইতে পরিধির উপর যে কোন বিন্দু পর্যন্ত একটি সরল রেখা টানিতে হইলে সেই রেখা নিশ্চয়ই অসীম হইবে। কিন্তু অসীম বলিয়া ইহা টানা অসম্ভব; অতএব এইরূপ অসীম বস্তুর বৃত্তাকার গতি অসম্ভব। কিন্তু আমরা জানি, ব্রহ্মাণ্ড বৃত্তাকারে আবর্তিত হইতেছে। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড অসীম হইতে পারে না। তাছাড়া কোন অসীম বস্তুর কেন্দ্র থাকিতে পারে না; ব্রহ্মাণ্ড একটি কেন্দ্রের চারিদিকে আবর্তিত হইতেছে। এই কারণেও ইহা সসীম।*

অ্যারিস্টটলীয় জ্যোতিষে একক, সম্পূর্ণ ও সসীম ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থলে পৃথিবী অধিষ্ঠিত। পিথাগোরীয়রা কেন্দ্রে অগ্নিকে বসাইয়াছিলেন, কারণ কেন্দ্রের মত বিশিষ্ট স্থানে মৃত্তিকা অপেক্ষা অগ্নিকে সংস্থাপন করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। অ্যারিস্টট্‌ল্‌ এই মতের বিরুদ্ধতা করিয়া বলেন, ভারী বস্তুমাত্রই পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হয়; পক্ষান্তরে অগ্নির গতি ঊর্ধ্বমুখী। সুতরাং মৃত্তিকাধর্মী কেন্দ্রাতিগ পৃথিবীরই স্থান হওয়া উচিত ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে। ইহার পর তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে কয়েকটি স্ফটিকস্বচ্ছ এককেন্দ্রীয়

* A body which has a circular motion, as the universe has, must be finite. For, if it is infinite, the straight line from the centre to a point on its circumference must be infinite; now if, as being infinite, this distance can never be traversed, it cannot revolve in a circle, whereas we see that in fact the universe does so revolve. Further, in an infinite body there can be no centre; hence the universe which rotates about its centre cannot be infinite. —Heath, *Aristarchus of Samos*, p. 229.

গোলকে (concentric crystal spheres) ভাগ করেন। ব্রহ্মাণ্ডকে স্ফটিক গোলকে বিভক্ত করিবার যে পরিকল্পনা তিনি প্রদান করেন তাহার প্রকৃত উদ্ভাবক অবশ্য ইউডক্সাস্। কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত প্রথম গোলকটি হইল মৃন্ময় পৃথিবীর গোলক; পরবর্তী গোলকে সমুদ্র ও মহাসমুদ্র বিরাজমান, তার পরের দুইটি গোলকে যথাক্রমে বাতাস ও অগ্নির অবস্থিতি। ইহার পরের এক একটি গোলক যথাক্রমে চন্দ্র, সূর্য, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি গ্রহকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া পৃথিবীর চতুর্দিকে আবর্তিত হইয়া থাকে। শনিগ্রহের পরবর্তী গোলকে স্থির নক্ষত্ররা সারিবদ্ধভাবে বিরাজ করে। এই স্থির নক্ষত্রের গোলকের দ্বারাই ব্রহ্মাণ্ডের সীমা নির্দিষ্ট।

এখন পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহদের এই যে বিরামহীন বৃত্তাকার গতি, ইহার কারণ কি? কাহার নির্দেশে এই অবিশ্রান্ত গতি? কোথায় ইহার উৎস? অ্যারিস্টটল্ হইতে নিউটন পর্যন্ত প্রত্যেক বিজ্ঞানীকে এই প্রশ্ন বিব্রত করিয়াছে। *Metaphysics* গ্রন্থে অ্যারিস্টটল্ গ্রহদের অবিশ্রান্ত গতির স্বরূপ ও কারণ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার পর বলেন যে, আকার (Form) ও পদার্থের (Matter) মত গতি চিরন্তন ও অবিনশ্বর। ইহার আদিও নাই অন্তও নাই। এই গতির পশ্চাতে রহিয়াছে "অচল চালক" (Primen Movens বা Unmoved Mover)। এই চালক অচল, কারণ নিজে অচল না হইলে তাহার পক্ষে অন্যকে অবিশ্রান্তভাবে চালনা করা অসম্ভব। এই অচল, অচঞ্চল, অশরীরী, অদৃশ্য Primen Movens একমাত্র সত্য, ইহাই প্রকৃত শক্তি, ইহাই ভগবান! এই অদৃশ্য সর্বশক্তিমান অচল চালক ব্রহ্মাণ্ডের প্রান্তদেশে অবস্থান করিয়া বিশ্বচক্রকে নিরন্তর ঘুরাইতেছেন।

পদার্থবিদ্যা ঃ অ্যারিস্টটল্ গতি সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা ও আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে গতি তিন প্রকার—বৃত্তাকার গতি, সরল রেখার গতি ও এই দুইয়ের সমন্বয়ে উৎপন্ন মিশ্র গতি। তিন প্রকার গতির মধ্যে বৃত্তাকার গতিই বিরামহীন ও অন্তহীন। এজন্য চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও নক্ষত্রের বিরামহীন গতি বৃত্তাকার গতি। এইরূপ গতিই নিখুঁত। পক্ষান্তরে মৃত্তিকা জল, বায়ু ও অগ্নি এই চারি মৌলিক পদার্থের গতি সরল রেখায় সম্পাদিত হয়। মৃত্তিকার গতি নিম্নমুখী, অগ্নির ঊর্ধ্বমুখী, জল ও বায়ুর গতি এই দুইয়ের মধ্যগা।

এইরূপ গতিবাদ হইতে অ্যারিস্টটল্ পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যবর্তী স্থান ভরাট করিলেন—প্রথমে বা সর্বনিম্ন স্তরে মৃত্তিকা, তারপর জল, তারপর বায়ু ও চন্দ্রমণ্ডলের কাছে সর্বশেষ স্তর অগ্নির দ্বারা। এখন এই চন্দ্রমণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের প্রান্তদেশে অবস্থিত স্থির নক্ষত্রমণ্ডল পর্যন্ত স্থান তিনি কিরূপে ভরাট করিবেন? এই স্থান ভরাট করিবার উদ্দেশ্যে তিনি পঞ্চম মৌলিক পদার্থ 'ঈথরের' পরিকল্পনা করেন। ঈথরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তি খুবই অদ্ভুত। মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও অগ্নির প্রত্যেকের যখন সরল রেখার গতি আছে, তখন আবর্তন-গতি-বিশিষ্ট একটি পঞ্চম মৌলিক উপাদান নিশ্চয়ই বিদ্যমান। এইরূপ গতি-বিশিষ্ট উপাদানের অভাবে সৃষ্টি সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। তারপর তিনি বলিলেন, আবর্তন-গতি-বিশিষ্ট পঞ্চম উপাদান ঈথর মৌলিক পদার্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট। ইহা চন্দ্রমণ্ডল হইতে নক্ষত্রমণ্ডল পর্যন্ত অবশিষ্ট স্থান জুড়িয়া থাকে। নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্করা এই ঈথর হইতেই উদ্ভূত, অ্যানাক্সাগোরাসের ধারণা অনুযায়ী তাহারা লোহিত উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ড নহে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে ঈথর-পরিকল্পনা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই অদৃশ্য, নানারূপ পার্থিব ও অপার্থিব গুণসম্পন্ন অত্যাশ্চর্য পদার্থটিকে বিজ্ঞানীরা সুবিধামত হাতের পাঁচ হিসাবে বহুবার বহুরকমে ব্যবহার করিয়াছেন।

*Meteorologica*তে অ্যারিস্টটল্ পৃথিবী ও চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যবর্তী দেশে (Sublunary sphere) যে সকল বিচিত্র নৈসর্গিক ব্যাপার সংঘটিত হয় তাহার বর্ণনা ও

ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মৌলিক পদার্থ, প্রস্তর ও খনিজের উৎপত্তি, গ্রহ, ধূমকেতু, উল্কা, রামধনু প্রভৃতি নানা প্রাকৃতিক ঘটনার স্বরূপ ও কারণ এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। মৌলিক পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার যে ব্যাখ্যা দেখা যায় তাহাতে অবশ্য কোন নূতনত্ব নাই, ইহা এম্পিডক্লেসের মতবাদেরই পুনরুক্তি মাত্র। অর্থাৎ বিপরীতধর্মী দুই প্রকার গুণের সমন্বয়ে মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি হইয়াছে; যেমন উত্তাপ ও শুষ্কতার মিলনে অগ্নি, শীতলতা ও সিক্ততা মিলিয়া জল উৎপন্ন হইয়াছে। উত্তাপ ও শীতলতাকে তিনি সক্রিয় গুণ এবং শুষ্কতা ও সিক্ততাকে নিষ্ক্রিয় গুণ বলিয়া অভিহিত করেন।

প্রস্তর ও খনিজের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, পৃথিবীর দুই প্রকার নিশ্বাস মোচন হইয়া থাকে,—একটি বাষ্পবৎ, আর একটি ধূম্রবৎ। বাষ্পবৎ নিশ্বাস মোচন সিক্ত; ইহা হইতে ধাতুর উৎপত্তি। ধূম্রবৎ নিশ্বাস মোচন শুষ্ক; ইহা হইতে প্রস্তর ও খনিজের উদ্ভব হয়। বাষ্পবৎ বলিয়া ধাতুর দ্রবীভবন, ধূম্রবৎ বলিয়া প্রস্তর ও খনিজকে সহজে দ্রবীভূত করা যায় না।

উপরিউক্ত দুই জাতীয় নিশ্বাস মোচনের ফলে উল্কারও সৃষ্টি হইয়া থাকে। বাষ্প ও ধূম্রবৎ পদার্থ উপরে উত্থিত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলের সহিত সংঘর্ষ বাধায় এবং এই সংঘর্ষের ফলে ইহা আবর্তন গতি লাভ করে। বেগে আবর্তিত হইবার জন্য বাষ্প ও ধূম্র প্রজ্বলিত হইয়া উল্কার আকার ধারণ করে। ধূমকেতুর আবির্ভাবও তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা করেন।

অ্যারিস্টট্‌ল্‌ ডিমোক্রিটাস্‌-প্রবর্তিত আণবিক মতবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি শূন্যস্থানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। আণবিক মতবাদের প্রধান ভিত্তিই হইল শূন্যস্থানের পরিকল্পনা। সুতরাং শূন্যস্থান অস্বীকার করিয়া আণবিকতত্ত্বের ভালমন্দ সবকিছুই তিনি এক আঁচড়ে উড়াইয়া দেন। শূন্যস্থানে তাঁহার অনাস্থার কারণ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। বস্তুমাত্রই একই পরমাণুর দ্বারা গঠিত, পরমাণুবাদীদের এইরূপ ধারণা অনুসরণ করিয়া তিনি বলেন যে, সমস্ত বস্তুই যখন এক উপাদানের দ্বারা গঠিত তখন সমান আয়তনের প্রত্যেক বস্তু সমান ভারী হইবে। আয়তনের তারতম্যের জন্য এক বস্তু আর এক বস্তু অপেক্ষা লঘু বা ভারী হইবে। এইরূপ কথা মানিতে হইলে ক্ষুদ্রায়তন মৃত্তিকা বা জল বাতাসে কখনই ডুবিবে না। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা ভিন্নরূপ। আপাত-দৃষ্টিতে অ্যারিস্টট্‌লের এই যুক্তি অকাট্য। কিন্তু আর্কিমিডিসের সূত্র তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই, বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্বের কল্পনা তখন পর্যন্ত অচিন্ত্যনীয়। তাই অক্লেশে ও বিনা আপত্তিতে অ্যারিস্টট্‌ল্‌ ঘোষণা করিতে পারিলেন যে, বস্তুর গুরুত্ব বা লঘুত্ব তাহার অন্তর্নিহিত নিজস্ব গুণ ও ধর্ম। অ্যারিস্টট্‌লের পর আর্কিমিডিসের সূত্র আবিষ্কৃত হইল, পদার্থবিদ্যা ও গতিবিদ্যার অনেক উন্নতি হইল, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অ্যারিস্টট্‌লের শিক্ষা ও মতবাদ অটুট রহিল। স্টেভিনাস ও গ্যালিলিও হাতেকলমে পরীক্ষা করিয়া যখন দেখাইলেন, ভারী ও লঘু বস্তু একই গতিতে উপর হইতে মাটিতে পড়ে তখন ধীরে ধীরে লোকের প্রত্যয় হইল, গুরুত্ব ও লঘুত্ব বস্তুর অন্তর্নিহিত নিজস্ব কোন গুণ নহে। ঠিক এইভাবে অ্যারিস্টট্‌লের ভূকেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনাও জগদ্দল পাষাণের মত দুই হাজার বৎসর যাবৎ মানুষের চিন্তাধারাকে চাপিয়া রাখিয়াছিল।

প্রাণিবিদ্যা, জীববিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সর্ববিদ্যাবিশারদ ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অ্যারিস্টট্‌ল্‌ জ্যোতিষ, বলবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যায় বিশেষ দুর্বলতার ও অপরিপক্কতার পরিচয় দিয়াছেন। বিজ্ঞানের এই বিভাগগুলিতে তাঁহার কোন নূতন অবদান নাই। বরং ভ্রান্ত মতবাদ দৃঢ়তার সহিত সমর্থনের জন্য, বিশেষতঃ আণবিক মতবাদ সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া তিনি ক্ষতিই করিয়াছিলেন বেশী। ইহা সত্ত্বেও সকল দিক বিচার করিয়া দেখিতে গেলে সকল যুগের ও সকল কালের তিনি যে এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও দার্শনিক ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৫·৪। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও রসায়ন

থিওফ্রেস্‌টাস্‌ (খ্রীঃ পূঃ ৩৭৩-২৮৮)

লেস্‌বসের অন্তর্গত ইরেসস্‌ নামক স্থানে থিওফ্রেস্‌টাসের জন্ম হয় আনুমানিক খ্রীঃ ৩৭৩ পূর্বাব্দে। তিনি প্লেটোর বিদ্যাপীঠে শিক্ষালাভ করেন এবং প্লেটোর মৃত্যুকাল পর্যন্ত একাডেমীর সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অ্যারিস্টট্‌ল্‌ তাঁহার লাইসিয়াম বিদ্যাপীঠ স্থাপন করিলে তিনি এই নূতন বিদ্যাপীঠে যোগদান করেন।

সে যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক প্লেটোর শিষ্য ও অ্যারিস্টট্‌লের বন্ধু ও সহকর্মী থিওফ্রেস্‌টাসের বৈজ্ঞানিক অবদানও বড় কম নহে। অ্যারিস্টট্‌লের বহুমুখী প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে থিওফ্রেস্‌টাসের প্রতিভা ঐতিহাসিকদের চোখে অনেক নিষ্প্রভ ঠেকিয়াছে। তাঁহার গবেষণার গুরুত্ব ও মূল্য সম্বন্ধেও তাহারা বহুকাল ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে থিওফ্রেস্‌টাস্‌ সম্বন্ধে গবেষণার ফলে যে সব নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রাচুর্য ও মূল্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা এখন মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অধ্যাত্মবিদ্যা, জীববিদ্যা ও রসায়ন সম্বন্ধে তিনি প্রায় পঞ্চাশটি বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ মাত্র চার পাঁচটি গ্রন্থ ছাড়া আর সমস্ত গ্রন্থই নিখোঁজ হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ঃ থিওফ্রেস্‌টাসের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পর্কে যে বিষয়টির প্রতি সর্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, তাহা হইতেছে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের উপর তাঁহার গুরুত্ব আরোপ ও তাঁহার নূতন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। জীববিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণায় অ্যারিস্টট্‌ল্‌ এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছিলেন এবং পর্যবেক্ষণের গুরুত্বও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে প্লেটোর প্রভাবমুক্ত হইতে না পারায় বৈজ্ঞানিক মতবাদ সৃষ্টিতে হেতুবাদের (teleology) আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাইয়া তিনি প্রায় ক্ষেত্রেই অদ্ভুত উপসংহারে পৌঁছিয়াছেন। বিজ্ঞানের আলোচনায় এই হেতুবাদের প্রয়োগ সম্বন্ধে থিওফ্রেস্‌টাস্‌ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং যতদূর সম্ভব পরীক্ষা-লব্ধ তথ্যের উপর তিনি নির্ভর করেন। *Metaphysics* গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন, বিজ্ঞানের আলোচনায় হেতুবাদের আশ্রয়-গ্রহণ সব সময়ে যুক্তিসঙ্গত নহে। আদিতত্ত্ব (First Principles) হইতে যুক্তির সাহায্যে সবকিছুর মীমাংসার চেষ্টা অধ্যাত্মবিদ্যায় ফলপ্রসূ হইলেও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা প্রবল। কারণ, যে প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক ঘটনার সহিত বিজ্ঞানের সম্পর্ক তাহা অতিশয় জটিল; দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে এই সব জটিল নৈসর্গিক ব্যাপার বোধগম্য হইতে পারে। প্রত্যেক ঘটনার পরিণতি ও সার্থকতা আছে এবং প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় কিছুই বৃথা হইবার নয়, দার্শনিকদের এইরূপ যুক্তি খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বলিতেন, তাহাই যদি হইবে তবে বন্যা বা অনাবৃষ্টির কারণ কি? পুরুষ জাতীয় প্রাণীর বক্ষে ও প্রাণিদেহের অনাবশ্যক স্থানে কেশোদ্গমের কারণ কি? প্রাণিজগতে সবই যদি শৃঙ্খলা তবে তাহাদের পুষ্টি-সাধন-ব্যবস্থায় এত বৈষম্য দেখা যায় কেন? সুতরাং হেতুবাদ প্রাণিজগতে বা নৈসর্গিক ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য হইতে পারে না। তথাপি থিওফ্রেস্‌টাস্‌ হেতুবাদের প্রয়োজনীয়তা একেবারে অস্বীকার করেন নাই; ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের যে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক, এই কথাই তিনি বার বার উল্লেখ করিয়াছেন।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ঃ উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও রসায়ন থিওফ্রেস্‌টাসের প্রধান গবেষণার বিষয় ছিল। আলেক্‌জান্দারের বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বৈজ্ঞানিক কর্মচারীরা নানা দেশ হইতে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-

সংক্রান্ত যে সকল নমুনা ও তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনে, তিনি তাহার বিশেষ সদ্ব্যবহার করেন। ছয় খণ্ডে সমাপ্ত *Causes of Plants* ও নয় খণ্ডে সমাপ্ত *History of Plants* বিরাট গ্রন্থদ্বয় তাঁহার উদ্ভিদ্‌বিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। উদ্ভিদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নানা অংশের গুণাগুণ ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য তিনি আবিষ্কার করেন। তাঁহার একটি বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ আবিষ্কার হইল আসল মূল হইতে বর্তুলাকার মূল (bulb), স্ফীতকন্দ (tuber), মূলাকার কাণ্ড বা রাইজোম প্রভৃতি নকল বা মূলসদৃশ উদ্ভিদাংশের প্রভেদ নির্ণয়। উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের জননক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি সঠিক ধারণা পোষণ করিতেন; কিন্তু অ্যারিস্টট্‌ল্‌ উদ্ভিদের জননে আস্থাবান ছিলেন না বলিয়া থিওফ্রেস্‌টাসের মত গ্রাহ্য হয় নাই এবং কালসহকারে বিজ্ঞানীরা তাঁহার এই গবেষণার কথাও ভুলিয়া যায়। রেনেশাঁর সময় সেসাল্‌পিনি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে থিওফ্রেস্‌টাসের এই কাজ উদ্ধার করেন।

প্রাণী ও উদ্ভিদের পার্থক্য নির্ণয় থিওফ্রেস্‌টাসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। মানুষ হইতে প্রাণীর এবং প্রাণী হইতে উদ্ভিদের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশের পরিবর্তে এইরূপ এক অধোগতির নিয়মে অ্যারিস্টট্‌ল্‌ বিশ্বাসী ছিলেন। মানবজাতির মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী নিকৃষ্ট গ্রীকদের অপেক্ষা অগ্রীক জাতিরা নিকৃষ্ট এবং সর্বনিম্নস্তরে হইল ক্রীতদাস-শ্রেণী। এইরূপ ধারণা হইতেই ক্রীতদাস-প্রথার উদ্ভব। যাহা হউক, আমরা দেখিয়াছি, অ্যারিস্টট্‌ল্‌ প্রাণী হইতে উদ্ভিদের প্রভেদ নির্দেশ করিতে সক্ষম হন নাই। প্রাণিদেহের বিভিন্ন অংশের গুণাগুণ ও তাৎপর্য লক্ষ্য করিয়া তিনি এই অংশগুলির সহিত বিভিন্ন উদ্ভিদাংশের তুলনা করেন এবং প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহাংশের মধ্যে যে একপ্রকার সমতা ও যোগসূত্র আছে, এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন।

History of Plants-এর প্রথম অধ্যায়ে থিওফ্রেস্‌টাস্‌ এই প্রভেদ বুঝাইবার চেষ্টা করেন। প্রাণিদেহাংশের মধ্যে একটা স্থায়িত্ব আছে; গুরুতর আঘাত, রোগ, জরা অথবা মৃত্যু ব্যতীত প্রাণীর অঙ্গহানি ঘটে না। কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে তাহার ফুল, ফল, পাতা প্রতি বৎসরই আপন নিয়মে শুকাইয়া ঝরিয়া যায় এবং আবার নূতন করিয়া তাহাদের জন্ম হয়। এমন কি উদ্ভিদের শিকড় ও ডালপালা পর্যন্ত নূতন করিয়া গজায়। উদ্ভিদের এই সব অংশ নিত্য পরিবর্তনশীল; ইহাদের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যাও নাই। প্রাণী হইতে উদ্ভিদের এইখানেই বিরাট পার্থক্য। থিওফ্রেস্‌টাস্‌ আরও বলেন, ফল উদ্ভিদের এক অঙ্গ-বিশেষ; কিন্তু জন্তুর শাবককে কেহ তাহার অঙ্গ-বিশেষ বলিবে না।

রসায়ন : রসায়ন ও মৌলিক পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে থিওফ্রেস্‌টাসের গবেষণা প্রণিধানযোগ্য। *Treatise on Stones* গ্রন্থে তিনি সীসশ্বেত বা সফেদার (white lead)* প্রস্তুত-প্রণালীর যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত। তিনি লিখিয়াছেন, "একটি মৃৎপাত্রে সির্কা ও পারদ একত্র রাখা হইল; প্রায় দশ মিনিট পরে মৃৎপাত্রের ঢাক্‌নি খুলিলে দেখা যাইবে পারদের গায়ে মরিচার মত এক পুরু স্তর পড়িয়াছে। এই স্তর চাঁছিয়া পারদ হইতে পৃথক করা হয়। অবশিষ্ট পারদকে পুনর্বার সির্কায় ভিজানো হয় এবং যতক্ষণ সমস্ত পারদ উপরিউক্ত পদ্ধতিতে মরিচায় পর্যবসিত না হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চালাইয়া যাওয়া হয়। তারপর মরিচাগুলিকে গুঁড়া করিয়া বহুক্ষণ (জলে) সিদ্ধ করিলে পাত্রের তলদেশে যাহা থিতাইয়া পড়িবে তাহাই সীসশ্বেত।"†

অগ্নির সহিত জল, বায়ু ও মৃত্তিকার এক মূলগত পার্থক্য নির্দেশ করিয়া

* গ্রীক ভাষায় সীসশ্বেতের নাম psimuthion.
† J. R. Partington, *A Short History of Chemistry;* p. 16.

থিওফ্রেস্টাস্ অগ্নির মৌলিকত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেন। *On Fire* নামে এক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার পর্যবেক্ষণ ও সন্দেহের কারণ আলোচনা করেন। এই আলোচনার মধ্যে আমরা তাঁহার বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টির কিছুটা পরিচয় পাই। এজন্য রচনার কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ দেওয়া যাইতেছে।

"সকল প্রকার উপাদানের মধ্যে অগ্নির কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে। বায়ু, জল ও মৃত্তিকা পরস্পর পরস্পরে রূপান্তরিত হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাদের কাহারই নিজেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎপাদন করিবার ক্ষমতা নাই। অগ্নি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেকে শুধু প্রকাশ করিতেই সক্ষম নয় নিজেকে সে নির্বাপিত করিতেও পারে। ক্ষুদ্র অগ্নি বৃহৎ অগ্নিকে উৎপন্ন করে, বৃহৎ অগ্নি ক্ষুদ্র অগ্নিকে নির্বাপিত করে। তারপর প্রায় সকল প্রকার অগ্ন্যুৎপাদনের মূলে রহিয়াছে বলপ্রয়োগ। উদাহরণস্বরূপ, ইস্পাতের উপর প্রস্তর-খণ্ডের আঘাত, দুইটি দাহ্য কাষ্ঠখণ্ডের ঘর্ষণ এবং মেঘপুঞ্জের পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে বায়ু হইতে অগ্নির উৎপাদন উল্লেখযোগ্য। বলপ্রয়োগপ্রসূত অগ্নির সহিত প্রাকৃতিক কারণে পরস্পর পরস্পরে রূপান্তরশীল অপর তিনটি মৌলিক পদার্থের প্রভেদ বিশেষ লক্ষণীয়। আমরা অগ্নিকে উৎপাদন করিতে পারি কিন্তু পারি না অন্য তিনটি মৌলিক পদার্থকে। এমন কি কূপখননের দ্বারা আমরা নূতন করিয়া জলোৎপাদন করি না; বিক্ষিপ্ত জলকে একত্রিত করিয়া শুধু দৃশ্যমান করিয়া তুলি মাত্র। কিন্তু বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এই যে, অন্যান্য মৌলিক পদার্থ স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাহাদের অস্তিত্বের জন্য কোনরূপ আধার বা মাধ্যমের প্রয়োজন নাই। আধার বা মাধ্যম ব্যতীত অগ্নির অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়। অগ্নি বলিতে যদি আমরা আলোক মনে করি তাহা হইলেও এই উক্তি সত্য, কারণ আলোকের অস্তিত্বের জন্যও বায়ু অথবা জলের মাধ্যম চাই। আলোককে বাদ দিলেও শিখা অথবা জ্বলন্ত অংগারের অগ্নিকে ধারণ করিবার জন্য একটি বিশেষ আধারের প্রয়োজন। শিখা জ্বলন্ত ধূম্র, অংগার মৃত্তিকাধর্মী এক প্রকার কঠিন বস্তু। আকাশে অথবা মাটিতে যেখানেই অবস্থান করুক অগ্নির স্বরূপ এক। আকাশের অগ্নি জ্বলন্ত বায়ু: মাটির অগ্নি অপর তিনটি অথবা দুইটি মৌলিক পদার্থের দহনের ফল। সাধারণভাবে বলিতে গেলে, অগ্নি সর্বদাই নিজেকে উৎপাদন করিতেছে। ইহা একপ্রকার গতিবিশেষ। জন্মের সংগে সংগেই ইহার মৃত্যু, আধারকে ত্যাগ করা মাত্রই ইহার বিনাশ। অগ্নি সর্বদাই খাদ্যান্বেষণে রত, প্রাচীনদের এই উক্তির ইহাই তাৎপর্য। প্রাচীনেরা দেখিয়াছিলেন, বস্তুর মাধ্যম ব্যতীত অগ্নির অস্তিত্ব অসম্ভব। বস্তুসম্পর্কশূন্য স্বাধীন সত্তাই যদি না রহিল তবে অগ্নিকে আদি তত্ত্ব বলিয়া অভিহিত করিবার অর্থ কি?......কেহ কেহ অবশ্য বলিতে পারেন, ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দেশবর্তী গোলকে যে অগ্নি অবস্থান করে তাহা বিশুদ্ধ, ইহার উত্তাপে কোন ভেজাল নাই। একথা সত্য হইলে সেই অগ্নি প্রজ্বলিত হয় না, আর প্রজ্বলনই অগ্নির ধর্ম।"*

উপরিউক্ত বর্ণনায় কোনরূপ অবান্তর যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা হয় নাই। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা হইতে অগ্নির আসল স্বরূপ সম্বন্ধে থিওফ্রেস্টাসের যেরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহাই তিনি পাণ্ডিত্যবর্জিত অতি সহজ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। অগ্নির অস্তিত্বের জন্য মাধ্যমের প্রয়োজন, ইহার গতি আছে; ইহা আপনা হইতে উৎসারিত হয় এবং উৎসারিত হইয়াই ইহার মৃত্যু ঘটে। এইভাবে বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রচলিত ধারণা ও মতবাদের অসারতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা একান্ত লক্ষণীয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এই বৈশিষ্ট্যের জন্য থিওফ্রেস্টাস বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক মূল্যবান স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

---

* **Benjamin Farrington, *Greek Science,* II; p. 25-26.**

৫·৫। একাডেমী ও লাইসিয়াম

আমরা 'একাডেমী' ও 'লাইসিয়াম' নামে প্লেটো ও অ্যারিস্টট্‌ল্‌ কর্তৃক স্থাপিত দুই বিদ্যাপীঠের উল্লেখ করিয়াছি। গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই দুই বিদ্যাপীঠ অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্লেটো ও অ্যারিস্টট্‌লের সমসময়ে ও অব্যবহিত পরবর্তীকালে বহু বিশিষ্ট দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার প্রধান কেন্দ্ররূপেই যে এই দুই বিদ্যাপীঠ বিখ্যাত ছিল তাহা নহে, বহু শত বৎসর পর্যন্ত ইউরোপ ও নিকট প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার প্রধান অনুপ্রেরণাও আসে এথেন্সের এই দুই শিক্ষায়তন হইতে। নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া প্লেটোর একাডেমী প্রায় নয় শত বৎসর চালু ছিল। ৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট জাষ্টিনিয়ান একাডেমীর দ্বার বন্ধ করিয়া দিলে এই প্রাচীন ও বিচিত্র ঐতিহ্যপূর্ণ বিদ্যাপীঠের পরিসমাপ্তি ঘটে। অ্যারিস্টট্‌লের লাইসিয়াম এইরূপ দীর্ঘস্থায়ী না হইলেও আলেক্‌জান্দ্রিয়ার মিউজিয়ামের মধ্য দিয়া ইহার আদর্শ বহুদিন পর্যন্ত সজীব ছিল, কারণ লাইসিয়ামের অনুকরণেই মিউজিয়াম স্থাপিত হইয়াছিল এবং তাহার প্রথম অধ্যক্ষ ষ্ট্রাটো ছিলেন পেরিপ্যাটেটিক বিদ্যাপীঠের একজন সুযোগ্য ছাত্র।

প্লেটোর পর একাডেমীর অধ্যক্ষের পদে যাঁহারা নিযুক্ত হন, প্রতিভায়, বুদ্ধিতে বা বিদ্যাবৈদগ্ধ্যে তাঁহারা ছিলেন অনেক নিকৃষ্ট। গুরুর শিক্ষা ও ভাবধারা জিয়াইয়া রাখিবার প্রশংসনীয় চেষ্টা করিলেও নূতন উদ্ভাবনী শক্তির কোন পরিচয় তাঁহারা দিতে পারেন নাই। প্লেটোর পরবর্তী অধ্যক্ষ স্পিউসিপাস্‌ (খ্রীঃ পূঃ ৩৪৭-৩৩৯) ছিলেন জীববিদ্‌; অথচ জীববিদ্যা সম্বন্ধীয় প্রথম শ্রেণীর গবেষণার কোন পরিচয় তাঁহার পাওয়া যায় না। স্পিউসিপাসের পরবর্তী অধ্যক্ষ জেনোক্রেটিস্‌ (খ্রীঃ পূঃ ৩৩৯-৩১৪) ছিলেন নীতিবাদী দার্শনিক। তাঁহার সম্বন্ধে হেন্‌রি জ্যাক্‌সন লিখিয়াছেন, "গুরুর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধাবশতঃ জেনোক্রেটিস্‌ প্লেটোর মতবাদ অধ্যাপনা করিতেন বটে, কিন্তু প্লেটোর দর্শন তিনি বুঝিতেন না।" এইভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতদের হাতে একাডেমী পরিচালনার ভার ন্যস্ত হওয়ায়, বিদ্যাপীঠ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন কিছুই আর সৃষ্টি করিতে পারে নাই, প্লেটোর বিরাট ও বিপুল পাণ্ডিত্যের ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া কোন মতে টিকিয়া রহিল মাত্র।

অ্যারিস্টট্‌লের লাইসিয়ামের ইতিহাস কিন্তু অন্যরূপ। প্লেটোর প্রভাব কাটাইয়া স্বাধীন পরিবেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চা ও অধ্যাপনার উদ্দেশ্যে অ্যারিস্টট্‌ল্‌ লাইসিয়াম উদ্যানের বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন খ্রীঃ ৩৩৪ পূর্বাব্দে। প্লেটোর জীবিতকাল পর্যন্ত তিনি একাডেমী পরিত্যাগ করেন নাই। তবে গুরুর ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদী দর্শনের আতিশয্যে বহু দিন হইতেই ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন। স্পিউসিপাস্‌ একাডেমীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলে তাঁহার সহিত অ্যারিস্টট্‌লের নানা বিষয়ে মতভেদ দেখা যায় এবং অল্পকাল পরেই তিনি একাডেমী পরিত্যাগ করিয়া যান। একাডেমী পরিত্যাগের প্রায় তের বৎসর পরে তিনি লাইসিয়ামের বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে লাইসিয়ামের পরিকল্পনা ও স্থাপনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আলেক্‌জান্দ্রিয়ার বিশ্ববিখ্যাত মিউজিয়াম প্রধানতঃ লাইসিয়ামের আদর্শে ও অনুকরণে গঠিত হইয়াছিল। একটি ভাল গ্রন্থাগার এবং নানা বিষয়ে গবেষণার জন্য অনেকগুলি প্রয়োগশালা লাইসিয়ামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিদ্যাপীঠের গবেষণা কয়েকটি প্রধান বিভাগে ভাগ করা হয় এবং এক একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর উপর এক একটি বিভাগ পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। যেমন প্রাকৃতিক দর্শন বিভাগের ভার নেন থিওফ্রেস্‌টাস্‌; গণিত ও জ্যোতিষ বিভাগের ভার নেন ইউডিমাস্‌; জেনোক্রেটিস্‌ নামে এক জ্যামিতি-বিশারদের উপর সমগ্র জ্যামিতিক গবেষণা পরিচালনার ভার অর্পিত হয়; এবং মেনন্‌ গ্রহণ করেন চিকিৎসাবিদ্যা বিভাগের কর্তৃত্ব।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা যে বহু বিজ্ঞানীর সম্মিলিত সাধনা ও চেষ্টার ফল এবং এই চেষ্টাকে ফলবতী করিয়া তুলিতে হইলে যে সুনিয়ন্ত্রিত পরিচালন-ব্যবস্থার প্রয়োজন, এরূপ একটি অস্পষ্ট বোধ লাইসিয়ামের সংগঠনে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। আলেকজান্দারের সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বৈজ্ঞানিক কর্মচারীরা বিভিন্ন দেশ হইতে প্রায় ১৫৮টি শাসনতন্ত্রের প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। অ্যারিস্টট্‌লের তত্ত্বাবধানে লাইসিয়ামের গবেষকগণ শাসনতন্ত্রগুলি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেন এবং এই বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার ভিত্তিতেই অ্যারিস্টট্‌ল্ তাঁহার রাজনৈতিক দর্শন ও মতবাদ সম্বলিত গ্রন্থগুলি রচনা করেন। প্রাণিবিদ্যা বিষয়ক গবেষণাতেও এইভাবে একাধিক বিজ্ঞানীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, এইরূপ নিয়ন্ত্রিত পরিচালন-ব্যবস্থার মধ্যে একাধিপত্যের মনোভাব বিদ্যমান ছিল না। স্ব স্ব বিভাগে বিজ্ঞানীদের চিন্তা, গবেষণা, আলোচনা ও অধ্যাপনার পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। থিওফ্রেস্‌টাস্ ও ষ্ট্রাটোর মত বিজ্ঞানীর উদ্ভব লাইসিয়ামের সুচিন্তিত পরিকল্পনার এক অকাট্য প্রমাণ।

বিভিন্ন বিদ্যায় প্রামাণিক গ্রন্থাদি সংকলন ও প্রকাশ করা লাইসিয়ামের আর একটি প্রধান কাজ ছিল। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত, জ্যোতিষ, বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, সঙ্গীত, ব্যাকরণ প্রভৃতি নানা বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়। অ্যারিস্টট্‌লের গবেষণা ও মতবাদ মূল আলোচ্য বিষয় হইলেও এই সব গ্রন্থে অন্যান্য প্রাচীন ও সমসাময়িক কালের বিজ্ঞানীদের গবেষণাও স্থান পাইয়াছিল।

অ্যারিস্টট্‌লের মৃত্যুর পর প্রথমে থিওফ্রেস্‌টাস্ (খৃঃ পূঃ ৩২২) ও পরে ষ্ট্রাটো (খৃঃ পূঃ ২৮৭) লাইসিয়ামের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। থিওফ্রেস্‌টাসের নেতৃত্বে লাইসিয়াম বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠে। থিওফ্রেস্‌টাস্ অ্যারিস্টট্‌লের শিক্ষা ও দর্শনই শুধু প্রচার করেন নাই, জীববিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা সম্পাদন করেন। মুষ্টিমেয় পণ্ডিতদের গণ্ডির বাহিরে সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের দিকে লাইসিয়ামের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তদুদ্দেশ্যে সাধারণের বোধগম্য সহজ ভাষায় নিয়মিত-ভাবে সান্ধ্য বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। থিওফ্রেস্‌টাসের সময় এই সব সান্ধ্য বক্তৃতায় প্রায় দুই হাজারের মত নরনারীর সমাবেশ ঘটিত।* বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে জ্ঞানের প্রচার ছাড়া অধ্যাপকেরা যাহাতে বাগ্মিতা অভ্যাসের সুযোগ পান, সান্ধ্য বক্তৃতার ইহাও এক অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। থিওফ্রেস্‌টাস্ নিজেও একজন ভাল বাগ্মী ছিলেন; লাইসিয়ামের অধ্যাপকদের মধ্যে অনেকেই এই গুণের অধিকারী ছিলেন।

থিওফ্রেস্‌টাসের পর ষ্ট্রাটো অধ্যক্ষ হিসাবে ১৮ বৎসর লাইসিয়ামের কার্য পরিচালনা করেন পূর্বগামীদের মত তিনিও লাইসিয়ামের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন। আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়াম স্থাপিত হইলে ষ্ট্রাটো তাহার অধ্যক্ষ ও গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হইয়া এথেন্স পরিত্যাগ করেন। তাঁহার স্থানে লাইকো লাইসিয়ামের প্রধান নিযুক্ত হন। বিজ্ঞানী হিসাবে লাইকোর তেমন কোন নাম ছিল না এবং এই সময় হইতেই লাইসি-য়ামের পতন আরম্ভ হয়।

* B. Farrington, *Greek Science*, II, p. 50.

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬·১। আলেক্‌জান্দ্রিয়া ও বিজ্ঞান

থালেস্‌ হইতে থিওফ্রেস্‌টাসের কাল পর্যন্ত এই তিনশত বৎসরের বিজ্ঞান-চর্চার যুগকে গ্রীক বিজ্ঞানের সুবর্ণ যুগ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই তিনশত বৎসরের মধ্যে গ্রীক জাতি বর্বর যুগের অজ্ঞতার অন্ধকার ভেদ করিয়া সে যুগের শ্রেষ্ঠ সভ্যজাতিরূপে নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠা করিল। আশ্চর্য উদ্দীপনা ও দক্ষতার সহিত অতি অল্প কালের মধ্যে ব্যাবিলন, মিশর প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যজাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি ও সমাজ-নীতি আয়ত্ত করিয়া স্বকীয় চিন্তাশক্তি ও গবেষণার দ্বারা মানুষের এই জ্ঞানভাণ্ডার বহুগুণ সমৃদ্ধ করিয়া চিন্তাজগতের অধিনায়ক হিসাবে ইতিহাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইল। পারমেনিডিস্‌, এম্পিডক্‌লেস্‌, ডিমোক্রিটাস্‌, প্লেটো ও অ্যারিষ্টটলের মত দার্শনিক ও রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ, পিথাগোরাস্‌, অ্যানাক্সাগোরাস্‌, আর্কিটাস্‌, হেরাক্লিডিস্‌, ইউডক্‌সাস্‌ ও মেনেক্‌মাসের মত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ এবং হিপোক্রেটিসের মত চিকিৎসক ও ভেষজ-বিদ্যাবিশারদের আবির্ভাব যে জাতির মধ্যে সেই জাতি যে জ্ঞানের পুরোভাগে থাকিয়া চিন্তা-জগতের অধিনায়কত্ব করিবে তাহাতে আশ্চর্য কি?

রাজনৈতিক জীবনেও এই তিনশত বৎসর গ্রীসের সুবর্ণ যুগ। প্রথম যুগে গ্রীকরা ভূমধ্য-সাগরের পূর্ব ও মধ্য উপকূলবর্তী বিস্তীর্ণ স্থান জুড়িয়া বহু সমৃদ্ধ উপনিবেশ গড়িয়া তুলিয়া একরূপ সুসম্বন্ধ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করিয়াছে। এই ঐক্য-শক্তিবলেই পরাক্রান্ত পারস্য সাম্রাজ্যের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া তাহারা জাতীয় স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই অধ্যায়েই মহাবীর আলেক্‌জান্দারের নেতৃত্বে গ্রীক জাতি আদ্রিয়াটিক হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধিবাসী বহু জাতির রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সৌভাগ্যের সহিত জাতির শিল্প, কলা, বিজ্ঞান ও দর্শনের উন্নতির যে নিবিড় সম্বন্ধ, ইহা তাহার এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

খ্রীঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে আলেক্‌জান্দারের মৃত্যুর পর গ্রীক সাম্রাজ্যের বনিয়াদ ভাঙিয়া পড়িল। এই সুযোগে পরস্পর বিবদমান উচ্চাভিলাষী সেনানায়করা যে যতটুকু পারিল নিজেদের মধ্যে সাম্রাজ্য বণ্টন করিয়া লইল। পূর্বে ভারতবর্ষের সীমান্ত হইতে পশ্চিমে প্রায় লিডিয়া পর্যন্ত সমগ্র পশ্চিম এসিয়া দখল করিল সেলুকাস, মিশর, সাইপ্রাস, আধুনিক প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার কিয়দংশ টলেমী সোতারের ভাগ্যে পড়িল। গ্রীসের মূল ভূখণ্ডের কর্তৃত্ব লইয়া সুরু হইল তুমুল গৃহযুদ্ধ। নিরন্তর গৃহবিবাদের ফলে গ্রীসের রাজনৈতিক জীবনও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। এই সুযোগে অতিষ্ঠ বিজ্ঞান-লক্ষ্মীও গ্রীসভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল অন্যত্র ভাগ্যান্বেষণে। আলেক্‌জান্দারের স্থাপিত উদীয়মান নূতন নগর টলেমীর আলেক্‌জান্দ্রিয়া পলাতকা বিজ্ঞান-লক্ষ্মীকে সাদরে আহ্বান করিল।

টলেমীদের বিদ্যোৎসাহিতা : রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাসে টলেমীদের অবদান যাহাই হউক বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তাহাদের খ্যাতি চিরদিনই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় রাজশক্তির উৎসাহ ও সমাদর লাভ করিয়া গ্রীক বিজ্ঞান তাহার পুরাতন গতি ফিরিয়া পাইল। ইউক্লিড্‌, হিরোফিলাস্‌, আর্কিমিডিস্‌, অ্যাপোলোনিয়াস্‌, ইরাটোস্থে-নিস্‌, অ্যারিস্‌টার্কাস্‌ হিপার্কাস্‌ ও ক্লডিয়াস্‌ টলেমী বিজ্ঞানের পতাকা অনেক উচ্চে উড্ডীয়মান রাখিলেন,—কেহ গণিতে ও জ্যামিতিতে, কেহ চিকিৎসাশাস্ত্রে, কেহ জ্যোতিষে, কেহ বা ভূগোলে। বিজ্ঞানের এই নূতন সৌধ গড়িয়া তুলিতে আলেক্‌জান্দ্রীয় গ্রীকরা অবশ্য প্রথম প্রথম এথেন্সের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু সেই

সংগে তাহারা ইহাও উপলব্ধি করে যে, বিজ্ঞানের সম্মিলিত অগ্রগতি তাহার বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞদের একক চেষ্টার উপর একান্ত নির্ভরশীল। একই ব্যক্তির সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইবার চেষ্টার পরিবর্তে, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে বহু মনীষীর একক গবেষণা ও সাধনায় সমগ্র বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন ত্বরান্বিত করা সম্ভবপর, আলেক্‌জান্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণার ধারায় এই উপলব্ধি বিশেষভাবে পরিস্ফুট। এইভাবে এক এক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে গবেষণায় ব্রতী হইবার ফলে জ্যামিতিতে ইউক্লিড্ যে মান বাঁধিয়া দিলেন, আর্কিমিডিস্ গণিত ও বলবিদ্যাকে যে স্তরে নিয়া পেঁৗছাইলেন, অথবা হিপার্কাস্ সমগ্র জ্যোতিষের যে পরিপূর্ণ ও সুসংহত রূপ দান করিলেন, ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে কোপার্নিকাস্, কেপ্‌লার, গ্যালিলিও ও নিউটনের আবির্ভাবের পূর্বে প্রায় দুই হাজার বৎসরের মধ্যে সেই মান, সেই স্তর অথবা সেই পরিপূর্ণতা অতিক্রম করা অন্য কোন বিজ্ঞানীর সাধ্য হয় নাই।

মিউজিয়াম: বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে এইরূপ ফলপ্রসূ করিবার পশ্চাতে আয়োজনও ছিল যথেষ্ট। টলেমীদের স্থাপিত বিশ্ববিশ্রুত মিউজিয়াম সম্ভবতঃ পৃথিবীর প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। মিউজেস্-এর মন্দির (Temple of the Muses) এই অর্থ হইতে 'মিউজিয়াম' শব্দের উৎপত্তি। প্লেটোর বিদ্যাপীঠ, বিশেষতঃ অ্যারিস্টট্‌লের লাইসিয়াম বিদ্যাপীঠ মিউজিয়ামের পরিকল্পনাকে যে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। প্লেটোর অথবা অ্যারিস্টট্‌লের বিদ্যালয় ছিল অনেকটা 'টোল' অথবা 'চতুষ্পাঠী'র মত। কিন্তু মিউজিয়ামের সংগঠনে আধুনিককালের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ আছে। সাহিত্য, গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসাবিদ্যার জন্য ইহার চারিটি প্রধান বিভাগ ছিল। প্রত্যেক বিভাগের কর্তা ছিলেন সেই বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞ সাহিত্যিক অথবা বিজ্ঞানী। সমগ্র বিভাগ মিলিয়া প্রায় একশতজন অধ্যাপক ছিলেন; রাজকোষ হইতে তাহাদের মাসহারার ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট গবেষণাগার ছাড়া মিউজিয়ামে একটি মানমন্দির, একটি চিড়িয়াখানা ও নানা গাছ-গাছড়ার একটি বাগান ছিল। তারপর মিউজিয়ামের বিখ্যাত গ্রন্থাগার। এক সময়ে এইখানে গ্রন্থের সংখ্যা ছিল ৪০০,০০০। এথেন্স হইতে গবেষণার পাট উঠিয়া গেলে অ্যারিস্টট্‌লের গ্রন্থাগার আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। পৃথিবীর বিস্ময় আলেক্‌জান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের এক অংশ ধ্বংস করেন বিশপ থিওফিলাস্ ৩৯০ খ্রীষ্টাব্দে। ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানেরা আলেক্‌জান্দ্রিয়া অধিকার করিয়া গ্রন্থাগারের অবশিষ্ট অংশ বিনষ্ট করে। সমগ্র মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি এই অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার খলিফা ওমরের ধর্মোন্মাদনার অগ্নিতে ভস্মীভূত হইল। প্রায় এক হাজার বৎসর ধরিয়া এই গ্রন্থাগার বহু দেশের বহু মনীষীর সারা জীবনের চিন্তা ও গবেষণার ধারা সংরক্ষণ করিয়া জ্ঞানের যে দীপশিখা প্রজ্বলিত রাখিয়াছিল, তাহা নির্বাপিত হইল। ওমর এই বর্বরতা সমর্থন করিয়াছিলেন এই বলিয়া যে, গ্রীকদের লিখিত গ্রন্থের মূলতত্ত্ব যদি কোরাণে বর্ণিত তত্ত্বের সহিত মেলে তবে এই গ্রন্থগুলির থাকা না থাকা সমান। যদি কোরাণ-বিরুদ্ধ শিক্ষা ইহাতে লিপিবদ্ধ থাকে, তবে রীতিমত ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক এই গ্রন্থগুলিকে পোড়াইয়া ফেলা উচিত কার্যই হইয়াছে। যাহা হউক, আলেক্‌জান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ধ্বংসের ফলে চিন্তাজগতের অপরিমেয় ও অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হইয়াছিল।

মিউজিয়াম স্থাপনার সঠিক কোন তারিখ পাওয়া যায় না। প্রথম টলেমী খ্রীঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে মিশরের পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন এবং খ্রীঃ পূঃ ৩০৫ অব্দে 'Soter' অর্থাৎ 'পালক' এই উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজেকে মিশরের রাজা হিসাবে ঘোষণা করেন। খ্রীঃ পূঃ ২৮৫ অব্দে প্রথম টলেমীর মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র ফিলোডেল্‌ফাস্ (দ্বিতীয় টলেমী) রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং ৩৮ বৎসর রাজত্ব করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় টলেমীর রাজত্বকালেই মিউজিয়ামের স্থাপনা ও প্রসার ঘটে। সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দের কাছাকাছি মিউজিয়াম

স্থাপনের কার্য মোটামুটি সম্পূর্ণ হয় এবং অধ্যাপকদের নিয়োগ ও ছাত্রদের ভর্তি ব্যবস্থা সুরু হয়। প্রধান গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হইয়া ষ্ট্রাটো সম্ভবতঃ খৃঃ ২৬৯ পূর্বাব্দের কিছু পরেই আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় কার্যভার গ্রহণ করেন। কারণ ২৬৯ অব্দ পর্যন্ত তাঁহাকে লাইসিয়ামের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত থাকিতে দেখা যায়। ষ্ট্রাটোর বৈজ্ঞানিক খ্যাতির কথা প্রথম টলেমী অবগত ছিলেন; পুত্র ফিলোডেল্‌ফাসের শিক্ষার জন্য তিনি ষ্ট্রাটোকেই গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করেন।

মাসিডোনীয়দের এই বিদ্যানুরাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যুবরাজদের শিক্ষার জন্য তৎকালীন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীদের নিয়োগ একরূপ রীতিতে পরিণত হইয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদের সহিত বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র উপলব্ধি করিয়াই সম্ভবতঃ মাসিডোনীয়রা এইরূপ বিদ্যোৎসাহী হইয়া থাকিবে। ফিলিপ্‌ ও আলেক্‌জান্দারের সামরিক সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করিয়াছিল তাহাদের বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়রদের দক্ষতার উপর। বিরাট বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণে যে উন্নত ধরনের সংগঠন-ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাহার জন্য ইঞ্জিনীয়র, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ্‌, চিকিৎসক, ভৌগোলিক প্রভৃতি নানা জাতীয় বিশেষজ্ঞের সাহায্য অপরিহার্য। সাম্রাজ্যের বনিয়াদ সামরিক শক্তি; ইঞ্জিনীয়র ও বিজ্ঞানী এই সামরিক শক্তির এক প্রধান অংগ। সাম্রাজ্যবাদী টলেমীরা এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। এই সত্যবোধ টলেমীদের আমলে আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্রুত প্রসারের অন্যতম কারণ।

সামাজিক পরিবেশ ঃ আলেক্‌জান্দ্রিয়ার যে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বিজ্ঞানের এরূপ উন্নতিসাধন সম্ভবপর হইল, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা দরকার। স্পার্টা ও এথেন্সের অভ্যুদয়ের সময় গ্রীকদের আমরা উগ্র জাতীয়তাবাদী ও স্বাতন্ত্র্যবোধসম্পন্ন জাতি হিসাবে দেখিতে পাই। এই উগ্র স্বাতন্ত্র্যবোধের দৃষ্টিতে বিদেশীরা বর্বর ও উন্নত ধরনের চিন্তা ও গবেষণার কার্যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। মিশর ও এসিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে বিভিন্ন জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া ঔপনিবেশিক গ্রীকদের উগ্র জাতীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আলেক্‌জান্দ্রীয় গ্রীকদের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বহু জাতির সম্মেলনে ও সংমিশ্রণে আলেক্‌জান্দ্রিয়া একরূপ আন্তর্জাতিক নগর হিসাবে গড়িয়া উঠে। এই নগরে পাশাপাশি ইহুদী, মিশরীয় এবং সিরিয়া ও এসিয়া-মাইনরের নানা জাতির বাস ছিল। ব্যবসায়, বাণিজ্য ও শাসন সংক্রান্ত নানা ব্যাপারে গ্রীকদের প্রতিনিয়ত ইহাদের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছে। এমন কি গ্রীকদের মিশরীয়দের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার বহু দৃষ্টান্ত আছে। এইরূপ অবস্থায় স্বাভাবিক কারণেই জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ও কুসংস্কার সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং অপর জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্মবিশ্বাস বা কুসংস্কারের প্রতি একরূপ উদার ও সহানুভূতি-সম্পন্ন মনোভাব আপনা হইতেই বৃদ্ধি পায়। রাজ-পরিষদে, সামরিক বাহিনীতে ও শাসনকার্যে টলেমীরা সাধারণভাবে অ-গ্রীক জাতির প্রবেশাধিকার মঞ্জুর করে নাই বটে এবং এই বিষয়ে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছে সত্য, কিন্তু সাধারণ জীবনযাত্রায় এই সব বৈদেশিক জাতির প্রভাব রোধ করিতে পারে নাই অথবা করিবার চেষ্টা করে নাই। বিজ্ঞানে গবেষণা-পদ্ধতি মূলতঃ গ্রীক হইলেও, এসিয়ার প্রভাব ইহার উপর সুপরিস্ফুট। আলেক্‌জান্দ্রীয় ইহুদীদের মধ্যে বিজ্ঞান-চর্চার বিশেষ আদর ছিল; বিশেষতঃ চিকিৎসাশাস্ত্রে তাহারা রীতিমত অগ্রগামী ছিল। এইরূপে অলক্ষ্যে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার বিজ্ঞান একপ্রকার আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। মিঃ ল্যাসি ও'লিয়ারি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ

"The new cosmopolitan Greek life which developed after the days of Alexander had many sides. It produced its own class of literature, and evolved a scientific literary criticism. It carried forward philosophy, often on rather new lines. It

produced new research in medicine, astronomy, mathematics, and other branches of science." *

৬·২। শারীরস্থান, শারীরবৃত্ত ও চিকিৎসাবিদ্যা

ক্রোটনের আল্‌কমাওন, কসের হিপোক্রেটিস্‌, অ্যারিস্টট্‌ল্‌ ও লাইসিয়ামের বিজ্ঞানীদের চিকিৎসাবিদ্যা ও জীববিদ্যা সম্বন্ধীয় গবেষণার পর বিজ্ঞানের এই সব বিভাগে আলেক্‌জান্দ্রিয়ার অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আলেক্‌জান্দ্রীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করেন দুই ব্যক্তি—ক্যাল্‌সিডনের হিরোফিলাস্‌ ও চিওসের ইরাসিস্‌ট্রেটাস্‌। হিরোফিলাস্‌ শারীরস্থানের (Anatomy) প্রকৃত স্রষ্টা। ইরাসিস্‌ট্রেটাস্‌ শারীরবৃত্তের (Physiology) ভিত্তি স্থাপন করেন।

হিরোফিলাস্‌ (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দ)

হিরোফিলাসের সঠিক জন্মসন জানা যায় না। আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় প্রথম টলেমীর রাজত্বকালে আনুমানিক খ্রীঃ ৩০০ পূর্বাব্দে তাঁহার গবেষণা ও কার্যাবলীর পরিচয় পাওয়া যায়। শারীরস্থান সম্বন্ধে তাঁহার তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ *Anatomy* প্রসিদ্ধ। *Of the eyes* গ্রন্থে চক্ষুর গঠন-বৈচিত্র্য ও ক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং এই সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। মাতৃগর্ভের গঠন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ইহাতে পাওয়া যায়।

শারীরস্থান সংক্রান্ত গবেষণায় হিরোফিলাসের প্রধান আবিষ্কার মস্তিষ্কের সহিত বুদ্ধিবৃত্তির সম্বন্ধ-নির্ণয়। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতকে আল্‌ক্‌মাওন মস্তিষ্কই যে বুদ্ধিবৃত্তির আধার এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে অ্যারিস্টট্‌লের দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে, হৃৎপিণ্ডেই বুদ্ধিবৃত্তির স্থিতি। এই মতভেদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিলেন হিরোফিলাস্‌। বিশেষ ধৈর্যসহকারে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্তুর ব্যবচ্ছেদ করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, মস্তিষ্কই বুদ্ধিবৃত্তির আধার। তাঁহার পূর্বে দেহতত্ত্ববিদ্‌রা কয়েকটি বিশেষ ধরনের চৈতন্যবহা স্নায়ু বা সংবেদ-নার্ভের (sensory nerve) ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে প্রথম পরিষ্কার ধারণা হিরোফিলাসের পূর্বে বোধ হয় আর কেহ করিতে পারেন নাই। তিনি সংবেদ-নার্ভ ও চেষ্টীয় নার্ভের (motor nerve) মধ্যে প্রভেদ নিরূপণ করেন। হিরোফিলাস্‌ শোণিত-সংবহন প্রণালীও (Circulation of blood) বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার অবশ্য ধারণা ছিল, ধমনী ও শিরা উভয়েই শোণিত বহন করে; ইহাদের প্রভেদ তিনি ধরিতে পারেন নাই। তবে দেহ-ব্যবচ্ছেদের অভিজ্ঞতার ফলে ধমনী ও শিরার সঠিক বর্ণনা তিনি দিয়াছিলেন।

হিরোফিলাস্‌ প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। ভেষজবিদ্যায় তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। পূর্ব নির্ধারিত কোন মতবাদের উপর নির্ভর না করিয়া পর্যবেক্ষণমূলক অভিজ্ঞতার সাহায্যে রোগীর চিকিৎসা করা তাঁহার বিশেষত্ব ছিল।

ইরাসিস্‌ট্রেটাস্‌

ইরাসিস্‌ট্রেটাস্‌ হিরোফিলাসের সমসাময়িক এবং তাঁহার অপেক্ষা বয়সে ছোট ছিলেন। হিরোফিলাস্‌ হইতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করেন। মানব-দেহ-ব্যবচ্ছেদে তিনি নিপুণ ছিলেন এবং প্রাণিদেহ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছিলেন। তবে

* Lacy O'Leary, *How Greek Science Passed to the Arabs;* p. 20.

শারীরবৃত্তের গবেষণায় তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। শোণিত-সংবহন প্রণালী, ধমনী ও শিরার ক্রিয়া, মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্তু প্রভৃতি নানা বিষয়ে ইরাসিস্ট্রেটাসের মৌলিক গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়।

ধমনী ও শিরার ক্রিয়া সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিরা ও ধমনীর অতি ক্ষুদ্র বিভাগ লক্ষ্য করিয়া তিনি মনে করেন, ইহারা জালক বা কৈশিক নাড়ীর সাহায্যে সংযুক্ত। তারপর জীবন্ত প্রাণীর ধমনী ছিন্ন হইলে ছিন্ন স্থান হইতে বেগে শোণিত-প্রবাহ দেখা যায়; কিন্তু মৃত প্রাণীর ধমনী-ছেদের ফলে শোণিত নির্গত হয় না, কারণ ধমনী বায়ুপূর্ণ থাকে। ভ্রান্ত হইলেও তিনি ইহার এক চমৎকার ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। স্ট্রাটোর পদার্থ বিষয়ক গবেষণা হইতে তিনি অবগত হন যে, জলীয় পদার্থ শূন্য স্থানের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়, এমন কি নীচের দিক হইতে উপরের দিকে পর্যন্ত সজোরে উত্থিত হয়। উদস্থিতিবিদ্যার (hydrostatics) এই তথ্য তিনি প্রয়োগ করিয়া বলিলেন, ধমনীরা সাধারণতঃ বাতাসের দ্বারা ভর্তি থাকে; ধমনী ছিন্ন হইলে বাতাস বহির্গত হয় ও তাহার ফলে ধমনীর ভিতর শূন্য স্থানের সৃষ্টি হয়। এই শূন্য স্থান পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে তখন শিরা হইতে ধমনীতে শোণিত প্রবাহিত হয় এবং ছিন্ন মুখে বাহিরে নির্গত হয়। ইরাসিস্ট্রেটাসের ব্যাখ্যার মৌলিকতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারিল না এবং গ্যালেনের পূর্ব পর্যন্ত চারিশত বৎসর পণ্ডিতেরা এই ব্যাখ্যাই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। গ্যালেন প্রথম জীবন্ত প্রাণীর দেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া প্রমাণ করেন যে, স্বাভাবিক অবস্থায় ধমনী বায়ুপূর্ণ থাকে না। ইহার মধ্য দিয়া শোণিত প্রবাহিত হয়। গ্যালেনেরও প্রায় দেড় হাজার বছর পরে শোণিত-সংবহন প্রণালীর প্রথম অধুনাস্বীকৃত মতবাদ প্রস্তাব করেন উইলিয়ম হার্ভি (১৫৭৮-১৬৫৭)।

৬·৩। গণিত ও পদার্থবিদ্যা

ইউক্লিড (খ্রীঃ পূঃ ৩৩০-২৭৫)

প্রথম টলেমীর রাজত্বকালে যে অল্প কয়েকজন বিজ্ঞানীর প্রতিভা আলেক্‌জান্দ্রীয় বিজ্ঞানের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করিয়াছিল, ইউক্লিড্ তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি মিউজিয়ামে গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন আনুমানিক খ্রীঃ ৩০০ পূর্বাব্দে। মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের গণিত শাখার কিউরেটার ও প্রধান হিসাবেও তিনি কাজ করেন এবং অধ্যাপনায় তাঁহার বিশেষ সুনাম ছিল। ইউক্লিডের জন্মবৃত্তান্ত এবং কোথায় তিনি বিদ্যাভ্যাস ও শিক্ষা লাভ করেন, সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ এথেন্সে তিনি বিদ্যাভ্যাস করেন। প্লেটোর বিদ্যাপীঠের গণিত ও জ্যামিতির প্রভাব তাঁহার চিন্তাধারায় ও রচনায় সুপরিস্ফুট।

ইউক্লিড্ সমগ্র জ্যামিতিক জ্ঞানকে একত্র গ্রথিত করিয়া তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত পুস্তক *Elements*এ ইহার যে রূপ ও সংহতি প্রদান করেন, প্রায় দুই হাজার বৎসরের মধ্যে তাহার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। জ্যামিতি অবশ্য বহু সুপ্রাচীন বিদ্যা। মাইলেটাসের থালেস্ হইতে আরম্ভ করিয়া স্নাইডাসের ইউডক্সাস্ পর্যন্ত বহু বিশিষ্ট গণিতজ্ঞের চিন্তা ও গবেষণায় এই বিদ্যা ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হইয়া আসিয়াছিল। অ্যানাক্সা-গোরাস্, পিথাগোরাস্ ও তাঁহার শিষ্যগণ, চিওসের হিপোক্রেটিস্, আর্কিটাস্, মেনেক্মাস প্রমুখ বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ বিভিন্ন পর্যায়ে ইহার উন্নতি সাধন করেন। প্লেটোর বিদ্যাপীঠে জ্যামিতিক গবেষণার গুরুত্ব ও সমাদরের কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। ইউক্লিডের পূর্বে রোড্‌সের ইউডিমাস্ জ্যামিতির এক ইতিহাস প্রণয়ন করেন আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩২০

অব্দে। এইভাবে ইউক্লিড মোটামুটি একরূপ সুসম্বন্ধ জ্যামিতি হাতে পাইয়াছিলেন। তথাপি এই বিদ্যায় করিবার তখন পর্যন্ত অনেক কিছুই বাকী ছিল। বহু উপপাদ্য ও প্রতিজ্ঞার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ছিল না। তারপর পূর্ববর্তী প্রতিজ্ঞা হইতে কিরূপে পরবর্তী প্রতিজ্ঞার স্বাভাবিক উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা দেখাইয়া ন্যায়সংগত ক্রমে প্রতিজ্ঞাগুলিকে ইতিপূর্বে কেহ সাজাইবার চেষ্টা করেন নাই। ইউক্লিড সমগ্র জ্যামিতিকে এইরূপ ন্যায়সংগত ক্রমে ঢালিয়া সাজাইতে মনোযোগী হইলেন। তিনি প্রথমেই যে অল্প সংখ্যক স্বতঃসিদ্ধের উপর সমগ্র জ্যামিতির কলেবর প্রতিষ্ঠিত সেই স্বতঃসিদ্ধগুলিকে পৃথক করিয়া লইলেন। বহু প্রতিজ্ঞার নূতন প্রমাণ আবিষ্কার করিলেন। বহু নূতন প্রতিজ্ঞার সংযোজনা করিলেন। তারপর প্রত্যেক প্রতিজ্ঞার প্রমাণ নিরূপণের উদ্দেশ্যে সাধারণ ও বিশেষ নির্বাচন, অংকন, প্রয়োজনীয় কল্পনা, প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বিভিন্ন ধাপ তিনি বাঁধিয়া দিলেন। এইরূপে যুক্তিপরম্পরার ভিত্তিতে প্রণালীবদ্ধ ও ত্রয়োদশ খণ্ডে সমাপ্ত ইউক্লিডের জ্যামিতি আধুনিককালের গণিত-শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রায় অপরিবর্তিতভাবেই রহিয়া গিয়াছে।

ইউক্লিডের জ্যামিতি যে নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর তাহা অবশ্য বলা চলে না। তাঁহার অনেক প্রতিজ্ঞার প্রমাণ অনাবশ্যকভাবে জটিল ও একঘেয়ে। তারপর স্বতঃসিদ্ধগুলি একপ্রকার বিশেষ দেশ, ইউক্লিডীয় দেশের (Euclidean space) ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবশ্য এই ইউক্লিডীয় দেশের পরিকল্পনা সাধারণ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা হইতেই উদ্ভূত। এইরূপ দেশ স্বীকার করিয়া লইলে ইউক্লিডের প্রতিপাদ্যগুলির যুক্তি ও প্রমাণ অভ্রান্ত ও অবিসংবাদিত। নিউটন এইরূপ দেশ স্বীকার করিয়াই তাঁহার গণিত ও জ্যোতিষের কাঠামো রচনা করিয়াছিলেন। অ্যাডাম্‌স্‌ ও লেভেরিয়েরের কাল পর্যন্ত নানাবিধ জ্যোতিষীয় তথ্যের সহিত ইউক্লিডীয় দেশের ভিত্তিতে রচিত গাণিতিক মতবাদের অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় নাই। তাহার অল্প কাল পরেই এমন কতকগুলি নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয় যাহাতে ইউক্লিডীয় দেশের পরিকল্পনা অচল হইয়া পড়ে এবং সাধারণ অভিজ্ঞতার অতীত সম্পূর্ণ নূতন ধরনের দেশ গণিতজ্ঞদের কল্পনা করিয়া লইতে হয়। এইরূপ দেশে ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধগুলি অচল ও ভ্রমাত্মক, সুতরাং জ্যামিতিও অচল। বিজ্ঞানীকে নূতন জ্যামিতি ও গণিত সৃষ্টি করিতে হইল প্রকৃতি ও পদার্থের এই সব নব নব রহস্যের কিনারা করিতে। প্রয়োজন হইল আইন্‌ষ্টাইনের প্রতিভার।

জ্যামিতি ছাড়া গণিতের অন্যান্য বিভাগেও ইউক্লিডের নানাবিধ মৌলিক গবেষণার প্রমাণ আছে। মৌলিক সংখ্যার (Prime numbers) কোন নির্দিষ্ট সীমা, অর্থাৎ বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা বলিয়া কিছু আছে কি না, সে সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করেন। আমরা জানি সংখ্যারা মৌলিক ও মিশ্র, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। মৌলিক সংখ্যার কোন গুণক হয় না; মিশ্র সংখ্যা একাধিক গুণকের গুণফল। উদাহরণস্বরূপ, ২, ৩, ৫, ৭, ১১, ১৩ ইত্যাদি মৌলিক সংখ্যা; ৪(২×২), ৬(৩×২), ৮(২×২×২), ৯(৩×৩) ইত্যাদি মিশ্র সংখ্যা। প্রথম দিকে মিশ্র সংখ্যার অনুপাতে মৌলিক সংখ্যারা অনেক বেশী থাকে, কিন্তু সংখ্যা ক্রমাগত বাড়াইয়া গেলে মিশ্র সংখ্যার অনুপাত বাড়িতে থাকে। যেমন, প্রথম ৬টি সংখ্যার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ মৌলিক সংখ্যা, অবশিষ্ট মিশ্র; প্রথম ১২টি সংখ্যার মধ্যে অর্ধেক মৌলিক, অর্ধেক মিশ্র; ২৪টি সংখ্যার ক্ষেত্রে মাত্র ৯টি, অর্থাৎ ৮ ভাগের ৩ ভাগ সংখ্যা মৌলিক। এইভাবে বাড়াইয়া গেলে ৯৬ সংখ্যার বেলায় দেখা যাইবে, মৌলিক সংখ্যা মাত্র এক-চতুর্থাংশ। এখন প্রশ্ন হইতেছে, এইভাবে সংখ্যা ক্রমাগত বাড়াইয়া যাইবার ফলে মৌলিক সংখ্যার অনুপাত ক্রমশঃ কমিতে থাকায় শেষ পর্যন্ত কোন এক বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যায় অর্থাৎ যার বড় আর মৌলিক হইতে পারে না, এরূপ একটি সংখ্যায় পৌঁছানো সম্ভবপর কি না। ইউক্লিড এই প্রশ্নের এক সহজ মীমাংসা প্রদর্শন করেন। ধরা যাক্, এইরূপ একটি বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যার অস্তিত্ব সম্ভবপর এবং ইহা হইতেছে P, তবে সহজেই প্রমাণ করা যাইবে যে, [(১×২×৩×...P)+১] সংখ্যাটি একই সংগে মিশ্র ও

মৌলিক সংখ্যা হইবে। ইহা মৌলিক সংখ্যা হইবে, কারণ P পর্যন্ত সর্বপ্রকার মৌলিক সংখ্যার দ্বারা ভাগ করিলেও প্রতিবারই ১ অবশিষ্ট থাকিবে। তারপর এই কল্পনা অনুযায়ী P-র উপর আর কোন মৌলিক সংখ্যা থাকা সম্ভব নয় এবং যেহেতু $[(১\times২\times৩\times...P)+১]$ P হইতে বৃহত্তর, ইহা একটি মিশ্র সংখ্যা। এখন একই সংখ্যা যুগপৎ মৌলিক ও মিশ্র হইতে পারে না। অতএব বৃহত্তর মৌলিক সংখ্যার কল্পনা ভ্রান্ত।

ইউক্লিড ২৫টি বিভিন্ন অমেয় রাশি (incommensurable number) আবিষ্কার করেন। দুইটি প্রমেয় রাশির (commensurable number) বর্গমূলের যোগ অথবা বিয়োগ ফলের আবার বর্গমূল নির্ণয়ের দ্বারা এই অমেয় রাশি প্রকাশ করা সম্ভব। অর্থাৎ—

$$p = \sqrt{\sqrt{m} \pm \sqrt{n}}$$

p — অমেয় রাশি;

m, n — প্রমেয় রাশি।

অমেয় রাশি সম্বন্ধে এইরূপ গবেষণা ইউক্লিডের পরে দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে আর কেহ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা নাই।

আলোকবিদ্যা : ইউক্লিডের গবেষণা শুধু গণিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আলোকতত্ত্ব ও সঙ্গীত শাস্ত্রেও তিনি গবেষণা করিয়াছেন। তাঁহার *Optics* নামক পুস্তকে আলোকের প্রতিফলন ও তাহার নিয়ম আলোচিত হইয়াছে। আলোকের স্বরূপ সম্বন্ধে এই পুস্তকে ইউক্লিড লেখেন যে, আলোক চক্ষু হইতে সরল রেখায় বিচ্ছুরিত হয় এবং বস্তুর উপর নিপতিত হইয়া বস্তুকে দৃশ্যমান করে। বস্তু হইতে আলোকের উদ্ভব যে সম্ভবপর নহে, এই বিশ্বাসের স্বপক্ষে তিনি এক যুক্তি-প্রদর্শন-প্রসঙ্গে বলেন যে, তাহা হইলে সূঁচ মাটিতে পড়িলে খুঁজিয়া বাহির করিতে এত বেগ পাইতে হইত না।*

ইউক্লিডের পূর্বে আলোকের স্বরূপ সম্বন্ধে অ্যারিস্টটল্‌ও এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী ছিলেন। পক্ষান্তরে পিথাগোরীয়রা কিন্তু বলিয়াছিলেন, আলোক উজ্জ্বল বস্তু হইতে অতি ক্ষুদ্র অজস্র কণিকার আকারে প্রবাহিত হইয়া চক্ষুতে প্রবেশ করিয়া বস্তুর অস্তিত্ব প্রকট করে। আলোক সম্বন্ধে নিউটনের কণিকাবাদের সহিত এই মতের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। আয়োনীয় এম্পিডক্লেস্ বলিয়াছিলেন, আলোকের বেগ আছে, এক বিশেষ মাধ্যমে ইহা প্রবাহিত হয়, এবং এই মাধ্যমে এক প্রকার আলোড়নের ফল আলোক। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত আলোকের তরঙ্গবাদের ইহাই পূর্বাভাস।

যাহা হউক, ইউক্লিড প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মূলতঃ জ্যামিতিক গবেষণাতেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। তিনি সর্বকালের ও সর্বদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যামিতিবিদ্ ছিলেন, ইহা নিঃসংশয়ে বলা চলে। জ্যামিতি সম্বন্ধে ইউক্লিডের এক উক্তি কালসহকারে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। তাহা হইল, "There is no royal road to geometry."

আর্কিমিডিস্ (খ্রীঃ পূঃ ২৮৭-২১২)

ইউক্লিড যদি জ্যামিতির মান সর্বকালের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া গিয়া থাকেন, আর্কিমিডিস্ ভিত্তি স্থাপন করিলেন বলবিদ্যার ও পূর্তবিদ্যার। উদস্থিতিবিদ্যা (hydrostatics) সংক্রান্ত গবেষণার জন্য তিনি সাধারণ পাঠকের নিকট পরিচিত। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে যে সব তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে তিনি সেই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ, পদার্থবিদ্ ও পূর্তবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। গণিতের সহিত ব্যবহারিক বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার এইরূপ

* **"For if light proceeded from the object we should not, as we often do, fail to perceive a needle on the floor". Euclid, *Optics*.**

সমন্বয় ও সামঞ্জস্য-সাধন তাঁহার পূর্বে আর দেখা যায় না। বর্তমান বিজ্ঞানাদর্শের বিচারে তিনি ছিলেন প্রকৃত বিজ্ঞানী। দর্শন ও শুদ্ধ আত্মিক চিন্তার সহিত বিজ্ঞানকে মিশাইয়া তিনি এক খিচুড়ি পাকাইবার চেষ্টা করেন নাই। তারপর বিজ্ঞানের সমগ্র বিভাগের পরিবর্তে মাত্র অল্প কয়েকটি বিভাগ বাছিয়া লইয়া কেবলমাত্র সেই সকল বিভাগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণতম জ্ঞানার্জন ছিল তাঁহার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এইজন্য যে বিষয়েই তিনি মনোনিবেশ করিয়াছেন তাহাতেই তিনি এক পরিপূর্ণতা আনিয়া দিয়াছিলেন। প্রসংগত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বহু বিদ্যার অনুশীলনের পরিবর্তে এক বা অল্পসংখ্যক বিদ্যার একাগ্র অনুশীলন ও বৈশিষ্ট্য-সম্পাদন আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞান-সাধনার বিশেষত্ব ছিল এবং এই গুণ ইউক্লিড হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী প্রায় সকল বিজ্ঞানীতেই দেখা যায়।

সংক্ষিপ্ত জীবনী : আর্কিমিডিসের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অল্প যাহা জানা যায়, তাহা প্রাচীনকালের লেখকদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানা রচনা, টীকা ও গল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত। হেরাক্লিডিস্ তাঁহার এক জীবনী লিখিয়াছিলেন, *Measurement of the Circle* গ্রন্থের টীকাকার ইউটোসিয়াস্ তাহার উল্লেখ করেন। এই জীবনী কালসহকারে বিনষ্ট ও অবলুপ্ত হয়। স্যার টমাস্ হীথ তাঁহার *The Works of Archimedes* পুস্তকে আর্কিমিডিসের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছু মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন।

আর্কিমিডিসের পিতা ফিডিয়াস্ জ্যোতির্বিদ্ ছিলেন। সিসিলির সাইরাকিউজ-রাজ পরিবারের সহিত সম্ভবতঃ আর্কিমিডিস্-বংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। রোমক সৈন্য কর্তৃক সাইরাকিউজ বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠিত হইবার সময় (খৃীঃ পূঃ ২১২) তিনি জনৈক সৈন্যের হস্তে নিহত হন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ ছিল, পণ্ডিতদের এইরূপ অনুমান হইতে তাঁহার জন্মসন খৃীঃ ২৮৭ পূর্বাব্দ নির্ধারিত হইয়াছে। আলেকজান্দ্রিয়ার মিউজিয়ামে তিনি বিদ্যাভ্যাস করেন। এইখানে ইউক্লিডের জ্যামিতি ও গণিতের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে এবং সম্ভবতঃ গণিতবিভাগে ইউক্লিডের পরবর্তী অধ্যাপকদের নিকট হইতে তিনি গণিত-চর্চার সুযোগ পান। এই সময় তিনি বিশিষ্ট গণিতবিদ্ সামোসের কোনন ও কোননের শিষ্য ডোসিথিয়াসের সংস্পর্শে আসেন। আর্কিমিডিস্ তাঁহার বহু গ্রন্থ কোনন ও ডোসিথিয়াসের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক ও জ্যোতির্বিদ্ ইরাটোস্থেনিসের সংগে তাঁহার আলেক্জান্দ্রিয়াতেই আলাপ। বিদ্যাভ্যাসের অল্পকাল পরে আর্কিমিডিস্ সাইরাকিউজে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার অধিকাংশ গবেষণা স্বদেশে অবস্থানকালেই সম্পাদিত হয়; চিঠিপত্র ও পুস্তকাদি আদান-প্রদানের মাধ্যমে আলেক্জান্দ্রিয়ার বিজ্ঞানীদের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগ অবশ্য তিনি বরাবার অব্যাহত রাখিয়াছিলেন।

সাইরাকিউজ বিধ্বস্তের সময় রোমক সৈন্যের হস্তে আর্কিমিডিসের মৃত্যুর ঘটনা মর্মন্তুদ। বহু বৎসর ধরিয়া রোমকদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি আত্মরক্ষা-মূলক নানারূপ বৈজ্ঞানিক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। প্রস্তরখণ্ড বর্ষণের জন্য তাঁহার ক্যাটাপাল্ট (Catapult) যন্ত্র বিখ্যাত। এই নিক্ষেপক যন্ত্রটি নগর-প্রাচীরের ছিদ্রপথে বহির্দেশে প্রসারিত থাকিত এবং ভিতর হইতে চালনা করিয়া বিভিন্ন দূরত্বে রীতিমত ভারী প্রস্তরখণ্ড অবলীলাক্রমে শত্রুর অভিমুখে নিক্ষেপ করা হইত। তারপর অনেকটা কপিকলের মত ও একপ্রান্তে সাঁড়াশির আকারে লোহার আংটা ও চঞ্চুবিশিষ্ট লম্বা লম্বা কাঠের খুঁটি আর্কিমিডিসের নির্দেশ অনুযায়ী প্রাচীরগাত্রে বসানো হইয়াছিল; এই খুঁটিগুলিকে লিভারের সাহায্যে উপরে ও নীচে, দক্ষিণে ও বামে, সামনে ও পিছনের নানা দিকে ও নানা ভাবে চালনা করিবার ব্যবস্থা ছিল। শত্রু নিকটবর্তী হইলেই এই কপিকলের সাহায্যে ভূমি হইতে বিরাট প্রস্তরখণ্ড উত্তোলন করিয়া বাহিনীর উপর সজোরে নিক্ষেপ করা হইত। অনেক সময় ইহাদিগকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত প্রসারিত করিয়া চঞ্চুর সাহায্যে বড় বড় জাহাজগুলিকে পর্যন্ত মাটিতে আছড়াইয়া ভাঙ্গা হইত। এইরূপ কৌশলের বিরুদ্ধে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রোমক

সৈন্যরা বহুবার অবরোধ পরিত্যাগ করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিল। আর্কিমিডিসের কৌশল বানচাল করিবার অক্ষমতার জন্য রোমক সৈন্যাধ্যক্ষ মার্সেলাস্ তাঁহার ইঞ্জিনীয়রদের কিভাবে হেয় ও অপদস্থ করিতেন, প্লুটার্ক তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"....Shall we not make an end of fighting against this geometrical Briareus who, sitting at ease by the sea, plays pitch and toss with our ships to our confusion, and by the multitude of missiles that he hurls at us outdoes the hundred-handed giants of mythology."*

কিন্তু ভর্ৎসনা ও নিন্দাবাক্যে কোন ফল হয় নাই। রোমক সৈন্যরা এতদূর ভীত ও ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে নগরপ্রাচীর হইতে সামান্য একটু দড়ি বা কাষ্ঠখণ্ড ঝুলিতে দেখিলেও ভয়ে বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিত।

দীর্ঘ অবরোধের পরে সাইরাকিউজের পতন ঘটে (খ্রীঃ পূঃ ২১২)। এই পতনের পর যে বিশৃঙ্খলা, হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠতরাজের মুখে সহরটি পতিত হয়, তাহাতে আর্কিমিডিস্ জনৈক রোমক সৈন্যের হস্তে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। কাহারও মতে, কোনও একটি জ্যামিতিক প্রশ্নের সমাধানকল্পে গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় থাকিবার কালে রোমকদের নগরপ্রবেশের কথা তিনি টের পান নাই এবং জনৈক রোমক সৈন্য তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া হত্যা করে। আর এক বিবরণ অনুসারে রোমক সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট তাঁহাকে অবিলম্বে যাইতে বলা হইলে, তিনি তাঁহার আরব্ধ প্রশ্ন শেষ না করিয়া উঠিবেন না, এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করায় সৈন্যটি তাহাকে হত্যা করে।* আবার কেহ বলেন, সাইরাকিউজ পতনের সংবাদ পাইলে আর্কিমিডিস্ মার্সেলাসের নিকট সূর্যবলয়, গোলক, কোণ-নির্দেশক যন্ত্র প্রভৃতি কয়েকটি জ্যোতিষীয় যন্ত্রপাতি বহন করিবার সময় পথে জনৈক সৈনিক তিনি লুকাইয়া স্বর্ণ লইয়া যাইতেছেন এই ভাবিয়া তাঁহাকে হত্যা করে।

এই কাহিনী হইতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, দুই সহস্র বৎসর পূর্বেও আত্মরক্ষার ব্যাপারে শাসকবর্গ বিজ্ঞানীর শরণাপন্ন হইয়াছে, অথবা বিজ্ঞানী স্বেচ্ছায় তাহার বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা বিপদকালে দেশের সেবায় নিয়োজিত করিয়াছে। যুদ্ধে আর্কিমিডিসের মৃত্যুর সহিত প্রথম মহাযুদ্ধে শত্রুর গুলিতে মোজ্‌লের মৃত্যুর সবিশেষ মিল আছে।

স্বরচিত গ্রন্থ: আর্কিমিডিসের লিখিত বহু পুস্তকের মধ্যে যেগুলিকে উদ্ধার করা সম্ভবপর হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য:—

On the Equilibrium of Planes, I;
Quadrature of the Parabola;
On the Equilibrium of Planes, II;
On the Sphere and Cylinder;
On Spirals;
On Conoids and Spheroids;
On Floating Bodies, I and II;
Measurement of a Circle;
এবং *The Sand-reckoner.*

Cattle problem নামে গণিত সম্বন্ধীয় এক জটিল প্রশ্নের রচয়িতা হিসাবেও ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে কৃতিত্ব দিয়া থাকেন। এই শেষোক্তটি আলেকজান্দ্রিয়ার গণিতজ্ঞের উদ্দেশ্যে ইরাটোস্থেনিস্‌কে লিখিত এক পত্রের শিরোনামা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উপরিউক্ত

* Plutarch, *Marcellus*, 17,

অধিকাংশ গ্রন্থই পরে বহু অধ্যবসায় ও চেষ্টার দ্বারা খুঁজিয়া বাহির করা হইয়াছে। আর্কিমিডিস্ ডোরিক কথ্য ভাষায় লিখিতেন। কিন্তু বহু হাত বদলাইবার ফলে ও বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হওয়ায় সেই আদি ডোরিক সংস্করণের ও রচনা-পদ্ধতির বিস্তর পরিবর্তন ও বিকৃতি ঘটিয়াছে।

উদস্থিতিবিদ্যা: উদস্থিতিবিদ্যায় আর্কিমিডিসের সূত্র সুপরিচিত। কোন বস্তুকে আংশিক বা পরিপূর্ণভাবে তরল পদার্থে নিমজ্জিত করিলে সেই বস্তুর ভার লাঘব হইয়া থাকে। এই ভার-লাঘবের পরিমাণ হইতেছে, তরল পদার্থের মধ্যে আপনার স্থান করিয়া লইতে যে পরিমাণ তরল পদার্থ বস্তুটিকে অপসারণ করিতে হয় ঠিক সেই পরিমাণ তরল পদার্থের ওজন। আর্কিমিডিস্ অনেকগুলি প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়া ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। যেমন:

"(১) যদি ঘন বস্তুর ওজন একই আয়তনের তরল পদার্থের ওজনের সমান হয় তবে এই ঘন বস্তুকে তরল পদার্থের মধ্যে নিমজ্জিত করিলে তাহা ডুবিবেও না অথবা কিছুটা অংশ তরল পদার্থের উপরে থাকিয়া ভাসিবেও না।" (Prop.3)

"(২) তরল পদার্থ হইতে কঠিন পদার্থ অপেক্ষাকৃত হাল্কা হইলে, কঠিন পদার্থ তরল পদার্থে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হইবে না, ইহার কিছুটা অংশ উপরে বাহির হইয়া থাকিবে।" (Prop. 4)

"(৩) কঠিন পদার্থ অপেক্ষাকৃত ভারী তরল পদার্থে নিমজ্জিত করিলে, ইহা এইরূপ আংশিকভাবে নিমজ্জিত থাকিবে যে সমগ্র কঠিন পদার্থের ওজন অপসারিত তরল পদার্থের ওজনের সমান।" (Prop. 5)

"(৪) তরল পদার্থে তাহা অপেক্ষা অধিকতর ভারী কঠিন পদার্থ নিমজ্জিত করিলে এই কঠিন পদার্থ তরল পদার্থের তলদেশ পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিবে এবং এই তরল পদার্থে গৃহীত কঠিন পদার্থের ওজন তাহার প্রকৃত ওজন অপেক্ষা কম হইবে; এই ওজনের পার্থক্য (কঠিন বস্তু কর্তৃক) অপসারিত তরল পদার্থের ওজনের সমান।" (Prop. 7) *

দুই খণ্ডে সমাপ্ত *On Floating Bodies* পুস্তকে আর্কিমিডিস্ ১৯টি প্রতিজ্ঞা সংযোজনা করিয়াছেন। কঠিন বস্তুগুলির বিভিন্ন জ্যামিতিক আকৃতি হইলে তাহারা তরল পদার্থে কিভাবে ভাসমান থাকিবে সেই সম্বন্ধে প্রমাণসহ অনেকগুলি আলোচনা আছে।

আর্কিমিডিসের সূত্র হইতেই আপেক্ষিক গুরুত্বের ধারণা। তিনি আপেক্ষিক গুরুত্ব মাপিবার এক সহজ উপায়ও বাহির করিয়াছিলেন। একটি পাত্রকে জলে সম্পূর্ণ ভর্তি করিয়া তাহার মধ্যে নির্দিষ্ট ওজনের একটি কঠিন বস্তু নিমজ্জিত করা হয়। অপসারণের ফলে পাত্রের বাহিরে যে জল উপছাইয়া পড়ে, তাহার ওজন মাপিয়া আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা যায়। আপেক্ষিক গুরুত্বের ধারণার অভাবে অ্যারিস্টট্ল্ ভারী ও লঘু বস্তুর পার্থক্য সম্বন্ধে কিরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেন ও অদ্ভুত মন্তব্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। আর্কিমিডিসের এই আবিষ্কারের সহিত একটি গল্প প্রচলিত আছে। সাইরাকিউজরাজ হীরণের একবার সন্দেহ হয়, তাঁহার স্বর্ণ-মুকুটের সহিত রূপার খাদ মিশানো হইয়াছে। মুকুটকে নষ্ট না করিয়া যথার্থই খাদ মিশানো হইয়াছে কি না, তাহা নিরূপণের জন্য তিনি আর্কিমিডিসের পরামর্শ চাহিয়া পাঠান। জলে দেহ ডুবাইয়া স্নান করিবার সময় দেহ হাল্কা বোধ হয় এবং দেহের সমপরিমাণ জল অপসারিত হয়, ইহা লক্ষ্য করিয়াই নাকি আর্কিমিডিস্ আপেক্ষিক গুরুত্বের আবিষ্কার ও হীরণের স্বর্ণমুকুটের সমস্যার সমাধান করেন।

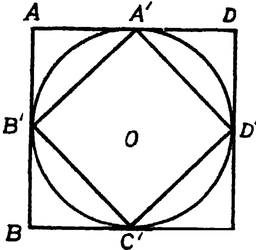
গণিত: গণিত ও জ্যোতিষের নানা বিভাগে আর্কিমিডিসের বহু মূল্যবান গবেষণা থাকিলেও জ্যামিতিক গবেষণাতেই তিনি অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করেন। আর্কিমিডিসের যে সব

* T. L. Heath, *The Works of Archimedes*, p. 255 গ্রন্থে প্রদত্ত আর্কিমিডিসে উপরিউক্ত সূত্রের ইংরেজী অনুবাদের বঙ্গানুবাদ।

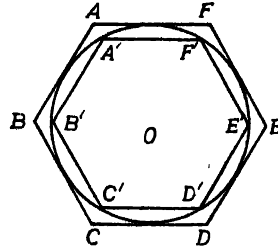
গ্রন্থের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের প্রায় সবগুলিরই আলোচ্য বিষয় জ্যামিতির কোন না কোন প্রশ্ন অথবা প্রয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা। তাঁহার প্রত্যেকটি জ্যামিতিক গবেষণাই মৌলিক। পূর্বগামীরা যে পর্যন্ত কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহার পর নূতন কিছু করা, যে সমস্যার সমাধানে তাঁহারা বিফল হইয়াছেন সেই সমস্যার সমাধান করা, যে কাজ তাঁহারা অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাকে সম্পূর্ণ করাই ছিল তাঁহার গবেষণার লক্ষ্য। তিনি সর্বদাই চেষ্টা করিতেন নূতন কিছু করিতে। তিনি বৃত্তের ক্ষেত্র, গোলকের উপরিভাগের ক্ষেত্র ও তাহার আয়তন নিরূপণ করিবার উদ্দেশ্যে 'π'এর মান এবং এই সব ক্ষেত্র ও আয়তনের সহিত π ও ব্যাসার্ধের সম্বন্ধ* আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এইভাবে শঙ্কু, পিরামিড ও নানা আকারের ঘন বস্তুর আয়তন ও উপরিভাগের ক্ষেত্রফল তিনি নির্ণয় করেন। তাঁহার π -এর মান-নির্ণয়ের ব্যাপার উল্লেখযোগ্য। মনে করা যাক, O-কেন্দ্রীয় বৃত্তটি A B C D বর্গক্ষেত্রের অন্তর্বৃত্ত ও A′B′C′D′ বর্গক্ষেত্রের পরিবৃত্ত। সুতরাং এই বৃত্তের ক্ষেত্রফল (S) দুই বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের মধ্যবর্তী হইবে। অর্থাৎ

$$S > 2r^2$$
$$< 4r^2$$

৮১নং চিত্রে $ABCDEF$ ও $A'B'C'D'E'F'$ একটি বৃত্তের যথাক্রমে বহির্বর্তী ও অন্তর্বর্তী দুইটি সুষম ষড়ভুজ (regular hexagon)। সুতরাং বৃত্তের ক্ষেত্রফল



৮০।



৮১।

অন্তর্বর্তী ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল অপেক্ষা বড় কিন্তু বহির্বর্তী ষড়ভুজের ক্ষেত্রফল অপেক্ষা ছোট হইবে। অর্থাৎ,

$$S > 2{\cdot}598r^2$$
$$< 3{\cdot}464r^2$$

বৃত্তের ভিতরে ও বাহিরে সুষম অষ্টভুজের কল্পনা করিলে ক্ষেত্রফলের মান

$$2{\cdot}828r^2 \text{ ও } 3{\cdot}314r^2$$

-এর মধ্যবর্তী হইবে। এইভাবে সুষম বহুভুজের বাহুর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়াইয়া গেলে

* r যদি বৃত্ত বা গোলকের ব্যাসার্ধ হয় তবে,
(১) বৃত্তের পরিধির দৈর্ঘ্য $= 2\pi r$;
(২) বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi r^2$;
(৩) গোলকের উপরিভাগের ক্ষেত্রফল $= 4\pi r^2$;
(৪) গোলকের ঘনফল $= \frac{4}{3}\pi r^3$;
(৫) $\pi = \frac{2\pi r}{2r} = \frac{\text{বৃত্তের পরিধির দৈর্ঘ্য}}{\text{বৃত্তের ব্যাস}}$

বহির্বর্তী ও অন্তর্বর্তী বহুভুজের ক্ষেত্রফল ক্রমশঃ বৃহত্তর ক্ষেত্রফলের কাছাকাছি আসিয়া পড়িবে। ১৬-বাহু-বিশিষ্ট ক্ষেত্রের পরিকল্পনা করিলে, *S*-এর মান হইবে,

$$S > 3{\cdot}1395r^2$$
$$< 3{\cdot}1426r^2$$

অর্থাৎ π-এর মান ৩.১৩৯৫ ও ৩.১৪২৬-এর মাঝামাঝি। আর্কিমিডিস্ এই মান নির্ণয় করেন ৩.১৪০৮ ও ৩.১৪২৯-এর মধ্যে; ইহার অধুনা-নির্ণীত মান হইতেছে ৩.১৪১৬।

এইরূপ নির্ণয়-পদ্ধতির নাম নিঃশেষীকরণ পদ্ধতি (method of exhaustion)। ইহার প্রয়োগ করিয়া আর্কিমিডিস্ বৃত্তের, গোলকের ও উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল ও ঘনফল বাহির করেন।

গণিতে নিঃশেষীকরণ পদ্ধতির প্রকৃত আবিষ্কর্তা ইউডক্সাস্। আর্কিমিডিসের বহু পূর্বে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করিয়া তিনি গোলক, পিরামিড, শঙ্কু প্রভৃতি ঘনবস্তুর ঘনফল ও ক্ষেত্রফল নির্ণয় করেন। আর্কিমিডিসের হাতে এই পদ্ধতির পূর্ণ পরিণতি ঘটে। এই পদ্ধতির মধ্যে Integral Calculus আবিষ্কারের বীজ যে প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা অনস্বীকার্য।

আর্কিমিডিসের *On Conoids and Spheroids* নামক পুস্তকে অধিবৃত্ত ও উপবৃত্ত সম্পর্কিত বহু প্রতিজ্ঞার বিবৃতি ও প্রমাণ আছে। ঘন-জ্যামিতির কিছু কিছু কাজও এই পুস্তকে পাওয়া যায়।

গ্রীক সংখ্যা-লিখন পদ্ধতি ঃ গ্রীকদের সংখ্যা প্রকাশ করিবার পদ্ধতি অসম্ভব জটিল ও জবড়জঙ্গ ছিল। আধুনিক অঙ্কপাতন-পদ্ধতি তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। বর্ণমালার অক্ষর পর পর সাজাইয়া সংখ্যা নির্দিষ্ট হইত। তারপর শূন্যের পরিকল্পনা তখন অজ্ঞাত। গ্রীক বর্ণমালার সংখ্যা মাত্র ২৪ এবং ইহার সহিত অবলুপ্ত আরও দুইটি গ্রীক অক্ষর ও একটি ফিনিশীয় অক্ষর যোগ করিয়া ২৭টি অক্ষরের সাহায্যে তাহারা সংখ্যা প্রকাশ করিত। এই উপায়ে কয়েক মিলিয়ন পর্যন্ত হিসাব করিতে বিশেষ অসুবিধা হইত না; কিন্তু তাহার পরই উপস্থিত হইত এক অচল অবস্থা। আমরা এখন যেমন ১-এর পর যত ইচ্ছা 0 বসাইয়া অর্থাৎ ১০-এর মাথায় এই শূন্যের সংখ্যা সূচক হিসাবে ব্যবহার করিয়া যত বড় ইচ্ছা সংখ্যা প্রকাশ করিতে পারি, গ্রীকরা তাহা পারিত না। উদাহরণস্বরূপ, $১০^{২১৮}$ বলিতে কত বড় সংখ্যা প্রকাশ পায় স্কুলের ছাত্রও তাহা সহজে বুঝিতে পারে। গ্রীকদের কাছে ইহা একরূপ দুর্বোধ্য ছিল। বর্তমানে সভ্য পৃথিবীর সর্বত্র প্রচলিত দশমিক স্থানিক অঙ্কপাতন পদ্ধতি হিন্দুদিগের আবিষ্কার। এই আবিষ্কার মানব-প্রতিভার এক শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

আর্কিমিডিস্ গ্রীক অঙ্কপাতন পদ্ধতির অসুবিধা সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন। তথাপি এই একরূপ অসম্ভব পদ্ধতির সাহায্যে তিনি অতি বৃহৎ সংখ্যা যেভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা চিন্তা করিলে রীতিমত বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Sand-reckoner*-এ তিনি যে কোন বৃহৎ সংখ্যা প্রকাশ করিবার এক উপায় উদ্ভাবন করেন। প্রশ্নটির উৎপত্তি এইভাবে। মনে করা যাক, একটি পপিফুলের বীজের অনুরূপ আয়তনের মধ্যে ১০,000 বালুকণার স্থান হয়; এই বীজের ব্যাস আঙ্গুলের প্রস্থের ৪0 ভাগের এক ভাগ (১|৪0)। এখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-গোলকের ব্যাস যদি দশ হাজার মিলিয়ন ষ্টাডিয়া (Stadia)* ধরা যায়, তবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বালুকণার দ্বারা পরিপূর্ণ করিতে হইলে এই বালুকণার সংখ্যা কিরূপ হইবে? আর্কিমিডিস্ রাজা গেলনকে লিখিত এক পত্রের প্রারম্ভে এইরূপ প্রস্তাব করেন।

* ১ মাইল=১০ ষ্টাডিয়া

"কেহ কেহ মনে করেন, বালুকণারা অগণিত ও অসংখ্য। এই বালুকণার দ্বারা আমি শুধু সাইরাকিউজ্ ও সিসিলির বালুর কথাই মনে করিতেছি তাহা নহে, পৃথিবীর অন্তর্গত যত বালুর অস্তিত্ব সম্ভবপর, সব বালুর কথাই বলিতেছি। আবার কেহ কেহ এই বালুকণারা অগণ্য এইরূপ মনে না করিয়া বলেন যে, এমন কোন সংখ্যার নির্দেশ এ পর্যন্ত হয় নাই যাহা (উপরিউক্ত) সমগ্র বালুকণার সংখ্যাকে অতিক্রম করিতে পারে।.........কিন্তু আপনাকে আমি সহজবোধ্য জ্যামিতিক প্রমাণের সাহায্যে দেখাইব যে, জিউক্সিপ্পাসের নিকট প্রেরিত আমার এক গবেষণায় যে সব সংখ্যার কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহারা পৃথিবী কেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে বালুরাশির দ্বারা ভরাট করিতে হইলেও যেরূপ বৃহৎ সংখ্যক বালুকণার প্রয়োজন, সেই সংখ্যা অপেক্ষাও বৃহত্তর......অ্যারিস্টার্কাস্ স্থির নক্ষত্র পর্যন্ত সীমা নির্দিষ্ট করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের যে আয়তন নিরূপণ করিয়াছেন, এইরূপ বৃহৎ আয়তনের বালুময় গোলকের বালুকণার সংখ্যা হইতেও *Principles*-এ উল্লিখিত আমার সংখ্যারা অনেক বড়।*

তারপর আর্কিমিডিস্ দশ হাজার মিলিয়ন ষ্টাডিয়ার ব্যাসের গোলকে কত সংখ্যক বালুকণা থাকিতে পারে, তাহা হিসাব করিয়া বাহির করিলেন। এই সংখ্যা হইল $১০^{৬৩}$!

আর্কিমিডিসের সংখ্যা-তত্ত্বের গবেষণার এক জায়গায় সূচক-নিয়মের (law of indices) ইঙ্গিত আছে। আমরা জানি m ও n দুইটি অখণ্ড ধনরাশি হইলে,

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

আর্কিমিডিস্ দেখান যে, $১০^{৮}$, $১০^{১৬}$, $১০^{২৪}$ প্রভৃতি রাশিগুলি যে গুণোত্তর প্রগতির সৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহার পর পর যে কোন দুইটি রাশির গুণফল পরবর্তী রাশির সমান। অর্থাৎ

$$১০^{৮} \times ১০^{১৬} = ১০^{২৪}$$

ইহা অবিকল উপরিউক্ত সূচক-নিয়মের প্রয়োগ। এই সূচক-নিয়মের মধ্যে লগারিদ্‌মের গণনা-পদ্ধতি অন্তর্নিহিত। আর্কিমিডিসের প্রায় দুই হাজার বৎসর পরে লগারিদ্‌ম্ পদ্ধতির আবিষ্কার ঘটে।

আর্কিমিডিস্ অনুন্নত ও জটিল গ্রীক সংখ্যার সাহায্যে বীজগণিতের যে কিরূপ দুরূহ সমস্যার সমাধান করিতেন তাহার আর এক প্রমাণ Cattle-Problem বা গো-সমস্যা। সমস্যাটি হইতেছে এইরূপ। মনে করা যাক, সাদা, কালো, বাদামী ও ছাই রং-এর কতকগুলি ষাঁড় ও গরু আছে। বিভিন্ন রং-এর ষাঁড়ের সংখ্যা A, B, C, D ও গরুর সংখ্যা a, b, c, d। এখন বাদামী রং-এর ষাঁড়ের সংখ্যা হইবে সাদা ষাঁড়গুলি হইতে কালো ষাঁড়ের (১/২ + ১/৩) গুণ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা, অথবা কালো ষাঁড়ের সংখ্যা হইতে ছাই রং-এর ষাঁড়ের (১/৪ + ১/৫) গুণের বিয়োগ ফল, অথবা ছাই রং-এর ষাঁড়ের থেকে সাদা রং-এর ষাঁড়ের (১/৬ + ১/৭) গুণ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই। চিহ্নের সাহায্যে লিখিলে উপরিউক্ত বিবৃতি এইরূপ দাঁড়াইবে:

$$\begin{aligned} C &= A - (\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{3})B \\ &= B - (\tfrac{1}{4} + \tfrac{1}{5})D \\ &= D - (\tfrac{1}{6} + \tfrac{1}{7})A \end{aligned}$$

তেমনি; সাদা গরুর সংখ্যা হইবে কালো ষাঁড় ও গরুর মিলিত সংখ্যার (১/৩+১/৪) গুণ; কালো গরু ছাই রং-এর ষাঁড় ও গরুর মিলিত সংখ্যার (১/৪+১/৫) গুণ; ছাই রং-এর গরু

* Heath, *The Works of Archimedes;* p. 221.

বাদামী ষাঁড় ও গরুর মিলিত সংখ্যার (১/৫+১/৬) গুণ; এবং বাদামী গরু সাদা ষাঁড় ও গরুর মিলিত সংখ্যার (১/৬+১/৭) গুণ। অর্থাৎ

$$a=(\tfrac{1}{3}+\tfrac{1}{4})(B+b)$$
$$b=(\tfrac{1}{4}+\tfrac{1}{5})(D+d)$$
$$d=(\tfrac{1}{5}+\tfrac{1}{6})(C+c)$$
$$c=(\tfrac{1}{6}+\tfrac{1}{7})(A+a)$$

প্রশ্ন, সাদা, কালো, বাদামী ও ছাই রং-এর ষাঁড় ও গরুর প্রত্যেকের সংখ্যা কত? হয়ত বলা যাইতে পারে, এই সহ-সমীকরণগুলির সমাধান করিতে পারিলেই উত্তর মিলিবে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে, সহ-সমীকরণের তখনও উদ্ভব হয় নাই, এবং আর্কিমিডিস্ এই সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। বর্তমান নিয়মে এই সহ-সমীকরণের সমাধানও বড় সুসাধ্য নহে। আর্কিমিডিসের সমাধান হইল*ঃ—

	ষাঁড়	গরু
সাদা	৮২৯,৩১৮,৫৬০	৫৭৬,৫২৮,৮০০
কালো	৫৯৬,৮৪১,১২০	৩৮৯,৪৫৯,৬৮০
বাদামী	৩৩১,৯৫০,৯৬০	৪৩৫,১৩৭,০৪০
ছাই	৪৪৮,৬৪৪,৮০০	২৮১,২৬৫,৬০০

অংকশাস্ত্রে কি পরিমাণ জ্ঞান ও দক্ষতা থাকিলে গ্রীক অংকপাতনের ভিত্তিতে এইরূপ দুরূহ প্রশ্নের সমাধান করা যায়, ইহা তার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। একমাত্র আর্কিমিডিসের প্রতিভায়ই ইহা সম্ভব।

বলবিদ্যা ঃ ফলিত বলবিদ্যায় আর্কিমিডিসের অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার উদ্ভাবিত এক প্রকার স্ক্রুর (water screw) সাহায্যে সেচ-কার্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। খনি হইতে জল-নিষ্কাশন অথবা জাহাজের খোলের ভিতর হইতে জল বাহির করিবার ব্যাপারে এই স্ক্রুর এককালে ব্যাপক ব্যবহার ছিল। লিভার ও মিশ্র-পুলির প্রয়োগ করিয়া তিনি নানা প্রকার যন্ত্র নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই সব কাজে তাঁহার এইরূপ দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস ছিল যে তিনি বলিতেন, "আমাকে কোথাও দাঁড়াইবার একটু জায়গা দেওয়া হউক, আমি গোটা পৃথিবীকে নড়াইয়া দিব।"

হীরণ আর্কিমিডিসের এইরূপ উক্তির কথা শুনিয়াছিলেন এবং গল্প আছে যে, ইহার সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য আর্কিমিডিস্‌কে তিনি আহ্বান করেন। আর্কিমিডিস্ এক বিপুলকায় বাণিজ্যবাহী জাহাজ বাছিলেন এবং তাহাকে নানা ভারী দ্রব্যসম্ভারে বোঝাই করিলেন। জাহাজটি এইরূপ ভারী হইল যে, ইহাকে নড়াইতে বহু ক্রীতদাস গলদঘর্ম হইল এবং রাজা হীরণ তাহা দেখিলেন। সমস্ত প্রস্তুত হইলে আর্কিমিডিস একটি মিশ্র-পুলির সাহায্যে দূর হইতে জাহাজটিকে অনায়াসে ও অবলীলাক্রমে নিজেই চালনা করিলেন 'as if she were moving through the sea'।† কেহ বলেন, হীরণ আলেকজান্দ্রিয়ার টলেমীরাজের নিকট দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ এক বিরাট জাহাজ পাঠাইবার মনস্থ করেন। কিন্তু জাহাজ এইরূপ ভারী হইয়া গেল যে, বহু লোকে মিলিয়াও ইহাকে জলে ভাসাইতে পারিল না। আর্কিমিডিস্ তখন একটি মিশ্র-পুলির সাহায্যে জাহাজকে উত্তোলন করিয়া জলে

* James Jeans, *The Growth of Physical Science*, Cambridge University Press, 1947; p. 80.
Heath, *The Works of Archimedes;* p. 321; Wurm's Problem শীর্ষক আলোচনায় দ্রষ্টব্য।

† Plutarch.

ভাসাইয়া দিলেন। যাহাই হউক, হীরণ আর্কিমিডিসের প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তিতে এরূপ আশ্চর্যান্বিত হন যে অমাত্যবর্গকে বলিয়াছিলেন, আজ হইতে যে কোন বিষয়ে আর্কিমিডিস্ যাহা কিছুই বলিবেন, তাহাই বিশ্বাস করিতে হইবে।

জ্যোতিষঃ নভোমণ্ডলে সূর্য, চন্দ্র ও পাঁচ গ্রহের পরিক্রমণ বুঝাইতে তিনি এক বিরাট গোলক বা প্ল্যানিটেরিয়াম তৈয়ারী করাইয়াছিলেন। সিসেরো এই প্ল্যানিটেরিয়াম স্বচক্ষে দেখিয়া এক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই প্ল্যানিটেরিয়ামে চন্দ্র, সূর্য ও গ্রহদের পরিক্রমণগতি এরূপ নিখুঁতভাবে অনুকরণ করা হয় যে, সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ পর্যন্ত স্বাভাবিক গ্রহণের অবিকল একই সঙ্গে সংঘটিত হইতে দেখা যাইত। প্ল্যানিটেরিয়ামের পরিকল্পনা ও গঠন-কৌশল হইতে জ্যোতিষে আর্কিমিডিসের উৎসাহ ও গবেষণার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রহদের দূরত্ব সম্ভবতঃ তিনিই আবিষ্কার করিয়া থাকিবেন। সূর্যের আপাত ব্যাস অর্থাৎ সূর্য পর্যবেক্ষকের চোখে যে কোণ উৎপাদন করিয়া থাকে তাহার মাপ তিনি নির্ণয় করিয়াছিলেন। *Sand-reckoner* পুস্তকে তাহার উল্লেখ আছে। অ্যারিস্টার্কাসের সূর্যকেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনার কথা তিনি জানিতেন। কিন্তু এই মত তিনি গ্রহণ করেন নাই। ভূকেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ডেই তাঁহার আস্থা ছিল।

যান্ত্রিক ও ফলিত গবেষণায় এরূপ আশ্চর্য দক্ষতা ও কৃতিত্বের অধিকারী হইয়াও তিনি এ জাতীয় গবেষণাকে হীন ও অবজ্ঞার চোখে দেখিতেন। এই সব কাজের কোন গুরুত্বই তিনি দিতেন না, বলিতেন, লঘু অবসর কাটাইবার জন্য এই যন্ত্রগুলি হইল আমার খেলার সামগ্রী। একমাত্র *On Sphere Making* পুস্তকে যান্ত্রিক গবেষণার সামান্য উল্লেখ ছাড়া ফলিত গবেষণা সম্বন্ধে তিনি কিছুই লেখেন নাই। যাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি শত্রুকে যুদ্ধক্ষেত্রে বার বার বিপর্যস্ত করিয়াছে, যন্ত্রের সাহায্যে জলসেচের কাজ সুগম করিয়া যিনি কৃষির প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন এবং ছোট বড় বহু যান্ত্রিক উন্নতি সম্ভব করিয়া যিনি সে যুগের শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের জন্য অনেকাংশে দায়ী, তাঁহার পক্ষে ফলিত বিজ্ঞানকে অবজ্ঞার চোখে দেখা কিছুটা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতে পারে। সম্ভবতঃ সমগ্র কারিগরি বিদ্যার প্রতি সাধারণভাবে গ্রীক দার্শনিকদের প্রতিকূল মনোভাবের প্রভাব আর্কিমিডিস্ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে প্লুটার্ক লিখিয়াছেনঃ—

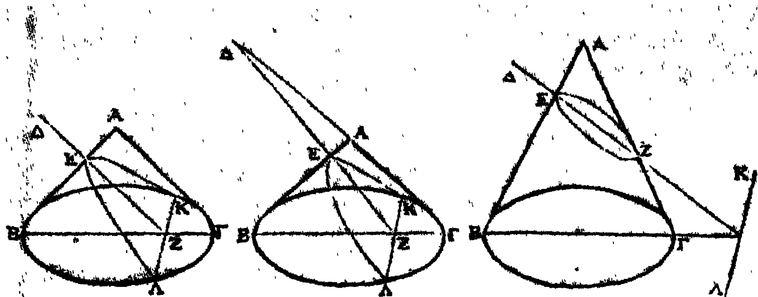
> "He possessed so high a spirit, so profound a soul, and such treasures of scientific knowledge that, though these inventions had obtained for him the renown of more than human sagacity, he yet would not design to leave behind him any written work on such subjects, but, regarding as ignoble and sordid the business of mechanics and every sort of art which is directed to use and profit, he placed his whole ambition in those speculations in whose beauty and subtlety there is no admixture of the common needs of life."*

অ্যাপোলোনিয়াস্ (খ্রীঃ পূঃ ২৬০-২০০)

আর্কিমিডিসের পর বিখ্যাত আলেকজান্দ্রীয় গণিতজ্ঞ অ্যাপোলোনিয়াসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মেনেক্মাস্ কনিক জ্যামিতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অ্যাপোলোনিয়াসের হাতে এই জ্যামিতির চরম পরিণতি ঘটে। আট খণ্ডে সমাপ্ত এক বিরাট গ্রন্থে কনিক রেখা সংক্রান্ত ৪০০টি প্রতিপাদ্যের প্রমাণ তিনি সংযোজনা করেন। গ্রন্থের ৭ খণ্ড এখনও সংরক্ষিত আছে,

* Plutarch, *Life of Marcellus,* chap. 17.

৪ খণ্ড মূল গ্রীক ভাষায় এবং ৩ খণ্ড আরবী ভাষায় তর্জমায়। ইউক্লিড্ প্রমুখ গণিতজ্ঞদের অনুকরণে কনিক জ্যামিতির রচনায় তিনি যুক্তিমূলক (deductive) পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। বিশ্লেষণমূলক জ্যামিতি (Analytical Geometry) তখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত; সপ্তদশ শতকে রেনে দেকার্তের পূর্বে ইহার ব্যবহার দেখা যায় না। তবে অ্যাপোলোনিয়াসের বহু প্রমাণ-পদ্ধতিতে বিশ্লেষণমূলক জ্যামিতির ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়। যুক্তিমূলক পদ্ধতিতে কনিক জ্যামিতির যতদূর উন্নতি সম্ভবপর অ্যাপোলোনিয়াস্ তাহার কিছুই বাকী রাখেন নাই।



৮২। অ্যাপোলোনিয়াসের কনিক-জ্যামিতিতে প্রদত্ত কয়েকটি রেখাঙ্কনের নমুনা। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ জ্যোতির্বিদ এডমণ্ড হ্যালি অ্যাপোলোনিয়াসের কনিক-জ্যামিতির যে সংস্করণ প্রণয়ন করেন তাহাতে এই রেখাঙ্কনগুলি পাওয়া যায়।

গ্রীকরা কনিক রেখার প্রয়োগ ও ব্যবহার করিতে পারে নাই। এই প্রয়োগের অভাবে গণিতজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিও গণিতের এই বিভাগে তেমন আকৃষ্ট হয় নাই। বৃত্তের পরিবর্তে উপবৃত্ত-পথে গ্রহদের পরিক্রমণ-তথ্য কেপ্‌লার কর্তৃক আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে কনিক জ্যামিতির গবেষণা গণিতজ্ঞদের ব্যাপক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিক্ষিপ্ত কামানের গোলা যে অধিবৃত্ত-পথে ধাবিত হয়, গ্যালিলিওর এই আবিষ্কারও কনিক জ্যামিতির অগ্রগতির বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। সেই দিক দিয়া বিচার করিলে গ্রীকদের উদ্ভাবিত কনিক জ্যামিতি ঠিক কালোপযোগী হয় নাই। গণিতের অগ্রগতি বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের বিশেষতঃ জ্যোতিষ ও পদার্থ বিজ্ঞানের অগ্রগতির উপর কিরূপ নির্ভরশীল ইহা তাহার একটি দৃষ্টান্ত।

অ্যাপোলোনিয়াস্ বহু বৎসর আলেকজান্দ্রিয়ায় বিদ্যাভ্যাস ও গবেষণা করেন। সম্ভবতঃ এইখানে তিনি অনেক দিন যাবৎ অধ্যাপনাও করিয়াছিলেন।

৬·৪। জ্যোতিষ ও ভূগোল—অ্যারিস্টার্কাস্ অব্ সামোস্, ইরাটোস্থেনিস্, হিপার্কাস্ ও টলেমী

অ্যারিস্টার্কাস্ অব্ সামোস্ (খৃঃ পূঃ ৩১০-২৩০)

সুপ্রসিদ্ধ রোমক পণ্ডিত ও লেখক ভিট্রুভিয়াস্ সামোসের অ্যারিস্টার্কাস্‌কে প্রাচীন-কালের কতিপয় শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের অন্যতম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে অ্যারিস্টার্কাস্ ছিলেন পিথাগোরীয় ফিলোলাউস্, ট্যারেণ্টামের আর্কিটাস্, আর্কিমিডিস্,

ইরাটোস্থেনিস্‌ প্রমুখ বিভিন্ন যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের সমকক্ষ*। ইঁহারা প্রতিভায়, জ্ঞানে ও চিন্তায় মানব-সভ্যতাকে সমৃদ্ধতর করিয়া গিয়াছেন। অ্যারিস্‌টার্কাস্‌ সূর্যকেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনার প্রথম উদ্যোক্তা। এজন্য অনেক সময় তাঁহাকে প্রাচীনকালের কোপার্নিকাস্‌ বলা হয়। পৃথিবীর তুলনায় চন্দ্র ও সূর্যের ব্যাস তিনিই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নির্ণয় করেন। জ্যোতিষে ও জ্যামিতিতে অ্যারিস্‌টার্কাসের গবেষণা প্রধানতঃ নিবদ্ধ হইলেও বিজ্ঞানের প্রায় সর্ব বিষয়ে ও বিভাগে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। সংগীতশাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল।

অ্যারিস্‌টার্কাস্‌ (জন্ম খৃীঃ পূঃ ৩১০) আর্কিমিডিস্‌ অপেক্ষা প্রায় ২৩ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। প্রথমে লাইসিয়ামের ও পরে মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ পদার্থবিদ্‌ স্ট্রাটোর নিকট তিনি অধ্যয়ন করেন। আলোক, বর্ণ, দৃষ্টি প্রভৃতি পদার্থবিদ্যা বিষয়ক গবেষণায় তাঁহার উপর স্ট্রাটোর প্রভাব দেখা যায়। স্ট্রাটোর যুক্তিবাদী ও পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শের দ্বারাও তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যসমূহ হইতে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার অভিপ্রায়ে তিনি সর্বদা ব্যক্তিগত সংস্কার ও ধারণা, কিংবদন্তী ও আর্যপ্রয়োগের ভুল পথ সযত্নে পরিহার করিয়াছেন এবং তাহার পরিবর্তে বাছিয়া লইয়াছেন গণিতের কঠিন ও নির্ভুল পথ। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *On the Sizes and Distances of the Sun and Moon* এই পর্যবেক্ষণ ও গণিতের সমন্বয়-সাধনের অপূর্ব নিদর্শন।

পর্যবেক্ষণের সহায়তাকল্পে তিনি কয়েকটি জ্যোতিষীয় যন্ত্রপাতিরও উদ্ভাবন ও উন্নতি-সাধন করেন। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি উন্নত ধরনের সূর্যঘড়ি-নির্মাণ। এই ঘড়ির গোলাকার ক্ষেত্রটি সমতলের পরিবর্তে অবতল (concave) গোলার্ধের আকারে নির্মিত হইয়াছিল। কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ঊর্ধ্বমুখী কাঁটার ছায়া এই অবতল গোলার্ধের ক্ষেত্রের উপর পড়িত। সূর্যের অবস্থান ও উচ্চতা (দিগন্ত হইতে) নির্দেশ করিবার উদ্দেশ্যে গোলার্ধের গায়ে অনেকগুলি দাগ কাটা থাকিত। এই দাগগুলির সহিত কাঁটার ছায়া মিলাইয়া সূর্যের অবস্থিতি, উচ্চতা প্রভৃতি অতি সহজে ও নির্ভুলভাবে মাপা হইত।

জ্যোতিষীয় গবেষণা: *On the Sizes and Distances of the Sun and Moon* গ্রন্থে অ্যারিস্‌টার্কাস্‌ পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য ও চন্দ্র কত বড় বা ছোট এবং পৃথিবী হইতে সূর্য ও চন্দ্র কত দূরে অবস্থিত, এই সব প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমে তিনি পর্যবেক্ষণমূলক তথ্যসমূহ হইতে কতকগুলি সাধারণ সূত্র বিবৃত করিয়াছেন; তারপর জ্যামিতির সাহায্যে এই সূত্রগুলিকে অবলম্বন করিয়া সূর্য ও চন্দ্রের আপেক্ষিক ব্যাস, পৃথিবী হইতে চন্দ্র ও সূর্যের দূরত্ব প্রভৃতির সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। এইরূপ সম্বন্ধনির্ণয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল, কারণ এই সব প্রশ্ন অধিকাংশই ত্রিকোণমিতির অন্তর্গত এবং তখন পর্যন্ত ত্রিকোণমিতির উদ্ভব হয় নাই। সুতরাং তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হয় জ্যামিতির ঘোরাল পথে।

পৃথিবী হইতে চন্দ্র ও সূর্যের দূরত্ব নির্ণয়: পৃথিবী হইতে সূর্য ও চন্দ্রের দূরত্বের অনুপাত বাহির করিবার জন্য তিনি এক মৌলিক উপায় অবলম্বন করেন। অ্যানাক্সাগোরাস্‌ বহু পূর্বেই চন্দ্রকলার প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অ্যারিস্‌টার্কাস লক্ষ্য করিলেন যে, অর্ধচন্দ্রের সময় পৃথিবী হইতে চন্দ্র পর্যন্ত একটি রেখা EM ও সূর্য হইতে চন্দ্র পর্যন্ত

* "Men of this type are rare, men such as were, in times past. Aristarchus of Samos, Philolaus and Archytas of Tarentum, Apollonius of Perga. Eratosthenes of Cyrene, Archimedes and Scopinas of Syracuse, who left to posterity many mechanical and gnomonic appliances which they invented and explained on mathematical and natural principles".—*De architectura.*

আর একটি রেখা SM কল্পনা করিলে, এই দুইটি কাল্পনিক রেখা চন্দ্রে একটি সমকোণ SME উৎপন্ন করে। এখন ME ও SE পৃথিবীতে অর্থাৎ E বিন্দুতে যে কোণ উৎপন্ন

৮৩।

করিয়া থাকে তাহাকে মাপিবার যদি কোন ব্যবস্থা করা যায়, তবে ME ও SE-র অনুপাত নির্ণয় করা কঠিন নয়। অ্যারিস্টার্কাস্ এই কোণ নির্ণয় করিয়া বাহির করিলেন ৮৭°। ত্রিকোণমিতির জ্ঞান হইতে আমরা এখন জানি,

$$Cos\theta = \frac{EM}{ES} = \frac{1}{19}$$

সুতরাং, $ES = 19\ EM$

অর্থাৎ, পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্ব পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্বের ১৯ গুণ। অ্যারিস্টার্কাস্‌কে জ্যামিতির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি বলিলেন, ইহা ১৮ গুণের কম নহে ও ২০ গুণের বেশী নহে।*

অ্যারিস্টার্কাসের পর্যবেক্ষণে অবশ্য ভুল হইয়াছিল। এই কোণের আসল মান ৮৯° ৫০′। এই ভুলের ফলে চন্দ্রের দূরত্ব অপেক্ষা সূর্যের দূরত্ব প্রকৃতপক্ষে যাহা হওয়া উচিত অ্যারিস্টার্কাসের হিসাবে তাহা হইল প্রায় ২০ গুণ কম। পর্যবেক্ষণ ভুল হইলেও তাঁহার গণনাপদ্ধতি নির্ভুল এবং অ্যারিস্টার্কাসের এইখানেই কৃতিত্ব।

অ্যারিস্টার্কাসের দ্বিতীয় প্রধান সিদ্ধান্ত হইল, চন্দ্রগ্রহণের সময় চন্দ্রের উপর পৃথিবীর যে বৃত্তাকার ছায়া পড়ে, সেই বৃত্তের ব্যাস চন্দ্রের ব্যাসের দ্বিগুণ। ইহা তাঁহার নিছক কল্পনা নহে। সম্ভবতঃ পূর্ণগ্রাসের সময় গ্রহণের স্থায়িত্বের দীর্ঘতা লক্ষ্য করিয়া তিনি এইরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে হিপার্কাস্ ও টলেমী চন্দ্রে পৃথিবীর ছায়ার ব্যাস অধিকতর নির্ভুলভাবে নির্ণয় করেন। তাঁহাদের পর্যবেক্ষণ অনুসারে এই ছায়াবৃত্তের ব্যাস চন্দ্রের ব্যাসের যথাক্রমে ২½ ও ২⅗ গুণ।†

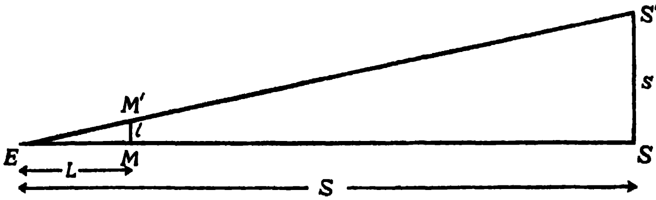
তাঁহার তৃতীয় সিদ্ধান্ত হইল, সূর্য ও চন্দ্রের কৌণিক ব্যাস (angular diameter) সমান এবং ইহা রাশিচক্রে ১২টি রাশির যে কোন একটির ১৫ ভাগের ১ ভাগ, অর্থাৎ ২° ডিগ্রী। *On the Sizes and Distances of the Sun and Moon* গ্রন্থে উল্লিখিত সূর্যের কৌণিক ব্যাসের এই মান প্রকৃত মানের অপেক্ষা অনেক বেশী। আর্কিমিডিস্

* ৭ ও ৯নং প্রতিজ্ঞা— ***On the Sizes and Distances of the Sun and Moon.***
† **Ptolemy, *Syntaxis, iv.* 9. Vol. 2.**

Sand-reckoner-এর এক জায়গায় কিন্তু লিখিয়াছেন, 'Aristarchus discovered that the Sun's apparent size is about one 720th part of the Zodiac Circle,' অর্থাৎ ½°। সম্ভবতঃ পরে তিনি আবার আরও নিখুঁতভাবে এই কৌণিক ব্যাস মাপিয়াছিলেন।

চন্দ্র ও সূর্যের কৌণিক ব্যাস মাপিবার চেষ্টা অবশ্য সুপ্রাচীন। অ্যারিস্‌টার্কাসের বহু পূর্বে ব্যাবিলনীয়েরা এবং তাঁহার পরে আর্কিমিডিস্‌, হিপার্কাস্‌, টলেমী প্রমুখ গ্রীক জ্যোতির্বিদ্‌গণ এই ব্যাস নিখুঁতভাবে নির্ণয় করিয়াছেন। ব্যাবিলনীয়দের হিসাবমত এই ব্যাস হয় ১° ডিগ্রী। আর্কিমিডিস্‌ ইহা নির্ণয় করিলেন ২৭′ ও ৩২′ ৫৫″ এর মধ্যে। চন্দ্রের ক্ষেত্রে হিপার্কাসের পর্যবেক্ষণ অনুসারে এই মান ৩৩′ ১৪″ এবং টলেমী বাহির করিলেন ৩১′ ২০″ ও ৩৫′ ২০″ এর মধ্যবর্তী।

পৃথিবীর তুলনায় চন্দ্র ও সূর্যের আয়তন নির্ণয়ঃ এইভাবে চন্দ্র ও সূর্যের কৌণিক ব্যাস নির্ণয়ের দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল যে, চন্দ্র ও সূর্যের কৌণিক ব্যাস সমান।

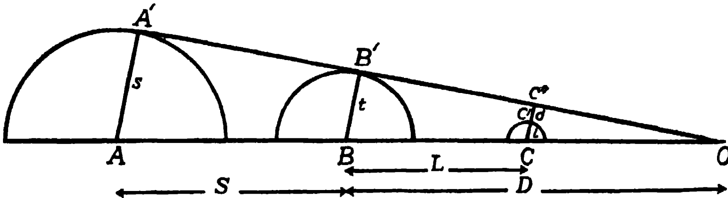


৮৪।

ইহা অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। উভয়েরই কৌণিক ব্যাস যখন সমান এবং পৃথিবী হইতে উভয়ের দূরত্বের অনুপাত যখন জানা আছে তখন সূর্য ও চন্দ্রের প্রকৃত ব্যাসের অনুপাত সহজেই নির্ণয় করা যায়। সূর্য ও চন্দ্রের ব্যাস যথাক্রমে s ও l এবং পৃথিবী হইতে সূর্য ও চন্দ্রের দূরত্ব যথাক্রমে S ও L হইলে, এই অনুপাত হইলঃ

$$\frac{S}{L}=\frac{s}{l}=19$$

এইভাবে চন্দ্র ও সূর্যের আপেক্ষিক ব্যাস ও তাহাদের আপেক্ষিক দূরত্ব জানা গেল। এইবার পৃথিবীর তুলনায় সূর্য ও চন্দ্র ঠিক কত বড় বা ছোট, অ্যারিস্‌টার্কাস্‌ তার মীমাংসা



৮৫।

করিলেন। ট্যানারি অ্যারিস্‌টার্কাসের এই প্রমাণের এক সহজ আধুনিক সংস্করণ দিয়াছেন।* সংক্ষেপে এই প্রমাণ উল্লেখ করা যাইতেছে।

* Tannery, *Memoires de la Societe des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, 2e* serie, *v*, 1883; p. 241-243.

একটি পূর্ণ চন্দ্র-গ্রহণের কথা মনে করা যাক। A, B, C যথাক্রমে সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্রের অবস্থান নির্দেশ করিতেছে। সূর্যের দ্বারা উৎপন্ন পৃথিবীর ছায়াশঙ্কুর শীর্ষ হইতেছে O।

সূর্যের ব্যাসার্ধ, $AA' = s$;
পৃথিবীর ব্যাসার্ধ, $BB' = t$;
চন্দ্রের ব্যাসার্ধ, $CC' = l$;
চন্দ্রের নিকট পৃথিবীর ছায়া-বৃত্তের ব্যাসার্ধ, $CC'' = d$;
পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্ব, $AB = S$;
পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব, $BC = L$;
পৃথিবী হইতে ছায়াশঙ্কুর শীর্ষের দূরত্ব, $BO = D$।

আগেই প্রমাণিত হইয়াছে যে,

$$\frac{S}{L} = \frac{s}{l} = x = 19 \qquad (১)$$

$$\frac{d}{l} = n = 2 \qquad (২)$$

সদৃশ ত্রিভুজের ধর্ম হইতে সহজেই প্রমাণ করা যায় যে,

$$\frac{D}{S} = \frac{t}{s-t} \qquad (৩)$$

$$\frac{d}{t} = \frac{D-L}{D} \qquad (৪)$$

(১) ও (২) প্রয়োগ করিলে, (৩) ও (৪) নিম্নলিখিত রূপ ধারণ করিবে,

$$\frac{t}{l} + \frac{t}{s} = n+1 \qquad (৫)$$

$$\frac{D}{L} = \frac{1}{1-n\frac{l}{t}} \qquad (৬)$$

(৫) সমীকরণে $l = s/x$ অথবা $s = lx$ বসাইলে,

$$\frac{tx}{s} + \frac{t}{s} = n+1, \text{ অর্থাৎ } \frac{s}{t} = \frac{x+1}{n+1} \qquad (৭)$$

$$\text{এবং, } \frac{t}{l} + \frac{t}{lx} = n+1, \text{ অর্থাৎ } \frac{t}{l} = \frac{n+1}{x+1}x \qquad (৮)$$

এইবার, $x = 19$ ও $n = 2$ বসাইলে,

$$\frac{s}{t} = \frac{20}{3} = 6{\cdot}7$$

$$\text{এবং } \frac{t}{l} = \frac{57}{20} = 2{\cdot}85$$

অর্থাৎ, পৃথিবীর অপেক্ষা সূর্যের ব্যাস ৬·৭ গুণ বড় এবং চন্দ্রের অপেক্ষা পৃথিবীর ব্যাস ২·৮৫ গুণ বড় হইবে।

এইভাবে নিঃসন্দেহে তিনি প্রমাণ করিলেন যে, সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা অনেকগুণ বড় এবং চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা অনেক গুণ ছোট। তাঁহার নির্ধারিত এই বড় অথবা ছোটর অনুপাতের মান হয়ত ভুল হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার পদ্ধতি ও সাধারণ সিদ্ধান্ত অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পরে ইরাটোস্থেনিস্, হিপার্কাস্ ও টলেমী পর্যবেক্ষণের অনেক উন্নতি সাধন করিয়া অধিকতর নির্ভরযোগ্য মান নির্ধারণে সমর্থ হইয়াছিলেন। তথাপি সূর্য যে পৃথিবী হইতে অনেকগুণ বড় এই আবিষ্কারই যুগান্তকারী। সূর্যের ব্যাস যদি পৃথিবীর ব্যাসের অপেক্ষা ৬·৭ গুণ বড় হয়, তবে সূর্যের আয়তন হইবে পৃথিবীর আয়তনের প্রায় ৩০০ গুণ।

সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ঃ সূর্যের এই বিরাটত্ব লক্ষ্য করিয়া অ্যারিস্টার্কাসের ভূকেন্দ্রীয় বিশ্বপরিকল্পনায় সন্দেহ উপস্থিত হইল। ক্ষুদ্রায়তনের একটি গোলককে কেন্দ্র করিয়া তাহার অপেক্ষা বহুগুণ বৃহদায়তনের একটি গোলক বৃত্তাকারে পরিক্রমণ করিবে, বলবিদ্যার নানা তথ্য ও সূত্র তখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত থাকিলেও, সাধারণ বুদ্ধিতে অ্যারিস্টার্কাসের নিকট ইহা অসম্ভব বোধ হইল। সুতরাং তিনি সূর্যকে কেন্দ্রে কল্পনা করিয়া পৃথিবীকে তাহার চতুর্দিকে পরিক্রমণরত কল্পনা করিলেন। সেই সঙ্গে অন্যান্য গ্রহদের বৃত্তাকার গতিও যে সূর্যকেন্দ্রীয় হইয়া থাকে, এই ধারণা তাঁহার জন্মিল। সৌরজগৎ পরিকল্পনার ইহাই প্রথম সূচনা, এবং ইহার গৌরব সামোসের অ্যারিস্টার্কাসের প্রাপ্য। তাঁহার পূর্বে পিথাগোরীয় ফিলোলাউস্ পৃথিবীর গতিহীন স্থিতির পরিকল্পনাকে অস্বীকার করিয়া পৃথিবীকে এককেন্দ্রীয় অগ্নির চারিদিকে পরিক্রমণ করাইয়াছিলেন; হেরাক্লিডিস্ ও এক্ফ্যান্টাস্ পৃথিবীর আহ্নিক গতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং বুধ ও শুক্র গ্রহের বৃত্তাকার গতিকে সূর্যকেন্দ্রীয় কল্পনা করিয়াছিলেন; কিন্তু এই সর্বপ্রথম ভবঘুরে সূর্যকে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রের বিশিষ্ট মর্যাদা অর্পণ করিয়া এবং পৃথিবী ও অনান্য গ্রহদের চক্রাকার গতিকে সূর্যকেন্দ্রীয় মনে করিয়া এক যুগান্তকারী পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন সামোসের অ্যারিস্টার্কাস্।

অ্যারিস্টার্কাসের অদ্যাপি সংরক্ষিত *On the Sizes and Distances of the Sun and Moon* গ্রন্থে সৌরজগতের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাহার কারণ, সৌরজগতের পরিকল্পনা সম্ভবতঃ তাঁহার পরবর্তী গবেষণা ও চিন্তার ফল। এই সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার আর কোন পুস্তক অথবা চিঠিপত্রের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তবে তাঁহার সমসময়ের ও অব্যবহিত পরবর্তী কালের বিজ্ঞানী ও লেখকদের রচনায় তাঁহার সূর্যকেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ *Sand-reckoner* পুস্তকে আর্কিমিডিস্ এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ

"Now you (King Gelon) are aware that 'Universe' is the name given by most astronomers to the sphere whose centre is the centre of the earth and whose radius is equal to the straight line between the centre of the sun and the centre of the earth. This is the common account, as you have heard from astronomers. But Aristarchus of Samos brought out a book consisting of some hypotheses, in which the premises lead to the result that the universe is many times greater than that now so called. His hypotheses are that the fixed stars and the sun remained unmoved, that the earth revolves about the sun in the circumference of a circle, the sun lying in the middle of the orbit, and that the sphere of the fixed stars, situated about the same centre as the sun, is so great

that the circle in which he supposes the earth to revolve bears such a proportion to the distance of the fixed stars as the centre of the sphere bears to its surface." *

আর্কিমিডিসের এই ভাষ্য অনুযায়ী অ্যারিস্টার্কাসের সৌরজগতের মূল কথা হইলঃ

(১) পৃথিবী হইতে সূর্য পর্যন্ত একটি সরলরেখা কল্পনা করিলে যে গোলকের ব্যাসার্ধ এই সরলরেখার দৈর্ঘ্যের সমান হইবে, ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃতি এইরূপ একটি গোলকের মত, পূর্ববর্তী জ্যোতির্বিদ্‌দের এই ধারণা ভ্রান্ত। ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তৃতি ইহা অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী।

(২) এইরূপ ব্রহ্মাণ্ডে স্থির নক্ষত্ররা ও সূর্য নিশ্চল ও গতিহীন। (নক্ষত্রের সহিত সূর্যের তুলনা লক্ষণীয়)।

(৩) সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া একটি বৃত্ত কল্পনা করিলে এই বৃত্তের পরিধিপথে পৃথিবী সূর্যকে পরিক্রমণ করিয়া থাকে।

(৪) সূর্য নক্ষত্র-মণ্ডলের গোলকের কেন্দ্র। সূর্যকেন্দ্রীয় পৃথিবীর পরিক্রমণ-বৃত্তের তুলনায় সূর্য হইতে নক্ষত্র-মণ্ডলের দূরত্ব এরূপ বিরাট যে, ইহা কেন্দ্রবিন্দুর অনুপাতে একটি গোলকের উপরিভাগের বিরাটত্বের সহিত তুলনীয়। অর্থাৎ, নক্ষত্র-মণ্ডলের তুলনায় সূর্য ও সূর্যের চারিধারে প্রদক্ষিণরত পৃথিবী বিন্দু বিশেষ।

সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব নক্ষত্র-মণ্ডলের দূরত্বের তুলনায় যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, এই চতুর্থ পরিকল্পনাটি তৃতীয় পরিকল্পনার উপর নির্ভরশীল। নক্ষত্র-মণ্ডলকে পূর্ববর্তী জ্যোতির্বিদ্‌দের ধারণা অনুযায়ী নিকটবর্তী মনে করিলে নক্ষত্র-মণ্ডলের অপরিবর্তনশীলতার সহিত পৃথিবীর পরিক্রমণ-গতির সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর পরিক্রমণ-গতির জন্য নক্ষত্র-মণ্ডলের আপাত স্থৈর্যের যে কোনপ্রকার ইতরবিশেষ পরিলক্ষিত হয় না তাহার একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হইল নক্ষত্র-মণ্ডলকে পৃথিবী হইতে বহু দূরে অবস্থিত মনে করা। তাই অ্যারিস্টার্কাস্ বলিলেন, নক্ষত্র-মণ্ডল হইতে পৃথিবী এত দূরে যে, ইহা বোধ হইবে একটি বিন্দুর মত এবং ইহার গতিবিধিতে নক্ষত্র-মণ্ডলের কোনরূপ পরিবর্তন বুঝা যাইবে না।

আর্কিমিডিসের ন্যায় প্লুটার্কের লেখায়ও অ্যারিস্টার্কাসের সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার উল্লেখ আছে।

"Only do not my good fellow, enter an action against me for impiety in the style of Cleanthes, who thought it was the duty of Greeks to indict Aristarchus of Samos on the charge of impiety for putting in motion the Hearth of the Universe, this being the effect of his attempt to save the phenomena by supposing the heaven to remain at rest and the earth to revolve in an oblique circle, while it rotates, at the same time, about its own axis." †

এই নির্দেশে দেখা যায় যে, হেরাক্লিডিস্-উদ্ভাবিত পৃথিবীর আহ্নিক গতির কথা অ্যারিস্টার্কাস্ সম্যক অবগত ছিলেন এবং এই গতি তিনি সম্পূর্ণ স্বীকার করিতেন। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যাজক সম্প্রদায় ও বিদ্বৎ সমাজের মধ্যে সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনা তীব্র বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার ও সমালোচনার সৃষ্টি করিয়াছিল।

* T. L. Heath, *The Works of Achimedes,*—Sand-reckoner; p. 221-22.
† Plutarch—*De facie en orbe lunae, c, b,* p. 922, F—923A.

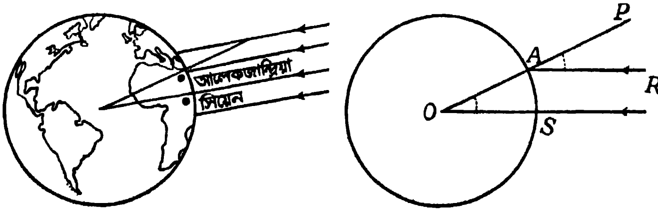
অ্যারিস্‌টার্কাস্ যে পুস্তকে এই পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন তাহা নিখোঁজ হইলেও তাঁহার মতবাদ অবলুপ্ত না হইবার প্রধান কারণ এই মতবাদ সম্বন্ধে ভূকেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনায় বিশ্বাসী পণ্ডিত ও লেখকদের বিরুদ্ধ সমালোচনা। তিনি সেকালের একজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ছিলেন; জ্যামিতি ও গণিতে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল এবং তদুপরি তিনি সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। এরূপ বিজ্ঞানীর মতবাদ যে সহজে উপেক্ষণীয় নহে, তাহা বুঝিয়াই অ্যারিস্‌টার্কাসের বিপক্ষ দল সমালোচনায় তীব্র হইয়াছিলেন। এজন্য মূল লিপি নিখোঁজ হইলেও ইহার সাক্ষীস্বরূপ সমালোচনাগুলি টিকিয়া রহিল।

একমাত্র ব্যাবিলনের সেলিউকাস্ (খৃঃ পূঃ ১৫০) ছাড়া প্রাচীনকালের আর কাহাকেও অ্যারিস্‌টার্কাসের সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকে সমর্থন করিতে দেখা যায় না। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ হিপার্কাস্ এই মতবাদকে আদৌ আমল দেন নাই; বিশেষ দক্ষতার সহিত তিনি ভূকেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনার নানারূপ উন্নতি সাধন করিয়া এই মতবাদকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। জ্যোতিষে হিপার্কাসের মৌলিক অবদান, পাণ্ডিত্য, বৈজ্ঞানিক সুনাম ও প্রতিপত্তিও যথেষ্ট ছিল। সংস্কারগ্রস্ত ধর্মভীরু মানুষ সৌরজগতের ন্যায় যুগান্তকারী ধারণাকে সহজে গ্রহণ করিবার মত উপযুক্ত মানসিক অবস্থায় তখনও আসিয়া পৌঁছে নাই।

ইরাটোস্থেনিস্ (খৃঃ পূঃ ২৭৩-১৯২)

প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ ও ভৌগোলিক ইরাটোস্থেনিসের নাম আর্কিমিডিসের জীবন-বৃত্তান্ত ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা আলোচনা করিবার সময়ই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি আর্কিমিডিস্ অপেক্ষা ১৩।১৪ বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। আলেকজান্দ্রিয়ায় মিউজিয়ামের গ্রন্থাগারের তিনি অধ্যক্ষ ছিলেন। জ্যোতিষ ও ভূগোল ছাড়া সাহিত্যে ও নানারূপ ক্রীড়া ও শরীর চর্চাতেও তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন।

পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাস নির্ণয়ঃ পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাস নির্ণয় করিয়া তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহার এই নির্ণয়-পদ্ধতি যেমন সহজ, তেমনই মৌলিক।



৮৬।

ইরাটোস্থেনিস্ লক্ষ্য করেন যে, সূর্যের কর্কট-ক্রান্তিতে অবস্থান করিবার সময় আলেকজান্দ্রিয়ার দক্ষিণে সিয়েনে (S) (আধুনিক আশ্বান) সূর্য মধ্যাহ্নকালে কোন বস্তুর ছায়া নিক্ষেপ করে না। সূর্য সোজাসুজি মাথার উপরে থাকে এবং এমন কি গভীর কূপের তলদেশ পর্যন্ত সূর্যালোক পৌঁছিয়া থাকে। ঠিক সেই সময়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় (A) কিন্তু সূর্য মাথার উপরে অর্থাৎ সুবিন্দুতে (Zenith) না থাকিয়া কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ঝুঁকিয়া থাকে। সূর্য-ঘড়ির দণ্ডায়মান ফলকের ছায়া মাপিয়া সুবিন্দু হইতে সূর্যের কৌণিক দূরত্ব অর্থাৎ PAR

নির্ণয় করিলেন ৭°১২′ অর্থাৎ ৩৬০° ডিগ্রীর ৫০ ভাগের এক ভাগ। এখন যদি সিয়েন (*S*) ও আলেকজান্দ্রিয়া (*A*) একটি মধ্যরেখার উপর অবস্থিত অনুমান করা যায় (ইরাটোস্থেনিস্ এরূপ অনুমান করিয়াছিলেন), তবে AOS = PAR = ৭°১২′। এইবার অনায়াসে বলা চলে যে, পৃথিবীর পরিধি ৫০ × *AS*। এখন *AS* অর্থাৎ সিয়েন হইতে আলেকজান্দ্রিয়ার দূরত্ব মাপিয়া বাহির করিলেই সমগ্র পরিধির মান বাহির হইয়া আসিবে। ইরাটোস্থেনিস্ এই দূরত্ব ৫,০০০ স্টাডিয়া (১ স্টাডিয়া = ৫১৬·৭৩ বা উপান্তিক ৫১৭ ফিট) ধরিয়া পৃথিবীর পরিধির মান ২৫০,০০০ স্টাডিয়া নিরূপণ করিলেন।

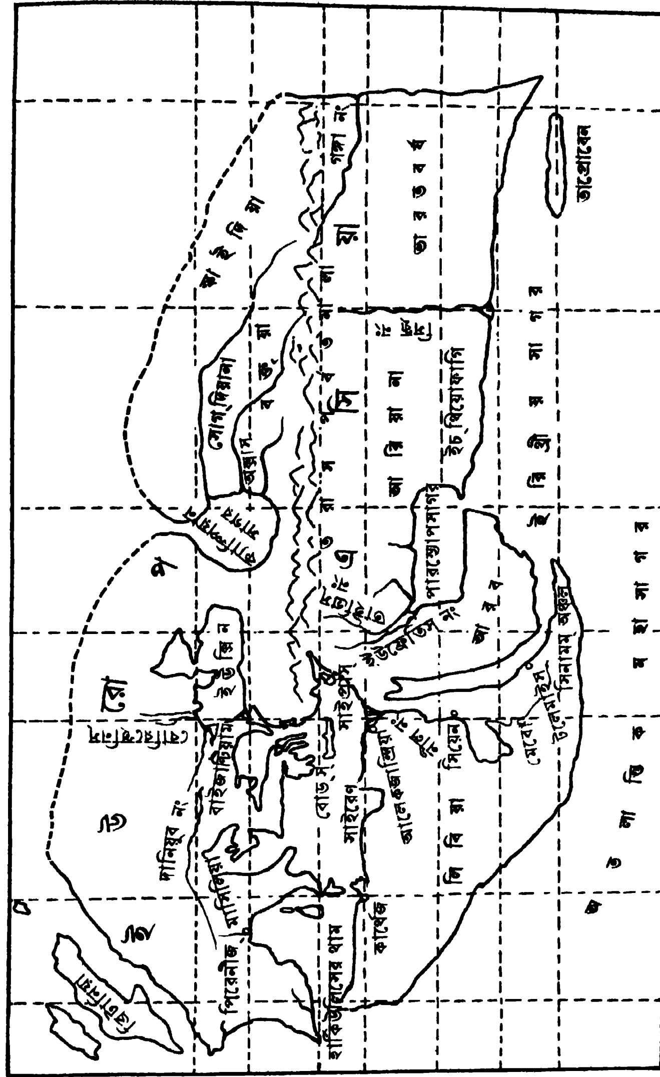
কোন অজ্ঞাত কারণে ইরাটোস্থেনিস্ এই মান সামান্য বদলাইয়া ২৫২,০০০ স্টাডিয়া লিখিয়াছিলেন। স্যার টমাস্ হীথের মতে, এই মান যাহাতে ৬০ দ্বারা বিভাজ্য হয় তদুদ্দেশ্যে তিনি এই পরিবর্তন-সাধন করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, মাইলের হিসাবে, পৃথিবীর পরিধি হইল ২৪,৬৬২ মাইল ও ব্যাস ৭৮৫০ মাইল। এই মান অতি আশ্চর্যভাবে অধুনা-নির্ণীত প্রকৃত মান যথাক্রমে ২৪,৮৭৫ মাইল ও ৭৯০০ মাইলের কাছাকাছি। অবশ্য এই মিল নিতান্তই আকস্মিক; কয়েকটি ভুল পরস্পরকে নাকচ করিবার ফলে এইরূপ শুদ্ধ মান বাহির হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, (১) সিয়েন কর্কট ক্রান্তি হইতে প্রায় ৪০ মাইল উত্তরে অবস্থিত; (২) আলেকজান্দ্রিয়া ও সিয়েন একই মধ্যরেখার অন্তর্গত নহে, আলেকজান্দ্রিয়ার প্রায় ১৮০ মাইল পূর্বে ভিন্ন মধ্যরেখার উপর ইহার অবস্থান; এবং (৩) এই দুইটি স্থানের অক্ষাংশের পার্থক্য ৭°১২′ এর পরিবর্তে ৬°৫৩′।*

যাহা হউক, ইরাটোস্থেনিস্ বৈজ্ঞানিক উপায়ে পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাসের প্রথম নির্ভরযোগ্য মান নির্ণয় করিলেন। পৃথিবী যে কত বড় দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত সাধারণ স্টাডিয়া বা মাইলের হিসাবে সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করা এইবার সম্ভবপর হইল। বহুকাল হইতে পৃথিবীর ব্যাস ও আয়তন সম্বন্ধে নানারূপ আজগুবি কল্পনা, ধারণা ও কিংবদন্তী বিজ্ঞানী ও সাধারণ লোকের মনে বাসা বাঁধিয়া ছিল, এইবার তাহার অবসান ঘটিল। অ্যারিস্টার্কাস্ ইতিপূর্বেই পৃথিবীর অনুপাতে চন্দ্র ও সূর্যের আপেক্ষিক ব্যাস ও দূরত্ব নির্ণয় করিয়াছিলেন। এখন পৃথিবীর ব্যাস নির্ণীত হইলে, চন্দ্র ও সূর্যের ব্যাস ও দূরত্বের পরম মানও (absolute value) কষিয়া বাহির করা সহজসাধ্য হইল। তাঁহার নির্ণীত সূর্যের দূরত্ব ৯২,০০০,০০০ মাইল ও অধুনা নির্ণীত মান ৯৩,০০০,০০০ মাইলের মধ্যে প্রভেদ খুব বেশী নহে।

ক্রান্তিবৃত্তের তির্যকতাঃ পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের সমতল (equetorial plane) যে ইহার ক্রান্তিবৃত্তের সমতলের (ecliptic plane) সহিত সমান্তরালভাবে থাকে না, তির্যকভাবে থাকিয়া একটি কোণ উৎপন্ন করে, ইহা ইরাটোস্থেনিসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। ইহার ফলে পৃথিবীর অক্ষরেখা ক্রান্তিবৃত্তের সমতলের উপর কল্পিত লম্বের সহিত সর্বদাই একটি কোণ উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইরাটোস্থেনিসের গণনায় এই কোণের মান নির্ধারিত হয় ২৩° ৫১′; সত্যকার মান ২৩° ৪৬′। আমরা জানি, ক্রান্তিবৃত্তের এই প্রকার তির্যকতার জন্য ঋতুভেদে দিন রাত্রির তারতম্য হয়।

ভূগোল ঃ এই জাতীয় জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলে পৃথিবী সম্বন্ধেও জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হইল। পৃথিবী সম্বন্ধে এই সব মূল্যবান জ্ঞান ও তথ্য একত্র গ্রথিত করিয়া ইরাটোস্থেনিস্ প্রাকৃতিক ভূগোলের বনিয়াদ স্থাপন করেন। তাঁহার অঙ্কিত পৃথিবীর মানচিত্র পশ্চিমে গ্রেট ব্রিটেন (ব্রিটানিয়া), স্পেন ও হার্কিউলিসের স্তম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বে ভারতবর্ষের প্রায় পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত, এবং উত্তরে আধুনিক জার্মানী, পোল্যাণ্ড, রাশিয়ার ও সাইবেরিয়ার মধ্যবর্তী অংশ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে সিনামম্, আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষ পর্যন্ত প্রসারিত। হিরোডোটাসের মানচিত্র অপেক্ষা ইহা অনেক বেশী উন্নত। তারপর

* Jeans, *The Growth of Physical Science;* p. 91.



৮৭। ইরাটোস্থেনিসের মানচিত্র।

অতলান্তিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের (ইরিথ্রীয় সাগর) জোয়ার-ভাটার সামঞ্জস্য ও সমতা লক্ষ্য করিয়া এই দুই মহাসাগর যে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত, তাঁহার এইরূপ ধারণা হইয়াছিল। তিনি মনে করিতেন, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে মহাসমুদ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং ইউরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকা মিলিতভাবে এই মহাসাগরে এক বিরাট দ্বীপ বিশেষ। আফ্রিকাকে প্রদক্ষিণ করিয়া সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে পেঁছান যে সম্ভব, তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস ছিল।

নূতন গোলার্ধ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনার সূত্রপাত: ইরাটোস্থেনিস্ আরও বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর বিপরীত গোলার্ধে সম্ভবতঃ এক বিরাট ভূখণ্ড সরাসরি উত্তর হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত থাকিয়া অতলান্তিক মহাসাগরকে বিভক্ত করিয়া আছে। সুতরাং সমুদ্রপথে পশ্চিম দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইলে এই নূতন অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ডের যে দর্শন মিলিবে সেনেকার এই ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভবতঃ ইরাটোস্থেনিসের উপরিউক্ত যুক্তি ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। অ্যারিস্টার্কাস্ ও ইরাটোস্থেনিস্-প্রদত্ত পৃথিবীর ব্যাস অতিরঞ্জিত এবং ইহার আসল ব্যাস অনেক কম, এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া রোড্স্-এর পোসিডোনিয়াস্ (খৃীঃ পূঃ ১৩৫-৫১) ইরাটোস্থেনিস্ ও সেনেকার পরিকল্পিত নূতন ভূখণ্ডের অস্তিত্বে অনাস্থা প্রকাশ করেন। পোসিডোনিয়াসের মাপ ও হিসাবে পৃথিবীর পরিধি নির্ধারিত হইয়াছিল ১৮০,০০০ ষ্টাডিয়া। এই মাপের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল যে, পৃথিবীর বিপরীত গোলার্ধে ইরাটোস্থেনিস্-কল্পিত নূতন ভূখণ্ডের অস্তিত্ব অসম্ভব এবং পশ্চিম দিকে জলপথে কোন নাবিক অগ্রসর হইলে মাত্র ৭০,০০০ ষ্টাডিয়া অর্থাৎ প্রায় ৬৮৫০ মাইল অতিক্রম করিলেই ভারতবর্ষে পেঁছিতে সক্ষম হইবে। পোসিডোনিয়াসের এই ধারণা সম্ভবতঃ কলম্বাসের সামুদ্রিক অভিযানকে অনুপ্রাণিত করিয়া থাকিবে।*

হিপার্কাস্ (খৃীঃ পূঃ ১৯০-১২০)

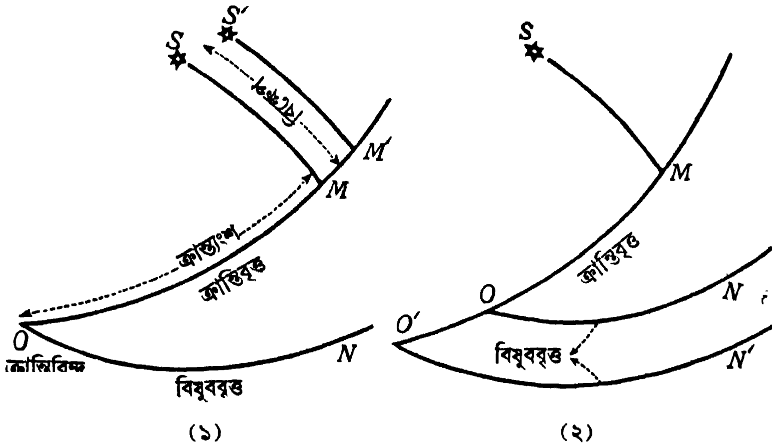
হিপার্কাসের জন্ম হয় বিথিনিয়ার অন্তর্গত নিসিয়া নামক স্থানে খৃীঃ ১৯০ পূর্বাব্দে। কেহ কেহ তাঁহার জন্মস্থান রোড্স্ দ্বীপ এরূপ নির্দেশ দিয়া থাকেন। এই দ্বীপে জ্যোতিষ-সংক্রান্ত তাঁহার গবেষণার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এইখানে এক মানমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। খৃীঃ পূঃ ১৬০ হইতে খৃীঃ পূঃ ১২৭ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৩ বৎসর তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় অতিবাহিত করেন। হিপার্কাসের প্রায় লেখাই বিনষ্ট হইয়াছে; ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি রচনার অংশ ছাড়া তাঁহার আর কোন লেখাই উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নাই। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ক্লডিয়াস্ টলেমী তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'অ্যালমাজেস্টে' হিপার্কাসের জ্যোতিষীয় গবেষণার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতপক্ষে টলেমী বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পদ্ধতির জন্য গুরুর নিকট একান্তভাবে ঋণী; তাঁহার অধিকাংশ গবেষণাই হিপার্কাসের গবেষণার সম্প্রসারণ বা সংস্কারসাধন মাত্র।

জ্যোতিষ: টলেমীর বিশদ বিবরণ হইতে নিঃসংশয়ে জানিতে পারা যায় যে, হিপার্কাস্ যে শুধু প্রাচীনকালের বিজ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহা নহে, সর্বদেশের ও সর্বকালের বিচারে তাঁহার সমকক্ষ জ্যোতির্বিদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতিষের তিনি ছিলেন সম্রাট। তিনি ১০০৮ নক্ষত্রের অবস্থান, খ-গোলে (Celestial sphere) তাহাদের বিক্ষেপ ও ক্রান্ত্যংশ, ও উজ্জ্বলতার ক্রম প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া যে নক্ষত্র-সারণী রচনা করিয়াছিলেন, পরবর্তী দুই হাজার বৎসরের মধ্যে সেই সারণীর বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন-চলন (precession of the equinoxes) তাঁহার শ্রেষ্ঠ

* Dampier, *A History of Science;* p. 47-48.

আবিষ্কার। চন্দ্র ও সূর্যের আয়তন ও দূরত্ব তিনি নূতন করিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন এবং চন্দ্রের লম্বন (parallax) লক্ষ্য করিয়াছিলেন। অ্যারিস্টার্কাসের সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেন নাই বটে কিন্তু নানারূপ জ্যামিতিক কৌশল অবলম্বন করিয়া ভূকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার যে খসড়া তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সময় পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রায় সমস্ত জ্যোতিষীয় তথ্যের সুচারু ও সন্তোষজনক কারণ-নির্দেশে ও ব্যাখ্যা-প্রদানে এই পরিকল্পনা আশাতীত সাফল্য লাভ করে। টলেমী পরে এই পরিকল্পনার কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন। এই পরিবর্তিত হিপার্কাস্-টলেমী ভূকেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কোপার্নিকাস্-কেপ্‌লার-গ্যালিলিওর আবির্ভাব পর্যন্ত সুদীর্ঘ দেড় হাজার বৎসর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জ্যোতির্বিদ্যার রাজ্যে একাধিপত্য করিয়াছে। হিপার্কাস্ ছিলেন গ্রীক জ্যোতিষের মধ্যাহ্ন সূর্য। তাঁহার মৃত্যুর পর ক্লডিয়াস্ টলেমী গ্রীক জ্যোতিষের উচ্চ মান কিছুকাল অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পর হইতেই ধীরে ধীরে গ্রীক জ্যোতিষের তথা সমগ্র গ্রীক বিজ্ঞানের অবনতি সুরু হয়।

ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন-চলন : হিপার্কাসের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন-চলন তাঁহার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ পরিচয়। খৃঃ পূঃ ১৩০ অব্দে বৃশ্চিক রাশিতে একটি নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব লক্ষ্য করায় সমস্ত নক্ষত্রের অবস্থান নির্দেশ করিয়া একটি ব্যাপক ও নিখুঁত নক্ষত্র-সারণী রচনার প্রয়োজনীয়তা তিনি প্রথম উপলব্ধি করেন। তারপর সুরু



৮৮। ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন-চলন। (১) নক্ষত্রের ক্রান্ত্যংশের আপাত পরিবর্তন; (২) অয়ন-চলনের ফলে ক্রান্তিবিন্দু O বিন্দু হইতে O' বিন্দুতে সরিয়া গিয়াছে।

হইল অসীম ধৈর্যসহকারে বহু বৎসর-ব্যাপী তাঁহার নক্ষত্র-অবলোকন। তিনি ১০০৮টি নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করিলেন;—খালি চোখে দৃশ্যমান নক্ষত্রের ইহাই প্রায় সর্বশেষ সীমা। ষোড়শ শতকের শেষভাগে টাইকো ব্রাহে যে নক্ষত্র-সারণী প্রস্তুত করেন, তাহাতেও তিনি ১০০৫টির বেশী নক্ষত্র লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই। হিপার্কাস্ বিক্ষেপ ও ক্রান্ত্যংশের সাহায্যে নক্ষত্রের অবস্থান নির্দেশ করিবার পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়া নক্ষত্রগুলিকে একে একে আকাশের মানচিত্রে সাজাইলেন। ইরাটোস্থেনিস্ দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠস্থ স্থান নির্দেশের সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন; খ-গোলে নক্ষত্রের অবস্থান নির্দেশ করিতে হিপার্কাস্ সেইরূপ বিক্ষেপ ও ক্রান্ত্যংশের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। এই নির্ণয়ে তিনি ক্রান্তিবিন্দুকে, অর্থাৎ যে বিন্দুতে বিষুববৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্ত ছেদ করে, তাহাকে মূল বিন্দু হিসাবে ব্যবহার

করিলেন। এইভাবে নক্ষত্রের সারণী তৈয়ারী করিতে গিয়া তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, তাঁহার পূর্ববর্তী জ্যোতির্বিদেরা নক্ষত্রের যে ছক তৈয়ারী করিয়াছিলেন সেই ছকে নির্দিষ্ট অবস্থান হইতে নক্ষত্রেরা সামান্য সরিয়া গিয়াছে (৮৮-১নং চিত্র)। উদাহরণস্বরূপ, হিপার্কাসের প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে টিমোচারিস্ ও অ্যারিষ্টিলাস্ স্পিকা (spica) নামক উজ্জ্বল নক্ষত্রের যে অবস্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন, হিপার্কাসের সময় তাহার অবস্থান বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন, এই পরিবর্তনের ফলে স্পিকা নক্ষত্রের ক্রান্ত্যংশ পূর্বদিকে ২° ডিগ্রী বাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ইহার বিক্ষেপ অপরিবর্তিতই রহিয়াছে। প্রাচীন নক্ষত্র সারণীর সহিত তাঁহার নবরচিত সারণী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মিলাইতে গিয়া তিনি আরও আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন যে, ক্রান্ত্যংশের এইরূপ পরিবর্তন শুধু স্পিকা নক্ষত্রেরই বিশেষত্ব নহে, প্রত্যেক নক্ষত্রের বেলায়ই এইরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিক্ষেপ অপরিবর্তিত থাকিয়া শুধু ক্রান্ত্যংশই পূর্বদিকে দীর্ঘতর হইয়াছে। হিপার্কাসের গণনা অনুযায়ী এই ক্রান্ত্যংশ-বৃদ্ধির অনুপাত বৎসরে অন্ততঃ ৩৬″। আধুনিক হিসাবে ইহা প্রায় ৫০″। তারপর বিষুববৃত্ত ও ক্রান্তিবৃত্ত পরস্পরকে ছেদ করিয়া যে কোণ উৎপন্ন করে, সেই কোণেরও কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।

নক্ষত্রদের ক্রান্ত্যংশের এইরূপ সাধারণ বৃদ্ধি হইতে হিপার্কাস্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, একই কালে সমানভাবে সমস্ত নক্ষত্রের ক্রান্ত্যংশ-বৃদ্ধি অসম্ভব, নক্ষত্রেরা প্রকৃতপক্ষে যে যাহার স্থানেই থাকে, এবং তাহাদের এই আপাত স্থানপরিবর্তনের জন্য দায়ী ক্রান্তিবিন্দুর স্থানপরিবর্তন, অর্থাৎ বিষুববৃত্ত ক্রমাগত পূর্ব হইতে পশ্চিমে সরিয়া যাইতেছে (৮৮-২নং চিত্র)। বিষুববৃত্তের এই গতির ফলে ক্রান্তিবৃত্তের সহিত ইহা যে কোণ উৎপন্ন করিয়া থাকে, সেই কোণের কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে না। বিষুববৃত্তের এই গতির আর এক অর্থ এই যে, পৃথিবীর অক্ষরেখা অবিচলিতভাবে বরাবর একদিকে থাকে না; বিষুববৃত্তের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরেখাও চক্রাকারে আবর্তিত হইয়া থাকে, অনেকটা ঘূর্ণ্যমান লাটিমের অক্ষ-বিচলনের মত। লাটিমের মত টাল খাইয়া পৃথিবীর আবর্তনের ফলে ক্রান্তিবিন্দুর এইরূপ বৃত্তাকার গতিকেই ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন-চলন (precession of the equinoxes) বলে। অয়ন-চলন আবিষ্কারের সহিত হিপার্কাসের নাম প্রধানতঃ জড়িত থাকিলেও স্যাবেল্-প্রমুখ বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, প্রসিদ্ধ ব্যাবিলনীয় জ্যোতির্বিদ্ কিদিন্নু (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৩৮৩), হিপার্কাসের প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে এই আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

ক্রান্তিবিন্দুর ক্রান্তিবৃত্তপথে সম্পূর্ণ একবার ঘুরিয়া আসিতে সময় লাগে প্রায় ২৬,০০০ বৎসর। ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন-চলন সংক্রান্ত তথ্য হইতে বহু প্রাচীন তারিখ বাহির করা সম্ভবপর। যেমন, হিপার্কাসের জীবিতকাল সম্বন্ধেই যদি কোন সংশয় কখনও উপস্থিত হয়, তবে তাঁহার বর্ণিত নক্ষত্র সারণীর অন্তর্ভুক্ত কোন বিশেষ তারকার অবস্থান আধুনিককালের অনুরূপ সারণীতে সেই একই তারকার অবস্থানের সহিত মিলাইয়া অনায়াসে হিপার্কাসের কাল নির্ভুলভাবে কষিয়া বাহির করা যায়। এই উপায়ে বহু প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত নক্ষত্র-সংস্থান বিচার করিয়া এই সব গ্রন্থের বা বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনার কাল সঠিকভাবে নির্ণীত হইয়াছে।

চন্দ্রগ্রহণের সময় চন্দ্রের উপর পতিত পৃথিবীর ছায়ার কৌণিক ব্যাস মাপিবার ব্যবস্থা করিয়া অ্যারিস্টার্কাস্ যে পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা প্রয়োগ করিয়া হিপার্কাস্ চন্দ্রের আয়তন ও দূরত্ব অধিকতর সন্তোষজনকভাবে নির্ণয় করিয়াছিলেন। তাঁহার গণনা অনুযায়ী চন্দ্রের দূরত্ব পৃথিবীর ব্যাসের ৩৩$\frac{1}{3}$ গুণ এবং সূর্যের দূরত্ব পৃথিবীর ব্যাসের ১,২৪৫ গুণ। চন্দ্র ও সূর্যের দূরত্বের ইহা অতি নির্ভুল মাপ। টলেমী তাঁহার গ্রন্থে হিপার্কাসের

নানা গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের কথা আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু চন্দ্র ও সূর্যের দূরত্বের এই মাপের কথা উল্লেখ করেন নাই। তিনি নিজে এই দূরত্বের যে মাপ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা হিপার্কাস্ প্রদত্ত মাপ অপেক্ষা অনেক কম। টলেমীর হিসাবে সূর্যের দূরত্ব পৃথিবীর ব্যাসের মাত্র ৬০৫ গুণ; ইহা হিপার্কাসের হিসাবের অর্ধেকেরও কম। হিপার্কাসের পরিমাপের কথা অজ্ঞাত থাকায় পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীরা টলেমীর মাপই স্বীকার করিয়া লয় এবং বহু শতাব্দী পর্যন্ত এই ভুল মাপই ঠিক বলিয়া গৃহীত হয়। কোপার্নিকাস্ এই দূরত্বের যে মাপ গ্রহণ করেন তাহাও ছিল পৃথিবীর ব্যাসের মাত্র ৭৫০ গুণ। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রিচার-প্রমুখ জ্যোতির্বিদ্গণের চেষ্টায় এই দূরত্বের সঠিক মাপ নির্ণীত হয়।*

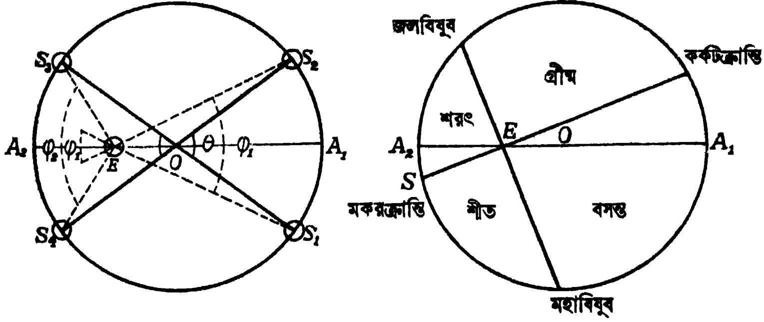
গ্রহণের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা : তারপর চন্দ্র যে ক্রান্তিবৃত্তপথে পরিক্রমণ করে না এবং ইহার পরিক্রমণ-বৃত্তের তল যে ক্রান্তিবৃত্তের তল হইতে প্রায় ৫° ডিগ্রী কোণে হেলিয়া থাকে, ইহা হিপার্কাসের আবিষ্কার বলিয়া অনেকে মনে করেন। চন্দ্রের পরিক্রমণ-বৃত্ত ও ক্রান্তি-বৃত্ত পরস্পরের সহিত এইভাবে সামান্য হেলিয়া থাকার দরুণ প্রত্যেক অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ ও পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ যে আমরা দেখিতে পাই না এবং গ্রহণ সংঘটিত হইতে হইলে সূর্য ও চন্দ্র উভয়কেই যে ক্রান্তিবৃত্ত ও চন্দ্রের পরিক্রমণ-বৃত্তের ছেদবিন্দুর খুব কাছাকাছি থাকা প্রয়োজন, হিপার্কাস্ এই তথ্য আবিষ্কার করিয়া গ্রহণের প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করেন। এজন্য গ্রহণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীও তাঁহার অনেক নির্ভুল হইত।

ভূকেন্দ্রীয় পরিকল্পনা: হিপার্কাসের ভূকেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। তিনি অ্যারিস্টার্কাসের সূর্যকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার কথা অবগত ছিলেন; ফিলোলাউসের অগ্নিকেন্দ্রীয় পরিকল্পনাও তাঁহার অজানা ছিল না। কিন্তু তিনি পৃথিবীর পরিক্রমণ-গতি সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া অ্যারিস্টট্ল্, ইউডক্সাস্-প্রমুখ প্রাচীন বিজ্ঞানীদের প্রদর্শিত পথে ভূকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার ভিত্তিতে সূর্য ও গ্রহদের পরিক্রমণ বুঝাইবার চেষ্টা করেন। পৃথিবীর স্থিতি তিনি অটল রাখিলেন। তথাপি তিনি সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন যে, ইউডক্সাস্ ও অ্যারিস্টট্লের এককেন্দ্রীয় গোলকের পরিকল্পনা জ্যোতিষের সমস্ত তথ্য ব্যাখ্যা করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। তিনি ইউডক্সাস্-অ্যারিস্টট্লের স্ফটিক-গোলকের ধারণা পরিত্যাগ করিয়া বলেন যে, গ্রহরা বৃত্তপথে পৃথিবীকে পরিক্রমণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সূর্য ও গ্রহরা যে সব এককেন্দ্রীয় বৃত্তপথে পরিভ্রমণ করে পৃথিবী সেই সব বৃত্তের ঠিক কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে না, কেন্দ্র হইতে কতকটা দূরে সরিয়া অবস্থান করে। অর্থাৎ গ্রহরা উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তপথে (eccentric circle) পৃথিবীকে পরিক্রমণ করিয়া থাকে।

সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া সমবেগে ধাবিত হইলে মহাবিষুব (Vernal equinox) হইতে জলবিষুবে (Autumnal equinox) পেঁছিতে এবং জলবিষুব হইতে আবার মহাবিষুবে ফিরিয়া আসিতে তাহার ঠিক অর্ধেক বৎসর অথবা ১৮২।১৮৩ দিন লাগিবার কথা। কিন্তু পর্যবেক্ষণের দ্বারা বহু পূর্বেই জানা গিয়াছিল যে, ক্রান্তিবৃত্তপথে মহাবিষুব হইতে জলবিষুবে পেঁছিতে সূর্যের সময় লাগে ১৮৬ দিন এবং বাকী অর্ধেক পথ ঘুরিয়া মহাবিষুবে পুনরায় পেঁছিতে তাহার লাগে ১৭৯ দিন। হিপার্কাস্ আরও লক্ষ্য করেন যে, বসন্তকালের (মহাবিষুব হইতে কর্কট ক্রান্তি) স্থায়িত্ব ৯৪ দিন এবং গ্রীষ্মকালের (কর্কটক্রান্তি হইতে জলবিষুব) স্থায়িত্ব ৯২ দিন। এই তথ্য হইতে এইরূপ প্রতীয়মান হইতেছে যে, ক্রান্তিবৃত্তের উভয় অর্ধে সূর্যের পরিক্রমণ-বেগ অসমান। পৃথিবীকে কেন্দ্র

* *Aristarchus of Samos;* p. 343.

করিয়া সূর্য সমবেগে সঞ্চারিত হইলে বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের দৈর্ঘ্যের এইরূপ তারতম্য ব্যাখ্যার অতীত হইয়া পড়ে।



৮৯। উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তের সাহায্যে হিপার্কাসের গ্রহ-গতি ব্যাখ্যা।

৯০। হিপার্কাসের ঋতু-পরিবর্তন ব্যাখ্যা।

এই অসংগতি দূর করিবার জন্য হিপার্কাস্ প্রস্তাব করেন যে, পৃথিবী ক্রান্তিবৃত্তের ঠিক কেন্দ্রে অবস্থান না করিয়া ইহার অনতিদূরে অবস্থান করে। দ্রষ্টার স্থান কেন্দ্র হইতে কিছুদূরে অর্থাৎ উৎকেন্দ্রে (ex-centre) কল্পনা করিলে সূর্যের গতির যে আপাত অসমবেগ পরিলক্ষিত হয়, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। ৮৯নং চিত্রে ইহা দেখানো হইয়াছে।

O — ক্রান্তিবৃত্তের কেন্দ্র; E — পৃথিবী; $A1$ — অপভূ; $A2$ — অনুভূ;

$S1$, $S2$, $S3$, $S4$ — সূর্যের বিভিন্ন অবস্থান। সহজেই দেখা যায় যে,

$$\phi_1 < \theta$$

সুতরাং সূর্য $S1$ হইতে $S2$-এ যে গতিতে অগ্রসর হয়, পৃথিবী (E) হইতে দেখিলে সেই গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর মনে হইবে। আবার,

$$\phi_2 > \theta > \phi_1$$

সুতরাং $S3$ হইতে $S4$-এ সূর্য পূর্বের মত একই কৌণিক বেগে অগ্রসর হইলেও পৃথিবী হইতে মনে হইবে যেন সে অনেক দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে। আর একটি লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, অপভূর নিকট সূর্যের গতি সর্বাপেক্ষা মন্থর; অপভূ হইতে ক্রমশঃ অনুভূর দিকে অগ্রসর হইবার সময় ইহার আপাত-গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া অনুভূতে সেই গতি হয় বৃহত্তম, এবং তারপর হইতে এই গতি আবার হ্রাস পাইতে থাকে।

বসন্ত, গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত প্রভৃতি বিভিন্ন ঋতুর দীর্ঘতার তারতম্য হিপার্কাস্ উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তের পরিকল্পনার সাহায্যে অতি চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেন। ৯০নং চিত্রে তাহা দেখানো হইল। হিপার্কাস্ হেরাক্লিডিসের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া গ্রহদের গতি ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ক্লডিয়াস্ টলেমী এই কার্য সম্পূর্ণ করেন। সেকথা পরে বলিতেছি।

গণিত, ত্রিকোণমিতি : গণিতেও হিপার্কাস্ বহু মৌলিক গবেষণা করিয়াছিলেন। জ্যোতিষীয় গবেষণায় তাঁহাকে ত্রিকোণমিতির ব্যবহার করিতে দেখা যায়। ত্রিকোণমিতির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপাদ্য,

$$\text{Sin } (A+B) = \text{Sin } A \text{ Cos } B + \text{Cos } A \text{ Sin } B,$$

সম্ভবতঃ তিনিই প্রমাণ করেন। বিভিন্ন কোণের 'সাইনে'র মান নির্ণয় করিয়া গণনার সুবিধার

জন্য তিনি এক সাইন-সারণী (Table of Sines) প্রস্তুত করিয়াছিলেন। গোলকের উপরিভাগে ত্রিভুজ অঙ্কন করিলে সেই ত্রিভুজের কোণ, ভুজ প্রভৃতির সম্বন্ধ ও মান নিরূপণের পদ্ধতি তিনি বাহির করিয়াছিলেন। এই পদ্ধতি তাঁহার জ্যোতিষীয় গণনায় বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

হিপার্কাসের বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে প্রধানতঃ চারিভাগে ভাগ করা যায়ঃ—(১) প্রচলিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে ব্যাপক ও নির্ভুল পর্যবেক্ষণ-গ্রহণ; (২) প্রাচীন ও পূর্বতন বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণলব্ধ বৈজ্ঞানিক তথ্যের সুচারু সমাবেশ ও চুলচেরা বিচার ও বিশ্লেষণ; (৩) বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সহজে ও বিধিবদ্ধ উপায়ে প্রকাশ করিতে গণিতের আশ্রয়-গ্রহণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে গণিত এই কার্যে অপারগ হইলে, গণিতের সংস্কার-সাধন অথবা নূতন গণিতের উদ্ভাবন (যেমন ত্রিকোণমিতি); এবং (৪) এক বিশেষ জ্যামিতিক পরিকল্পনার সাহায্যে সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহদের গতির বর্ণনা ও ব্যাখ্যা। এই চারি বিভাগেই তিনি আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ঐতিহাসিক ডেলম্বর্ লিখিয়াছেন ঃ

> "When we consider all that Hipparchus invented or perfected, and reflect upon the number of his works and the mass of calculations which they imply, we must regard him as one of the most astonishing men of antiquity, and as the greatest of all in the sciences which are not purely speculative, and which require a combination of geometrical knowledge with a knowledge of phenomena, to be observed only by diligent attention and refined instruments."*

হিপার্কাসের গবেষণাতেই গ্রীক জ্যোতিষের চরম পরিণতি। ইহার পরেই এই জ্যোতিষের অগ্রগতি রুদ্ধ হইল। বহু টীকাকার, ভাষ্যকার ও সুলেখকদের সম্মিলিত চেষ্টায় জ্যোতিষের জনপ্রিয়তা ও সম্মান অব্যাহত থাকিলেও সত্যকার প্রতিভার অভাবে নূতন জ্ঞানের পথপ্রদর্শক জীবন্ত বিজ্ঞান হিসাবে জ্যোতিষের সে গৌরব আর রহিল না। খ্রীঃ অঃ দ্বিতীয় শতকে হিপার্কাসের সুযোগ্য শিষ্য ক্লডিয়াস্ টলেমী এই রুদ্ধ স্রোত পুনঃপ্রবাহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইতিহাসের অনিবার্য কারণে সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রতিকূল পরিবেশে সেই স্রোতকে বেশী দিন সঞ্জীবিত রাখা যায় নাই।

ক্লডিয়াস্ টলেমী (খ্রীঃ অঃ দ্বিতীয় শতক)

ধারাবাহিক ঐতিহাসিক তারিখ অনুযায়ী দেখিতে গেলে ক্লডিয়াস্ টলেমীর বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোচনা আমাদের খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের জন্য স্থগিত রাখাই উচিত হইত। কিন্তু আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞানের আলোচনায় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই মহানগরীর সর্বশেষ বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ক্লডিয়াস্ টলেমীর প্রসঙ্গ এখানে বাদ দিলে এই অধ্যায় অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে। তারপর অ্যারিস্টার্কাস্, ইরাটোস্থেনিস্ ও হিপার্কাসের তৎপরতায় জ্যোতিষশাস্ত্রের বিবর্তন ও ক্রমোন্নতির যে ইতিহাস আমরা আলোচনা করিয়াছি তাহার সম্পূর্ণতার জন্যও টলেমীর জ্যোতিষের আলোচনা এখানে অপরিহার্য।

টলেমীর জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না; তবে আলেকজান্দ্রিয়ার টলেমী রাজবংশের সহিত তাঁহার যে কোন সম্পর্ক ও সংস্রব ছিল না, তাহা সুনিশ্চিত। ১২৭ হইতে ১৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি নানা গবেষণায় লিপ্ত থাকিয়া কালাতিপাত করেন।

* Delambre, *Histoire de l'Astronomie Ancienne,* Vol. I; p. 185.

জ্যোতিষই ছিল তাঁহার প্রধান গবেষণার বিষয়; গণিতে, পদার্থবিদ্যায় ও ভূগোলেও তিনি অনেক মূল্যবান কাজ করিয়াছেন। ফলিত জ্যোতিষে অর্থাৎ ভাগ্যগণনায়ও নাকি তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং এই সম্বন্ধে *Tetrabiblos* নামে একখানি পুস্তকও লিখিয়াছিলেন।

গ্রন্থ-পরিচয় ঃ টলেমীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষীয় গ্রন্থ 'অ্যাল্‌মাজেস্ট'কে (*Almagest*) প্রাচীন জ্যোতিষের বিশ্বকোষ বলা যাইতে পারে। মধ্যযুগে জ্যোতির্বিদ্‌রা ইহাকে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের বাইবেল মনে করিতেন। টলেমীর মূল গ্রন্থের গ্রীক নামের বাংলা অর্থ 'বৃহৎ সংহিতা'। শ্রদ্ধাবশতঃ হউক অথবা ভ্রমবশতঃই হউক, আরব্য অনুবাদকেরা 'বৃহৎ' কথাটির গ্রীক প্রতিশব্দের অর্থ করিয়াছিল 'বৃহত্তম' এবং আরবী অনুবাদে ইহা দাঁড়ায় *Al Magisti*। আরবী হইতে অনূদিত হইবার ফলে টলেমীর গ্রন্থের ল্যাটিন নাম হয় *Almagestum*; ইহার ইংরেজী অপভ্রংশ হইল *Almagest*।* *Optics* নামে তাঁহার আর এক গ্রন্থে আলোকের গুণাগুণ বর্ণিত হইয়াছে। ধ্বনি-বিজ্ঞান, ভাগ্যগণনা প্রভৃতি আরও কতকগুলি বিষয়ে কয়েকখানি পুস্তক তাঁহার প্রণীত, কোন কোন ঐতিহাসিকদের এরূপ অভিমতের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। এই পুস্তকগুলি নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং *Almagest*-এর রচয়িতার উপযুক্ত নহে।

অ্যালমাজেস্ট ঃ ইউক্লিডের *Elements* এর মত টলেমীর *Almagest* সমগ্র জ্যোতিষকে এক সুবিন্যস্ত ও বিধিবদ্ধ বিজ্ঞান হিসাবে উপস্থাপিত করিবার সুমহান প্রয়াস। ইহাতে টলেমীর নিজস্ব গবেষণার উল্লেখ ও আলোচনা থাকিলেও ইহা প্রধানতঃ পূর্বগামী জ্যোতির্বিদ্‌গণের বিশেষতঃ হিপার্কাসের গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ত্রয়োদশ খণ্ডে সমাপ্ত এই *Almagest*-ই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক জ্যোতিষীয় গ্রন্থ। ইহার প্রভাব শুধু পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, ভারতবর্ষ, ঐশ্লামিক মধ্যপ্রাচ্য প্রভৃতি দেশের জ্যোতিষ-চর্চাকেও বহুশত বৎসর যাবৎ এই গ্রন্থ বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। এজন্য বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই গ্রন্থ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

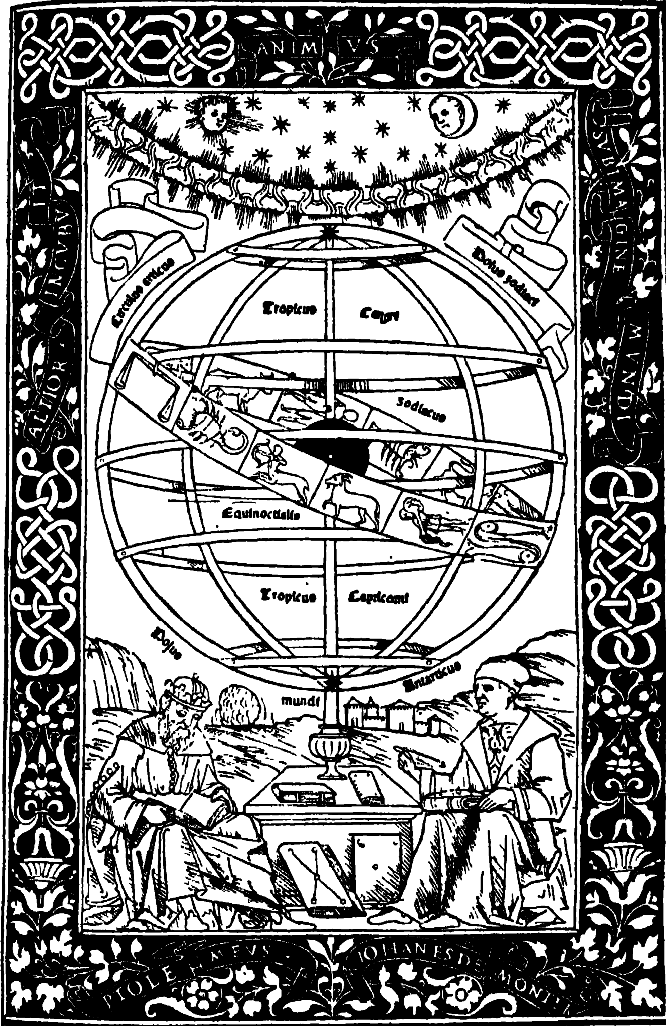
অ্যাল্‌মাজেস্টের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা দেখিতে পাই সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহদের গতি, পৃথিবীর আহ্নিক গতি, দিনরাত্রি ও তাহার দীর্ঘতা, নক্ষত্রের উদয়াস্ত, খ-গোলের আবর্তন ইত্যাদি সহজ জ্যোতিষীয় বিষয়ের আলোচনা। পৃথিবীর গোলাকৃতি সম্বন্ধে নানা তথ্যের সমাবেশ করা হইয়াছে, এবং ইহার পরিধি সম্বন্ধে টলেমী পোসিডোনিয়াসের নির্ণীত মাপ ১৮০০০০ ষ্টাডিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা ইরাটোস্থেনিস্‌ কর্তৃক নির্ণীত মাপ অপেক্ষা অনেক কম। এইরূপ ভুল মাপ প্রচলনের ফলে পৃথিবীর অপর গোলার্ধ সম্বন্ধে পরবর্তী কালে ভৌগোলিকদের মনে কিরূপ ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। গণিত সম্বন্ধেও কয়েকটি মূল্যবান অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে ত্রিকোণমিতি-সংক্রান্ত বহু প্রশ্নের আলোচনা উল্লেখযোগ্য। 0° হইতে ১৮০° ডিগ্রী পর্যন্ত $\frac{1}{2}^\circ$ ডিগ্রী অন্তর সাইনের মান লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি এক মূল্যবান সারণী প্রস্তুত করেন; এই সারণী প্রথম খণ্ডে স্থান পাইয়াছে। সম্ভবতঃ ত্রিকোণমিতির এই সব আলোচনা হিপার্কাসের গবেষণা হইতে গৃহীত। এই খণ্ডের আর এক জায়গায় তিনি π -এর মান নির্দেশ করিয়াছেন ৩·১৪১৬৭। অধুনা স্বীকার্য মান হইল ৩·১৪১৫৯২৭।

তৃতীয় খণ্ডে বৎসরের দীর্ঘতা, পঞ্জিকা ও সূর্য সংক্রান্ত নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ইহার সবটুকুই হিপার্কাসের গবেষণা; টলেমী নূতন কিছু যোগ করেন নাই।

চন্দ্রের গতি; ডেফারেন্ট ও পরিবৃত্তের পরিকল্পনা ঃ চতুর্থ খণ্ডের মূল বিষয়বস্তু চন্দ্রের গতি ও গ্রহণ। পূর্ববর্তী বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ্‌দের গবেষণার বিবরণের পর এ সম্বন্ধে

* Berry, *A Short History of Astronomy.*

টলেমী তাঁহার নিজস্ব পর্যবেক্ষণের ফল ও মতবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। চন্দ্রের গতি সম্বন্ধে তাঁহার আবিষ্কার ও মতবাদ প্রণিধানযোগ্য। টলেমীর অনেক পূর্বে হিপার্কাস্ চন্দ্রের অসমান গতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং ইহা বুঝাইবার জন্য সূর্যের ন্যায় চন্দ্রের ক্ষেত্রেও



৯১। টলেমীর 'অ্যাল্মাজেস্টে'র এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণে এই চিত্রটি মুখপত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

তিনি উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তের সাহায্য গ্রহণ করেন, অর্থাৎ চন্দ্র যে বৃত্তে পৃথিবীকে পরিক্রমণ করে সেই বৃত্তের কেন্দ্র হইতে সামান্য কিছু দূরে পৃথিবীর অবস্থিতি। টলেমী দেখাইলেন, হিপার্কাসের এই পরিকল্পনা অনুযায়ী চন্দ্রের অসমান গতির পুরাপুরি ব্যাখ্যা সম্ভবপর

নহে। হিপার্কাসের গণনায় চন্দ্রের বিভিন্ন অবস্থান যেরূপ হওয়া উচিত অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় সেই অবস্থানের বিশেষ কোন ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত না হইলেও অর্ধচন্দ্রের সময় এই অবস্থানের যথেষ্ট ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। হিপার্কাস্ প্রধানতঃ চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সময় চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর আপেক্ষিক অবস্থান পর্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার মতবাদ প্রস্তাব করিয়াছিলেন; টলেমী গ্রহণ ছাড়া অন্য সময়ে ইহাদের অবস্থান লক্ষ্য করিতে গিয়া এই গরমিল আবিষ্কার করেন। ইহার সমাধানকল্পে তিনি যে মতবাদ প্রস্তাব করেন তাহা সংক্ষেপে বুঝানো যাইতেছে।

মনে করা যাক, E পৃথিবী এবং E-র অনতিদূরে O বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া $M'PQ$ একটি উৎকেন্দ্রীয় (eccentric) বৃত্ত (৯২নং চিত্র)। হিপার্কাস্ এই উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তে চন্দ্রকে পরিক্রমণ করাইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু টলেমী বলিলেন, এই $M'PQ$ বৃত্তের উপর অবস্থিত M' বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া আসল চন্দ্র M একটি পরিবৃত্তের (epicycle) উপর ঘুরিতেছে। এই পরিকল্পনায় চন্দ্রের গতি এইরূপ যে, M যখন পরিবৃত্তপথে সঞ্চরণ করিতেছে সেই পরিবৃত্তের কেন্দ্র M' বিন্দুটি তখন উৎকেন্দ্রীয় বৃত্ত $M'PQ$-এর পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। $M'PQ$ বৃত্তের নাম ডেফারেণ্ট (deferent)। এখন অবশ্য আমরা জানি, চন্দ্র উপবৃত্তপথে পৃথিবীকে পরিক্রমণ করিয়া থাকে। এই উপবৃত্তের কথা টলেমীর জানা না থাকায় পরিবৃত্ত, ডেফারেণ্ট প্রভৃতি অবাস্তব জ্যামিতিক কৌশল তাঁহাকে প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। অধুনাসম্মত বলবিদ্যার নীতি হইতে এইরূপ গতির কল্পনা যতই অস্বাভাবিক হউক না কেন, এই উপায়ে টলেমী চন্দ্রের অবস্থান নির্ভুলভাবে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং গণনা ও পর্যবেক্ষণের অমিল তিনি ১০ সেকেণ্ড পর্যন্ত নামাইয়া আনিয়াছিলেন।

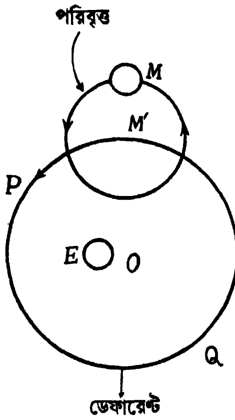
প্রাচীনকালে জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত আস্তর্লাব্ (astrolabe) যন্ত্রের বর্ণনা পাওয়া যায় পঞ্চম খণ্ডে। লম্বনের সাহায্যে চন্দ্রের দূরত্ব নিরূপণ-পদ্ধতি এবং চন্দ্রের দূরত্বের অনুপাতে সূর্যের দূরত্বের মাপ সংক্রান্ত আলোচনা এই খণ্ডে লিপিবদ্ধ। এ সম্বন্ধেও তিনি প্রধানতঃ হিপার্কাসের গবেষণার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন মাত্র।

ষষ্ঠ খণ্ডে গ্রহণ এবং সপ্তম ও অষ্টম খণ্ডে নক্ষত্র-পরিচয়, তাহাদের অবস্থান ও নক্ষত্র-তালিকার কথা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার সারণীতে ১০২৮টি নক্ষত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সারণী হিপার্কাসের সারণীরই প্রায় নকল; ক্রান্তিবিন্দুর অয়ন-চলনের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে। টলেমী ও তাঁহার সহকর্মীরা কোন কোন জায়গায় নূতন পর্যবেক্ষণের দ্বারা সামান্য কিছু অদল বদল করিলেও এই সারণীর প্রত্যেকটি নক্ষত্র তাঁহারা নূতন করিয়া পর্যবেক্ষণ করেন নাই, এবং ইহা যে মূলতঃ হিপার্কাসের নক্ষত্র-তালিকার ভিত্তিতে রচিত, ঐতিহাসিকেরা এইরূপ মনে করেন।

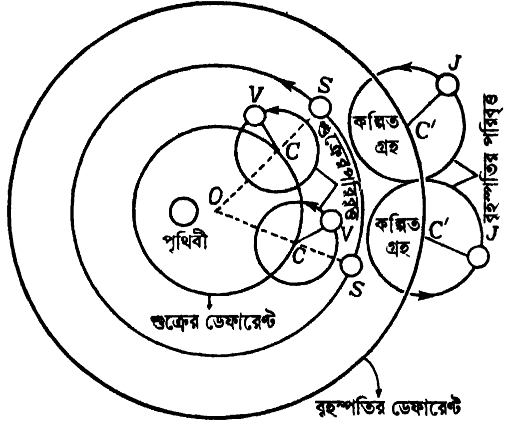
ভূকেন্দ্রীয় পরিকল্পনাঃ নবম হইতে ত্রয়োদশ খণ্ডে গ্রহদের গতি ও সাধারণভাবে ভূকেন্দ্রীয় ব্রহ্মাণ্ড-পরিকল্পনার কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনার জন্যই টলেমীর প্রসিদ্ধি। ভূকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার ভিত্তিতে জ্যোতিষের সকল তথ্য সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করিবার ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়াস। পরবর্তীকালে টলেমীর মতবাদ ভুল প্রতিপন্ন হইয়াছে বলিয়া বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইহার গুরুত্ব কিছু কম নহে। বিজ্ঞান প্রগতিশীল। তাহার ইতিহাসে বহু পর্যবেক্ষণ ও তথ্যের ভুল বাহির হইয়াছে, বহু মতবাদের পতন-অভ্যুত্থান ঘটিয়াছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি এই সমস্ত ভুল ও নির্ভুল প্রচেষ্টার সম্মিলিত ফল। যে অনন্যসাধারণ প্রতিভা, বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, ধৈর্য ও অধ্যবসায় এই জাতীয় তৎপরতাকে সম্ভবপর করিয়াছে, তাহার মূল্য চিরন্তন ও শাশ্বত।

হিপার্কাসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া টলেমী সূর্যের পরিক্রমণ নির্দেশ করিতে উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তের আশ্রয় গ্রহণ করেন। চন্দ্রের গতি সম্বন্ধে তাঁহার ব্যাখ্যা আগেই আলোচিত

হইয়াছে। এইবার বাকী রহিল গ্রহদের গতির কথা। গ্রহদের গতির ব্যাখ্যা-ব্যাপারেই তিনি সবচেয়ে বেশী অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে এই গতি নিতান্ত খাপছাড়া ও বিশৃঙ্খল বলিয়া বোধ হইবে। এই গতি যে শুধু অসমান তাহা নহে, কখনও কখনও এরূপ মনে হয় যে, গ্রহরা পশ্চিম হইতে পূর্বে না গিয়া যেন ইহার ঠিক বিপরীত দিকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। আবার কখনও মনে হইবে, গ্রহরা যেন কিছুক্ষণের জন্য একেবারে নিশ্চল অবস্থায় রহিয়াছে। গ্রহদের এই ছন্নছাড়া গতি হেরাক্লিডিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং বুধ ও শুক্রের বেলায় পরিবৃত্তের কল্পনা করিয়া তিনি ইহার কিরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। টলেমী পরিবৃত্তের সাহায্য গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু কোন গ্রহকে সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণ্যমান কল্পনা করেন নাই। তাঁহার পূর্ণ পরিকল্পনা ৯৩নং চিত্রে দেখানো হইল।



৯২। ডেফারেণ্ট ও পরিবৃত্তের সাহায্যে চন্দ্রের গতির ব্যাখ্যা—টলেমী।



৯৩। টলেমীর ভূকেন্দ্রীয় পরিকল্পনার চিত্ররূপ। *O*—কেন্দ্রবিন্দু; *V*—শুক্র; *C*—কল্পিত শুক্র; *S*—সূর্য; *J*—বৃহস্পতি; *C′*—কল্পিত বৃহস্পতি।

সূর্য (*S*) উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তপথে পৃথিবীকে সমবেগে পরিক্রমণ করে। ক্রান্তিবৃত্ত অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর দুইটি উৎকেন্দ্রীয় বৃত্তে (ডেফারেণ্ট) যথাক্রমে কল্পিত শুক্র ও বুধ (চিত্রে শুধু শুক্রের (*V*) গতি দেখানো হইয়াছে) পরিক্রমণ করে; আসল শুক্র ও বুধ আবর্তিত হয় এক একটি পরিবৃত্তের উপর,—কল্পিত শুক্র বা বুধ এই বৃত্তের কেন্দ্র মাত্র। তারপর বুধ ও শক্রের গতি এইরূপভাবে বিধিবন্ধ যে, পরিবৃত্তে ইহাদের অবস্থান যাহাই হউক, *O* বিন্দু, কল্পিত গ্রহ *C* ও সূর্য *S* সব সময় একই সরল রেখার (*OCS*) উপর থাকিবে। সূর্য অপেক্ষা অধিক দূরবর্তী গ্রহদের গতি বৃহস্পতির (*J*) দৃষ্টান্তর দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। বৃহস্পতিও একটি পরিবৃত্তের উপর আবর্তিত হয় এবং এই পরিবৃত্তের কেন্দ্র অর্থাৎ কল্পিত বৃহস্পতি (*C′*) *O* বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া একটি বৃহৎ বৃত্তের (ডেফারেণ্ট) পরিধিপথে পরিক্রমণ করে। এই বৃহৎ বৃত্তপথে একবার ঘুরিয়া আসিতে বৃহস্পতির ১২ বৎসর সময় লাগে; কিন্তু পরিবৃত্তপথে সম্পূর্ণরূপে একবার ঘুরিয়া আসিতে লাগে এক বৎসর। টলেমী বুধ ও শুক্র ছাড়া অন্যান্য গ্রহের ক্ষেত্রে পরিবৃত্তের মাপ এইরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন যাহাতে প্রত্যেকেরই ঠিক এক বৎসর লাগে স্ব স্ব পরিবৃত্ত একবার ঘুরিয়া আসিতে। ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি বলেন যে, গ্রহের আসল অবস্থান

হইতে পরিবৃত্তের কেন্দ্র পর্যন্ত সরল রেখা টানিলে সেই সরল রেখা সব সময়ই পৃথিবী হইতে সূর্য পর্যন্ত অঙ্কিত সরল রেখার সহিত সমান্তরাল থাকিবে। সমগ্র পরিকল্পনাটি যে অতীব জটিল ও নানা দিক দিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে অসংগত তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু এই পরিকল্পনার সাহায্যে টলেমী গ্রহদের আপাত গতির সন্তোষজনক মিল ঘটাইয়াছিলেন। তাঁহার এই সাফল্যের জন্য অন্যান্য নানা অসংগতি সত্ত্বেও সমগ্র বিদ্বৎসমাজ ইহাকে অকুণ্ঠ-চিত্তে গ্রহণ করিয়াছিল এবং কোপার্নিকাসের পূর্বে ইহা অপেক্ষা উন্নততর পরিকল্পনা আর কেহই প্রস্তাব করিতে সমর্থ হন নাই।

আলোকবিদ্যা: টলেমী আলোক সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান গবেষণা করেন। *Optics* নামক গ্রন্থে তাঁহার এই সব গবেষণা লিপিবদ্ধ আছে। বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী আলেকজান্দার ফন্ হাম্বোল্ট এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এই গ্রন্থে টলেমী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যে উচ্চ আদর্শের নিদর্শন দেখাইয়াছেন, প্রাচীন বিজ্ঞানীদের মধ্যে এইরূপ দৃষ্টান্ত খুব অল্পই পাওয়া যায়। হাম্বোল্টের এই মন্তব্য অবশ্য কিছুটা অতিশয়োক্তি। কারণ, হীরো, স্টেসিবিয়াস্ প্রমুখ আলেক্জান্দ্রীয় বিজ্ঞানীরা অতি নিপুণ ব্যবহারিক বিজ্ঞানী ছিলেন এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আদর্শের প্রতি তাঁহারা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ব্যাপারে টলেমী হীরো অথবা স্টেসিবিয়াস্কে অতিক্রম করিয়াছিলেন তাহা বলা চলে না।

টলেমীর অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থের ন্যায় এই *Optics* গ্রন্থের মূল গ্রীক পাণ্ডুলিপি নিখোঁজ হইয়াছে। পুস্তকটি আরবী ভাষায় অনূদিত হয়; দুর্ভাগ্যবশতঃ এই আরবী তর্জমাও সংরক্ষিত হইতে পারে নাই। এক্ষণে আমাদের হাতে আসিয়া যাহা পৌঁছিয়াছে তাহা হইল আরবী হইতে *Optics* পুস্তকের এক ল্যাটিন তর্জমা; এই ল্যাটিন সংস্করণের ষোলটি প্রতিলিপির খোঁজ পাওয়া গিয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে সিসিলীয় নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ইউজেন অব্ পালের্মো (Eugene of Palermo) এই গ্রন্থের ল্যাটিন অনুবাদ করেন।

Optics গ্রন্থটি পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ডে আলোক ও চক্ষুর বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই খণ্ডটিও আবার অধুনা নিখোঁজ হইয়াছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রজার বেকন এই খণ্ডের কথা জানিতেন।* দ্বিতীয় খণ্ডে বস্তুর আপাত আয়তন কিভাবে দৃষ্টিকোণের উপর নির্ভর করে তাহা দেখানো হইয়াছে। তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডে সমতল, অবতল, উত্তল, শঙ্কু ও পিরামিডের আকারের বিভিন্ন প্রকার প্রতিফলকের বর্ণনা আছে। পঞ্চম খণ্ডের প্রধান আলোচ্য বিষয় আলোকের প্রতিসরণ। টলেমীর পূর্বে এবং তাঁহার পরে মুসলমান বিজ্ঞানী আল্-হাজেনের আগে আলোকের প্রতিসরণ সম্বন্ধে আর কেহ গবেষণা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। কাচখণ্ডে ও জলে প্রবেশ করিবার কালে আলোক-রেখা কিভাবে বাঁকিয়া যায় সেই প্রতিসরণের এক নিয়ম তিনি প্রস্তাব করেন। নিয়মটি হইতেছে,

$$A = lB - cB^2$$

A হইল আপতন কোণ (angle of incidence), B প্রতিসরণ কোণ, l প্রতিসরাঙ্ক এবং c একটি ধ্রুবক। প্রকৃত নিয়ম অবশ্য

$$\text{Sin } A = l \text{ Sin } B$$

A ও B-র মান খুব ছোট হইলে এই উভয় নিয়মই প্রায় এক ফল দিবে।

এই প্রতিসরণের আলোচনার জন্য *Optics*-এর পঞ্চম খণ্ড বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আর ঠিক এই কারণেই টলেমীর *Optics*-এর যে ল্যাটিন অনুবাদ এখন সংরক্ষিত আছে, তাহা

* Lynn Thorndike, *A History of Magic and Experimental Science,* Vol. I; p. 108.

কতদূর নকল ও কতদূর আসল, সে সম্বন্ধে অনেকে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই সন্দেহের প্রধান কারণ, *Almagest*-এ আলোক-প্রতিসরণের কোন উল্লেখ নাই, অথচ *Optics*-এ শুধু প্রতিসরণই নহে, বায়ুস্তরে সূর্য ও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক হইতে বিচ্ছুরিত আলোকের প্রতিসরণের ফলে যেসব জ্যোতিষীয় ঘটনা ঘটে, তাহার উল্লেখ পর্যন্ত আছে। তারপর *Optics*-এ জ্যামিতির প্রয়োগের যেসব নমুনা দৃষ্ট হয় তাহা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর জ্যামিতি এবং আদৌ টলেমীর যোগ্য নহে। এই সব সমালোচনায় মনে হয় যে, টলেমীর এই *Optics*-প্রণয়ন ব্যাপারে কোথাও কোন গলদ লুক্কায়িত আছে। ইহা যদি সত্যই টলেমীর লেখনীপ্রসূত হয়, তবে মধ্যযুগে আরব বা ল্যাটিন অনুবাদকেরা টলেমীর সুনামের সুযোগ গ্রহণ করিয়া হয়ত স্থানে স্থানে মূল গ্রন্থের বিকৃতি ঘটাইয়া থাকিবে, এইরূপ ধারণা অযৌক্তিক মনে হয় না।

জ্যোতিষের সম্ভবতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার ক্লডিয়াস্ টলেমীর স্বকীয়তা সম্বন্ধে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহা সত্য যে, তাঁহার জ্যোতিষ হিপার্কাসের গবেষণার নিকট বহুলাংশে ঋণী; তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল অনুপ্রেরণাও হিপার্কাস্। তাঁহার স্বকীয়তায় সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও পাণ্ডিত্যে ও জ্ঞানের ব্যাপকতায় টলেমীর সমকক্ষ বিজ্ঞানী সে যুগে অল্পই ছিল। *Almagest* চিরদিনই তাঁহার অক্ষয় কীর্তি ঘোষণা করিবে। *Almagest* রচনা করিয়া হিপার্কাসের অমূল্য গবেষণাকে বিস্মৃতির হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্যও টলেমীর নিকট আমরা চিরঋণী।

৬·৫। বলবিদ্যা, যান্ত্রিক আবিষ্কার ও ফলিত পদার্থবিদ্যা— স্টেসিবিয়াস্, ফিলো ও হীরো

গ্রীক বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা-প্রসঙ্গে প্রধানতঃ জ্যামিতি, গণিত ও জ্যোতিষে, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জীববিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যায় গ্রীকদের অত্যাশ্চর্য গবেষণা ও আবিষ্কারের কথাই এ পর্যন্ত সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। পিথাগোরাস্, আর্কিটাস্, ইউডক্সাস্, ইউক্লিড্, আর্কিমিডিস্, অ্যাপোলোনিয়াস্ প্রমুখ গণিতজ্ঞরা গণিত ও জ্যামিতির জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন; থিওফ্রেস্টাস্ উদ্ভিদ্বিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করেন; অ্যারিস্টটল্ জীববিদ্যায় এবং ফিলোলাউস্, হেরাক্লিডিস্, অ্যারিস্টার্কাস্, ইরাটোস্থেনিস্, হিপার্কাস্, টলেমী প্রমুখ জ্যোতির্বিদ্গণ জ্যোতিষে যুগান্তর আনয়ন করেন; এবং হিপোক্রেটিস্, হিরোফিলাস্ ইরাসিসট্রেটাস প্রমুখ চিকিৎসকদের গবেষণার ফলে চিকিৎসাবিদ্যায় বৈজ্ঞানিক আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বুনিয়াদী ও তত্ত্বীয় বিজ্ঞানে প্রাচীন জাতিদের মধ্যে গ্রীকদের অবদান যে সত্যই অতুলনীয়, একথা অবিসংবাদিত।

ফলিত বিজ্ঞানে গ্রীকদের অনগ্রসরতা

ঐতিহাসিকগণ সাধারণতঃ এই তত্ত্বীয় বিজ্ঞানে গ্রীকদের অবদান বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া এবং গ্রীক প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করেন। কিন্তু বিজ্ঞানের আরও একটি দিক আছে, আরও একটি প্রকাণ্ড বিভাগ আছে। সেই দিক হইল মানুষের কল্যাণে, তাহার জীবনযাত্রা সহজে নির্বাহ করিবার জন্য এবং প্রকৃতির নানা বাধা-বিপত্তি জয় করিয়া এই জীবনযাত্রা শুধু সহজ করা নহে, ইহার মান রীতিমত উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের প্রয়োগের দিক। এই প্রয়োগের দিক বিজ্ঞানের যে বিভাগের আলোচ্য বিষয় তাহার নাম ফলিত বিজ্ঞান। ফলিত বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাসও বড় কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। ইহার অগ্রগতির সহিত সভ্যতার বিবর্তন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখন প্রশ্ন, গ্রীকরা

বিজ্ঞানের প্রয়োগে কতদূর যত্নবান ও সফলকাম হইয়াছিল? ফলিত বিজ্ঞানে তাঁহাদের অবদান কিরূপ?

এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর-প্রদান সহজসাধ্য নহে। তাহার এক কারণ, গ্রীক ও গ্রেকো-রোমক আমলে ফলিত বিজ্ঞান সম্পর্কিত পুঁথিপত্রের অপ্রতুলতা। সম্ভবতঃ এজাতীয় কিছু কিছু পুঁথিপত্র নিখোঁজ হইয়া থাকিবে, যেমন তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের অনেক পুঁথিই নিখোঁজ হইয়াছে। তবে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সংখ্যক গ্রন্থ যে প্রণীত বা লিখিত হয় নাই, তাহা মনে করিবারও কারণ আছে। থর্নডাইকের মতে * প্রাচীন সভ্যতার আওতায় ফলিত বিজ্ঞানের গতি ছিল অত্যন্ত শ্লথ ও মন্থর। একমাত্র পশুশক্তি ও ক্রীতদাসদের শ্রমলব্ধ শক্তির ব্যবহার ছাড়া অন্য কোন প্রকার শক্তির ব্যবহার প্রাচীন সভ্যতায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল এবং অন্যবিধ শক্তির ব্যবহার অনাবিষ্কৃত থাকায় বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ যান্ত্রিক আবিষ্কার বা মানুষের সুখ-সুবিধার্থে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্ভবপর হয় নাই। বস্তুবাদী সমাজ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগের প্রশ্ন কাহারও কল্পনায় আসে নাই।

প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের দার্শনিক মতবাদ এবং দাস-প্রথার ভিত্তিতে সমাজ-ব্যবস্থার পরিকল্পনা ফলিত বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। সমাজে এইরূপ শ্রেণী বিভাগের ফলে সর্বপ্রকার কায়িক পরিশ্রম ও হাতে-কলমে কাজ করিবার দায় ক্রীতদাসের উপর ন্যস্ত হয়। যে কাজ ক্রীতদাসের যোগ্য, তাহা স্বাধীন নাগরিকের অযোগ্য এবং তাহার পক্ষে ঘৃণ্য, অতএব সর্বৈব পরিত্যাজ্য। এইরূপ মনোভাবের প্রাধান্য থাকায় কারিগরি বিদ্যার আদর কমিল, তাহা রীতিমত অসম্মানের ও অবজ্ঞার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। আর্কিমিডিস্ নিজে বহু মূল্যবান যান্ত্রিক আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে তিনি বহু গুরুত্বপূর্ণ যান্ত্রিক কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এইসব আবিষ্কার একাধিকবার তাঁহার প্রিয় স্বদেশ সাইরাকিউজকে রোমক সৈন্যবাহিনীর অবরোধের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু তিনি কোনদিনই যান্ত্রিক আবিষ্কারকে উচ্চ স্থান দেন নাই; 'জ্যামিতির খেলা' বলিয়া ইহাদের বরাবর উড়াইয়া দিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় ফলিত বিজ্ঞানের উন্নতি আদৌ আশা করা যাইতে পারে না। তাই গ্রীকদের তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের ঔজ্জ্বল্যের পাশে তাহাদের ফলিত বিজ্ঞানের দীপ্তিহীনতা নিতান্তই প্রকট ঠেকে।

তারপর কালেভদ্রে এই অনাদৃত ফলিত বিজ্ঞানের সামান্য কিছু উন্নতি যদিও বা হইয়া থাকে, এ সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণার অভাবে তাহাও আমাদের জানা নাই। তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের ইতিহাস উদ্ধারে যেরূপ দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনা ও পণ্ডিতদের লড়াই হইয়াছে এবং তাহার ফলে এ সম্বন্ধে বহু সমস্যার মীমাংসায় পেঁছানো যেমন সম্ভবপর হইয়াছে, ফলিত বিজ্ঞানের ইতিহাস উদ্ধারে সেরূপ কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। টেক্‌নলজির ইতিহাস সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কাজ হইয়াছে খুবই অল্প; ইহার গুরুত্ব উপলব্ধিও অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ব্যাপার। টেক্‌নলজি ও ফলিত বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার দ্বারা বহু মূল্যবান ও অপ্রত্যাশিত তথ্যের যে সন্ধান মিলিবে এইরূপ আশা করা অযৌক্তিক নহে।

সাধারণভাবে বিজ্ঞানের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা প্রাচীনকালে উপলব্ধ না হইলেও, যুদ্ধে, ধর্ম ব্যাপারে ও যাদুবিদ্যার অনুপ্রেরণায় ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাবিধ যান্ত্রিক আবিষ্কারের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। অবশ্য যুদ্ধও একপ্রকার সামাজিক ঘটনা; ধর্ম ও যাদুবিদ্যাও সমাজাশ্রয়ী। সেইদিক দিয়া বিচার করিলে যুদ্ধ, ধর্ম ও যাদুবিদ্যার প্রয়োজনে সংঘটিত বিজ্ঞানের ব্যবহারিক আবিষ্কার সামাজিক কারণেও অনুপ্রাণিত বটে। তবে এইরূপ ব্যাপক অর্থ না করাই ভাল। যুদ্ধ, ধর্ম বা যাদুবিদ্যার খাতিরে বিজ্ঞানের যে প্রয়োগ ঘটিতে দেখা গিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা বা আক্রমণ, প্রতারণা ও অর্থকরী মনোবৃত্তির চরিতার্থতা। সমগ্রভাবে মানুষের কল্যাণ, সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি তাহার উদ্দেশ্য নহে। যুদ্ধে শত্রুর বিনাশ-সাধনের উদ্দেশ্যেই হউক অথবা

* Thorndike, *History of Magic and Experimental Science*, Vol. I, p. 182.

ধর্মান্ধতার সুযোগ লইয়া মানুষকে প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যেই হউক, এই সব যান্ত্রিক আবিষ্কার একেবারে বৃথা যায় নাই। শেষ পর্যন্ত কোন না কোন উপায়ে এইসব আবিষ্কার যে মানুষের উপকারে লাগিয়াছে, তাহা অনস্বীকার্য।

আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞানের যুগে এই ধরনের যান্ত্রিক আবিষ্কারের দ্বারা যাঁহারা ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন স্টেসিবিয়াস্, ফিলো ও হীরো তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

স্টেসিবিয়াস্ (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২৮৫-২২২)

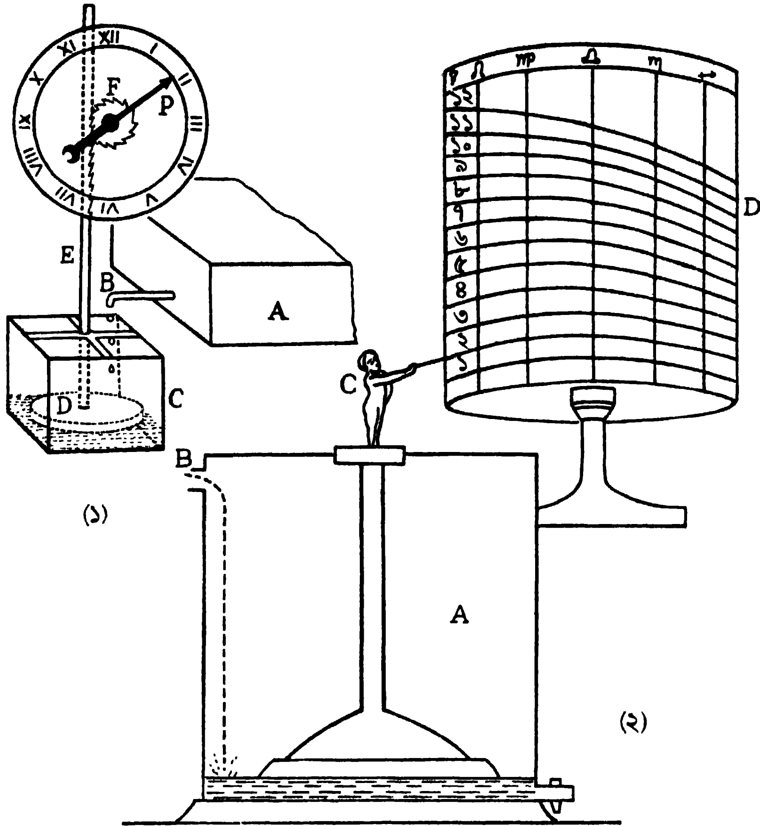
আলেকজান্দ্রীয় ক্ষৌরকারের পুত্র নীচকুলোদ্ভব স্টেসিবিয়াস্ জলঘড়ি, জলতরঙ্গ ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রের আবিষ্কার ও উন্নতির জন্য বিখ্যাত। আলেকজান্দ্রীয় যন্ত্রবিদ্যার তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থের বিশেষ কিছুই সংরক্ষিত হয় নাই। সুপ্রসিদ্ধ রোমক লেখক ভিট্রুভিয়াস্ ও প্লিনির গ্রন্থ হইতে তাঁহার আবিষ্কারের কথা জানা যায়। অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেন। ক্ষৌরকার্যের সুবিধার জন্য যান্ত্রিক উপায়ে আয়না উপরে উঠাইতে বা নীচে নামাইতে অথবা যে কোন ভাবে ইহাকে সংস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে একটি দড়ির প্রান্তভাগে এক খণ্ড সীসা ঝুলাইবার ব্যবস্থা করেন। সীসক খণ্ডের সাহায্যে আয়নার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রিত করা হইত। সীসক খণ্ডটিকে একটি পাইপের মধ্যে উঠা-নামা করানো হইত। এইরূপ পরীক্ষা করিবার সময় তিনি লক্ষ্য করেন যে, সীসক খণ্ডটি উপর হইতে নীচে নামিবার সময় প্রায় প্রত্যেকবারই পাইপের মধ্য হইতে একপ্রকার ধ্বনি নির্গত হইতেছে। এইরূপ ধ্বনি সৃষ্টি তাঁহার কাছে রহস্য মনে হইল। এই অভিজ্ঞতার সূত্র অবলম্বন ও এ সম্বন্ধে ক্রমাগত পরীক্ষা করিয়া তিনি শেষ পর্যন্ত এক জলতরঙ্গের আবিষ্কার করেন। জলতরঙ্গ যান্ত্রিক উপায়ে সঙ্গীত সৃষ্টির এক অভিনব আবিষ্কার। ফারিংটন্ লিখিয়াছেন, সভ্যতার ইতিহাসে জলতরঙ্গ প্রভৃতি শব্দযন্ত্রের আবিষ্কার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। *

জলঘড়িঃ স্টেসিবিয়াসের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার জলঘড়ি। ভিট্রুভিয়াস্ *De architectura*-য় এই জলঘড়ির এক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ৯৪-৯নং চিত্রে এই জলঘড়ির যান্ত্রিক কৌশল বুঝানো হইয়াছে। A পাত্র হইতে C পাত্রে একটি সরু নল B-র মধ্য দিয়া অতি ধীরে অথচ সমান বেগে জল প্রবেশ করানো হয়। নলের মুখ যাহাতে ক্ষয়প্রাপ্ত বা বন্ধ না হয় তজ্জন্য স্বর্ণ বা মনিমুক্তা জাতীয় মূল্যবান পদার্থনির্মিত নল ব্যবহৃত হয়। C পাত্রটির মধ্যে সোলা বা সোলা জাতীয় ভাসমান একটি চাক্তি D থাকে; E সোলার কেন্দ্রস্থলে একটি দণ্ডায়মান শলাকা। এই শলাকার অগ্রভাগের কিছুটা অংশ অতি সূক্ষ্ম দন্তবিশিষ্ট। F একটি দন্তবিশিষ্ট ক্ষুদ্র চাকা; ঘড়ির বলয়ের কেন্দ্রস্থলে এই চাকা অবস্থিত। E শলাকার গুণ ও F চাকার দাঁতগুলি একই মাপের তৈরী; সুতরাং শলাকার গুণ ও চাকার দাঁত পরস্পর খাঁজে খাঁজে লাগিয়া থাকে। এখন B নলের মুখ হইতে নির্গত জল ক্রমাগত C পাত্রে জমিবার ফলে ভাসমান সোলার চাক্তিটি ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠিতে থাকিবে। সেই সঙ্গে E শলাকাটি। প্রান্তভাগের সহিত সংলগ্ন F চাক্তিও ধীরে ধীরে ঘুরিতে থাকিবে। বলয়ের প্রান্তদেশে দাগ কাটিয়া সময় চিহ্নিত করা থাকে; F চাকার সংলগ্ন কাঁটা P অনায়াসেই সময় নির্দেশ করিতে সক্ষম।

স্টেসিবিয়াস্ তাঁহার পরিকল্পিত জলঘড়ির ঘণ্টার মেয়াদ সমান রাখিতেন না। ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মেয়াদও তিনি বদলাইতেন। তারপর দিন ও রাত্রি তিনি সমান ১২ ভাগে ভাগ করেন। ফলে গ্রীষ্মকালে দিনের বেলায় ঘণ্টার মেয়াদ শীতকালের দিবাভাগের ঘণ্টা অপেক্ষা দীর্ঘতর হইত। ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টার দৈর্ঘ্য যাহাতে আপনা হইতেই পরিবর্তিত হয় তদুদ্দেশ্যে গোলাকার সমতল চাক্তির বদলে তিনি একটি ড্রাম

* B. Farrington, *Greek Science*, Part II, p. 61.

ব্যবহার করেন। এই ড্রামটি আসলে একটি ফাঁকা সিলিন্ডার। ইহার গায়ে খাড়াইভাবে সমান দূরত্বে বারোটি সরল রেখা টানা আছে বৎসরে বারো মাসের জন্য। এই বারোটি উল্লম্ব রেখাকে ছেদ করিয়া এবং ড্রামটিকে গোলভাবে ঘিরিয়া আবার বারোটি রেখার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়োক্ত রেখাগুলির পারস্পরিক দূরত্ব প্রায় সমান হইলেও কিছু পার্থক্য



৯৪। স্টেসিবিয়াসের জলঘড়ি।

আছে (চিত্র ৯৪-২)। ইহাদের দ্বারা দিনের অথবা রাত্রির ১২ ঘণ্টা বুঝাইতেছে। বৎসরের বিভিন্ন মাস নির্দেশক উল্লম্ব রেখাগুলির উপর অনুভূমিক রেখাগুলির দূরত্বের পার্থক্য হেতু ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টাও দীর্ঘ বা হ্রস্ব হইয়া থাকে।

জলতরঙ্গ ও জলঘড়ি ছাড়া যুদ্ধে ব্যবহার্য নানাপ্রকার নিক্ষেপক যন্ত্র, পাম্প, আগুন নিভাইবার একপ্রকার ইঞ্জিন ইত্যাদি নানাবিধ আবিষ্কারের জন্যও স্টেসিবিয়াস্ বিখ্যাত। বায়ুর চাপের ধর্ম সুকৌশলে ব্যবহার করিয়া তিনি নিক্ষেপক অস্ত্র, পাম্প ও অগ্নিনিবারক যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। ভিট্রুভিয়াসের মতে স্টেসিবিয়াসই সম্ভবতঃ বায়ুর চাপ ও তজ্জনিত ধর্মের আবিষ্কর্তা। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

"....He discovered the natural pressure of the air and pneumatic principles,....devised methods of raising water,

automatic contrivances, and amusing things of many kinds ......blackbirds singing by means of water clocks, and *angobatae,* and figures that drink and move, and other things that have been found to be pleasing to the eye and the ear."*

ফিলো

স্টেসিবিয়াসের সমসাময়িক বাইজান্টিয়ামের ফিলোও নানাবিধ যান্ত্রিক আবিষ্কারের জন্য খ্যাত। বলবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার এক বৃহৎ গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ এখন পর্যন্ত সংরক্ষিত



৯৫। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত ফিলোর গ্রন্থের এক গ্রীক সংস্করণে এই চিত্রটি দেখা যায়। উত্তাপ প্রয়োগে বায়ু কিরূপ স্ফীত হয়, এই যন্ত্রের দ্বারা তাহা দেখানো হইয়াছে।

আছে। লিভার, বন্দর-নির্মাণ, অটোম্যাটা-নির্মাণ, বায়ুর চাপ ব্যবহার করিয়া নানারূপ যন্ত্র তৈয়ারী করিবার কৌশল ইত্যাদি এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

হীরো বা হেরণ (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৫০ (?); আনুমানিক ২৫০ খ্রীষ্টাব্দ)

খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে স্টেসিবিয়াস্, ফিলো প্রমুখ পদার্থবিদ্ ও বলবিদ্যা-বিশারদগণ যান্ত্রিক আবিষ্কারের যে আদর্শ স্থাপন করেন, সেই আদর্শের চরম পরিণতি আমরা দেখিতে পাই হীরোর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ও আবিষ্কারে। এই সব গবেষণায় তিনি স্টেসিবিয়াস্-প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করেন। ভিয়েনায় প্রাপ্ত তাঁহার লিখিত *Belopoeica* গ্রন্থে স্টেসিবিয়াসের নিকট এই ঋণ তিনি অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। বহু ক্ষেত্রে তিনি গুরুর প্রদর্শিত নীতি ও পদ্ধতি হুবহু অনুসরণ করিয়া একই জাতীয় আবিষ্কারের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হন। হীরো এক উন্নত ও তৈয়ারী বলবিদ্যা হাতে পাইয়াছিলেন এবং নিজ প্রতিভাবলে সেই বিদ্যাকে নানাভাবে উন্নততর ও সমৃদ্ধতর করিয়াছিলেন। গবেষণার মৌলিকতা ও প্রাচুর্য, অগাধ পাণ্ডিত্য ও বিশ্বকোষের মত রচনা প্রভৃতি নানা দিক বিচার করিলে দেখা যাইবে, যন্ত্রবিদ্যায় হীরো প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে, সম্ভবতঃ সমগ্র প্রাচীন সভ্য জাতির মধ্যে, সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারক ছিলেন। জ্যামিতিতেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল প্রথম শ্রেণীর। তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল প্রধানতঃ ফলিত জ্যামিতি।

হীরোর তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা এখন পর্যন্ত একমত হইতে পারেন নাই। যে দল হীরোর জীবদ্দশার অধিকতর প্রাচীনতায় বিশ্বাসী এবং যে দল ইহার ঠিক বিপরীতটিতে

* Vitruvius, *De architectura,* IX, *viii,* 2 & 4; x, *vii,* 4.

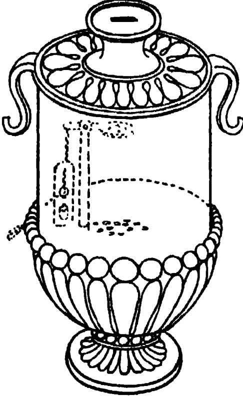
বিশ্বাসী, এই দুই দলের প্রস্তাবিত তারিখের মধ্যে প্রায় চারিশত বৎসরের প্রভেদ দেখা যায়। প্রথমোক্তদের মতে, তিনি খ্রীঃ পূঃ ১৫০ অব্দে জীবিত ছিলেন; দ্বিতীয় দলের মতে, তিনি খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় শতকে জীবিত ছিলেন। এই শেষোক্ত দল দেখাইয়াছেন যে, ভিট্রুভিয়াস্ বা প্লিনি কাহারও কোন গ্রন্থেই হীরোর উল্লেখ পাওয়া যায় না।* যাঁহারা হীরোর কাল খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় শতক বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের গবেষণা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক এবং সম্ভবতঃ অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

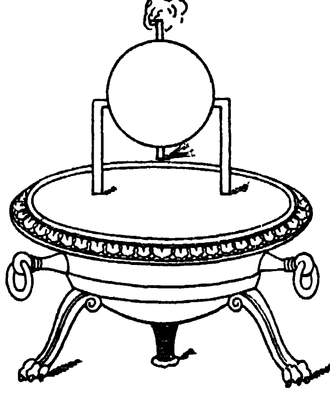
গ্রন্থ-পরিচয় ঃ হীরোর লিখিত যন্ত্রবিদ্যা-বিষয়ক যে সমস্ত পুস্তকের কথা জানা যায় তন্মধ্যে *Pneumatica, Automatopoietice Belopoeica* ও *Cheiroballistra* বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই তিনখানি গ্রন্থই গ্রীক ভাষায় লিখিত। *Pneumatica*-তে সাইফন, ফোয়ারা (হীরোর ফোয়ারা), জলতরঙ্গ ও আগুনে ইঞ্জিন, বাষ্পশক্তির প্রয়োগের দ্বারা উদ্ভাবিত নানাবিধ যন্ত্র প্রভৃতির বর্ণনা ও আলোচনা আছে। যুদ্ধে বলবিদ্যার নানাবিধ প্রয়োগ ও যান্ত্রিক আবিষ্কারের কথা *Belopoeica*-তে লিপিবদ্ধ। এই গ্রন্থ প্রধানতঃ ক্টেসিবিয়াসের গবেষণা অবলম্বনে রচিত। ইহা ছাড়া *Mechanics* (বলবিদ্যা) তাঁহার আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি একমাত্র আরবী ভাষাতেই সংরক্ষিত আছে; কুস্তা ইব্‌ন্ লুকা ইহার আরবী অনুবাদক। প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়ার ব্যবহারিক জীবনে যে প্রধান পাঁচটি যন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়—যেমন, চাকা ও চাকার অক্ষদণ্ড, লিভার, কপি (pulley), কীলক (wedge) ও স্ক্রু—তাহার প্রত্যেকটি বিষয় এই গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

গ্রীকদের যান্ত্রিক আবিষ্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ ও রণকৌশলের সহায়তা করা, সম্ভবপর হইলে লোকের মনোরঞ্জন করা, অথবা ভোজবাজী, যাদুবিদ্যা প্রভৃতিতে সাধারণ লোকের অজ্ঞতা ও কৌতূহলের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নানারূপ আপাত আশ্চর্য পরীক্ষার অবতারণা করিয়া লোক ঠকানো। ধর্মব্যবসায়ীরা এইরূপ বৈজ্ঞানিক যাদুবিদ্যার বিশেষ ভক্ত ছিল এবং মন্দিরের নানা ব্যাপারে ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মে ইহার ব্যবহারের দ্বারা প্রচুর লাভবান হইত। হীরোর আবিষ্কার এই জাতীয় প্রয়োগের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। লোকে যাহাতে পরীক্ষার ফলাফল দেখিয়া বিস্ময়ে সম্পূর্ণরূপে বিহ্বল হইতে পারে তজ্জন্য তিনি নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিতেন এবং পরীক্ষার মূল নীতিটি সযত্নে সর্বদা সর্বসাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে গুপ্ত রাখিতেন। লোকে শুধু বাহিরের ব্যাপারটিই দেখিত, ভিতরে কি হইতেছে তাহা দেখিতে বা জানিতে পারিত না। *Pneumatica*-তে এইরূপ ৭০ কি ৮০টি যান্ত্রিক কৌশলের আলোচনা আছে। উদাহরণস্বরূপ, ম্যাজিক জলপাত্রের কথা ধরা যাক্। ম্যাজিক জলপাত্রের সঙ্গে একটি শিঙ্ লাগানো থাকে; এই শিঙ্-এর মধ্যে ইচ্ছামত যে কোন পানীয় চাহিলেই পাওয়া যাইবে। জল চাহিলে জল, মদ্য চাহিলে মদ্য, অথবা অন্য কোন প্রকার পানীয় ইচ্ছা করিলে সেই পানীয়। একপ্রকার রাক্ষুসে কলসী তিনি এমনভাবে তৈয়ারী করেন যে, ইহাতে যতই জল ঢালা হউক না কেন, কিছুতেই জল উপ্‌ছাইয়া পড়িবে না। এক জোড়া ম্যাজিক জলপাত্রের (harmonius jars) বর্ণনায় দেখা যায় যে, ইহার যে কোন একটিকে সম্পূর্ণ ভর্তি না করা পর্যন্ত কোন পাত্র দিয়াই জল বাহির হইবে না; অথচ ভর্তি হওয়ামাত্র একটি হইতে জল ও অপরটি হইতে মদ্য নির্গত হইবে। এই সমস্তই সাইফনের কারসাজি; নানাভাবে এক বা একাধিক সাইফন ব্যবহার করিয়া এবং সেগুলিকে সুকৌশলে গোপন রাখিয়া এই সব ম্যাজিক ও ভোজবাজী দেখানো হইত।

* "Hero, however, is not mentioned either by Vitruvius or Pliny, and it is now generally agreed as a result of recent studies that he belongs to the third century of our era"—Lynn Thorndike, *A History of Magic and Experimental Science,* Vol. I; p. 188.

Catoptrica নামক আর একখানি গ্রন্থে নানাবিধ আয়নার ম্যাজিক বর্ণিত আছে। নানা ধরনের ও বিভিন্ন অবস্থায় একাধিক আয়না সাজাইয়া দর্শককে নিকটবর্তী হইবার সুযোগ দিলে, সে দেখিতে পাইবে তাহার মাথা নীচে ও পা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে; দুই চক্ষুর বদলে তিন চক্ষু হইয়াছে; এবং একের জায়গায় দুইটি নাসিকা মুখমণ্ডলকে বীভৎস করিয়া তুলিয়াছে। আয়নার আর একটি কারসাজির ফলে দর্শক দেখিতে পাইত





(১) (২)

৯৬। হীরো উদ্ভাবিত কয়েকটি যন্ত্র। (১) পবিত্র বারি বিতরণের যন্ত্র; উপরের ছিদ্রপথে মুদ্রা প্রবেশ করাইবার ব্যবস্থা দ্রষ্টব্য। (২) বাষ্পযন্ত্র বা টার্বাইন; নীচের পাত্রে জল গরম করিবার ব্যবস্থা; উপরের ফাঁপা গোলকের মধ্য হইতে বেগে বাষ্প নির্গমের ফলে গোলকটি আবর্তিত হইয়া থাকে।

যেন গ্রীক পুরাণে বর্ণিত জিউস্‌দেবের ছিন্ন মুণ্ড হইতে পাল্লাস্‌ নির্গত হইতেছে।* কিরূপে আয়নাগুলিকে সাজাইলে দর্শকের এরূপ ভ্রম জন্মিতে পারে তাহার নির্দেশ এই গ্রন্থে আছে। এক সময় এই *Catoptrica*-কে টলেমীর *Optics*-এর একটি অংশরূপে গণ্য করা হইত; এখন সে ধারণা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

হীরোর বলবিদ্যার সবটুকুই অবশ্য ম্যাজিক নয়। উপরিউক্ত নানাবিধ কারসাজির বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বহু আলোচনাও প্রচ্ছন্ন আছে। বাতাস যে একপ্রকার পদার্থ এবং ইহার অস্তিত্ব আছে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি সযত্নে একটি পাত্রকে নীচের দিকে মুখ করিয়া সোজাসুজি জলের মধ্যে ডুবাইবার চেষ্টা করিলে দেখা গেল পাত্রটি ডুবিতেছে না, কিসের যেন বাধা পাইতেছে। তিনি বলিলেন, পাত্রস্থ বায়ু বাহির হইতে না পারিয়া বাধার সৃষ্টি করিতেছে। বায়ুর যে স্থিতিস্থাপকতা আছে তাহাও তিনি প্রমাণ করেন। এইগুলি হীরোর আদর্শ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দৃষ্টান্ত। তবে কতকগুলি বিষয়ে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণাও তিনি পোষণ করিতেন। যেমন, শিলাজতু ও কর্দমজল হইতে মৃত্তিকার রূপান্তর। কোন জলমগ্ন পাত্রের অভ্যন্তরস্থ বায়ু ছাড়া পাইয়া বাহির হইলে তাহা আবার জলেই পর্যবসিত হয়, ইত্যাদি।

ব্যবহারিক জ্যামিতি, পরিমিতি : জ্যামিতি ও গণিত সম্বন্ধেও হীরোর গবেষণা প্রসিদ্ধ। ইউক্লিড্‌, অ্যাপোলোনিয়াস্‌ প্রমুখ পূর্বতন গ্রীক গণিতজ্ঞদের মত তাঁহার জ্যামিতি কেবলমাত্র

* Thorndike, *A History of Magic and Experimental Science*, Vol. I; p. 193.

আনুমানিক ও বিশ্লেষণমূলক নহে; যান্ত্রিক আবিষ্কারকের হাতে পড়িয়া সেই জ্যামিতি নানাদিকে নানা ব্যবহারিক সার্থকতা লাভ করিয়াছিল। তাঁহার রচিত *Metrica, Definitiones, Geometria, Geodaesia, Stereometrica, Mensurae, Liber Geiponicus, Dioptra* প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় জ্যামিতি। ইহার সবগুলিই গ্রীকভাষায় লিখিত এবং সৌভাগ্যবশতঃ এক্ষণে সংরক্ষিত আছে। *Metrica*ই ইহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। পরবর্তীকালের লেখকদের ভুল বুঝিবার ফলে ও সংকলনের দোষে অন্যান্য গ্রন্থের যেরূপ বিকৃতি ঘটিয়াছিল ইহার ক্ষেত্রে সেরূপ কোন বিকৃতি ঘটে নাই। হীরো যে কত বড় গণিতজ্ঞ ছিলেন, এই গ্রন্থ তাহার এক মস্ত বড় প্রমাণও বটে।* ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শোয়েন (R. Schone) কনস্তান্তিনোপলে এই গ্রন্থের এক পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। যেসব সংখ্যার বর্গমূল একটি পূর্ণসংখ্যা নহে, এইরূপ সংখ্যার কতদূর পর্যন্ত নির্ভুল বর্গমূল নির্ণয় করা যায়, তাহার একটি সাধারণ পদ্ধতির আলোচনা এই গ্রন্থে আছে। এই পদ্ধতির নাম Successive Approximation বা ক্রমিক আসন্নতার নিয়ম। এই নিয়ম প্রয়োগ করিয়া যেসব সংখ্যার ঘনমূল পূর্ণসংখ্যা নহে, তাহাদেরও ঘনমূল তিনি নির্ণয় করেন।

উপরিউক্ত অন্যান্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু পরিমিতি বা ক্ষেত্রবিজ্ঞান (mensuration)। *Dioptra*-তে জমির মাপজোখের কাজে তখনকার দিনে ব্যবহৃত নানাপ্রকার যন্ত্রের বর্ণনা আছে। এইরূপ একটি যন্ত্র ডাই-অপ্ট্রা (ইহার নামানুসারেই গ্রন্থের নামকরণ) অনেকটা অধুনা ব্যবহৃত থিওডোলাইটের মত। এই যন্ত্রে একটি দণ্ডের উপর ৮ অথবা ৯ ফুট লম্বা একটি তক্তা বসানো থাকে; তক্তাটিকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরানো যায়। স্ক্রু, দাঁত-বসানো চাকা প্রভৃতির সাহায্যে তক্তাটিকে ঘুরাইবার ব্যবস্থা। তক্তার লেভ্‌ল বা অনুভূমিক নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে লেভ্‌ল ব্যবহারের উল্লেখ আছে। সরল রেখায় কোন বস্তু নিরীক্ষণের জন্য তক্তার দুই প্রান্তে 'আই-পিস্' (Eye-piece) বা লেন্‌স্ ব্যবহৃত হইত। ইহা অবিকল এক আধুনিক থিওডোলাইটের বর্ণনা। পাহাড় কাটিয়া টানেল তৈয়ারীর কার্যে, গর্ত খুঁড়িয়া খাড়াইভাবে কোন দণ্ড প্রবেশ করাইতে, জমির ভিতর প্রবেশ না করিয়া বাহির হইতেই তাহার মাপ নির্ণয় করিবার ব্যাপারে ডাই-অপ্ট্রার ব্যবহার বিশদভাবে এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

বলা বাহুল্য, এই প্রকার কার্যে তাঁহাকে সর্বদাই জ্যামিতির প্রয়োগ করিতে হইত। এই প্রসঙ্গে তিনি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিবার জন্য একটি সূত্র আবিষ্কার করেন। এই বিখ্যাত সূত্রটি হইতেছেঃ—

$$S=\sqrt{\frac{a+b+c}{2}\times\frac{a+b-c}{2}\times\frac{b+c-a}{2}\times\frac{c+a-b}{2}}$$

ইউক্লিডে ইহার প্রমাণ নাই। হীরো ইহা প্রমাণ করেন।

উপরিউক্ত সূত্রটির উপর হীরো এইরূপ গুরুত্ব আরোপ করিতেন যে, ইহার প্রমাণ *Dioptra* ও *Geodaesia*-তে পাওয়া যায় এবং ইহার উল্লেখ তাঁহার লিখিত পরিমিতি বিষয়ক প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থেই আছে। বহু শতাব্দী পর্যন্ত হীরোর পরিমিতি প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিল। যুগপরম্পরায় পরিদর্শকেরা জরিপের কাজে তাঁহার পদ্ধতি, নিয়ম ও ফরমুলা চোখ বুজিয়া প্রয়োগ করিয়া গিয়াছে।

ব্যবহারিক বিদ্যার প্রতি হীরোর এই গুরুত্ব আরোপ লক্ষ্য করিয়া অনেকে মনে করেন

* *Encyclopaedia Britannica, T. N. Heath* কর্তৃক লিখিত *'Heron of Alexandria'* শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

যে, মিশরীয় বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। প্রাচীন গ্রীকদের বিশুদ্ধ গণিত ও দর্শন-মিশ্রিত বিজ্ঞানের আদর্শ হইতে তিনি যে অনেকখানি সরিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই দর্শনে বীতরাগ রোমকরা ইউক্লিড ও আর্কিমিডিসের জ্যামিতির অপেক্ষা হীরোর জ্যামিতিকেই অধিকতর প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করিয়াছিল। গ্রীক গণিত অধ্যয়ন যখন তাহারা অপরিহার্য মনে করিল, বিনা দ্বিধায় তাহারা হীরোর জ্যামিতিকেই বাছিয়া লইয়াছিল।

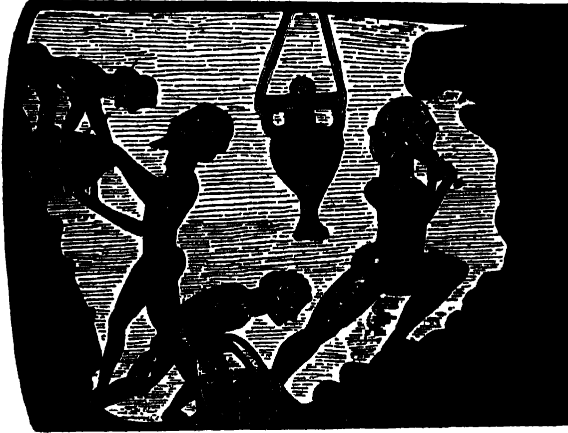
৬·৬। গ্রীক রসায়ন—আলেকজান্দ্রীয় কিমিয়া—কিমিয়ার আদি ইতিহাস

রসায়নে গ্রীকদের অনগ্রসরতা

রসায়নে গ্রীকদের অনগ্রসরতা অপ্রত্যাশিত নহে। এই বিদ্যা একান্তভাবেই পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল। যে জাতির জ্ঞানী, গুণী ও বিদগ্ধ সমাজ বস্তু লইয়া হাতে-কলমে কাজ করাকে নীচু কাজ মনে করে, তাহাদের হাতে আর যাহাই হউক রসায়নের উন্নতি সম্ভবপর নহে।

রসায়নের একটি তত্ত্বীয় দিকও আছে। তাহা হইতেছে বস্তুর গঠন-বৈচিত্র্যের রহস্য উপলব্ধির দিক। গ্রীক দার্শনিকগণ প্রথম হইতেই এই বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। বস্তুর প্রাথমিক উপাদান সম্বন্ধে মাইলেশীয় দার্শনিকদের জল্পনা-কল্পনা, আয়োনীয় লিউসিপ্পাস ও ডিমোক্রিটাসের আণবিক তত্ত্ব, এম্পিডক্লেস্ ও অ্যারিস্টট্লের চারি মৌলিক উপাদান-তত্ত্ব এবং অগ্নি, বস্তুর দহন প্রভৃতি বিষয়ে থিওফ্রেস্টাসের গবেষণা তত্ত্বীয় রসায়নকে যে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রীকদের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব হইতে ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় কারিগরেরা ধাতু নিষ্কাশন বিদ্যায়, কাচ-শিল্পে ও নানাবিধ রঞ্জক দ্রব্য উৎপাদনে আশ্চর্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া



৯৭। প্রাচীন গ্রীসে খনির কাজের একটি চিত্র (পাত্রের গায়ে অঙ্কিত একটি চিত্র হইতে)।

আসিয়াছিল। এই জাতীয় কারিগরিবিদ্যার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের গ্রীকপূর্ব প্রাচীন জাতিরা খনিজ, তাম্র, লোহ ও দস্তার অক্সাইড্ঘটিত লবণ এবং নানাবিধ

উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ দ্রব্য সম্বন্ধে উন্নত ধরনের জ্ঞান ও ইহাদের প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে দক্ষতা অর্জন করিয়াছিল। গ্রীকরাও মিশরীয়দের এই সব ব্যবহারিকবিদ্যা গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের খনিজ শিল্প, বিশেষতঃ রৌপ্য-খনিজ শিল্প, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। হিরোডোটাস্ লরিয়াম, থ্যাসোস্, সিফ্নোস্, দামাস্তিয়াম, পায়োনিয়া প্রভৃতি স্থানের রৌপ্য-খনির উল্লেখ করিয়াছেন। এথেন্সের রজত মুদ্রা প্রচলনের ও মুদ্রা-সংস্কারের মাধ্যমে ব্যবসায়-বাণিজ্যে সাফল্য লাভের পশ্চাতে ছিল অ্যাটিকার এই রৌপ্য-খনিজ সম্পদ। এই রজত মুদ্রার কল্যাণেই থেমিস্টক্লস্ তাঁহার নৌবহর নির্মাণের পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিয়া স্যালামিসে পারসিকদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তথাপি ধাতুশিল্পে বা অন্যান্য কারিগরিবিদ্যায় গ্রীকরা কোনদিনই মিশরীয়, ফিনিশীয় প্রভৃতি প্রাচীন জাতিদের স্বভাবজ দক্ষতা আয়ত্ত করিতে পারে নাই। অ্যাটিকায় এই সব কাজের ভার প্রধানতঃ বিদেশী কারিগর ও ক্রীতদাসের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। লরিয়ামের প্রসিদ্ধ রৌপ্য-খনি ছিল মিশরীয়দের পরিচালনাধীনে। থ্যাসোসের রৌপ্য-খনি সম্বন্ধে হিরোডোটাস্ লিখিয়াছেন, ইহা জনৈক ফিনিশীয় খনি-সন্ধানীর আবিষ্কার। তিনি আরও লিখিয়াছেন, অ্যাটিকার প্রধান খনিগুলির অধিকাংশই ফিনিশীয়দের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল।*

ধাতুশিল্পে ও ফলিত রসায়নে মিশরীয়, ফিনিশীয় ও ব্যাবিলনীয়দের এইরূপ উন্নতি সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে কোন ডিমোক্রিটাস্, এম্পিডক্লেস্, অ্যারিস্টট্ল্ বা থিওফ্রেস্টাসের উদ্ভব হয় নাই। কেবল তত্ত্বীয় বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে যেমন বিজ্ঞানের উন্নতি সম্ভবপর নহে, সেইরূপ কেবল কারিগরিবিদ্যার স্তরে জ্ঞান আবদ্ধ থাকিলেও বিজ্ঞানের উন্নতির কোন আশা থাকে না। মানুষ অভ্যাসবশে চিরাচরিত পদ্ধতিকেই শুধু নকল করিয়া চলে, নূতন জ্ঞানের সন্ধান দিতে অপারগ হয়।

আলেকজান্দ্রীয় কিমিয়া

এই দুই বিভিন্ন ও বিপরীতমুখী ধারা ও দৃষ্টিকোণ আলেকজান্দ্রিয়ায় আসিয়া মিলিত হয়। এই মহানগরীতে মিশরীয়দের ধাতু-নিষ্কাশন, রঞ্জন, কাচ-নির্মাণ সংক্রান্ত সুপ্রাচীন কারিগরিবিদ্যার প্রবল ঐতিহ্যের সহিত মিলিত হয় কল্পনাপ্রবণ গ্রীকদের নানা দার্শনিক ও তত্ত্বীয় মতবাদ। কারিগরিবিদ্যার অভিজ্ঞতা হইতে এতদিন বস্তুর বাহ্যিক প্রভেদটাই বড় বলিয়া মনে হইয়াছিল। দার্শনিকদের তত্ত্বীয় আলোচনা হইতে এখন ক্রমশঃই বস্তুর অন্তর্নিহিত সাম্য ও এককত্ব প্রকট হইতে লাগিল। প্লেটো বস্তুজগৎ সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিলেও আপাতদৃষ্টিতে পদার্থ বলিয়া যাহাদের আমরা মনে করি, মূলতঃ তাহারা প্রত্যেকেই এক। গুণ ও ধর্মের পার্থক্যহেতু পদার্থের প্রভেদ উপলব্ধ হয়। এই গুণ ও ধর্ম পরিবর্তনশীল। এইরূপ যুক্তির সম্প্রসারণ করিয়া 'নস্টিক' নামে আর একদল দার্শনিক প্রচার করে যে, একই ধাতুতে তৈয়ারী দেহধারী মানুষ যেমন আত্মার উন্নতির দ্বারা অসদ্‌গুণ বর্জন করিয়া সদ্‌গুণের অধিকারী হয়, সেইরূপ সকল ধাতুই স্বর্ণের উৎকৃষ্ট ধর্ম ও গুণ লাভ করিতে চেষ্টা করে। সুতরাং গুণ ও ধর্মের পরিবর্তন সাধন করিয়া নিকৃষ্ট ধাতুকেও উৎকৃষ্ট ধাতুতে পর্যবসিত করা সম্ভবপর। একটি উদাহরণের দ্বারা বিষয়টি বুঝানো সহজ হইবে। সেই সময় জানা ছিল যে, নিকৃষ্ট ধাতুর উপর রঞ্জন কার্যে ব্যবহৃত বিদাহী লবণ প্রয়োগ করিলে ধাতুর উপরিভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এখন কোন নিকৃষ্ট ধাতুর সহিত সামান্য পরিমাণ স্বর্ণ মিশাইয়া এই মিশ্র ধাতুর উপরিভাগ বিদাহী লবণের দ্বারা ঈষৎ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে দিলে ধাতু স্বর্ণের রং ধারণ করিবে। নস্টিকরা বলিল, ইহা নিকৃষ্ট ধাতুর স্বর্ণে রূপান্তরের এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

পদার্থের এজাতীয় রূপান্তরের সম্ভাবনার কথা রীতিমত উত্তেজনাপূর্ণ। ইহার দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে দুর্লভ ও মহার্ঘ ধাতু, মণি, মুক্তা ইত্যাদি দ্রব্য প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা বর্ধিত হয়।

* T. A. Rickard, *Man and Metals,* Vol. I; p. 356.

এইরূপ লোভনীয় সম্ভাবনার তীব্র আকর্ষণে একদল লোক ধাতু, লবণ ও নানাবিধ যৌগিক পদার্থ সম্বন্ধে ব্যাপক পরীক্ষা ও গবেষণার কার্যে আত্মনিয়োগ করে। শেষ পর্যন্ত তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলেও এই প্রচেষ্টা হইতেই রসায়নের আদি অবস্থা কিমিয়ার উদ্ভব হয়।

ইংরেজী 'chemistry', ফরাসী 'chimie' ইত্যাদি বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় রসায়নের যে সব পরিভাষা পাওয়া যায়, তাহা গ্রীক 'chemia' বা $\chi\eta\mu\iota\alpha$ শব্দ হইতে উদ্ভূত। ২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ডায়োক্লিটিয়ান কিমিয়া সম্বন্ধে রচিত সমস্ত প্রাচীন পুঁথিপত্র পোড়াইবার নির্দেশ দিয়া যে আদেশ জারি করেন, তাহাতে 'chemia' শব্দটির প্রথম ব্যবহার দেখা যায়। ইহা কোন গ্রীক শব্দ নহে; সম্ভবতঃ কোন মিশরীয় শব্দের গ্রীকরূপ। প্রাচীন হায়রোগ্লিফিকে ইহার অনুরূপ একটি শব্দ পাওয়া যায়; তাহার অর্থ 'মিশরীয় বিদ্যা'। মিশরীয়দের ধারণা ছিল, হার্মেস্ ত্রিস্মেজিস্তস্ নামে এক অলৌকিক গুণসম্পন্ন দৈবজ্ঞ মহাপুরুষ প্রথম এই বিদ্যা আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে আরবরা 'chemia' শব্দের পূর্বে বিশেষ্য-নিরূপক আরবী শব্দ 'al' যোগ করিয়া কিমিয়ার নাম 'alchemy' রাখে।

সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের অনুরূপ সময়ে বা তাহার কিছু পূর্বে আলেকজান্দ্রিয়ায় কিমিয়ার চর্চা সুরু হইয়া থাকিবে। এই সময়কার কিমিয়াবিদ্‌দের মধ্যে নকল ডিমোক্রিটাস্, মারিয়া নামে এক ইহুদী মহিলা বিজ্ঞানী ও জোসিমোসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই তিন কিমিয়াবিদের রচিত গ্রন্থ ছাড়া সমসময়ের কয়েকখানি প্যাপিরাসও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সব গ্রন্থ ও প্যাপিরাস্ হইতে আলেকজান্দ্রীয় কিমিয়া সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা এখন সম্ভবপর হইয়াছে।

ডিমোক্রিটাস্ঃ কিমিয়াবিদ্ ডিমোক্রিটাস্ ও আণবিক মতবাদের উদ্যোক্তা অ্যাব্‌ডেরার ডিমোক্রিটাস্ এক ব্যক্তি নহেন। পরমাণুবিদ্ ডিমোক্রিটাস্ খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন; কিমিয়াবিদ্ ডিমোক্রিটাসের তৎপরতা খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দীতে নিবদ্ধ। এজন্য শেষোক্ত বিজ্ঞানী অনেক সময় নকল ডিমোক্রিটাস্ নামে খ্যাত। তাঁহার (*Physica et Mystica*) গ্রীক ভাষায় কিমিয়ার সর্বপ্রথম গ্রন্থ। কিমিয়া সম্বন্ধে তিনি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁহার গ্রন্থাবলীর কিছু কিছু অংশ ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত ও মুদ্রিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী রাসায়নিক ও রসায়নের ঐতিহাসিক বের্থেলো লাইডেন ও স্টকহোম প্যাপিরাসের বর্ণিত বিষয়ের সহিত ডিমোক্রিটাসের রচনা ও বক্তব্য বিষয়ের মিল লক্ষ্য করিয়া মনে করেন যে, নকল ডিমোক্রিটাস্ ও লাইডেন প্যাপিরাসের রচয়িতা সমসময়ের; অর্থাৎ উভয়েরই কাল খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দী।

মারিয়াঃ নকল ডিমোক্রিটাসের সমসময়ে মারিয়া নামে এক ইহুদী কিমিয়াবিদের তৎপরতার কথা জানা যায়। তাঁহার রচনায় পাতন, ঊর্ধ্বপাতন প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে। এই সব প্রক্রিয়া সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যে সব যন্ত্রপাতি তখন ব্যবহৃত হইত, মারিয়া তাহারও বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

জোসিমোস্ঃ জোসিমোস্ আলেকজান্দ্রিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কিমিয়াবিদ্। খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় শতকে মিশরের প্যানোপোলিস্ নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। কিমিয়া সম্বন্ধে গ্রীক ভাষায় ২৮ খণ্ডে সমাপ্ত এক বিরাট বিশ্বকোষ তিনি প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে নিজস্ব গবেষণা ছাড়া তিনি তাঁহার পূর্বগামী ও সমসাময়িক অন্যান্য কিমিয়াবিদ্‌দের পরীক্ষা, গবেষণা ও মতবাদ বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। জোসিমোসের এই বিশ্বকোষ পরবর্তীকালের কিমিয়া-চর্চাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। বস্তুতপক্ষে প্রাচীন আলেকজান্দ্রীয়, তথা মধ্যপ্রাচ্যের কিমিয়া সম্বন্ধে জানিবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর প্রামাণিক গ্রন্থ বিরল।

জোসিমোস্ নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার, যেমন গলন, ভস্মীকরণ, দ্রবণ, পরিস্রাবণ, কেলাসন, ঊর্ধ্বপাতন, পাতন, ইত্যাদি, এবং এই সব প্রক্রিয়া সম্পাদনের উপযোগী নানাবিধ যন্ত্রপাতির বর্ণনা দিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে বর্ণিত রাসায়নিক যন্ত্রপাতির কয়েকটি নমুনা চিত্রে দেখানো

হইল। বাতি, বালিখোলা (Sand-bath), জলগাহ (Water-bath), উন্মুক্ত চুল্লী ইত্যাদি উত্তাপ প্রয়োগের নানা ধরনের কৌশলও তিনি এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন।

DEMOCRITVS
ABDERITA
DE ARTE
MAGNA,

Siue de rebus naturalibus.

Nec non Synesii, & Pelagii, & Stephani Alexandrini, & Michaelis Pselli in eundem commentaria.

Dominico Pizimentio Vibonensi Interprete.



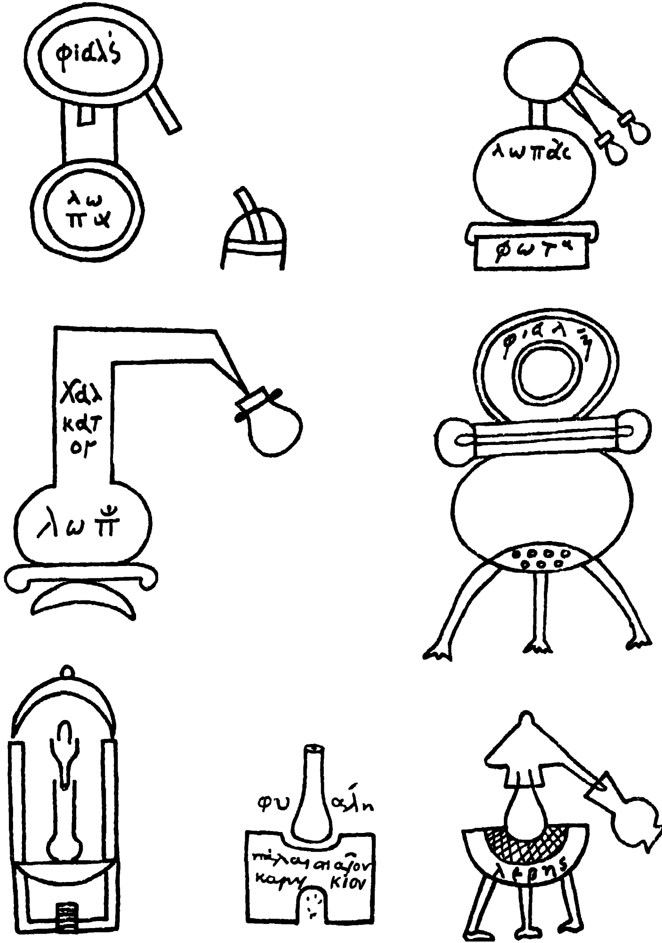
PATAVII
Apud Simonem Galignanum
M D LXXIII.

৯৮। ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত ডিমোক্রিটাসের একটি গ্রন্থের নামপত্র (মুদ্রণ—১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ)।

উদ্বায়ী ও অনুদ্বায়ী পদার্থ সম্বন্ধে জোসিমোসের একরূপ অস্পষ্ট ধারণা জন্মিয়াছিল। উদ্বায়ী বস্তুদের তিনি *Pneumata* নাম দিয়াছিলেন। এই সব বস্তু হইতে অদৃশ্য বাষ্প নির্গত হয়; এই বাষ্প অনেক সময় ধাতুর উপর কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন যে, আর্সেনিক, গন্ধক ও পারদ হইতে নির্গত বাষ্পের সংস্পর্শে আসিলে অনেক ধাতুরই অল্প-বিস্তর রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। তিনি তাঁহার বিশ্বকোষের এক জায়গায় পারদ ও আর্সেনিকের প্রস্তুত-প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাম্রের উপর আর্সেনিকের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তাম্র রৌপ্যে পর্যবসিত হয়, তাঁহার এই মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে কপার আর্সেনাইড্ নামে যে যৌগিক উৎপন্ন হয় রৌপ্যের মত তাহার শুভ্র বর্ণ লক্ষ্য করিয়া সম্ভবতঃ তিনি এই মন্তব্য করিয়া থাকিবেন।

রাসায়নিক প্যাপিরাস্ঃ আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ের গ্রীক ও আলেকজান্দ্রীয় কিমিয়া সম্বন্ধীয় জ্ঞানের আর একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র হইল লাইডেনের ও স্টকহোমের রাসায়নিক প্যাপিরাস্। এই দুই প্যাপিরাস্ প্রকৃতপক্ষে একই প্যাপিরাসের দুইটি পৃথক খণ্ড। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে থিব্সের এক কবরের অভ্যন্তরে ইহা আবিষ্কৃত হয়। প্রথম খণ্ডটি লাইডেনের মিউজিয়ামে ও দ্বিতীয়টি স্টকহোমের মিউজিয়ামে এখন সযত্নে সংরক্ষিত আছে। এজন্য মিশরীয় প্যাপিরাসের দুই অংশ যথাক্রমে লাইডেন ও স্টকহোম প্যাপিরাস্ নামে পরিচিত।

প্যাপিরাস্‌টি গ্রীক ভাষায় রচিত। ইহার রচনা-কাল আনুমানিক খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক। কিমিয়া সংক্রান্ত আলোচ্য বিষয়বস্তু অবশ্য অনেক প্রাচীনতর। সম্ভবতঃ ইহা কৃত্রিম ধাতব



৯৯। জোসিমোস্‌ কর্তৃক উল্লিখিত তাঁহার সময়ে প্রচলিত কয়েকটি রাসায়নিক যন্ত্রপাতি।

দ্রব্যাদি নির্মাণে সুদক্ষ কোন স্বর্ণকারের স্মারক-লিপি বিশেষ। লাইডেন প্যাপিরাসে আসল স্বর্ণ, রৌপ্য ও এই দুই ধাতুর মিশ্রণে উৎপন্ন সংকর ধাতুর অনুকরণে কৃত্রিম উপায়ে কিরূপে অনুরূপ ধাতু প্রস্তুত করা যায়, তাহার নির্দেশ বর্ণিত হইয়াছে। দুষ্প্রাপ্য স্বাভাবিক মণি, মুক্তা ও মূল্যবান রঞ্জকদ্রব্যের অনুকরণে অনুরূপ মণি, মুক্তা ও রঞ্জক দ্রব্য প্রস্তুত-বিধি স্টকহোম প্যাপিরাসের প্রধান আলোচ্য বিষয়। লাইডেন প্যাপিরাসে বর্ণিত এক পদ্ধতির নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"স্বর্ণ ও সীসককে ময়দার মত মিহি করিয়া গুঁড়া কর; এইরূপ ২ ভাগ সীসক চূর্ণের সহিত ১ ভাগ স্বর্ণচূর্ণ মিশাইয়া তাহার সহিত আবার কিছুটা গঁদ মিশাইতে হইবে। এখন একটি তামার আংটিতে এই প্রলেপ মাখাইয়া বার বার আগুনে গরম করিলে ইহা (স্বর্ণের) রং

৩২

গ্রহণ করিবে এবং ইহা অবিকল স্বর্ণের মত মনে হইবে। এই জালিয়াতি ধরা সুকঠিন। পরশ পাথরে দাগ কাটিলেও আসল স্বর্ণের দাগ পড়িবে। ইহার কারণ, উত্তাপে সীসক নিঃশেষিত হয়, কিন্তু স্বর্ণ অবিকৃত থাকে।"

স্টকহোম প্যাপিরাসের কিছুটা অংশ ও তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া যাইতেছে।*

"২ গ্রাম ম্যালাকাইট্ (সবুজ কপার কার্বনেট), ২ গ্রাম অ্যাজিউরাইট্ (নীল রং-এর কার্বনেট-ঘটিত আর এক প্রকার তাম্র খনিজ), ১৩০ সিসি বালকের মূত্র ও ১৮০ সিসি বৃষের পিত্ত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া একটি পাত্রে রাখ। প্রত্যেকটি ০·২৭ গ্রাম ওজনের ২৪টি প্রস্তর-খণ্ড এইবার পাত্রের মধ্যে রাখ। পাত্রের মুখ ঢাকনির দ্বারা বন্ধ করিয়া তাহার চারিপাশে মাটির প্রলেপ দাও। তারপর জলপাই কাঠের মৃদু আগুনে ৬ ঘণ্টার উপর পাত্রটিকে গরম কর। ঢাকনি হরিৎ বর্ণ ধারণ করিলে আর গরম করিবার প্রয়োজন নাই। পাত্রটিকে ঠাণ্ডা করিয়া প্রস্তর-খণ্ডগুলি বাহির করিলে দেখিতে পাইবে ইহারা প্রত্যেকে মকরত মণিতে পর্যবসিত হইয়াছে।"

কিমিয়া ও ফলিত জ্যোতিষ

ফলিত জ্যোতিষের সহিত কিমিয়ার এক প্রকার সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস লক্ষণীয়। গ্রহ-নক্ষত্ররা যেমন মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে, সেইরূপ স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন বিভিন্ন

ধাতু	গ্রহ	সঙ্কেত
স্বর্ণ	সূর্য	☉
রৌপ্য	চন্দ্র	☾
সীসক	শনি	♄
ব্রোঞ্জ বা ইলেকট্রাম	বৃহস্পতি	♃
মিশ্র ধাতু	মঙ্গল	♂
টিন	শুক্র	♀
লৌহ	বুধ	☿

(১)

মৌলিক পদার্থ	সঙ্কেত
মৃত্তিকা	🜃
বায়ু	🜁
অগ্নি	🜂
জল	≈

(২)

১০০। কিমিয়াবিদ্‌দের ব্যবহৃত ধাতু ও মৌলিক পদার্থের সংকেত। (১) চিত্রে ধাতু ও গ্রহের সংকেত দ্রষ্টব্য।

ধাতুর উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। সুতরাং ধাতুদের সহিত গ্রহদের এক নিবিড় সম্পর্ক থাকা মোটেই বিচিত্র নয়। এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া কিমিয়াবিদ্‌রা এক একটি ধাতুকে এক একটি গ্রহের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে। যেমন, সূর্যের ধাতু হইল স্বর্ণ, চন্দ্রের রৌপ্য, শনির সীসক, বৃহস্পতির ব্রোঞ্জ বা ইলেকট্রাম্, মঙ্গলের মিশ্রধাতু, শুক্রের টিন এবং বুধের লৌহ। বিভিন্ন গ্রহ নির্দেশ করিতে যে সব সংকেত ব্যবহৃত হইত, তাহাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত ধাতুদের নির্দেশ করিতেও আমরা সেই সব সংকেতের ব্যবহার দেখিতে পাই। সেইরূপ চারি মৌলিক পদার্থ নির্দেশ করিতেও কিমিয়াবিদ্‌রা সংকেত ব্যবহার করিত।

* Partington, *A Short History of Chemistry*, p. 17; বের্থেলোর *Introduction a l'etude de la chimie des anciens et du moyen age (Paris* 1889) গ্রন্থে উপরিউক্ত প্যাপিরাসের অনুবাদ ও বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

স্টকহোম প্যাপিরাসের এক পাতা; ইহাতে কৃত্রিম মকরত মণি প্রস্তুত-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ ২৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন সময়ে এই সব সংকেতের কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। যেমন, পারদ নির্দেশ করিতে কেহ কেহ চন্দ্রের আবার কেহ কেহ বুধের সংকেত ব্যবহার করিয়াছে। বৃহস্পতির সংকেতের দ্বারা ইলেকট্রামের পরিবর্তে টিনকে অনেক সময় বুঝানো হইত।

কিমিয়ার জন্মস্থান—চীনদেশ

আলেকজান্দ্রিয়ার কিমিয়া-চর্চার প্রাচীনত্ব হইতে অনেকে মনে করেন এইখানেই প্রথম কিমিয়ার উদ্ভব হইয়াছিল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে কিমিয়া-চর্চার প্রাচীনতম কেন্দ্র হিসাবে আলেকজান্দ্রিয়ার খ্যাতি থাকিলেও ইহাই যে কিমিয়ার জন্মস্থান এইরূপ ধারণায় এখন সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আলেকজান্দ্রিয়ায়, তথা সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, কিমিয়া-চর্চার প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে। চীনদেশের কিমিয়া-চর্চার ইতিহাস ইহা অপেক্ষা অন্ততঃ তিন কি চারিশত বৎসরের পুরাতন। এ বিষয়ে সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে যে তথ্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, চীনদেশেই কিমিয়ার প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল।

চৈনিক কিমিয়ার প্রাচীনত্ব : প্রাচীন চৈনিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ *Shih Chi*-তে (Historical Memoirs) চীনদেশে কিমিয়ার প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। এই গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন সু-মা ট্যান এবং ইহা শেষ করেন তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সু-মা চিয়েন (খ্রীঃ পূঃ ১৪৫-৮৭)। এই গ্রন্থে লি শাও-চুন নামে এক যাদুকর ও কিমিয়াবিদের আশ্চর্য ক্ষমতার বর্ণনা আছে। হানবংশীয় সম্রাট উ তি-র (খ্রীঃ পূঃ ১৫৬-৮৭) সহিত এক সাক্ষাৎকারে লি শাও-চুন এইরূপ মন্তব্য করেন।*

"হিঙ্গুল (cinnabar) কিরূপে তাহার স্বভাব পরিবর্তন করিয়া পীতবর্ণ স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়, আমি সেই তথ্য অবগত আছি। আমি উড়ন্ত ড্রাগনকে লাগামবদ্ধ করিতে পারি এবং পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকল স্থান পরিদর্শন করিতে পারি। বৃদ্ধ সারস পক্ষীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নবম স্বর্গে বিচরণ করাও আমার পক্ষে অতি সহজ।"

আর এক জায়গায় সম্রাটের উদ্দেশ্যে লি শাও-চুন বলিতেছেন :

"অগ্নিতে আহুতি প্রদানের ব্যবস্থা করিলে আপনি হিঙ্গুলকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করিতে পারিবেন। এইরূপে প্রস্তুত স্বর্ণের দ্বারা আপনি আহার ও পানীয়ের উপযোগী পাত্রাদি তৈয়ারী করাইতে পারিবেন এবং এই পাত্র হইতে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের ফলে আপনার জীবন দীর্ঘতর হইবে। আপনি তখন মধ্য-সমুদ্রে অবস্থিত পেং-লাই দ্বীপের অমর ঋষিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন। তাঁহাদের দর্শন লাভের পর দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতির ব্যবস্থা করিলে আপনিও অমরত্ব লাভ করিবেন।"

এই বর্ণনায় দেখা যায়, দীর্ঘ জীবন ও অমরত্ব লাভের উদ্দেশ্যে চীনদেশে কিমিয়ার উদ্ভব হয়। ইহা অবশ্য চীনদেশেরই বিশেষত্ব নহে। অমরত্ব লাভের উপায় স্বরূপ নানা ভেষজের ব্যবহার ও তাহার গুণাগুণ বর্ণনায় অথর্ববেদও বিশেষ সমৃদ্ধ।

হুয়াই-নান্-এর রাজা লিউ আন (মৃত্যু খ্রীঃ পূঃ ১২২) কিমিয়া বিদ্যার এক প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার সভায় আটজন বিখ্যাত পণ্ডিতদের মধ্যে কয়েকজন কিমিয়া বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কিমিয়া সম্বন্ধে লিউ আন নিজেও কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। উই পো-ইয়াং (আনুমানিক ১৪০ খ্রীষ্টাব্দ), কো হুং (খ্রীঃ অঃ ২৮১-৩৬১) প্রমুখ পরবর্তীকালের বিখ্যাত কিমিয়াবিদ্গণ লিউ আনের গ্রন্থের ও কিমিয়া-চর্চার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে পারদের চৈনিক পরিভাষার প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। মোমছাল, গন্ধক, শ্বেত আর্সেনিক, হিঙ্গুল প্রভৃতি দ্রব্যের তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। পারদের রূপান্তরের ফলে স্বর্ণ,

* Tenny L. Davis, *'The Chinese Beginnings of Alchemy'*, **Endeavour**, October, 1943; p. 154-160.

সীসক, তাম্র, রৌপ্য ও লৌহ প্রভৃতি ধাতুদের যে উদ্ভব হইয়া থাকে, তিনি এইরূপ মত ব্যক্ত করেন। ইহাদের মধ্যে পারদের স্বর্ণে রূপান্তরই অবশ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; কারণ স্বর্ণের মধ্যেই দীর্ঘ জীবন ও অমরত্ব লাভের গুপ্ত তথ্য অন্তর্নিহিত। লিউ আন নিজেও নাকি এক অমৃত সেবন করিয়া অমরত্ব লাভ করেন। প্রকৃত ঘটনা, এক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবার জন্য তিনি নির্বাসিত হন এবং সম্ভবতঃ নির্বাসনে আত্মহত্যা করেন।

হোমার ডাব্‌স্‌ লিউ সিয়াং (খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকের প্রথমভাগ) নামে এক কিমিয়াবিদের তৎপরতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।* হান-রাজবংশে তাঁহার জন্ম হয়। সাহিত্য, জ্যোতিষ, কিমিয়া প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। এইরূপ অসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্যের জন্য অতি অল্প বয়সে তিনি সম্রাট সুয়ানের প্রধান পরামর্শদাতার পদে উন্নীত হন। এই পদ পাইবার অল্পকাল পরে কিমিয়াশাস্ত্রে সুয়ানের উৎসাহ ও অনুরাগ লক্ষ্য করিয়া তিনি কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ ও তদ্দ্বারা অমরত্বলাভের এক আশ্চর্য ঔষধ প্রস্তুত করিবার সম্ভাবনার কথা সম্রাটের নিকট জ্ঞাপন করেন এবং এই কার্যে রাজকোষ হইতে অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করিতে সম্রাটকে রাজী করান। প্রচুর অর্থব্যয় সত্ত্বেও প্রস্তাবিত কৃত্রিম স্বর্ণ ও অমৃত প্রস্তুত করিতে লিউ সিয়াং ব্যর্থ হন। এই ব্যর্থতার দণ্ড তাঁহাকে ভালভাবেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। শেষ পর্যন্ত সম্রাট তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতা, পাণ্ডিত্য ও নানা গুণের কথা স্মরণ করিয়া এই আদেশ মকুফ করেন।

আলেকজান্দ্রিয়ায় কিমিয়া-চর্চা সুরু হইবার বহু পূর্ব হইতে চীনদেশে এই বিদ্যার যে রীতিমত চর্চা হইয়াছিল উপরিউক্ত তথ্য হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণোৎপাদন ও একপ্রকার অমৃত প্রস্তুত করিবার সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার উদ্দেশ্যে সে দেশে বহু পরীক্ষা সম্পাদিত হইয়াছিল। এইরূপ পরীক্ষা শুধু যাদুকর ও প্রতারকশ্রেণীর লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই; বহু জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিত ব্যক্তিও এই সম্বন্ধে পরীক্ষার চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন।

হোমার ডাব্‌স্‌ চীনদেশে কিমিয়ার প্রথম আত্মপ্রকাশের স্বপক্ষে আরও কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন।† তিনি দেখাইয়াছেন, যে দেশে স্বর্ণ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় এবং আসল স্বর্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান বিশেষ উন্নত, সে দেশে কৃত্রিম স্বর্ণোৎপাদনের চেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা প্রবল। কুশলী স্বর্ণকারের পক্ষে আসল ও নকল স্বর্ণের প্রভেদ-নির্ণয় মোটেই কঠিন নহে। সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে স্বর্ণের জ্ঞান সুপ্রাচীন। খ্রীঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দী হইতেই ব্যাবিলনীয়রা স্বর্ণঘটিত খনিজের কাজে ও স্বর্ণনির্মিত দ্রব্যে বিশুদ্ধ স্বর্ণের ভাগ নিখুঁতভাবে নির্ণয় করিবার ব্যাপারে হাত পাকাইয়াছে। অনুরূপ সময়ে চীনদেশে স্বর্ণের জ্ঞান অতিশয় অনুন্নত। প্রত্নতত্ত্বীয় খননকার্যের ফলে চীনদেশে এই সময়কার যেসব দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে স্বর্ণঘটিত দ্রব্য কদাচ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন চৈনিক ভাষায় স্বর্ণের কোন পরিভাষা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। স্বর্ণের বর্তমান চৈনিক পরিভাষা 'জিন্‌' (jin)। পূর্বে এই শব্দের দ্বারা সাধারণভাবে যে কোন ধাতুকেই বুঝাইত। হান-আমলের পূর্বে তাম্র অথবা ব্রোঞ্জ নির্দেশ করিতে 'জিন্‌' শব্দ ব্যবহৃত হইত। পরে স্বর্ণের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইলে এবং এই ধাতুর জন্য একটি নির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন ঘটিলে 'হুয়াং-জিন্‌' (huang-jin) (পীত ধাতু) শব্দের ব্যবহার আমরা দেখিতে পাই। হান-আমলে এই নামেই স্বর্ণ পরিচিত ছিল। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দী হইতে চৈনিক সাহিত্যে স্বর্ণের নিয়মিত উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং স্বাভাবিক স্বর্ণের অপ্রতুলতা ও স্বাভাবিক স্বর্ণ সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব চীনদেশে কৃত্রিম স্বর্ণোৎপাদন-প্রচেষ্টাকে সম্ভবতঃ অনুপ্রাণিত করিয়া থাকিবে।

---

* Homer H. Dubs, *'The Beginnings of Alchemy', Isis,* Vol. 38, 1947; p. 62-86.

† Homer H. Dubs, *loc. cit.*

রোমক ও গ্রেকো-রোমক বিজ্ঞান; প্রাচীন বিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি ও ইউরোপে অন্ধকার যুগের সূচনা

সপ্তম অধ্যায়

৭·১। রোমক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য

রোমক বিজ্ঞানের ইতিহাসের অপ্রিয় সত্য এই যে, জাতি হিসাবে রোমকরা বিজ্ঞানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে পারে নাই। দীর্ঘ সাতশত বৎসরের অপ্রতিহত রাজনৈতিক প্রাধান্যের সুযোগ সত্ত্বেও বিজ্ঞান রোমক সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ মৃত্তিকার কোথাও অঙ্কুরিত হইতে পারে নাই। নূতন করিয়া অঙ্কুরিত হওয়া দূরে থাকুক, আয়োনীয় বিজ্ঞানের যে বীজ গ্রীসে, আলেকজান্দ্রিয়ায়, এসিয়া মাইনরে, দক্ষিণ ইতালীর ও দক্ষিণ ফ্রান্সের নানা জায়গায় অঙ্কুরিত হইয়া মহীরূহে পরিণত হইয়াছিল, তাহাকেও বাঁচাইয়া রাখা রোমকদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। রোমকদের মধ্যে প্লেটো বা অ্যারিস্টট্‌লের মত দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর, অ্যারিস্‌টার্কাস্‌ ও হিপার্কাসের মত জ্যোতির্বিদের, ইউক্লিড, অ্যাপোলোনিয়াস্‌ ও আর্কিমিডিসের মত জ্যামিতি-বিশারদ্‌ ও গণিতজ্ঞের, কিংবা হিপোক্রেটিসের মত চিকিৎসাবিজ্ঞানীর সমকক্ষ বা অন্ততঃ কিছুটা তুলনীয় বিজ্ঞানীর সন্ধানের চেষ্টা বৃথা। রোমক সাম্রাজ্যের প্রাধান্যের কালে যে অল্প কয়েকজন বিজ্ঞানী ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বিজ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছিলেন তাঁহারা সবাই ছিলেন গ্রীক। টলেমী, ডায়োফ্যান্টাস্‌, প্যাপাস্‌ ও গ্যালেন প্রত্যেকেই গ্রীকদের বংশধর। দীপ নির্বাপিত হইবার পূর্বে সে যেমন পরিপূর্ণ দীপ্তিতে শেষবারের মত জ্বলিয়া উঠে, গ্রীক বিজ্ঞানের ইতিহাসে খৃষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমী, গ্যালেন প্রমুখ বিজ্ঞানীর আবির্ভাব অনেকটা সেইরূপ।

রোমক বিজ্ঞানের এই দারিদ্র্য শুধু তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সত্য। ফলিত বিজ্ঞানে রোমকরা এইরূপ নিঃস্ব নহে। বিজ্ঞানের যে বিভাগেরই কিছুমাত্র ব্যবহারিক সার্থকতা আছে, আমরা দেখি সেই বিভাগই রোমকদের দৃষ্টি অল্প-বিস্তর আকর্ষণ করিয়াছে। গণিত ও জ্যোতিষে যদি রোমকরা উদাসীন, বলবিদ্যা ও যন্ত্রবিদ্যায় তাহারা রীতিমত তৎপর, স্থাপত্য ও পূর্তবিদ্যায় তাহারা শীর্ষস্থানীয়। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও ভেষজে তাহারা উৎসাহ দেখাইয়াছে। স্থাপত্য ও পূর্তবিদ্যায় ভিট্রুভিয়াস্‌ ও ফ্রন্টিনাসের প্রতিভা প্রথম শ্রেণীর। উদ্ভিদ্‌ ও ভেষজ-বিজ্ঞানে ডিওস্কোরিডিস্‌ থিওফ্রেস্‌টাসের সমকক্ষ না হইলেও প্রাচীন কালের উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞানী ও ভেষজবিশারদ্‌দের মধ্যে তাঁহার স্থান থিওফ্রেস্‌টাসের পরেই। তত্ত্বীয় জীববিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞান ভাল না লাগিলেও, হাসপাতাল, সেবাশ্রম প্রভৃতি ব্যবস্থার উদ্ভাবনে, সামরিক বাহিনীর চিকিৎসা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধনের ব্যাপারে ও জনস্বাস্থ্যের পরিকল্পনায় রোমকরা ছিল প্রাচীন সভ্য জাতিদের মধ্যে অগ্রগণ্য। চার্লস্‌ সিংগার লিখিয়াছেন:

> "In general we may say that Roman science appears at its best in the department of 'Nature Study' and at its weakest in 'Pure Mathematics'. The success or failure of the Romans in any scientific field may be roughly gauzed by its nearness to one or other of these disciplines."*

কিন্তু যে প্রতিভা বিজ্ঞানের মধ্যে বিকশিত হইবার সুযোগ পায় নাই, বাগ্মিতায় সাহিত্যে, ইতিহাস-রচনায়, আইন-প্রণয়নে, রাষ্ট্র-পরিচালনায়, স্থাপত্যে, কলাশিল্পে আমরা দেখি সেই প্রতিভারই অপূর্ব বিকাশ। সিসেরো, ভার্জিল ও ট্যাসিটাস্‌ যে কোন জাতির পরম গৌরব। এই সাহিত্য, ইতিহাস, স্থাপত্য ও শিল্পকলা সৃষ্টির জন্য রোমকরা অবশ্য গ্রীকদের নিকট

---

* Charles Singer, *From Magic to Science,* London, 1928; p. 5.

বিশেষভাবে ঋণী। জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত জাতির কাছে অনগ্রসর জাতির শিক্ষানবিসি মানিয়া লইতেই হয়। গ্রীক বিজ্ঞান ত প্রধানতঃ প্রাচীন ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় বিজ্ঞান হইতে উদ্ভূত। রোমকরাও গ্রীকদের কাছে এই শিক্ষানবিসি মানিয়া লইতে আপত্তি করে নাই। খ্রীঃ ১৬৮ পূর্বাব্দে পিড্‌নার যুদ্ধের পর বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত গ্রীক যখন পুঁথিপত্র সঙ্গে লইয়া চিরস্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে রোমে আসিয়া উপস্থিত হইল, রোমকরা তাহাদের সাদরে অভ্যর্থনাই করিয়াছিল। সংগঠন-ক্ষমতা ও সঙ্ঘবদ্ধতার গুণে ও উন্নততর সামরিক নেতৃত্বে রোমকরা দুইশত বৎসরের মধ্যে প্রথমে বৃহত্তর গ্রীক জগতে অর্থাৎ, 'ম্যাগ্‌না গ্রেসিয়ায়', পরে মূল গ্রীক ভূখণ্ডে ও সর্বশেষে আয়োনিয়ায় রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল বটে; কিন্তু সমগ্র রোমক সাম্রাজ্যে সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, স্থাপত্যে ও শিল্পকলায় গ্রীকরা তখনও একচ্ছত্র অধিপতি। রোমকদের সাহিত্য ছিল না, দর্শন ছিল না, বিজ্ঞান ছিল না; এমন কি জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকাশ করিবার মত উপযুক্ত ভাষা পর্যন্ত ছিল না। রোমকরা তাহাদের এই সাংস্কৃতিক দুর্বলতা বুঝিতে বিলম্ব করে নাই। গ্রীকরাজ্য জয় করিবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক সভ্যতাকেও জয় করিতে তাহারা দৃঢ়সংকল্প হয়। গ্রীক জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদেরই সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের কাছে নতি স্বীকার করা আত্মাভিমানী জাতির পক্ষে লজ্জাকর। এই লজ্জা এড়াইতে অন্ততঃ সাহিত্যে, ইতিহাসে, কলাশিল্পে, স্থাপত্যে রোমকরা চেষ্টার ত্রুটী করে নাই। এই চেষ্টার প্রথমাবস্থায় গ্রীকদের তাহারা অনুকরণ করিলেও নূতন অনেককিছু সৃষ্টিও করিয়াছে।

ব্যাকরণ ও ভাষার কথাই ধরা যাক। ভাষার উন্নতি ও সমৃদ্ধি ব্যতীত সাহিত্য, দর্শন বা বিজ্ঞান কোন কিছুরই উন্নতি সম্ভবপর নয়। আবার ব্যাকরণের মান নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ভাষার উন্নতি ও সমৃদ্ধি পদে পদে ব্যাহত হইবার আশঙ্কা। তাই রোমকরা আগে ব্যাকরণ বানাইয়াছে। লুসিয়াস্ ষ্টিলো (খ্রীঃ পূঃ ১৫৪-১৭৪) হইতে আরম্ভ করিয়া ভারো. ডোনাটাস্ ও প্রিসিয়ান-প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত বৈয়াকরণেরা সর্বকালের জন্য পৃথিবীর এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষার গোড়াপত্তন করিয়া যান। ডোনাটাসের গবেষণা এইরূপ প্রসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে যে, মধ্যযুগে ইউরোপে ব্যাকরণের নাম ছিল 'ডোনাট'। প্রিসিয়ানের আঠারো খণ্ডে সমাপ্ত *Institutiones Grammaticae* ল্যাটিন ব্যাকরণের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। সমগ্র প্রাচীনকালে এক পাণিনীর ব্যাকরণ ছাড়া ইহার তুল্য ব্যাকরণ একরূপ রচিত হয় নাই বলিলেই হয়। মধ্যযুগে প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থাগারে *Institutiones Grammaticae*-র একখানি প্রতিলিপি পাওয়া যাইত। বর্তমানে এই গ্রন্থের প্রায় এক হাজার প্রতিলিপি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।*

সিসেরো, ভার্জিল ও ট্যাসিটাস্ প্লেটো, হেসিয়ড ও হিরোডোটাস্-প্রমুখ গ্রীক লেখকগণের পদ্ধতি হুবহু অনুকরণ করিয়াছেন সত্য এবং আপাত-দৃষ্টিতে সিসেরো ও ভার্জিলের সাহিত্য অথবা ট্যাসিটাসের ইতিহাস এইসব বিষয়ে পূর্বগামী গ্রীক মনীষিগণের প্রচেষ্টার পুনরাবৃত্তি মনে হইবে বটে, তথাপি এই দুই সাহিত্যের বস্তু বা ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গী এক নহে। এক নূতন সাহিত্যের ও এক নূতন সভ্যতার ইঙ্গিত এইসব বিখ্যাত রোমক লেখকদের রচনায় সুস্পষ্ট। সাহিত্যিক ক্ষেত্রে ইহা তাঁহাদের নূতন সৃষ্টি।

সাহিত্য, স্থাপত্য ও কলাবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীকরা তাহাদের বিজ্ঞান ও দর্শনও রোমে আনিয়াছিল। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দী হইতেই দক্ষিণ ইতালী, সিসিলি ও দক্ষিণ ফ্রান্সের গ্রীক উপনিবেশগুলিতে দর্শন ও বিজ্ঞানের রীতিমত চর্চা ও আদর ছিল। দীর্ঘকাল-ব্যাপী এইরূপভাবে গ্রীকদের সান্নিধ্যে ও সংস্পর্শে থাকিয়াও এবং তাহাদের দর্শন ও বিজ্ঞান আয়ত্ত করিবার সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও রোমক বিজ্ঞানের এই দৈন্য ও দুর্দশা

* **Farrington, *Greek Science*, Vol. II; p. 107.**

কেন? রোমক আমলেও আলেকজান্দ্রিয়ায় বসিয়া গ্রীক বিজ্ঞানীরা তাহাদের পূর্বপুরুষদের আদর্শে বিজ্ঞানের চর্চা করিয়া গিয়াছেন। খ্রীঃ পূঃ ৫০ অব্দে টলেমীদের মিশর রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও বিজ্ঞান-চর্চায় ছেদ পড়ে নাই। খ্রীষ্টাব্দ প্রথম হইতে তৃতীয় শতকের মধ্যে গণিতে নিকোমেকাস্, গণিত, জ্যোতিষ ও ভূগোলে প্রাচীনকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী টলেমী, জ্যামিতিতে প্যাপাস্, বীজগণিতে ডায়োফ্যান্টাস্ এবং বলবিদ্যা ও যান্ত্রিক গবেষণায় হীরো অতি মূল্যবান তথ্য ও মতবাদ আবিষ্কার করিয়াছেন। তথাপি তত্ত্বীয় বিজ্ঞান রোমে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না কেন?

কেহ কেহ বলেন, প্রতিনিয়ত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকায় ও সাম্রাজ্য গঠন ও সংরক্ষণকার্যে ব্যাপৃত থাকায় বিজ্ঞানের দিকে মনোযোগ দিবার আর তাহাদের অবসর হয় নাই।* কিন্তু এই যুদ্ধবিগ্রহ ও সাম্রাজ্য গঠন সত্ত্বেও রোমক জাতি সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে, ইতিহাস লিখিয়াছে, সুবৃহৎ বিশ্বকোষ প্রণয়ন করিয়াছে।

রাজনৈতিক স্বাধিকার ও প্রাধান্য বিজ্ঞানের অগ্রগতির অনুকূল, এইরূপ মত যাহারা পোষণ করেন রোমক সাম্রাজ্যে বিজ্ঞানের অধঃপতন তাহাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হইবার কথা। ফিলিপ ও আলেকজান্দারের অভ্যুত্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রীক রাষ্ট্রগুলি রাজনৈতিক স্বাধিকার হারাইলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও দর্শনে স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা ও সৃজনী শক্তি তাহাদের ধীরে ধীরে লোপ পায়। আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতি অনেকাংশে টলেমীদের সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্যাণেই সম্ভবপর হইয়াছিল। রোমকদের এই বিপুল সাম্রাজ্য ও ঐশ্বর্যের দিনে বিজ্ঞানের এই দৈন্য দেখিয়া প্লিনিও বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন এবং এক জায়গায় আক্ষেপ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে প্লিনির মন্তব্য আলোচনাপ্রসঙ্গে থর্নডাইক লিখিয়াছেনঃ

> "In a third passage (of *Historia Naturalis*, II, 46) he (Pliny) looks back regretfully at the widespread interest in science among the Greeks, although those were times of political disunion and strife and although communication between different lands was interrupted by piracy as well as war, whereas now, with the whole empire at peace, not only is no new scientific inquiry undertaken, but men do not even thoroughly study the works of the ancients, and are intent on the acquisition of lucre rather than learning."†

বিজ্ঞানের প্রতি পরাঙ্মুখতার প্রকৃত কারণ রোমকদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে অন্তর্নিহিত। এক সম্পূর্ণ ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী এই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ভাবপ্রবণতা ও কল্পনাবিলাসিতা এই চরিত্রের বহির্ভূত। এজন্য শুধু বিজ্ঞান নহে, বিজ্ঞান যে দর্শনের একটা ক্ষুদ্র বিভাগ মাত্র সেই দর্শনও রোমক চিত্তকে নিবিড়ভাবে আলোড়িত করিতে পারে নাই। রোমকদের কাছে দর্শন বাগাড়ম্বর, অসার যুক্তি-তর্ক, শুধু অনাবশ্যক কথার কচকচি। তত্ত্বীয় বিজ্ঞানে ভাব-প্রবণতার অবকাশ আছে, যুক্তি-তর্ক এখানে অপরিহার্য। গণিত ও জ্যামিতি এইরূপ বিশ্লেষণ-মূলক মনোভাব হইতে উদ্ভূত। প্রকৃতির ও ব্রহ্মাণ্ডের নানা দুর্জ্ঞেয় ব্যবহারের এক সুসম্বন্ধ চিত্র মানসপটে অঙ্কিত করা, মতবাদ ও পরিকল্পনা রচনার দ্বারা ইহা বুঝিবার চেষ্টা করা এক ভাববাদী ও বিশ্লেষণমূলক মনোভাব ছাড়া সম্ভবপর নহে। এইরূপ মনোভাবের অভাব তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের রস গ্রহণে রোমকদের অক্ষমতার প্রধান কারণ।

এই দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব চিত্রাঙ্কন ও স্থাপত্যকে যে কি নিবিড়ভাবে

---

* Singer, *From Magic to Science.*

† Lynn Thorndike, *A History of Magic and Experimental Science*, Vol. I, 1929; p. 47.

প্রভাবিত করে গ্রীক ও রোমক শিল্পকলা তাহার দৃষ্টান্ত। গ্রীক শিল্পী মানুষের মূর্তি গড়িতে দেবতার মূর্তি গড়িয়াছে; তাহার পশু-পক্ষীরাও যেন এজগতের জীব নহে। এই সব চিত্র বা মূর্তি সর্বাঙ্গসুন্দর, নিখুঁত এক একটি ভাবের প্রতিমূর্তি। পক্ষান্তরে বাস্তববাদী রোমকশিল্পীর অঙ্কিত মানুষ, পশুপক্ষী বা তরুলতা ভাল মন্দ দোষ ত্রুটী লইয়া একান্তই স্বাভাবিক ও পার্থিব। সহজ দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক পরিবেশে বস্তু, প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌কে সে যেভাবে দেখিয়াছে অবিকল সেইভাবে তাহাকে রূপায়িত করাই রোমক শিল্পীর আদর্শ। ভিয়েনাতে প্রাপ্ত এক প্রস্তর খোদাই-এ একটি ভেড়া ও তাহার দুগ্ধপানরত শাবকের যে চিত্র অথবা পম্পাই-এ প্রাপ্ত রৌপ্য পাত্রের গায়ে দ্রাক্ষালতার যে নিখুঁত কারুকার্য আমরা দেখি, তাহাতে রোমকদের এই স্বভাবজ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী সুপরিস্ফুট।

স্টোইক ও এপিকিউরীয় দর্শন—লুক্রেটিয়াস্

প্লেটো ও অ্যারিস্টট্‌লের প্রজ্ঞাবাদ, অধ্যাত্মবাদ বা অধিবিদ্যা সাধারণভাবে রোমকদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলেও গ্রীকদের দুইটি দার্শনিক ধারা রোমকদের ব্যবহারিক মনকে কিছুটা আকৃষ্ট করিয়াছিল। আমরা এপিকিউরীয় ও স্টোইক দর্শনের কথা বলিতেছি। অ্যারিস্টট্‌লের মৃত্যুর পর গ্রীক চিন্তাজগতে যে নানারূপ দ্বন্দ্ব, সংশয় ও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছিল সেই সংশয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে এই দুই দর্শনের উদ্ভব হয়। স্টোইক দর্শনের প্রবর্তক জেনোর পূর্বপুরুষেরা ফিনিশীয় ছিলেন। তিনি সাইপ্রাস্ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এবং খ্রীঃ ৩১১ পূর্বাব্দ হইতে এথেন্সে তাঁহার দার্শনিক মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে এক বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন। আয়োনীয় গ্রীকদের বিখ্যাত উপনিবেশ সামোস দ্বীপের অধিবাসী এপিকিউরাস্ এপিকিউরীয় দর্শনের প্রবর্তক। এই দুই দর্শনই একান্তভাবে বাস্তববাদী। দুঃখ, দুর্দশা, অশান্তি ও বিপর্যয়ের মধ্যে যে মানুষকে বাঁচিতে হয় কিসে তাহার সুখ শান্তি হইতে পারে তাহার নির্দেশ প্রদান স্টোইক ও এপিকিউরীয় দর্শনের মূল উদ্দেশ্য। উভয় দর্শনই সর্বপ্রকার অলৌকিকতা-বিবর্জিত। এই দর্শনে ঈশ্বরের স্থান থাকিলেও মানুষ ও প্রকৃতির উপর তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি সীমাবদ্ধ। মানুষের ভাগ্যকে বা তাহার সমাজকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন না; মানুষের সম্পত্তির উপরও তিনি খবরদারি করেন না, অথবা কেহ বিপথগামী ও নীতিভ্রষ্ট হইলে তাহাকে বজ্রাঘাতও করেন না। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আপনার নিয়মে সৃষ্ট হইয়াছে এবং চলেও প্রাকৃতিক নিয়মে। এপিকীউরীয় দর্শনে পরমাণুবাদীদের প্রভাব বিশেষভাবে বিদ্যমান। এপিকিউরাস্ নিজে ডিমোক্রিটাস্ ও লিউসিপ্পাসের রচনাবলী পাঠ করিয়াছিলেন এবং পরমাণুবাদীদের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের প্রস্তাবিত বস্তু ও ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যা প্রায় হুবহু গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য স্টোইক ও এপিকিউরীয়দের বস্তুবাদী দর্শন কালোপযোগী হইয়াছিল এবং এই কারণেই কর্মবীর রোমকদের মধ্যে এই দুই দর্শনের কিছুটা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পোসিডোনিয়াস্, মার্কাস অরেলিয়াস্ প্রমুখ স্টোইক বিজ্ঞানী ও লেখকগণের কল্যাণে রোমক বিদ্বৎ সমাজে স্টোইক দর্শনের প্রচার ঘটে। এইরূপ প্রচারকার্যে এপিকিউরীয়রা স্টোইকদের মত সাফল্য লাভ করিতে না পারিলেও, তাহাদের মধ্য হইতেই সর্বশ্রেষ্ঠ রোমক কবি ও দার্শনিক লুক্রেটিয়াসের উদ্ভব হয়। সুললিত কবিতার মধ্য দিয়া তিনি যেমন এপিকিউরীয় দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সঙ্গে ডিমোক্রিটাসের বিস্মৃতপ্রায় আণবিক তত্ত্বকেও তিনি পুনরুদ্ধার করিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এপিকিউরীয় দর্শন ও আণবিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা তাঁহার অমর গ্রন্থ *De rerum natura*-য় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

De rerum natura-র পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে মহাকবি ও দার্শনিকের অপূর্ব পাণ্ডিত্য-পূর্ণ উদার চরিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। এই মহাকাব্য পাঠে মনে হয়, ইহার রচয়িতার জ্ঞান শুধু এপিকিউরাসের রচনাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আয়োনীয় দার্শনিকগণ হইতে

সুরু করিয়া তাঁহার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক বিশিষ্ট গ্রীক দার্শনিকের রচনার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। হেরাক্লিটাস্, অ্যানাক্সাগোরাস্, লিউসিপ্পাস্ ও ডিমোক্রিটাস্, হিপোক্রেটিস্, থুসিডাইড্‌স্, এম্পিডক্‌লেস্ প্রমুখ প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক ও বিজ্ঞানিগণের কোন গ্রন্থ বা রচনা তিনি বাদ দেন নাই। তারপর প্লেটো ও অ্যারিস্টট্‌লের দর্শনের সহিতও তিনি সুপরিচিত ছিলেন এবং বহুস্থানে তাঁহাদের মতবাদের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। লুক্রেটিয়াস্ নিজস্ব কোন মৌলিক দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন নাই এবং তাঁহার বিষয়বস্তুও প্রধানতঃ ডিমোক্রিটাস্ ও এপিকিউরাসের রচনাবলী হইতে গৃহীত। তথাপি গ্রীকদের এই বিশাল ও কঠিন দর্শনশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া সাধারণের বোধগম্য অতি মনোজ্ঞ ও সুললিত ভাষায় এই জ্ঞান প্রকাশ করিবার কার্যে তিনি যে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, রোমক অধ্যবসায় ও প্রতিভার তাহা আর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

De rerum natura-র ছয় খণ্ড এপর্যন্ত সংরক্ষিত আছে। সম্ভবতঃ কবি তাঁহার এই মহাকাব্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই মহাকাব্য-রচনা ছিল তাঁহার সমগ্র জীবনের একমাত্র ব্রত এবং ইহাকে সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে না পারিবার ব্যর্থতা শেষ জীবনে তাঁহাকে বিশেষভাবে বিদ্ধ করিয়াছিল। এসম্বন্ধে ফারিংটন মন্তব্য করিয়াছেন যে, "One feels that Lucretius must have died like Buckle, exclaiming 'My Book, my book'"।

গ্রন্থের প্রথম দুই খণ্ডে পরমাণু-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে; পরমাণুদের সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ ও প্রকৃতির ব্যাখ্যা কি ভাবে সম্ভবপর লুক্রেটিয়াস্ তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তৃতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু আত্মার স্বরূপ ও প্রকৃতি এবং আত্মার সহিত দেহের সম্পর্ক। আত্মা যে একান্তই পার্থিব এবং দেহের সঙ্গে সঙ্গে ইহার মৃত্যু অনিবার্য এই মত তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চতুর্থ খণ্ডে ইন্দ্রিয়লব্ধ নানাবিধ অনুভূতি ও কিছু কিছু জীবতত্ত্বের কথা আলোচিত হইয়াছে। পৃথিবী ও তাহার ইতিবৃত্ত ও গঠন-বৈচিত্র্য, জ্যোতিষ্ক ও নৈসর্গিক বস্তুর প্রকৃতি ও গতি, পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে পঞ্চম খণ্ডে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে *De rerum natura*-র এই পঞ্চম খণ্ডই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ষষ্ঠ খণ্ডে আবহবিদ্যা ও ভূবিদ্যা সম্পর্কিত নানা প্রকার তথ্য ও পর্যবেক্ষণের ফল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই খণ্ডে পেলোপোনেশীয় যুদ্ধের সময় এথেন্সে যে ব্যাপক প্লেগ মহামারী দেখা দিয়াছিল তাহার এক বর্ণনা আছে। এরূপ বিবিধ বিষয়ের অবতারণা ও আলোচনার জন্য এই গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে এক বিরাট বিশ্বকোষের সহিত তুলনীয়। তথাপি ইহা একটি বিশ্বকোষ নহে। বিবিধ তথ্য ও বিষয়ের আলোচনার মধ্যে সর্বদা তিনি একক মতবাদ, চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। এপিকিউরীয় দর্শনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া তিনি এই মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন বিভিন্ন ও আপাত-অসংলগ্ন বিষয়ের অবতারণা সত্ত্বেও তিনি সেই কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য হইতে এতটুকু বিচ্যুত হন নাই।

আণবিক তত্ত্ব: বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে লুক্রেটিয়াস্ বিশেষ করিয়া আণবিক তত্ত্বের ব্যাখ্যার জন্য প্রসিদ্ধ। শুধু বস্তুর গঠন নহে, আণবিক তত্ত্বের ভিত্তিতে তিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এমন কি পার্থিব অপার্থিব নানা রহস্য বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অণু-পরমাণুর অবিশ্রান্ত সংঘাত, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। ব্রহ্মাণ্ড অপরিবর্তনশীল ও অসীম। বস্তু ও শূন্যতা মিলিয়া ব্রহ্মাণ্ডের গঠন। বস্তুর অস্তিত্ব অনুভূতি-গ্রাহ্য; তাহার গতি, আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রভৃতি বাহ্যিক গুণ উপলব্ধি করিবার জন্য শূন্যতার অস্তিত্ব অপরিহার্য। বস্তুর গতি অবিশ্রান্ত এবং প্রতিনিয়ত পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে তথাকথিত কঠিন পদার্থের উদ্ভব হইয়া থাকে। আত্মা সম্বন্ধে লুক্রেটিয়াস্ বলেন যে, ইহা ধারণাতীত অতি সূক্ষ্ম পরমাণুর দ্বারা গঠিত। আত্মা সমগ্র দেহ পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকে, দেহকে বাদ

দিয়া আত্মার অস্তিত্ব অসম্ভব। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মা আবার প্রাথমিক পরমাণুতে বিভক্ত হইয়া বিলীন হইয়া যায়। দেবতাদের সম্বন্ধে এপিকিউরীয়দের ধারণার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, দেবতারাও পার্থিব ও অতি সূক্ষ্ম পরমাণুর দ্বারা গঠিত। তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে জীবন ধারণ করেন, মানুষেরই মত তাঁহারা নশ্বর, কিন্তু মানুষের কোন ব্যাপারে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করেন না, ইত্যাদি।*

আপাত-দৃষ্টিতে প্রাচীন গ্রীক আণবিক তত্ত্বের সহিত আধুনিক আণবিক তত্ত্বের অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইলেও ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, আধুনিক আণবিক তত্ত্ব যেমন রাসায়নিক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ডিমোক্রিটাস্-লুক্রেটিয়াস্ প্রবর্তিত আণবিক তত্ত্বের বনিয়াদ সেইরূপ নহে। পরমাণুর সংযোগে কিরূপে অণুর উদ্ভব হইয়া থাকে, পরমাণুদের পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে কিরূপে নানারূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্ভব হয়, এ সম্বন্ধে জন ডাল্‌টনের পূর্বে কাহারও কোন ধারণা ছিল না। আর একটি কথা, আধুনিক আণবিক তত্ত্বের উদ্ভাবনে গ্রীক আণবিক তত্ত্ব আদৌ সহায়ক হয় নাই। এই তত্ত্বের প্রধান ধারক ও বাহক এপিকিউরীয় দর্শন বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রগতিকে যে খুব বেশী প্রভাবিত করিয়াছিল, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে তাহা মনে হয় না। মধ্যযুগে এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডাল্‌টনের (১৭৬৬-১৮৪৪) পূর্ব পর্যন্ত আণবিক তত্ত্ব একরূপ ধামাচাপাই পড়িয়াছিল। মাঝে মাঝে দুই একজন বিজ্ঞানী বা দার্শনিককে অবশ্য প্রাচীন আণবিক তত্ত্বের সপক্ষে লিখিতে ও মত পোষণ করিতে দেখা যায়। যেমন মুসলমান দার্শনিক আভেরস্ (১১২৬-৯৮) ও ইহুদী দার্শনিক মাইমোনিড্‌স্ (১১৩৫-১২০৪) আণবিক তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে পোগ্‌গিও মধ্যযুগের বিস্মৃতির অন্ধকার হইতে লুক্রেটিয়াসের আণবিক তত্ত্বকে উদ্ধার করিয়া ইহার প্রচারে যত্নবান হন এবং অনেকের মতে তাঁহার প্রচেষ্টার ফলেই নাকি রেণেশাঁর সময় লুক্রেটিয়াস্ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন।† তবে মধ্যযুগের এই সব দার্শনিকদের বিক্ষিপ্ত আলোচনা যে আধুনিক আণবিক তত্ত্বের গোড়াপত্তনে উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য করিয়াছিল তাহা মোটেই মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে ডাল্‌টন তাঁহার রাসায়নিক পরীক্ষা ও গবেষণা হইতে স্বাধীনভাবেই আণবিক মতবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই গবেষণায় ও পরিকল্পনা-রচনায় ডিমোক্রিটাসের বা লুক্রেটিয়াসের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায় না।

৭·২। রোমক আমলে গণিত ও জ্যোতিষ-চর্চা

গণিত সম্বন্ধে রোমকদের গবেষণার বৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া ফ্লোরিয়ান ক্যাজরি নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেনঃ

> "Nowhere is the contrast between the Greek and Roman minds shown forth more distinctly than in their attitude toward mathematical science. The sway of the Greek was a flowering time for mathematics, but that of the Roman a period of sterility. In philosophy, poetry and art the Roman was an imitator. But in mathematics he did not even rise to the desire for imitation. The mathematical fruits of Greek genius lay before them untasted."§

* *Encyclopaedia Britannica*, 'Lucretius'. শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।
† Singer, *From Magic to Science*, p. 7.
§ F. Cajori, *A History of Mathematics*, MacMillan, 1926; p. 63.

কেন? রোমক আমলেও আলেকজান্দ্রিয়ায় বসিয়া গ্রীক বিজ্ঞানীরা তাহাদের পূর্বপুরুষদের আদর্শে বিজ্ঞানের চর্চা করিয়া গিয়াছেন। খ্রীঃ পূঃ ৫০ অব্দে টলেমীদের মিশর রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও বিজ্ঞান-চর্চায় ছেদ পড়ে নাই। খ্রীষ্টাব্দ প্রথম হইতে তৃতীয় শতকের মধ্যে গণিতে নিকোমেকাস্, গণিত, জ্যোতিষ ও ভূগোলে প্রাচীনকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী টলেমী, জ্যামিতিতে প্যাপাস্, বীজগণিতে ডায়োফ্যান্টাস্ এবং বলবিদ্যা ও যান্ত্রিক গবেষণায় হীরো অতি মূল্যবান তথ্য ও মতবাদ আবিষ্কার করিয়াছেন। তথাপি তত্ত্বীয় বিজ্ঞান রোমে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না কেন?

কেহ কেহ বলেন, প্রতিনিয়ত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকায় ও সাম্রাজ্য গঠন ও সংরক্ষণকার্যে ব্যাপৃত থাকায় বিজ্ঞানের দিকে মনোযোগ দিবার আর তাহাদের অবসর হয় নাই।* কিন্তু এই যুদ্ধবিগ্রহ ও সাম্রাজ্য গঠন সত্ত্বেও রোমক জাতি সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে, ইতিহাস লিখিয়াছে, সুবৃহৎ বিশ্বকোষ প্রণয়ন করিয়াছে।

রাজনৈতিক স্বাধিকার ও প্রাধান্য বিজ্ঞানের অগ্রগতির অনুকূল, এইরূপ মত যাহারা পোষণ করেন রোমক সাম্রাজ্যে বিজ্ঞানের অধঃপতন তাহাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হইবার কথা। ফিলিপ ও আলেকজান্দারের অভ্যুত্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রীক রাষ্ট্রগুলি রাজনৈতিক স্বাধিকার হারাইলে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও দর্শনে স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা ও সৃজনী শক্তি তাহাদের ধীরে ধীরে লোপ পায়। আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতি অনেকাংশে টলেমীদের সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্যাণেই সম্ভবপর হইয়াছিল। রোমকদের এই বিপুল সাম্রাজ্য ও ঐশ্বর্যের দিনে বিজ্ঞানের এই দৈন্য দেখিয়া প্লিনিও বিশেষ আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন এবং এক জায়গায় আক্ষেপ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে প্লিনির মন্তব্য আলোচনাপ্রসঙ্গে থর্নডাইক লিখিয়াছেন:

> "In a third passage (of *Historia Naturalis*, II, 46) he (Pliny) looks back regretfully at the widespread interest in science among the Greeks, although those were times of political disunion and strife and although communication between different lands was interrupted by piracy as well as war, whereas now, with the whole empire at peace, not only is no new scientific inquiry undertaken, but men do not even thoroughly study the works of the ancients, and are intent on the acquisition of lucre rather than learning."†

বিজ্ঞানের প্রতি পরাঙ্মুখতার প্রকৃত কারণ রোমকদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যে অন্তর্নিহিত। এক সম্পূর্ণ ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী এই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ভাবপ্রবণতা ও কল্পনাবিলাসিতা এই চরিত্রের বহির্ভূত। এজন্য শুধু বিজ্ঞান নহে, বিজ্ঞান যে দর্শনের একটা ক্ষুদ্র বিভাগ মাত্র সেই দর্শনও রোমক চিত্তকে নিবিড়ভাবে আলোড়িত করিতে পারে নাই। রোমকদের কাছে দর্শন বাগাড়ম্বর, অসার যুক্তি-তর্ক, শুধু অনাবশ্যক কথার কচকচি। তত্ত্বীয় বিজ্ঞানে ভাব-প্রবণতার অবকাশ আছে, যুক্তি-তর্ক এখানে অপরিহার্য। গণিত ও জ্যামিতি এইরূপ বিশ্লেষণ-মূলক মনোভাব হইতে উদ্ভূত। প্রকৃতির ও ব্রহ্মাণ্ডের নানা দুর্জ্ঞেয় ব্যবহারের এক সুসম্বদ্ধ চিত্র মানসপটে অঙ্কিত করা, মতবাদ ও পরিকল্পনা রচনার দ্বারা ইহা বুঝিবার চেষ্টা করা এক ভাববাদী ও বিশ্লেষণমূলক মনোভাব ছাড়া সম্ভবপর নহে। এইরূপ মনোভাবের অভাব তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের রস গ্রহণে রোমকদের অক্ষমতার প্রধান কারণ।

এই দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব চিত্রাঙ্কন ও স্থাপত্যকে যে কি নিবিড়ভাবে

---

* Singer, *From Magic to Science.*

† Lynn Thorndike, *A History of Magic and Experimental Science*, Vol. I, 1929; p. 47.

প্রভাবিত করে গ্রীক ও রোমক শিল্পকলা তাহার দৃষ্টান্ত। গ্রীক শিল্পী মানুষের মূর্তি গড়িতে দেবতার মূর্তি গড়িয়াছে; তাহার পশু-পক্ষীরাও যেন এজগতের জীব নহে। এই সব চিত্র বা মূর্তি সর্বাঙ্গসুন্দর, নিখুঁত এক একটি ভাবের প্রতিমূর্তি। পক্ষান্তরে বাস্তববাদী রোমকশিল্পীর অঙ্কিত মানুষ, পশুপক্ষী বা তরুলতা ভাল মন্দ দোষ ত্রুটী লইয়া একান্তই স্বাভাবিক ও পার্থিব। সহজ দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক পরিবেশে বস্তু, প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌কে সে যেভাবে দেখিয়াছে অবিকল সেইভাবে তাহাকে রূপায়িত করাই রোমক শিল্পীর আদর্শ। ভিয়েনাতে প্রাপ্ত এক প্রস্তর খোদাই-এ একটি ভেড়া ও তাহার দুগ্ধপানরত শাবকের যে চিত্র অথবা পম্পাই-এ প্রাপ্ত রৌপ্য পাত্রের গায়ে দ্রাক্ষালতার যে নিখুঁত কারুকার্য আমরা দেখি, তাহাতে রোমকদের এই স্বভাবজ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী সুপরিস্ফুট।

স্টোইক ও এপিকিউরীয় দর্শন—লুক্রেটিয়াস্

প্লেটো ও অ্যারিষ্টট্‌লের প্রজ্ঞাবাদ, অধ্যাত্মবাদ বা অধিবিদ্যা সাধারণভাবে রোমকদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিলেও গ্রীকদের দুইটি দার্শনিক ধারা রোমকদের ব্যবহারিক মনকে কিছুটা আকৃষ্ট করিয়াছিল। আমরা এপিকিউরীয় ও স্টোইক দর্শনের কথা বলিতেছি। অ্যারিষ্টট্‌লের মৃত্যুর পর গ্রীক চিন্তাজগতে যে নানারূপ দ্বন্দ্ব, সংশয় ও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছিল সেই সংশয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে এই দুই দর্শনের উদ্ভব হয়। স্টোইক দর্শনের প্রবর্তক জেনোর পূর্বপুরুষেরা ফিনিশীয় ছিলেন। তিনি সাইপ্রাস্ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন এবং খৃীঃ ৩১১ পূর্বাব্দ হইতে এথেন্সে তাঁহার দার্শনিক মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে এক বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন। আয়োনীয় গ্রীকদের বিখ্যাত উপনিবেশ সামোস দ্বীপের অধিবাসী এপিকিউরাস্ এপিকিউরীয় দর্শনের প্রবর্তক। এই দুই দর্শনই একান্তভাবে বাস্তববাদী। দুঃখ, দুর্দশা, অশান্তি ও বিপর্যয়ের মধ্যে যে মানুষকে বাঁচিতে হয় কিসে তাহার সুখ শান্তি হইতে পারে তাহার নির্দেশ প্রদান স্টোইক ও এপিকিউরীয় দর্শনের মূল উদ্দেশ্য। উভয় দর্শনই সর্বপ্রকার অলৌকিকতা-বিবর্জিত। এই দর্শনে ঈশ্বরের স্থান থাকিলেও মানুষ ও প্রকৃতির উপর তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি সীমাবদ্ধ। মানুষের ভাগ্যকে বা তাহার সমাজকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন না; মানুষের সম্পত্তির উপরও তিনি খবরদারি করেন না, অথবা কেহ বিপথগামী ও নীতিভ্রষ্ট হইলে তাহাকে বজ্রাঘাতও করেন না। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আপনার নিয়মে সৃষ্ট হইয়াছে এবং চলেও প্রাকৃতিক নিয়মে। এপিকীউরীয় দর্শনে পরমাণুবাদীদের প্রভাব বিশেষভাবে বিদ্যমান। এপিকিউরাস্ নিজে ডিমোক্রিটাস্ ও লিউসিপ্পাসের রচনাবলী পাঠ করিয়াছিলেন এবং পরমাণুবাদীদের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের প্রস্তাবিত বস্তু ও ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যা প্রায় হুবহু গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য স্টোইক ও এপিকিউরীয়দের বস্তুবাদী দর্শন কালোপযোগী হইয়াছিল এবং এই কারণেই কর্মবীর রোমকদের মধ্যে এই দুই দর্শনের কিছুটা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পোসিডোনিয়াস্, মার্কাস অরেলিয়াস্ প্রমুখ স্টোইক বিজ্ঞানী ও লেখকগণের কল্যাণে রোমক বিদ্বৎ সমাজে স্টোইক দর্শনের প্রচার ঘটে। এইরূপ প্রচারকার্যে এপিকিউরীয়রা স্টোইকদের মত সাফল্য লাভ করিতে না পারিলেও, তাহাদের মধ্য হইতেই সর্বশ্রেষ্ঠ রোমক কবি ও দার্শনিক লুক্রেটিয়াসের উদ্ভব হয়। সুললিত কবিতার মধ্য দিয়া তিনি যেমন এপিকিউরীয় দর্শনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই সঙ্গে ডিমোক্রিটাসের বিস্মৃতপ্রায় আণবিক তত্ত্বকেও তিনি পুনরুদ্ধার করিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এপিকিউরীয় দর্শন ও আণবিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা তাঁহার অমর গ্রন্থ *De rerum natura*-য় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

De rerum natura-র পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে মহাকবি ও দার্শনিকের অপূর্ব পাণ্ডিত্য-পূর্ণ উদার চরিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। এই মহাকাব্য পাঠে মনে হয়, ইহার রচয়িতার জ্ঞান শুধু এপিকিউরাসের রচনাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আয়োনীয় দার্শনিকগণ হইতে

সুরু করিয়া তাঁহার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক বিশিষ্ট গ্রীক দার্শনিকের রচনার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। হেরাক্লিটাস্, অ্যানাক্সাগোরাস্, লিউসিপ্পাস্ ও ডিমোক্রিটাস্, হিপো-ক্রেটিস্, থুসিডাইড্স্, এম্পিডক্লেস্ প্রমুখ প্রখ্যাত গ্রীক দার্শনিক ও বিজ্ঞানিগণের কোন গ্রন্থ বা রচনা তিনি বাদ দেন নাই। তারপর প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের দর্শনের সহিতও তিনি সুপরিচিত ছিলেন এবং বহুস্থানে তাঁহাদের মতবাদের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। লুক্রে-টিয়াস্ নিজস্ব কোন মৌলিক দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন নাই এবং তাঁহার বিষয়বস্তুও প্রধানতঃ ডিমোক্রিটাস্ ও এপিকিউরাসের রচনাবলী হইতে গৃহীত। তথাপি গ্রীকদের এই বিশাল ও কঠিন দর্শনশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া সাধারণের বোধগম্য অতি মনোজ্ঞ ও সুললিত ভাষায় এই জ্ঞান প্রকাশ করিবার কার্যে তিনি যে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, রোমক অধ্যবসায় ও প্রতিভার তাহা আর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

De rerum natura-র ছয় খণ্ড এপর্যন্ত সংরক্ষিত আছে। সম্ভবতঃ কবি তাঁহার এই মহাকাব্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই মহাকাব্য-রচনা ছিল তাঁহার সমগ্র জীবনের একমাত্র ব্রত এবং ইহাকে সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে না পারিবার ব্যর্থতা শেষ জীবনে তাঁহাকে বিশেষভাবে বিদ্ধ করিয়াছিল। এসম্বন্ধে ফারিংটন মন্তব্য করিয়াছেন যে, "One feels that Lucretius must have died like Buckle, exclaiming 'My Book, my book'"।

গ্রন্থের প্রথম দুই খণ্ডে পরমাণু-তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে; পরমাণুদের সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ ও প্রকৃতির ব্যাখ্যা কি ভাবে সম্ভবপর লুক্রেটিয়াস্ তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তৃতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু আত্মার স্বরূপ ও প্রকৃতি এবং আত্মার সহিত দেহের সম্পর্ক। আত্মা যে একান্তই পার্থিব এবং দেহের সঙ্গে সঙ্গে ইহার মৃত্যু অনিবার্য এই মত তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। চতুর্থ খণ্ডে ইন্দ্রিয়লব্ধ নানাবিধ অনুভূতি ও কিছু কিছু জীবতত্ত্বের কথা আলোচিত হইয়াছে। পৃথিবী ও তাহার ইতিবৃত্ত ও গঠন-বৈচিত্র্য, জ্যোতিষ্ক ও নৈসর্গিক বস্তুর প্রকৃতি ও গতি, পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে পঞ্চম খণ্ডে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে *De rerum natura*-র এই পঞ্চম খণ্ডই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ষষ্ঠ খণ্ডে আবহবিদ্যা ও ভূবিদ্যা সম্পর্কিত নানা প্রকার তথ্য ও পর্যবেক্ষণের ফল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই খণ্ডে পেলোপোনেশীয় যুদ্ধের সময় এথেন্সে যে ব্যাপক প্লেগ মহামারী দেখা দিয়াছিল তাহার এক বর্ণনা আছে। এরূপ বিবিধ বিষয়ের অবতারণা ও আলোচনার জন্য এই গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে এক বিরাট বিশ্বকোষের সহিত তুলনীয়। তথাপি ইহা একটি বিশ্বকোষ নহে। বিবিধ তথ্য ও বিষয়ের আলোচনার মধ্যে সর্বদা তিনি একক মতবাদ, চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। এপিকিউরীয় দর্শনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া তিনি এই মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন বিভিন্ন ও আপাত-অসংলগ্ন বিষয়ের অবতারণা সত্ত্বেও তিনি সেই কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য হইতে এতটুকু বিচ্যুত হন নাই।

আণবিক তত্ত্ব ঃ বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে লুক্রেটিয়াস্ বিশেষ করিয়া আণবিক তত্ত্বের ব্যাখ্যার জন্য প্রসিদ্ধ। শুধু বস্তুর গঠন নহে, আণবিক তত্ত্বের ভিত্তিতে তিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এমন কি পার্থিব অপার্থিব নানা রহস্য বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। অণু-পরমাণুর অবিশ্রান্ত সংঘাত, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। ব্রহ্মাণ্ড অপরিবর্তনশীল ও অসীম। বস্তু ও শূন্যতা মিলিয়া ব্রহ্মাণ্ডের গঠন। বস্তুর অস্তিত্ব অনুভূতি-গ্রাহ্য; তাহার গতি, আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রভৃতি বাহ্যিক গুণ উপলব্ধি করিবার জন্য শূন্যতার অস্তিত্ব অপরিহার্য। বস্তুর গতি অবিশ্রান্ত এবং প্রতিনিয়ত পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে তথাকথিত কঠিন পদার্থের উদ্ভব হইয়া থাকে। আত্মা সম্বন্ধে লুক্রেটিয়াস্ বলেন যে, ইহা ধারণাতীত অতি সূক্ষ্ম পরমাণুর দ্বারা গঠিত। আত্মা সমগ্র দেহ পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকে, দেহকে বাদ

দিয়া আত্মার অস্তিত্ব অসম্ভব। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মা আবার প্রাথমিক পরমাণুতে বিভক্ত হইয়া বিলীন হইয়া যায়। দেবতাদের সম্বন্ধে এপিকিউরীয়দের ধারণার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন, দেবতারাও পার্থিব ও অতি সূক্ষ্ম পরমাণুর দ্বারা গঠিত। তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে জীবন ধারণ করেন, মানুষেরই মত তাঁহারা নশ্বর, কিন্তু মানুষের কোন ব্যাপারে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করেন না, ইত্যাদি।*

আপাত-দৃষ্টিতে প্রাচীন গ্রীক আণবিক তত্ত্বের সহিত আধুনিক আণবিক তত্ত্বের অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইলেও ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, আধুনিক আণবিক তত্ত্ব যেমন রাসায়নিক পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ডিমোক্রিটাস্-লুক্রেটিয়াস্ প্রবর্তিত আণবিক তত্ত্বের বনিয়াদ সেইরূপ নহে। পরমাণুর সংযোগে কিরূপে অণুর উদ্ভব হইয়া থাকে, পরমাণুদের পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ফলে কিরূপে নানারূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্ভব হয়, এ সম্বন্ধে জন ডাল্টনের পূর্বে কাহারও কোন ধারণা ছিল না। আর একটি কথা, আধুনিক আণবিক তত্ত্বের উদ্ভাবনে গ্রীক আণবিক তত্ত্ব আদৌ সহায়ক হয় নাই। এই তত্ত্বের প্রধান ধারক ও বাহক এপিকিউরীয় দর্শন বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রগতিকে যে খুব বেশী প্রভাবিত করিয়াছিল, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে তাহা মনে হয় না। মধ্যযুগে এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডাল্টনের (১৭৬৬-১৮৪৪) পূর্ব পর্যন্ত আণবিক তত্ত্ব একরূপ ধামাচাপাই পড়িয়াছিল। মাঝে মাঝে দুই একজন বিজ্ঞানী বা দার্শনিককে অবশ্য প্রাচীন আণবিক তত্ত্বের সপক্ষে লিখিতে ও মত পোষণ করিতে দেখা যায়। যেমন মুসলমান দার্শনিক আভেরস্ (১১২৬-৯৮) ও ইহুদী দার্শনিক মাইমোনিড্স্ (১১৩৫-১২০৪) আণবিক তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে পোগ্গিও মধ্যযুগের বিস্মৃতির অন্ধকার হইতে লুক্রেটিয়াসের আণবিক তত্ত্বকে উদ্ধার করিয়া ইহার প্রচারে যত্নবান হন এবং অনেকের মতে তাঁহার প্রচেষ্টার ফলেই নাকি রেনেশাঁর সময় লুক্রেটিয়াস্ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন।† তবে মধ্যযুগের এই সব দার্শনিকদের বিক্ষিপ্ত আলোচনা যে আধুনিক আণবিক তত্ত্বের গোড়াপত্তনে উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য করিয়াছিল তাহা মোটেই মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে ডাল্টন তাঁহার রাসায়নিক পরীক্ষা ও গবেষণা হইতে স্বাধীনভাবেই আণবিক মতবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই গবেষণায় ও পরিকল্পনা-রচনায় ডিমোক্রিটাসের বা লুক্রেটিয়াসের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায় না।

৭·২। রোমক আমলে গণিত ও জ্যোতিষ-চর্চা

গণিত সম্বন্ধে রোমকদের গবেষণার বৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া ফ্লোরিয়ান ক্যাজরি নিম্নোক্ত মন্তব্য করিয়াছেনঃ

> "Nowhere is the contrast between the Greek and Roman minds shown forth more distinctly than in their attitude toward mathematical science. The sway of the Greek was a flowering time for mathematics, but that of the Roman a period of sterility. In philosophy, poetry and art the Roman was an imitator. But in mathematics he did not even rise to the desire for imitation. The mathematical fruits of Greek genius lay before them untasted."§

* *Encyclopaedia Britannica*, 'Lucretius'. শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।
† Singer, *From Magic to Science*, p. 7.
§ F. Cajori, *A History of Mathematics*, MacMillan, 1926; p. 63.

গাণিতিক গবেষণার প্রতি রোমকদের এইরূপ বিতৃষ্ণা ও পরাঙ্মুখতা গ্রীক ও রোমক মনোবৃত্তির ও দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্যের পরিচায়ক। ইউক্লিড-অ্যাপোলোনিয়াস্-আর্কিমিডিসের জ্যামিতির, অথবা পিথাগোরীয়দের অঙ্কশাস্ত্রের, অথবা ইউডক্সাস্-অ্যারিস্টার্কাস্-হিপার্কাসের জ্যোতিষের রস গ্রহণে রোমকরা বরাবরই অক্ষম থাকিয়া গিয়াছে। একমাত্র বোয়েথিয়াস্ ছাড়া আর কোন রোমক গণিতজ্ঞের নাম উল্লেখযোগ্য নহে। এই বোয়েথিয়াস্ও বৃক্ষহীন দেশে এরণ্ডের ন্যায়। ইউক্লিড, অ্যাপোলোনিয়াস্, আর্কিমিডিস্ প্রমুখ প্রতিভার সহিত তাঁহার কোন তুলনাই হয় না। ঐতিহাসিকেরা তাই রোমক আমলকে গাণিতিক গবেষণার বন্ধ্যাতার যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

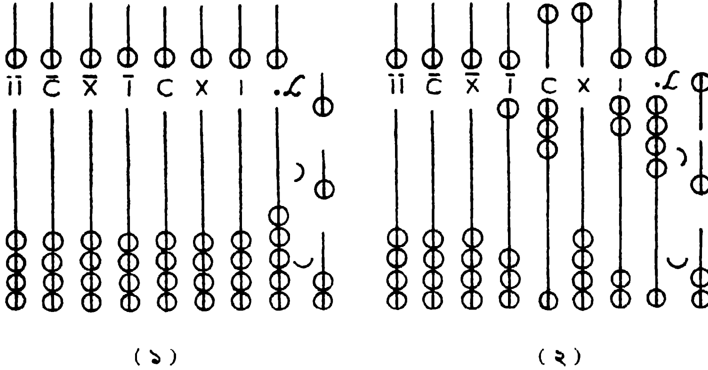
কিন্তু তাই বলিয়া রোমক প্রাধান্যের কালে সাম্রাজ্যের কোথাও গণিতের চর্চা একেবারেই হয় নাই তাহা নহে। গ্রীক গণিতের মধ্যাহ্ন অ্যাপোলোনিয়াস্ ও আর্কিমিডিসের সঙ্গে সঙ্গে অতিক্রান্ত হইলেও সূর্য তখনও অস্ত যায় নাই। জ্যোতিষে পোসিডোনিয়াস্, জেমিনাস্ ও ক্লডিয়াস্ টলেমী, পাটীগণিতে নিকোমেকাস্, থিওন অব্ স্মার্ণা ও আয়াম্‌ব্লিকাস্, বীজগণিতে ডায়োফ্যাণ্টাস্ ও জ্যামিতিতে প্যাপাস্, থিওন অব্ আলেকজান্দ্রিয়া ও হাইপেসিয়া প্রমুখ গ্রীক জ্যোতির্বিদ্ ও গণিতজ্ঞগণ রোমক সাম্রাজ্যের একপ্রান্তে আলেকজান্দ্রিয়ায় বসিয়া প্রায় পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত জ্যোতিষীয় ও গাণিতিক চর্চা অব্যাহত রাখেন। রোমক রাজনৈতিক প্রাধান্যের কালে সংঘটিত হইলেও এই গণিত ও জ্যোতিষের চর্চা পুরাপুরি গ্রীক; ইহা পূর্ববর্তী গ্রীক গণিত ও জ্যোতিষের ইতিহাসের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত। জাতীয়তার দিক হইতে এই গবেষণার কোন কৃতিত্ব রোমকদের প্রাপ্য নহে। রোমক আমলে গ্রীকদের জ্যোতিষ ও গণিতের আলোচনার পূর্বে, রোমকদের নিজস্ব গণিত ও গণনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে সামান্য যাহা কিছু জানা যায়, আমরা তাহার কিছু উল্লেখ করিব।

রোমকদের নিজস্ব গণিত

গণনা ও সংখ্যা-পাতন পদ্ধতিঃ রোমকদের এই নিজস্ব গণিত গ্রীক গণিত হইতে উদ্ভূত নহে। সম্ভবতঃ গ্রীকদের অপেক্ষা প্রাচীনতর এক বা একাধিক জাতির কাছে রোমকরা গণিত সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করে। ঠিক কোন্ জাতির কাছ হইতে এবং কিভাবে গণিতের সহিত রোমকদের প্রথম পরিচয় ঘটিয়াছিল তাহা প্রায় সম্পূর্ণই অজ্ঞাত। বহু প্রাচীনকাল হইতেই রোমকদের মধ্যে সংখ্যা-লিখন ও ব্যবহারিক জ্যামিতি সম্বন্ধে যে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, রোমকরা সম্ভবতঃ সেই জ্ঞান তাহাদের পূর্বপুরুষ টিবের উপত্যকাবাসী এট্রুস্কানদের কাছ হইতে আহরণ করে। বৎসর গণনার উদ্দেশ্যে এই এট্রুস্কানরা মিনার্ভার মন্দিরগাত্রে প্রতিবৎসরই একটি পেরেক পুঁতিবার ব্যবস্থা করিত; রোমকদের এই ব্যবস্থা বহুদিন পর্যন্ত অনুসরণ করিতে দেখা যায়। রোমক সংখ্যা-পাতন-পদ্ধতির সূত্রপাতও এই এট্রুস্কানদের আমল হইতে। এই পদ্ধতিতে যে বিয়োগের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে তাহা সুবিদিত: যেমন, একটি বৃহত্তর সংখ্যা-সংকেতের পূর্বে আর একটি সংখ্যা-সংকেত যোজনা করিয়া ($X = ১০$; $IX = ৯$) একটি ক্ষুদ্রতর সংখ্যার নির্দেশ দান। এইরূপ সংখ্যা-পাতন-পদ্ধতি অন্যান্য জাতিদের মধ্যে ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। কোন একটি সংখ্যার উপর একটি ক্ষুদ্র সরলরেখা টানিয়া সেই সংখ্যা অপেক্ষা সহস্রগুণ বড় একটি সংখ্যাকে নির্দেশ করিবার পদ্ধতিও রোমকদের আর একটি বিশেষত্ব।

রোমক আবাকাসঃ সাধারণ গণনার কার্যে আঙ্গুলের কর, 'আবাকাস' ও ধারাপাত এই ত্রিবিধ পদ্ধতির ব্যবহার রোমকদের মধ্যে চালু ছিল। এককালে আবাকাস গণনাকার্যে অপরিহার্য সহায়ক হিসাবে গণ্য হইত এবং শিশুদের শিক্ষার জন্য ইহার সর্বত্র প্রচলন ছিল। নানাপ্রকার আবাকাসের ব্যবহার জানা যায়। আবাকাসে একক, দশক, শতক প্রভৃতি অঙ্ক নির্দেশ করিতে কতকগুলি সমান্তরাল সরলরেখার পঙ্‌ক্তিতে নুড়ি বা ঐ জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

বস্তু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গণনার কার্যে ব্যবহৃত এইরূপ নুড়ি বা পাথরকে বলা হইত 'calculi'; এই 'calculi' শব্দ হইতে 'calculation', 'calculus' প্রভৃতি ইউরোপীয় শব্দের উদ্ভব হইয়াছে। অনেক সময় মাটিতে ধূলা বা বালি বিছাইয়া তাহার উপর একক, দশক ইত্যাদি নির্দেশক কতকগুলি দাগ কাটা হইত। পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিবার উদ্দেশ্যে ধাতুর পাতের উপর সমান্তরালভাবে খাঁজ কাটিয়া সেই খাঁজগুলির উপর অনায়াসে উপর হইতে নীচে চালনা করা যাইতে পারে এইরূপ কতকগুলি বোতাম বসানো থাকিত। ১০১নং চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আবাকাস-ব্যবহারের মূল পদ্ধতি সহজেই বুঝা যাইবে।



(১) (২)

১০১। রোমক আবাকাসের সাহায্যে গণনা।

১০১(১)নং চিত্রে আবাকাস-ব্যবহারের পূর্ববর্তী অবস্থা দেখানো হইয়াছে। বাম হইতে ডাহিনে এবং উপরে ও নীচে ৮টা করিয়া সমান্তরাল রেখা টানা আছে; ডানদিকের সর্বশেষ অর্থাৎ নবম সারিতে ৩টি ক্ষুদ্র রেখা আছে। নীচের প্রথম হইতে সপ্তম সারিতে ৪টি করিয়া বোতাম আছে এবং অষ্টম সারিতে আছে ৫টি। নবম সারির সর্বোচ্চটিতে একটি, মধ্যের সারিতে একটি এবং সর্বনিম্ন সারিতে ২টি বোতাম আছে। অষ্টম ও নবম সারির ব্যবহার ভগ্নাংশের জন্য নির্দিষ্ট। নবম সারির সর্বোচ্চ বোতামটি ১।২৪, তার পরেরটি ১।৪৮ এবং সর্বনিম্ন বোতামের প্রত্যেকটির দ্বারা ১।৭২ ভগ্নাংশ বুঝায়। অষ্টম সারির নীচের ৫টি বোতামের প্রত্যেকটি ১।১২ এবং ঐ সারির উপরের বোতামটি ৬।১২ বা ১।২ ভগ্নাংশ নির্দেশ করিতেছে। সপ্তম সারি হইতে প্রথম সারি পর্যন্ত যথাক্রমে একক, দশক, শতক, সহস্র, অযুত, লক্ষ ও নিযুত বুঝাইতেছে। এই পঙ্‌ক্তিগুলির অব্যবহিত উপরে অবস্থিত সারির এক একটি বোতাম নীচের বোতামের পাঁচগুণ বৃহৎ সংখ্যা নির্দেশ করিতেছে।

এখন মনে করা যাক, আবাকাসের সাহায্যে ১৮৫২ ১।৩ ১।২৪ সংখ্যাকে নির্দেশ করিতে হইবে। ১০১(২)নং চিত্রে ইহা দেখানো হইয়াছে। বোতামগুলিকে প্রয়োজনমত স্থানচ্যুত করিয়া কিভাবে সারির অপর প্রান্তে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, তাহা একান্ত লক্ষণীয়।

নীচের	৪র্থ	সারি	--	১,০০০
উপরের	৫ম	সারি	—	৫০০
নীচের	৫ম	সারি	—	৩০০
উপরের	৬ষ্ঠ	সারি	—	৫০
নীচের	৭ম	সারি	—	২

নীচের	৮ম	সারি	—		১।৩	
সর্বোচ্চ	৯ম	সারি	—			১।২৪
সংখ্যা				১,৮৫২	১।৩	১।২৪

আবাকাসের সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ এই চারি নিয়ম অতি সহজে সম্পাদন করা যায়। গুণ ও ভাগ যথাক্রমে নানা পর্যায়ে যোগ ও বিয়োগের দ্বারা নিষ্পন্ন করা হইত।

আবাকাসের সাহায্যে গণনা-পদ্ধতি এরূপ জটিল যে, নিপুণ ও অভিজ্ঞ গণিতজ্ঞ ছাড়া সাধারণের পক্ষে আবাকাসের ব্যবহার রীতিমত কঠিন ছিল। সিসেরো এই গণকদের বলিতেন, *eruditum attigisse pulverem,* অর্থাৎ 'বালুকা গণনায় সুনিপুণ'। এজন্য সাধারণ লোকে গুণের ও ভাগের নানারূপ তালিকা মুখস্থ করিয়া রাখিত যাহাতে ব্যবহারিক গণনায় ও হিসাব-নিকাশের কাজে অসুবিধায় পড়িতে না হয়।

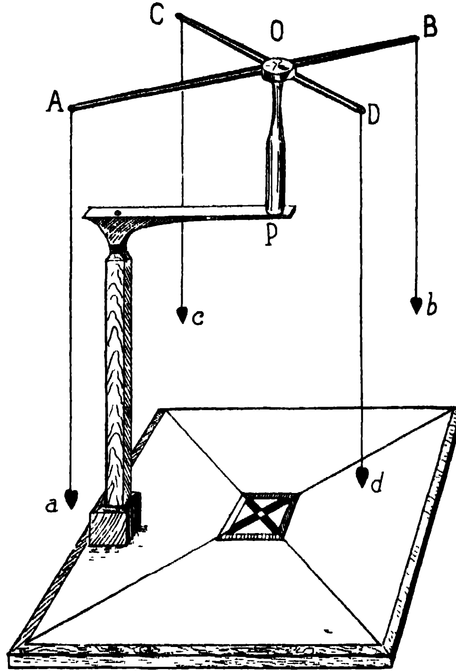
সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কিত রোমক আইনে নানাবিধ গাণিতিক সমস্যার উল্লেখ আছে। এই সমস্যা লইয়া বিচারালয়ে আইনজীবীদের প্রায়ই মুশকিলে পড়িতে হইত। একবার এক মৃত ব্যক্তির দলিল অনুসারে সম্পত্তি ভাগ করিবার সময় এক দুরূহ গাণিতিক সমস্যার উদ্ভব হয়। মৃত্যুশয্যায় এই দলিল রচনাকালে ব্যক্তিটির পত্নী সন্তানসম্ভবা ছিল। সুতরাং দলিলে এইরূপ লেখা থাকে যে, পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিলে পুত্র সম্পত্তির $\frac{2}{3}$ ভাগ ও পত্নী $\frac{1}{3}$ ভাগ পাইবে, কিন্তু কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে কন্যা পাইবে সম্পত্তির $\frac{1}{3}$ অংশ ও পত্নী $\frac{2}{3}$ অংশ। শেষ পর্যন্ত মহিলার যমজ সন্তান হয়, তন্মধ্যে একটি পুত্র ও অপরটি কন্যা। এখন সম্পত্তি ভাগ কিরূপে হইবে? বিখ্যাত রোমক আইনজ্ঞ স্যালভিয়ানাস্ জুলিয়ানাস্ রায় দেন, পুত্র পাইবে সম্পত্তির ৪।৭ ভাগ, পত্নী ২।৭ ভাগ, ও কন্যা ১।৭ ভাগ!

জ্যামিতিঃ জরিপের কাজে রোমকরা জ্যামিতির ব্যবহার জানিত বটে; কিন্তু সে জ্যামিতি ছিল নিতান্তই প্রাথমিক পর্যায়ের। এট্রুস্কানদের আমল হইতে এইরূপ ব্যবহারিক জ্যামিতির প্রচলন রোমকদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তাহারা নির্ণয় করিতে জানিত। রোমক জ্যামিতির উপর মিশরীয় জ্যামিতির প্রভাব সুপরিস্ফুট। এই প্রভাবের সূত্রপাত সম্ভবতঃ জুলিয়াস সিজারের সময় হইতে। সিজার মিশরীয় পদ্ধতিতে সমগ্র রোমক সাম্রাজ্যের জরিপ গ্রহণ করিতে এক আদেশ জারি করিয়াছিলেন। তাঁহার নামে প্রচলিত বিখ্যাত জুলিয়ান পঞ্জিকা প্রণয়নের কার্যে তিনি সোসিজেনিস্ নামে এক আলেকজান্দ্রীয় গ্রীক জ্যোতির্বিদকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হীরোর জ্যামিতির প্রয়োগ রোমক ব্যবহারিক জ্যামিতিতে দেখা যায়।

নিতান্ত প্রাথমিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইলেও পাটীগণিতে ও ব্যবহারিক জ্যামিতিতে রোমকদের এই সকল উন্নতি-সাধন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গ্রীক গণিতজ্ঞেরা পাটীগণিত, ব্যবহারিক জ্যামিতি প্রভৃতি গণিতের কয়েকটি বিভাগকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট জ্ঞান করিত: গণনার কার্য শুধু ক্রীতদাসদের উপযুক্ত, তাহাদের এইরূপ ধারণা ছিল। ফলে গ্রীক সংখ্যা-লিখন ও গণনা-পদ্ধতি অতিশয় জটিল ও অসুবিধাজনক হইয়া পড়ে। সেই তুলনায় রোমকদের অঙ্ক-পাতন ও গণনা-পদ্ধতি ছিল অনেক বেশী সহজ ও সরল।

পরিমিতি ও জরিপের কাজে ব্যবহৃত কয়েকটি যন্ত্রপাতিঃ পরিমিতি ও জরিপের কাজে রোমকরা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়। পূর্তবিদ্যার সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকায় রোমক পূর্তবিদ্যার স্বাভাবিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ফলিত গণিতের এই দুই বিভাগেও যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। পম্পাই-এর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পরিমিতি ও জরিপের কাজে প্রাচীন রোমকদের ব্যবহৃত যে সব যন্ত্রপাতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহাতে

এই বিদ্যায় তাহাদের পারদর্শিতাই প্রমাণিত হয়। এই ধ্বংসস্তূপে 'গ্রোমা' (groma) নামে একটি যন্ত্র পাওয়া গিয়াছে। জরিপের কাজে গ্রোমার ব্যাপক ব্যবহারের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। একটি উল্লম্ব পিভটের দুইটি অনুভূমিক দণ্ড পরস্পর পরস্পরকে ছেদ করিয়া এবং একটি অপরটির উপর লম্ব অবস্থায় থাকে (১০২নং চিত্র)। অনুভূমিক দণ্ডদ্বয়

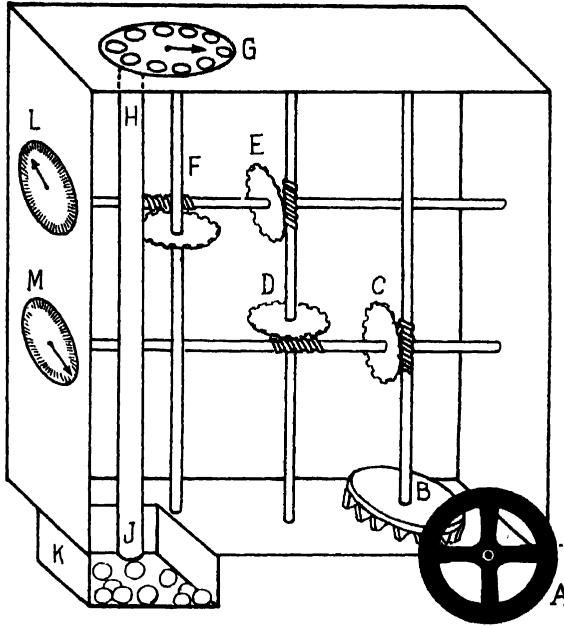


১০২। গ্রোমা। পম্পাই-এ এক পরিমাপকের কবরে প্রাপ্ত একটি গ্রোমার অনুকরণে অঙ্কিত। *OP*—উল্লম্ব পিভট্; *AB*, *CD*—অনুভূমিক দণ্ড; *Aa*, *Bb*—লম্বসূত্র।

ক্ষিতিজের (horizontal plane) উপর ঘুরিতে পারে। প্রত্যেক দণ্ডের দুই প্রান্ত হইতে একটি করিয়া লম্বসূত্র (plumb line) ঝোলানো থাকে। রোমকরা সাধারণতঃ আয়ত-ক্ষেত্রের আকারে নগর, গ্রাম অথবা কৃষিক্ষেত্রের পরিকল্পনা করিত; এজন্য গ্রোমার ব্যাপক প্রয়োগ ছিল।

অনধিগম্য স্থানের দূরত্ব নির্ণয়ের জন্য হোডোমিটার (hodometer) নামে এক প্রকার যন্ত্রের ব্যবহার ছিল। হোডোমিটারের সাহায্যে নদীর প্রস্থ বা অন্য কোন স্থানের দূরত্ব পর্যবেক্ষক অনায়াসে নির্ণয় করিতে পারিত। ভিট্রুভিয়াস্ এইরূপ একটি হোডোমিটারের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'A' চাকার সাহায্যে হোডোমিটারকে ভূমির উপর চালনা করা যায় (১০৩নং চিত্র)। এই চাকার অক্ষদণ্ডের সহিত সংলগ্ন দন্তবিশিষ্ট একটি চাকার সহিত আর একটি দন্তবিশিষ্ট চাকা 'B' এইরূপভাবে সংযুক্ত থাকে যে, 'A' অক্ষদণ্ড ক্ষিতিজের উপর ঘুরিতে থাকিলে 'B'-র সংলগ্ন অক্ষদণ্ডটি উল্লম্বের দিকে ঘুরিতে থাকিবে। আসলে অনুভূমিক দণ্ডের ঘূর্ণনকে উল্লম্বে অবস্থিত দণ্ডের ঘূর্ণনে পর্যবসিত করিবার ইহা এক কৌশল মাত্র। C, D, E, ও F-এ এইরূপ দন্তবিশিষ্ট চাকা ও খাঁজকাটা দণ্ডের সাহায্যে

একদিকের ঘূর্ণনকে অন্যদিকের ঘূর্ণনে পর্যবসিত করিবার ব্যবস্থা আছে। সর্বশেষ উল্লম্বদণ্ড F-এর অগ্রভাগে একটি গোলাকার চাকতি G-এর প্রান্তবৃত্তে কতকগুলি ছিদ্রের ব্যবস্থা লক্ষণীয়। HJ একটি ফাঁপা নল। এই নলটি এইরূপভাবে বসানো থাকে যে, G চাকতি ঘুরিবার সময় ইহার প্রত্যেক ছিদ্র HJ নলের মুখের উপর দিয়া যাইবে। এখন চাকতির



১০৩। হোডোমিটার।

প্রত্যেক ছিদ্রে একটি করিয়া নুড়ি বসাইয়া রাখিলে ছিদ্রগুলি HJ নলের উপর দিয়া যাইবার সময় একটি করিয়া নুড়ি নলের ভিতর প্রবেশ করিয়া K পাত্রে জড়ো হইবে। হোডোমিটারের B, C, D, E, F চাকা ও তৎসংলগ্ন দণ্ডগুলি এইভাবে সাজানো থাকে যাহাতে প্রতি মাইলে একটি করিয়া নুড়ি K পাত্রে সংগৃহীত হইতে পারে। সুতরাং এই নুড়িগুলি গণনা করিলেই হোডোমিটার কতদূর চলিয়াছে তাহা অতি সহজে জানা যাইবে।

স্টীলিয়ার্ড (steelyard), কপি, ক্রেণ, প্রভৃতি নানাবিধ যন্ত্রপাতির সহিত রোমকরা সুপরিচিত ছিল। পরিমাপক ও পূর্তবিদ্যাবিশারদেরা এই সব যন্ত্রের কার্যকলাপ উত্তমরূপে অবগত ছিল এবং তাহাদের হাতে মাঝে মাঝে এই সব যন্ত্রের যে কৃতিত্বপূর্ণ উন্নতিসাধনও ঘটিয়াছিল, তাহার বহু নিদর্শন বর্তমান।

রোমক আমলে গ্রীক জ্যোতিষ ও গণিতের গবেষণা

উচ্চাঙ্গের জ্যোতিষীয় ও গাণিতিক গবেষণায় রোমকদের অবদান অকিঞ্চিৎকর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহাদের আমলে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগ হইতে খ্রীষ্টাব্দ পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত একমাত্র গ্রীক বিজ্ঞানিগণই যে গণিত ও জ্যোতিষের গবেষণার

দ্বার খোলা রাখিয়াছিল তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। সুতরাং এই সময়কার গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় চর্চার কথা বলিতে গেলে আবার গ্রীক বিজ্ঞানীদের কথাই বলিতে হয়।

পোসিডোনিয়াস্ (আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৩৫-৫১)

স্টোইকপন্থী পোসিডোনিয়াস্ ছিলেন একাধারে ভৌগোলিক, জ্যোতির্বিদ্ ও গণিতজ্ঞ। *On the Ocean* শীর্ষক গ্রন্থে তিনি সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার এক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণ যে এই জোয়ার-ভাটার জন্য দায়ী, এই মত তিনি ব্যক্ত করেন। পোসিডোনিয়াস্ ফলিত জ্যোতিষে (astrology) পরম বিশ্বাসী ছিলেন এবং বলিতেন, পৃথিবীতে মানুষের গতিবিধি ও ভাগ্য গ্রহ, নক্ষত্র ও জ্যোতিষ্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ফলিত জ্যোতিষে এইরূপ বিশ্বাসের ফলেই সম্ভবতঃ সমুদ্রের উপর সূর্য ও চন্দ্রের প্রভাবের কথা তিনি চিন্তা করেন।

পোসিডোনিয়াস্ পৃথিবীর পরিধির এক মাপ নির্ণয় করেন। তাঁহার এই পরিধির মাপ দাঁড়ায় ১৮০,০০০ ষ্টাডিয়া। ইরাটোস্থেনিস্ পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করিয়াছিলেন ২৫২,০০০ ষ্টাডিয়া। পোসিডোনিয়াসের ধারণা হয় যে, ইরাটোস্থেনিস্ ও পূর্বগামী অন্যান্য ভৌগোলিকদের নির্ণীত মাপ অনেক বড় এবং পৃথিবীর পরিধির আসল মাপ অনেক ছোট ও তাঁহার নির্ণীত মাপের কাছাকাছি। তাঁহার এইরূপ ভ্রান্ত মাপ কলম্বাস প্রমুখ নাবিকদের সমুদ্রযাত্রাকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, সে কথা স্থানান্তরে আলোচিত হইয়াছে।

জ্যামিতি সম্বন্ধেও পোসিডোনিয়াসের কিছু কিছু গবেষণা আছে। সমান্তরাল সরল রেখার এক সংজ্ঞা-প্রদান তাঁহার জ্যামিতিক গবেষণার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সংজ্ঞা হইল, একই সমতল ক্ষেত্রের উপর দূরত্ব বরাবর সমান রাখিয়া দুইটি সরল রেখা টানিলে সরল রেখাদ্বয় সমান্তরাল হইবে।

জেমিনাস্ (খ্রীঃ অঃ ৭০)

পোসিডোনিয়াসের শিষ্য রোড্স্ দ্বীপের অধিবাসী জেমিনাস্ খ্রীঃ অঃ প্রথম শতাব্দীতে *Introduction to Astronomy, Arrangement of Mathematics* নামে জ্যোতিষ ও গণিতের কয়েকটি সুললিত গ্রন্থ রচনা করেন। জ্যোতিষকে সহজ ও সুখপাঠ্য করিয়া প্রকাশ করিবার প্রয়াস যে সব প্রাচীন বিজ্ঞানীদের মধ্যে দেখা যায়, জেমিনাস্ তাঁহাদের অন্যতম। *Introduction to Astronomy*-র প্রকাশভঙ্গী অপূর্ব। তারপর জ্যোতিষের ইতিহাস হিসাবেও ইহা অতি মূল্যবান গ্রন্থ। পরবর্তীকালে প্রোক্লাস্-প্রমুখ বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকগণ প্রধানতঃ এই গ্রন্থ অবলম্বনেই তাঁহাদের জ্যোতিষ ও গণিতের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কালসহকারে বহু লোকের সম্পাদনার ফলে জেমিনাসের মূল গ্রন্থের কিছু কিছু অদলবদল এমন কি বিকৃতিও ঘটিয়াছিল। এই পুস্তকের বৈজ্ঞানিক মূল্য সম্বন্ধেও মতদ্বৈধ আছে। পল ট্যানারির মতে, এক্ষণে সংরক্ষিত প্রাচীন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলির মধ্যে জেমিনাসের গ্রন্থ সর্বোৎকৃষ্ট। ওয়েলম্যানের মতে, এই পুস্তক রচনায় জেমিনাস্ শুধু অন্যের গবেষণার উপরই নির্ভর করেন নাই, নিজের অনেক গবেষণার ফলও ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে স্যার টমাস্ হীথ্ *Introduction to Astronomy*-কে জ্যোতিষের প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন।

যাহা হউক, জেমিনাসের জ্যোতিষে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়ের আলোচনা পাই—রাশিচক্র, দ্বাদশ রাশির ক্রমিক স্থান, রাশিদের আকৃতি, অক্ষরেখা ও মরু, খগোল, দিন ও রাত্রি, দ্বাদশ রাশির উদয়-কাল, মাস, চন্দ্রকলা, সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ, ব্রহ্মাণ্ড বা কস্‌মস্-এর গতির বিপরীত দিকে গ্রহদের যে গতি দৃষ্ট হয় তাহার আলোচনা, স্থির নক্ষত্রের বৃত্ত,

পৃথিবীমণ্ডল, নক্ষত্রের অবস্থানের সহিত আবহাওয়ার সম্বন্ধ, যুতিকাল, ইত্যাদি। সর্বশেষে রবিমার্গে সূর্যের অবস্থান-কাল নির্দেশ করিয়া তিনি এক বর্ষপঞ্জীর আলোচনা করেন।*

মেনেলাউস (আনুমানিক খৃঃ অঃ ৯৮)

মেনেলাউসের প্রসিদ্ধি জ্যামিতিতে। তাঁহার লিখিত *Sphaerica* গ্রন্থটি আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। গোলক সম্বন্ধীয় ত্রিভুজ ও ত্রিকোণমিতির বহু প্রতিপাদ্য *Sphaerica*য় আলোচিত হইয়াছে। কিরূপ অবস্থায় দুইটি গোলীয় ত্রিভুজ পরস্পর পরস্পরের সহিত সর্বতোভাবে সমান হয় তাহার আলোচনা ও ত্রিভুজের তিনটি কোণের যোগফল যে দুই সমকোণের অপেক্ষা বৃহত্তর এই প্রতিপাদ্যের প্রমাণ *Sphaerica*য় পাওয়া যায়।

নিকোমেকাস্ (আনুমানিক খৃঃ অঃ ১০০)

খৃষ্টাব্দ প্রথম শতকের শেষ ও দ্বিতীয় শতকের প্রথমভাগে নব্য পিথাগোরীয় নিকোমেকাস্ পাটীগণিত সংক্রান্ত গবেষণার জন্য প্রসিদ্ধ। গ্রীক গণিতীয় গবেষণার ইতিহাসে প্রথম যুগে পিথাগোরাস্ ও পিথাগোরীয় গণিতজ্ঞগণ ও তাঁহাদের পরে আর্কিমিডিস্ পাটীগণিত সম্বন্ধে কিছু কিছু গবেষণা করেন। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রীক প্রাধান্যের কালে জ্যামিতিক গবেষণার মর্যাদা এইরূপ উচ্চ ছিল যে, পাটীগণিত সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন ইহারা কেহই অনুভব করেন নাই। হিপ্সিক্লস্-এর পরে নিকোমেকাসের আবির্ভাব পর্যন্ত দুই শত বৎসরের মধ্যে গ্রীকদের মধ্যে পাটীগণিত-চর্চার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। নিকোমেকাস্ই প্রথম গণিতের এই বিভাগের গবেষণা নূতন করিয়া ও নূতন উদ্যমে সুরু করেন। তৎলিখিত *Introductio Arithmetica* পাটীগণিতের বিখ্যাত ও বহুসমাদৃত গ্রন্থ। তাঁহার সময়ে ও মধ্যযুগে এই গ্রন্থের বহুল প্রচারের প্রমাণ পাওয়া যায়। রোমক গণিতজ্ঞ বোয়েথিয়াস্ মূল গ্রীক পাণ্ডুলিপি হইতে ল্যাটিন ভাষায় *Arithmetica*-র তর্জমা করেন।

জ্যামিতিকে বাদ দিয়া স্বাধীনভাবে পাটীগণিতের আলোচনা এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। নিকোমেকাসের পূর্বে পাটীগণিত এইরূপ মর্যাদা আর কখনও লাভ করে নাই। পিথাগোরাস্ ও পিথাগোরাস-পন্থী গণিতজ্ঞদের সংখ্যা সম্বন্ধীয় গবেষণার বিশদ আলোচনা এই গ্রন্থে আছে। সংখ্যার গুণাগুণ সম্বন্ধে নিকোমেকাস্ নিজেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ও প্রতিপাদ্য আবিষ্কার করেন। তাঁহার এইরূপ একটি প্রতিপাদ্য হইল, ঘন সংখ্যারা (cubical number) সব সময়েই পর পর অযুগ্ম সংখ্যার সমষ্টির সমান। যেমন,

$$৮ = ২^৩ = ৩ + ৫\ ;$$
$$২৭ = ৩^৩ = ৭ + ৯ + ১১\ ;$$
$$৬৪ = ৪^৩ = ১৩ + ১৫ + ১৭ + ১৯$$

প্রতিপাদ্যটি আর একভাবেও প্রকাশ করা যায়। প্রথম হইতে অযুগ্ম সংখ্যাগুলিকে পর পর লিখিলে দাঁড়ায়—১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯......। এখন সহজেই দেখা যায়, প্রথম অযুগ্ম সংখ্যা (১) ১-এর ঘন; তার পরের দুইটি অযুগ্ম সংখ্যার যোগফল (৩+৫) ২-এর ঘন; তার পরের তিনটি অযুগ্ম সংখ্যার যোগফল (৭+৯+১১) ৩-এর ঘন; তার পরের চারিটি অযুগ্ম সংখ্যার যোগফল (১৩+১৫+১৭+১৯) ৪-এর ঘন ইত্যাদি। পরবর্তীকালে ঘন সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ে এই প্রতিপাদ্য বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। বর্গ সম্বন্ধেও তিনি এই জাতীয় কয়েকটি প্রতিপাদ্যের আলোচনা করিয়াছেন।

---

* **Manitius (Ed.),** ***Gemini Elementa Astronomiae*****, Leipzig, 1898.**

নিকোমেকাসের পাটীগণিতে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই সব সমস্যার প্রমাণ বিশ্লেষণমূলক (deductive) জ্যামিতির সাহায্যে সম্ভবপর নহে, তিনি আরোহ-প্রণালী বা inductive method-এর সাহায্যে এইরূপ প্রতিপাদ্যে উপনীত হন। এইরূপ গবেষণায় সংকেত ও সংখ্যার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধ হয়। রেখা-গণিত বা জ্যামিতি এই কার্যে একরূপ অচল। ৫-এর বর্গ, ঘন বা উর্ধ্বতন ঘাত (power) নির্ণয় করিলে যে সংখ্যারই উদ্ভব হউক না কেন তার এককের ঘরে যে সর্বদাই ৫ সংখ্যাটি থাকিবে, জ্যামিতির সাহায্যে ইহা প্রমাণ করা কঠিন। ইহার জন্য সংখ্যার ব্যবহার অপরিহার্য। আরোহ-পাটীগণিতের গবেষণার ফলে ধীরে ধীরে গণিতে সাংকেতিকতা প্রবেশ করে এবং উত্তরকালে ডায়োফ্যাণ্টাস্ প্রমুখ গণিতজ্ঞদের হাতে বীজগণিতের উদ্ভব ও পরিণতি সম্ভবপর হয়। জে. গাও লিখিয়াছেন:

> "Now though geometry was competent to provide this to a certain extent, yet it was useless for precisely those propositions in which Nichomachus takes most interest. The Euclidean symbolism would not show, for instance, that all the powers of 5 end in 5 or that the square numbers are the sums of the series of odd numbers. What was wanted, was a symbolism similar to the ordinary numerical kind, and thus inductive arithmetic led the way to algebra."

নিকোমেকাসের পর হইতে জ্যামিতি অপেক্ষা পাটীগণিতের গবেষণাই অধিকাংশ গ্রীক গণিতজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। থিওন অব্ স্মার্ণা, আয়াম্‌ব্লিকাস্ প্রমুখ গ্রীক গণিতজ্ঞগণ নিকোমেকাসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সংখ্যা সম্বন্ধে নানাবিধ প্রতিপাদ্য প্রস্তাব করেন। আয়াম্‌ব্লিকাসের এক প্রতিপাদ্য বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। বৃহত্তম সংখ্যাটি ৩ দ্বারা বিভাজ্য হয় এইরূপ যে কোন তিনটি ক্রমিক সংখ্যা মনে করা যাক্। এই তিনটি সংখ্যার যোগফল যাহা দাঁড়াইবে তাহার একক, দশক প্রভৃতি ঘরের অংক যোগ দিয়া সেই যোগফলের আবার একক, দশক প্রভৃতি অংকের যোগফল বাহির করা হউক। এইভাবে অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে সর্বশেষ যোগফল সর্বদাই ৬। যেমন, ৯৭, ৯৮ ও ৯৯ তিনটি ক্রমিক সংখ্যা; বৃহত্তম ৯৯ সংখ্যাটি ৩ দ্বারা বিভাজ্য। সংখ্যাত্রয়ের যোগফল ২৯৪; ২, ৯ ও ৪-এর যোগফল ১৫; এবং ১ ও ৫-এর যোগফল ৬। দশমিক স্থানিক অংকপাতন-পদ্ধতিতে এইরূপ অংকের কারসাজি কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। কিন্তু গ্রীকরা তখনও এই পদ্ধতির সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত; বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশ করিতে তাহারা অভ্যস্ত। এরূপ অবস্থায় এজাতীয় আংকিক সমস্যার নির্দেশ দেওয়া সত্যই বিস্ময়কর।

ডায়োফ্যাণ্টাস্ (খ্রীঃ অঃ তৃতীয় শতাব্দী)

সংক্ষিপ্ত জীবনী: ডায়োফ্যাণ্টাস্* আলেকজান্দ্রীয় বিদ্যালয়ের সর্বশেষ প্রতিভাবান গণিতজ্ঞ এবং গ্রেকো-রোমক আমলের সর্বশ্রেষ্ঠ বীজগণিতজ্ঞ। খ্রীঃ অঃ তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাঁহার কার্যকলাপের উল্লেখ পাওয়া যায়। মাইকেল সেলাসের এক বৃত্তান্তে জানা যায় যে, ডায়োফ্যাণ্টাস্ লাওডিসিয়ার বিশপ অ্যানাটোলিয়াসের (২৭০ খ্রীষ্টাব্দ) পরবর্তীকালের লোক নহেন। আবার নিকোমেকাসের (১০০ খ্রীষ্টাব্দ) অথবা স্মার্ণার থিওনের (১৩০ খ্রীষ্টাব্দ) লেখাতেও তাঁহার কোনরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না। আলেকজান্দ্রিয়ার থিওন (৩৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) ও তাঁহার বিদুষী কন্যা হাইপেসিয়া (মৃত্যু ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ) ডায়োফ্যাণ্টাসের গণিতের উল্লেখ ও সমালোচনা করিয়াছেন। ইহাতে এইটুকুই

* *Encyclopaedia Britannica*, 14th Ed. 1947; 'Diophantus' শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়ায় জীবিত ও গাণিতিক গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন। ডায়োফ্যান্টাসের একটি সমাধি-লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি ৮৪ বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। 'জীবনের ১/৬ অংশ তিনি বাল্যাবস্থায় কাটান, ১/১২ যৌবনে এবং ১/৭ বৎসর অকৃতদার অবস্থায়। বিবাহের পাঁচ বৎসর পরে তাঁহার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পুত্র পিতার মৃত্যুর চার বৎসর পূর্বে মারা যায়; তখন তাহার বয়স ছিল পিতার বয়সের অর্ধেক।'* ইহা বিখ্যাত বীজগণিতজ্ঞের উপযুক্ত সমাধি-লিপিই বটে।

রচনাবলী ঃ ডায়োফ্যান্টাসের প্রসিদ্ধি প্রধানতঃ তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Arithmetica*-র উপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রীক ভাষায় লিখিত ১৩ খণ্ডে এই গ্রন্থ সমাপ্ত। মূল গ্রীক পাণ্ডুলিপির ছয়খানির বেশী খণ্ডের সন্ধান এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। *Arithmetica* আরবী ভাষায়ও অনূদিত হইয়াছিল; কিন্তু এই আরবী তর্জমাতেও ছয়টির বেশী খণ্ডের উল্লেখ নাই। ইহাতে মনে হয় যে, বহু পূর্বেই *Arithmetica*-র অন্যান্য খণ্ড লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। *Arithmetica* ছাড়া ডায়োফ্যান্টাস্ *Polygonal Numbers* ও *Porisms* নামে আরও দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। প্রথমোক্তটির সামান্য অংশ এখন পর্যন্ত সংরক্ষিত আছে, শেষোক্তটি সম্পূর্ণরূপে নিখোঁজ হইয়াছে। অনেকের মতে *Porisms* পৃথক কোন গ্রন্থ নহে, *Arithmetica*-রই কোন একটি লুপ্ত খণ্ডের অংশবিশেষ।

বীজগণিত ঃ গ্রীক গণিতজ্ঞেরা জ্যামিতিকেই প্রধান স্থান দিয়াছিল; গণিত বলিতে তাহারা প্রধানতঃ জ্যামিতিকেই বুঝিত। তাই একমাত্র জ্যামিতির সাহায্যেই গণিতের সর্ব বিভাগের সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা গ্রীক গণিতজ্ঞদের বৈশিষ্ট্য। ডায়োফ্যান্টাসের গবেষণায় এই গ্রীক বৈশিষ্ট্যের ব্যতিক্রম একান্ত লক্ষণীয়। তিনি জ্যামিতিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া সাংকেতিক ও গণনামূলক পদ্ধতিতে সমীকরণ, অভেদ (identity) প্রভৃতির সমাধান করেন। বীজগণিতীয় সংকেতের সাহায্যে সমীকরণ লিখিবার ও জ্যামিতিক পদ্ধতির পরিবর্তে শুদ্ধ বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে সমীকরণের সমাধান-নির্ণয়ের ব্যাপারে তিনিই প্রথম পথ-প্রদর্শক। তাঁহার পূর্বে ইউক্লিড জ্যামিতির সাহায্যে

$$a(a+b)=a^2+ab$$
$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$$

প্রভৃতি সরল অভেদের নির্দেশ দিয়াছিলেন। হীরোও কয়েকটি দ্বিঘাত সমীকরণের সমাধান করেন, কিন্তু তাঁহার পদ্ধতি অনেকটা বীজগণিতীয় পদ্ধতির অনুরূপ হইলেও ইহাতে সংকেতের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ডায়োফ্যান্টাসের গ্রন্থে গ্রীক বীজগণিতের যে বিকাশ ও পরিণতি দেখা যায় তাহা হঠাৎ একদিনে কিছু আর গড়িয়া উঠে নাই; এই পরিণতির পশ্চাতে ছোট বড় বহু গণিতজ্ঞের প্রয়াস ছিল। তবে ডায়োফ্যান্টাসের হাতেই যে গ্রীক বীজগণিতের চরম বিকাশ ও পরিণতি ঘটিয়াছিল তাহা নিঃসংকোচে বলা যায়।

বীজগণিতের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারা যাঁহারা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের অভিমত অনুসারে বীজগণিতের ক্রমবিকাশে তিনটি স্তর সুপরিস্ফুট দেখা যায়।†

(১) **আলংকারিক** (Rhetorical)—বীজগণিতের এই অবস্থায় কোনরূপ সংকেতের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না; করণীয় সমস্ত বিষয়টি ভাষায় ব্যক্ত হইয়া থাকে। ডায়োফ্যান্টাসের

---

* F. Cajori, *A History of Mathematics;* p. 60.
† W. T. Sedgwick & H. W. Tyler, *A Short History of Science*, MacMillan, 1918; p. 134.

পূর্বে ও পশ্চিম ইউরোপে অন্ধকার যুগে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বীজগণিতকে আমরা এই স্তরেই সীমাবন্ধ দেখি।

(২) **শব্দ-সংক্ষেপণ** (Syncopation)—পরিপূর্ণ শব্দের পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত শব্দের ব্যবহারের দ্বারা বীজগণিতীয় বিষয়ের অবতারণা ও প্রকাশ এই পর্যায়ের বিশেষত্ব। অর্থাৎ গণিতীয় সমস্যাগুলি মোটামুটি ভাষাতে প্রকাশ করা হইত, তবে সুবিধামত স্থানবিশেষে পূর্ণ শব্দের পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত শব্দ ব্যবহৃত হইত। ডায়োফ্যান্টাস্ এই পদ্ধতিই অনুসরণ করেন।

(৩) **সাঙ্কেতিক** (Symbolical) বা আধুনিক পদ্ধতিতে শব্দের বদলে সংকেতের ব্যবহার।

টমাস হীথ তাঁহার *Diophantus of Alexandria* পুস্তকে শব্দ-সংক্ষেপণ পদ্ধতির অনেক উদাহরণ দিয়াছেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

"এইরূপ প্রস্তাব করা হইতেছে যে, ১৬-কে দুইটি বর্গে ভাগ করিতে হইবে। এইবার প্রথমটিকে $1S$ মনে করিলে দ্বিতীয়টি হইবে $16U-1S$। সুতরাং $16U-1S$ একটি বর্গের সমান হইবে। $16U$-এর বাহুতে যতগুলি U আছে ঠিক ততগুলি U, N-এর যে কোন সংখ্যা হইতে বিয়োগ করিয়া আমি এই বর্গ তৈয়ারী করিতে পারি। ধরা যাক ইহা $2N-4U$। সুতরাং বর্গটি হইবে $4S16U-16N$, ইত্যাদি।"

ডায়োফ্যান্টাস্-উদ্ভাবিত কয়েকটি সংকেত ঃ ডায়োফ্যান্টাসের *Arithmetica*-কে অনেকে বীজগণিতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া মনে করেন।* তাঁহার প্রবর্তিত বীজগণিতীয় সংকেতের সাহায্যে সমীকরণ, অভেদ প্রভৃতি লিখিবার পদ্ধতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

তিনি অজ্ঞাত রাশি, অজ্ঞাত রাশির বর্গ ও ঘন, বিয়োগ ও সমতা প্রভৃতি নির্দেশ করিতে যে সব সংকেত ব্যবহার করিতেন. তাহার নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল—

অজ্ঞাত রাশির সংকেত (x) — ς
অজ্ঞাত রাশির বর্গের সংকেত (x^2) — Δ^Y
অজ্ঞাত রাশির ঘনর সংকেত (x^3) — K^Y
বিয়োগ-নির্দেশক চিহ্ন $(-)$— ⩚
সমতা-নির্দেশক চিহ্ন $(=)$— ι

বীজগণিতীয় রাশিদের সমষ্টি বা বিয়োগ-ফলের সহিত অনুরূপ রাশিদের সমষ্টি বা বিয়োগ-ফলের গুণন, অর্থাৎ $(x+1)$ $(x-2)$-এর গুণফল ডায়োফ্যান্টাস্ জ্যামিতির সাহায্য ছাড়াই নির্ণয় করিতে পারিতেন। তিনি

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$$

এই অভেদ প্রমাণ করেন। গ্রীক গণিতজ্ঞরা জ্যামিতির সাহায্যে অবশ্য বহুপূর্বেই এই জাতীয় সমাধান নির্ণয় করিয়াছিলেন এবং এই ধরনের সমস্যাকে তাঁহারা উচ্চ জ্যামিতির অন্তর্ভুক্তই মনে করিতেন। কিন্তু ডায়োফ্যান্টাস‌ই প্রথম বীজগণিতীয় নিয়মের সাহায্যে ইহাদের সমাধান করেন।

ঋণাত্মক রাশি সম্বন্ধে ডায়োফ্যান্টাসের কোনরূপ ধারণা ছিল না। তিনি দুইটি রাশির বিয়োগ-ফল সব সময় ধনাত্মক মনে করিতেন; অর্থাৎ $a-b=+c$। b যে কখনও a অপেক্ষা বড় হইতে পারে তাহা তিনি ভাবিতে পারিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ইহা হইতে এক অদ্ভুত ও অসম্ভব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

---

* *Encyclopaedia Britannica,* 'Diophantus'.

সমীকরণ-সমাধান ঃ ডায়োফ্যাণ্টাস্ নানাবিধ সমীকরণের সমাধান করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে নির্ণেয় (determinate) একঘাত ও দ্বিঘাত এবং অনির্ণেয় (indeterminate) একঘাত ও দ্বিঘাত সমীকরণ উল্লেখযোগ্য। এই সকল সমীকরণে এক বা একাধিক এমন কি চারিটি পর্যন্ত চল (variable) থাকিত। অমিশ্র সমীকরণ সমাধানকল্পে তিনি এক নিয়মের নির্দেশ দেন। নিয়মটি এইরূপঃ

"যদি কোন প্রশ্ন হইতে এমন একটি সমীকরণের উদ্ভব হয় যাহার দুই দিকে সমঘাত (same powers) কিন্তু অসম গুণকবিশিষ্ট (different co-efficients) রাশি থাকে, তবে সমঘাত রাশিদের একটি হইতে অন্যকে বাদ দিতে হইবে। যদি কোন সমীকরণের এক অথবা উভয় দিকে ঋণাত্মক রাশি থাকে তবে সমতা-চিহ্নের উভয় দিকেই এইরূপ ঋণাত্মক রাশিদের যোগ দিয়া সমীকরণের সমস্ত রাশিকে ধনাত্মক করিতে হইবে। এইভাবে সমস্ত রাশিকে ধনাত্মক রাশিতে পরিণত করা হইলে পূর্ব ব্যবস্থামত সমঘাত রাশিগুলিকে পরস্পর পরস্পর হইতে বাদ দিতে হইবে।"

ডায়োফ্যাণ্টাস্ কোন সমাধানেরই পরিপূর্ণ সমাধান দিতেন না; সমীকরণটি লিখিয়া সংক্ষেপে তাহার উত্তর বসাইতেন। যেমন,

$$84x^2+7x=7$$

এখন সহজেই প্রমাণ করা যায় যে,

$$x=\frac{1}{4}$$

তিনি তিন প্রকার দ্বিঘাত সমীকরণের আলোচনা করিয়াছেন, যথাঃ—

$$ax^2+bx=c$$
$$ax^2=bx+c$$
$$ax^2+c=bx$$

তারপর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি x-এর একটি মাত্র মূল নির্দেশ করিয়াছেন। দ্বিঘাত সমীকরণের যে দুইটি করিয়া মূল হয় তাহা তিনি আদৌ লক্ষ্য করেন নাই; এমন কি যে সব ক্ষেত্রে দুইটি মূলই ধনাত্মক সেই সব ক্ষেত্রও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। তারপর কোন সমীকরণের সমাধান হিসাবে অমূলদ রাশিকে তিনি গ্রহণ করিতেন না। ঋণাত্মক ও অমূলদ রাশির গুরুত্ব গ্রীক গণিতজ্ঞরা কখনই উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

যে কোন সমস্যাকে বীজগণিতীয় সমীকরণে দাঁড় করাইবার ব্যাপারে ডায়োফ্যাণ্টাস্ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। "এমন তিনটি সংখ্যা বাহির কর যাহাতে ইহাদের যে কোন দুইটি সংখ্যার গুণফলের সহিত সেই দুই সংখ্যার যোগফল যোগ করিলে একটি প্রদত্ত সংখ্যা হয়। মনে কর, এই প্রদত্ত সংখ্যাগুলি ৮, ১৫ ও ২৪। সংখ্যা তিনটি কত ?"

আধুনিক সংকেতের সাহায্যে লিখিলে সমস্যাটি দাঁড়ায় এইরূপঃ

$$xy+x+y=8$$
$$yz+y+z=15$$
$$zx+z+x=24$$

বিয়োগ করিয়া অনায়াসে লেখা যায়,

$$x(z-y)+z-y=16$$
$$x+1 = \frac{16}{z-y}$$
$$z+1 = \frac{9}{x-y}$$

ডায়োফ্যাণ্টাস্ নির্ণেয় তিনটি সংখ্যার যে কোন একটিকে মনে করিলেন $a-1$। ইহা হইতে তিনি দেখাইলেন যে, অপর দুইটি সংখ্যা হইবে যথাক্রমে $9/a-1$ ও $16/a-1$। তারপর a-এর মান নির্ণয় করিলেন ১২/৫।

মাত্র একখানি খণ্ডে ডায়োফ্যাণ্টাস্ নির্ণেয় সমীকরণের আলোচনা করিয়াছেন; অন্যান্য খণ্ডগুলির প্রধান আলোচ্য বিষয় অনির্ণেয় দ্বিঘাত সমীকরণ। এই সমীকরণগুলি সাধারণতঃ নিম্ন প্রকারেরঃ—

$$Ax^2+Bx+C=y^2$$

এই ধরনের সমীকরণের অনেক রূপ আছে। তিনি তাহার অনেকগুলির সমাধানে সচেষ্ট হইলেও প্রত্যেকটির সমাধান দিবার চেষ্টা করেন নাই। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যে সকল সমীকরণের মধ্যে দ্বিঘাত অথবা পরম (absolute) রাশিটি থাকে না সেইসব বিশেষ সমীকরণের পূর্ণাঙ্গ সমাধান আমরা ডায়োফ্যাণ্টাসে পাই। অন্যান্য অনির্ণেয় সমীকরণের কোন সুষ্ঠু বা পূর্ণাঙ্গ সমাধান তিনি দেন নাই, অথবা দিলেও তাহা অতিশয় জটিল ও ঘোরালো আকার ধারণ করিয়াছে। তথাপি তিনি বহু অনির্ণেয় সমীকরণের সমাধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অপূর্ব কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন।

ডায়োফ্যাণ্টাসের প্রতিভা ও মৌলিকতা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তিনি কতদূর মৌলিক ছিলেন এবং তাঁহার গবেষণার কতটা অংশ পূর্ববর্তী গ্রীক গণিতজ্ঞদের নিকট হইতে গৃহীত, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তাঁহার বীজগণিতের উপর ব্যাবিলনীয় গণিতের প্রভাব সুস্পষ্ট। সাঙ্কেতিকতার প্রবর্তন করিয়া বীজগণিতের গবেষণায় তিনি যুগান্তর আনিয়াছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য। সমীকরণের একাধিক সমাধান, ঋণাত্মক রাশির অস্তিত্ব প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছিল, ইহা মারাত্মক ত্রুটী সন্দেহ নাই। বহু সমীকরণের অসম্পূর্ণতা ও সমাধানের অযৌক্তিকতা কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভাকে ম্লান করিয়াছে। তেমনি আবার অনির্ণেয় সমীকরণের সমাধান-ব্যাপারে তিনি অত্যাশ্চর্য দক্ষতা দেখাইয়াছেন। সব দিক বিচার করিয়া দেখিলে প্রাচীন কালের অত্যল্পসংখ্যক প্রতিভাবান গণিতজ্ঞদের মধ্যে ডায়োফ্যাণ্টাস্ যে অন্যতম ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্যাপাস্ (আনুমানিক খৃষ্টাব্দ তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দী)

নিকোমেকাস্ ও ডায়োফ্যাণ্টাসের সময় কি তাহারও কিছু পূর্ব হইতে গ্রীক গাণিতিক গবেষণার ধারা জ্যামিতির পথ ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিয়া পাটীগণিত ও বীজগণিতের পথে অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু গণিতের যে বিভাগে গ্রীকরা অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছে এবং যে বিভাগ প্রকৃতপক্ষে তাহাদেরই আবিষ্কার, সেই জ্যামিতির আদর কমিয়াও কমে নাই। গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পতনোন্মুখ যুগেও কয়েকজন প্রতিভাবান জ্যামিতি বিশারদের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আলেকজান্দ্রিয়ার প্যাপাস্ বোধ করি গ্রীক জ্যামিতিক প্রতিভার শেষ নিদর্শন। ইউক্লিড, অ্যাপোলোনিয়াস্ বা আর্কিমিডিসের সহিত প্যাপাস্ ঠিক তুলনীয় নহেন বটে; তবে তিনি নিঃসন্দেহে তাঁহাদের সগোত্র। গণিতের ঐতিহাসিক জেম্‌স্ গাও লিখিয়াছেনঃ—

> "..But among his contemporaries, Pappus is like the peak of Teneriffe in the Atlantic. He looks back from a distance of 500 years, to find his peer in Apollonius."*

প্যাপাসের জন্ম বা মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। তিনি তাঁহার রচনার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্ববর্তী বিজ্ঞানী ও লেখকদের উল্লেখ করিতেন না। এক

* James Gow, *A Short History of Greek Mathematics*, Cambridge, 1884.

টলেমীর বেলায় তিনি বরাবরই খ্রীষ্টাব্দ ১৪০ অব্দের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে প্যাপাসের তারিখ যে টলেমীর পরবর্তী তাহা নিশ্চিতরূপে বলা চলে। ডায়োক্লিটিয়ানের রাজত্বকালে (২৮৫-৩০৫) রচিত এক পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত আছে যে, প্যাপাস্ এই সময়েই অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় শতকের শেষভাগে বা চতুর্থ শতকের প্রথমভাগে আলেকজান্দ্রিয়ায় গাণিতিক গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন।* সুইডাসের মতে প্যাপাস্ ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার থিওনের সমসাময়িক। এই মত সত্য হইলে প্যাপাসের কাল খ্রীষ্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দী দাঁড়ায়।

টলেমীর *Almagest*-এব ও ইউক্লিডের *Elements*-এর উপর তিনি কয়েকটি টীকা রচনা করেন। 'গাণিতিক সংগ্রহ' বা *Mathematical Collections* তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। *Almagest* বা *Elements*-এর উপর টীকা এক্ষণে অবলুপ্ত হইয়াছে। প্রোক্লাসের লেখায় প্রথমোক্ত ও আরবী অনুবাদে শেষোক্ত টীকার কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। *Mathematical Collections*-এর আট খণ্ডের মধ্যে প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডের কিয়দংশ ছাড়া আর সব খণ্ডের সম্পূর্ণ অংশই এপর্যন্ত সংরক্ষিত আছে। আধুনিক কালে ফ্রেডারিক হুল্‌শ্ প্রমুখ পণ্ডিতগণের চেষ্টায় প্যাপাসের এই গাণিতিক সংগ্রহ সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সংগ্রহ শুধু প্যাপাসের নিজস্ব গবেষণার আলোচনার দ্বারাই সমৃদ্ধ নহে; প্রাচীনকালের সমগ্র গণিতের ইতিহাস ও বিবর্তনের ধারাও এই গ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনা অতিশয় প্রণালীবদ্ধ ও ভাষার দিক দিয়াও ইহা অনবদ্য।

অবলুপ্ত প্রথম খণ্ডের আলোচ্য বিষয় ছিল পাটীগণিত, এইরূপ অনুমিত হয়। কারণ, দ্বিতীয় খণ্ডে পাটীগণিতের বহু আলোচনা আছে এবং ইহা সুরু হইয়াছে মধ্যপথে।

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডের প্রধান আলোচ্য বিষয় জ্যামিতি। তৃতীয় খণ্ডে একটি জ্যামিতিক সমস্যার আলোচনা প্রণিধানযোগ্য। সমস্যাটি হইল, দুইটি প্রদত্ত রেখার দুইটি মধ্যক সমানুপাত (two mean proportions between two given lines) নির্ণয় করা। একটি ঘনর দ্বিগুণ আর একটি ঘনর অঙ্কন প্রসঙ্গে হিপোক্রেটিস্ অব্ চিওস্ এইরূপ মধ্যক সমানুপাতের প্রশ্ন লইয়া গবেষণা করিয়াছিলেন। প্যাপাস্ এই প্রশ্নের কয়েকটি সামাধানের নির্দেশ দেন; তন্মধ্যে একটি তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব। মধ্যকের সাধারণ গুণাগুণও এই খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে। দুইটি সরল রেখার অন্তর্বর্তী সমান্তর, গুণোত্তর ও বিপরীত মধ্যক (arithmetic, geometric and harmonic means) এবং এই তিন প্রকার মধ্যককে একই সঙ্গে ও একটি মাত্র জ্যামিতিক অঙ্কনের দ্বারা প্রকাশ করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে প্যাপাস্ আলোচনা করিয়াছেন। পরস্পর পরস্পরের সহিত স্পর্শরত অবস্থায় কিভাবে একাধিক বৃত্ত অঙ্কন করা যায়, তাহা চতুর্থ খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে। যেমন, তিনটি বৃত্ত প্রত্যেকটিকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে; এখন এই তিনটি বৃত্তকে ঘিরিয়া একটি পরিবৃত্ত (circumscribed circle) অঙ্কন করিতে হইবে। গোলকের উপর অঙ্কিত হেলিক্স্ বা পেঁচালো রেখার নানারূপ জ্যামিতিক ধর্ম সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেন। এই পেঁচালো রেখার অঙ্কন-প্রণালী অনেকটা সমতল ক্ষেত্রের উপর অঙ্কিত আর্কিমিডিসের কুণ্ডলিত রেখা বা স্পাইরালের মত। একটি কোণকে সমভাবে ত্রিখণ্ডিত করিবার সুপ্রাচীন ও সুকঠিন প্রশ্নের আলোচনাও এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম খণ্ডে সুষম বহুভুজ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। নানারূপ ঘনর আয়তন নির্ণীত হইয়াছে। এক জায়গায় তিনি ১৩টি বহুতলক ঘনর বর্ণনা দিয়াছেন। এই বহুতলক ঘনর বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের তলগুলি হয় সমবাহু (equilateral) নয় সদৃশকোণ (equi-angular) বহুভুজ হয়, কিন্তু সদৃশ বহুভুজ (similar polygon) হয় না।

---

* ***Encyclopaedia Britannica,*** **14th Ed., 'Pappus'.**

এই ধরনের বহুতলকের সাহায্যে তিনি গোলকের ঘনফল ও উপরিভাগের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করেন।

ষষ্ঠ খণ্ডে কয়েকটি মূল্যবান জ্যোতিষীয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনায় অবশ্য প্যাপাসের নিজস্ব কোন অবদান নাই; ইহা প্রধানতঃ পূর্ববর্তী জ্যোতির্বিদ্‌দের গবেষণা অবলম্বনে রচিত। যেমন সূর্য ও চন্দ্রের দূরত্ব ও আয়তন সম্বন্ধে অ্যারিস্‌টার্কাসের গবেষণা, আলোক ও তাহার প্রবাহ সম্বন্ধে ইউক্লিডের মতবাদ, দিন ও রাত্রি সম্বন্ধে থিয়োডোসিয়াসের বৈজ্ঞানিক বর্ণনা ইত্যাদি বিষয় প্যাপাস্‌ এই খণ্ডে আলোচনা করিয়াছেন। এই জন্য ষষ্ঠ খণ্ডটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব যথেষ্ট।

সপ্তম খণ্ডে জ্যামিতির কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক প্রতিপাদ্যের সমাধান আলোচিত হইয়াছে। প্যাপাসের প্রায় এক হাজার বৎসর পরে পল্‌ গুল্‌ডিন (Guldin) এই প্রতিপাদ্যগুলি নূতন করিয়া আবিষ্কার করেন এবং ভ্রমবশতঃ ইহাদের গুল্‌ডিনের প্রতিপাদ্য বলিয়াই চালানো হয়। প্রকৃতপক্ষে প্যাপাস্‌ই এই জ্যামিতিক প্রতিপাদ্যগুলির আবিষ্কর্তা।

নিউটন ও দেকার্তের কল্যাণে প্যাপাসের আর একটি জ্যামিতিক সম্পাদ্য গণিতের ইতিহাসে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। ইহা ‘প্যাপাসের সম্পাদ্য’ নামে পরিচিত। একটি সমতল ক্ষেত্রের উপর অনেকগুলি সরল রেখা দেওয়া আছে। এখন একটি বিন্দুর সঞ্চার-পথ (locus) এমনভাবে টানিতে হইবে যাহাতে এই বিন্দু হইতে বিভিন্ন সরল রেখার উপর লম্ব অঙ্কিত করিলে কতকগুলি লম্বের গুণফল অবশিষ্ট লম্বের গুণফলের সহিত সর্বদা এক প্রদত্ত অনুপাত রক্ষা করে। সঞ্চার-পথ সংক্রান্ত এই জাতীয় গবেষণার সূত্র ধরিয়া প্যাপাস্‌ অধিবৃত্তের ফোকাস্‌ বা নাভি নির্ণয়ে সমর্থ হন। তারপর নিয়ামক (directrix) ও ফোকাস্‌ হইতে দূরত্বের এক অনুপাত রক্ষা করিয়া একটি বিন্দুর সঞ্চার-পথ রচনা করিলে সেই সঞ্চার-পথই যে কনিক রেখার সৃষ্টি করে, প্যাপাস্‌ এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহা কনিক রেখার এক সাধারণ সংজ্ঞা।

অষ্টম খণ্ডের প্রধান আলোচ্য বিষয় বলবিদ্যা সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন। ভারকেন্দ্রের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এই খণ্ডে আছে।

প্যাপাসের জ্যামিতি ও গণিত সমসময়ের অধিকাংশ গণিতজ্ঞের পক্ষেই দুরূহ ও দুর্বোধ্য ছিল। তাঁহার জ্যামিতি বুঝিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি বা পাণ্ডিত্য সমসাময়িক গণিতজ্ঞদের মধ্যে একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। সেজন্য বহুদিন পর্যন্ত কেহ তাঁহার রচনা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন অনুভব করে নাই। এই আলোচনার অভাবে প্যাপাসের প্রতিভারও যথাযোগ্য সমাদর হইতে পারে নাই। মননশীলতার সাধারণ অবনতির যুগে প্রতিভার এইরূপ দুর্দশাই ঘটিয়া থাকে।

থিওন অব্‌ আলেকজান্দ্রিয়া ও হাইপেসিয়া

প্যাপাসের সমসাময়িক (সুইডাসের মতে) আলেকজান্দ্রিয়ার গণিতজ্ঞ থিওনের প্রসিদ্ধি ইউক্লিড ও টলেমীর টীকাকার হিসাবে। *Almagest*-এর উপর রচিত তাঁহার টীকার মধ্যে বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন আছে। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনা-কার্যে এই সব তথ্য বিশেষ কাজে আসিয়াছে। থিওন পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু প্রতিভাবান ছিলেন না। তাঁহার নিজস্ব কোন মৌলিক গবেষণার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

থিওনের বিদুষী কন্যা হাইপেসিয়া সত্যকার প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন। হাইপেসিয়া প্রাচীন গ্রেকো-রোমক সভ্যতার একমাত্র উল্লেখযোগ্য মহিলা বিজ্ঞানী। অ্যাপোলোনিয়াসের কনিক জ্যামিতি ও ডায়োফ্যাণ্টাসের বীজগণিতের উপর তিনি কয়েকটি সমালোচনা লেখেন। তাঁহার অধিকাংশ রচনাই এখন নিখোঁজ। হাইপেসিয়া শুধু বিদুষীই ছিলেন না তিনি

অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন। এই রূপ ও গুণই তাঁহার কাল হইয়াছিল। এক পৌত্তলিক বিধর্মী গ্রীক মহিলার এত পাণ্ডিত্য ও রূপ ধর্মান্ধ খ্রীষ্টানদের অসহ্য হইয়া উঠে। বিধর্মী হাইপেসিয়ার প্রভাবে খ্রীষ্টধর্ম বিপন্ন এই রব তুলিয়া ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে একদল পাদ্রী তাঁহাকে নির্মম ও অমানুষিকভাবে হত্যা করে। এই জঘন্য হত্যা-কার্যে আর্কবিশপ সেণ্ট সিরিলের প্ররোচনা ছিল, এইরূপ সন্দেহ হয়। এই সেণ্ট সিরিলেরই খুল্লতাত আর্কবিশপ থিয়োফিলাস্—'the perpetual enemy of peace and virtue, a bold bad man, whose hands were alternately polluted with gold and blood'* —৩৯০ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থাগারের এক বিরাট অংশ ধ্বংস করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

বোয়েথিয়াস্ (৪৭৫-৫২৪)

হাইপেসিয়া ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য গণিতজ্ঞ। তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুর পর প্রাচীন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার প্রধান কেন্দ্র আলেকজান্দ্রিয়া হইতে বিদ্যাচর্চার পাট একেবারে উঠিয়া যায়। বিদ্যোৎসাহী অল্প কয়েকজন যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ এথেন্সে কেহ কন্স্তান্তিনোপলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এদিকে রোমক সাম্রাজ্যেরও বড় দুর্দিন। বহু পূর্ব হইতেই নানাদিক দিয়া সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়াছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে ইহা শতধা ভাঙ্গিয়া পড়িল। স্পেন, গল ও উত্তর আফ্রিকার প্রদেশগুলি একে একে বর্বরদের অধিকারে চলিয়া গেল। চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে রোমক সাম্রাজ্য গ্রীকভাষী পূর্ব সাম্রাজ্যে ও ল্যাটিনভাষী পশ্চিম সাম্রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। বর্বররা এই সাম্রাজ্যভাগের সুযোগ গ্রহণ করিতে ছাড়ে নাই। ভিসিগথ্ ও অস্ট্রোগথ্দের আক্রমণে শীঘ্রই পশ্চিম সাম্রাজ্য একেবারে ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ওডোয়াসেরের নেতৃত্বে ভিসিগথ্রা পশ্চিম সাম্রাজ্য দখল করে এবং ইহার অনতি-কালের মধ্যেই অস্ট্রোগথ্ থিয়োডোরিক সমগ্র ইতালী ও সিসিলির সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করে।

আশ্চর্যের কথা এই যে, এই ঘোর রাজনৈতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের কালে ইতালীতে গ্রীক বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি নানা বিদ্যা অধিকতর মনোযোগের সহিত আয়ত্ত ও আলোচনা করিবার এক নূতন স্পৃহা জাগ্রত হয়। রোমক আমলে ইতালীর অধিবাসীরা যে গ্রীক গণিতে চরম পরাঙ্মুখতা প্রদর্শন করিয়াছে পঞ্চম শতাব্দীর এই ঘোর দুর্দিনে সেই গণিতই আমরা দেখিতে পাই শ্রদ্ধার সহিত পঠিত ও আলোচিত হইতেছে। গ্রীক গ্রন্থ অবলম্বনে ল্যাটিন ভাষায় এই সময় বহু পাঠ্য পুস্তক সংকলিত হয়।

বোয়েথিয়াস্ এই সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ রোমক গণিতজ্ঞ। অস্ট্রোগথ্ সম্রাট থিয়োডোরিক প্রথমে বোয়েথিয়াসের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিদ্যাচর্চার নানাবিধ সুবিধা দিয়াছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে, সম্ভবতঃ ঈর্ষাপরায়ণ কোন প্রভাবশালী সভাসদের প্ররোচনায়, ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত ও শেষ পর্যন্ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

বোয়েথিয়াসের বিখ্যাত গ্রন্থ *On the Consolations of Philosophy* তাঁহার কারাবাসকালে রচিত হয়। *Institutis Arithmetica* তাঁহার রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ গাণিতিক গ্রন্থ। প্রাচীন গ্রীক গণিতজ্ঞদের রচনার তুলনায় ইহা একটি সহজপাঠ্য পুস্তক মাত্র। কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ও ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গণিতের গ্রন্থ ইউরোপে আর রচিত হয় নাই *Institutis Arithmetica* প্রধানতঃ নিকোমেকাসের পাটীগণিতের অনুবাদ। জ্যামিতি সম্বন্ধে লিখিত বোয়েথিয়াসের আর একটি গ্রন্থও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে ইউক্লিড-প্রস্তাবিত বহু জ্যামিতিক প্রতিপাদ্য ও সম্পাদ্যের আলোচনা আছে। বোয়েথিয়াস্ কোন প্রতিপাদ্যের বা সম্পাদ্যের প্রমাণ দিবার চেষ্টা করেন নাই। ইহাতে অনেকের

* Gibbon, *Decline and Fall of the Roman Empire,* Chap. 37.

ধারণা হইয়াছে, সম্ভবতঃ তিনি *Elements*-এর কোন অসম্পূর্ণ প্রতিলিপি হাতে পাইয়া থাকিবেন এবং তাহার ভিত্তিতেই এই জ্যামিতি রচনা করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে থিওন কর্তৃক সঙ্কলিত *Elements*-এর এক প্রতিলিপি অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হয়।

গুবার সংখ্যা : বোয়েথিয়াসের জ্যামিতি আর এক কারণে ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। এই গ্রন্থে গুবার সংখ্যার অনুরূপ এক ধরনের সংখ্যার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। পশ্চিমদেশীয় আরবদের মধ্যে এককালে গুবার সংখ্যা প্রচলিত ছিল। এই গুবার সংখ্যার উৎপত্তিও আবার ভারতীয় সংখ্যা হইতে। বোয়েথিয়াস্ কিরূপে এই সংখ্যার কথা অবগত হইয়াছিলেন এবং পঞ্চম শতাব্দীতে ইতালীতে এই অভিনব সংখ্যা-পাতন পদ্ধতি কিরূপে প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহার সন্তোষজনক উত্তর এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। সংখ্যার ইতিহাসে ইহা 'বোয়েথিয়াস্ প্রশ্ন' নামে খ্যাত। এক সময় ঐতিহাসিকদের ধারণা হইয়াছিল, পিথাগোরাস্ সম্ভবতঃ একবার ভারতবর্ষে আসিয়া থাকিবেন এবং ভারতীয় গণিতের সহিত পরিচিত হইবার পর ইউরোপে ফিরিয়া তিনি শিষ্যদের নিকট ভারতীয় অঙ্ক-পাতন পদ্ধতির কথা প্রচার করেন। এইরূপ ধারণা এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। ভারতীয় অঙ্ক-পাতন পদ্ধতির এইরূপ প্রাচীনত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আর একদল ঐতিহাসিকের অভিমত, বোয়েথিয়াসের জ্যামিতির সবটাই নকল; দশম শতাব্দীর পূর্বে এই জ্যামিতি রচিত হয় নাই; ভুল করিয়াই হউক বা ইচ্ছাকৃতই হউক, ইহা বোয়েথিয়াসের নামে চালানো হয়। তাহাদের যুক্তি হইতেছে : (১) গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় জ্যামিতির সহিত সংখ্যার কোন সম্বন্ধ নাই; (২) *Institutis Arithmetica*-তে বা তাঁহার রচিত আর কোন গ্রন্থে সংখ্যার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না; (৩) বোয়েথিয়াসের সমসাময়িক ক্যাপেলার (আনুমানিক ৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) বা তাঁহার রচনাবলীর সহিত সুপরিচিত মধ্যযুগীয় অন্য কোন লেখকের রচনায় বা সমালোচনায় এই সংখ্যার কোন উল্লেখ নাই; (৪) হিন্দু অঙ্ক-পাতন পদ্ধতি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে সংশোধিত ও উন্নীত হয় নাই; সুতরাং বোয়েথিয়াসের সময় বা তাঁহার পূর্বে ইউরোপে ভারতীয় সংখ্যার প্রচলন ঘটিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

উপরিউক্ত যুক্তির অনেকগুলিই অকাট্য তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ভারতীয় অঙ্ক-পাতন পদ্ধতি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর গোড়ার দিক হইতেই বিশেষ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। শূন্যের ব্যবহার তখন হইতেই সুরু হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে পঞ্চম শতাব্দী কি তাহারও পূর্বে ইউরোপে হিন্দু অঙ্ক-পাতন পদ্ধতির প্রবর্তন মোটেই অসম্ভব নহে। সেভেরাস্ সেবক্ত্ (আনুমানিক ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে) লিখিয়াছেন যে, ইউরোপে হিন্দু সংখ্যার প্রচলনের বহু পূর্বে এই পদ্ধতির উচ্চ প্রশংসা ও মাহাত্ম্যের কথা সেখানে পেঁছিয়াছিল।* ভোয়েপ্‌কে বলেন, আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে আলেকজান্দ্রীয়রা হিন্দুদের প্রথম নয়টি সংখ্যার কথা অবগত হয়। আলেকজান্দ্রীয়দের কাছ হইতে পরে পশ্চিমদেশীয় আরবরা এবং সম্ভবতঃ রোমকরা হিন্দু অঙ্ক-পাতন পদ্ধতির কথা জানিয়াছিল। ফ্লোরিয়ান ক্যাজরির অভিমত, ভোয়েপ্‌কের ব্যাখ্যাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।†

৭·৩। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও জীববিদ্যা — ক্যাটো, ভারো, প্লিনি ও ডিওস্কোরিডিস্

কৃষিবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যায় রোমকদের অনেক মূল্যবান গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। কর্মবীর রোমকদের পক্ষে কৃষিবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রভৃতি ফলিতবিদ্যার

* Datta and Singh, *History of Hindu Mathematics,* 1935, Part I; p. 92-93.
† Cajori, *loc. cit;* p. 68.

অনুশীলনে মনোযোগী হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। কৃষি ছিল রোমকদের প্রধান উপজীবিকা এবং রোমক জাতির শ্রীবৃদ্ধির প্রধান উৎস। রোমকরা অসি ও লাঙল সমান দক্ষতার সহিত চালনা করিয়াছে।

মার্কাস্ পোর্সিয়াস্ ক্যাটো (খ্রীঃ পূঃ ২৩৪-১৪৯)

মার্কাস্ পোর্সিয়াস্ ক্যাটো ল্যাটিন ভাষায় লিখিত কৃষিবিদ্যার প্রথম পুস্তক *De re rustica*-র রচয়িতা হিসাবে বিখ্যাত। এই পুস্তকে তিনি ১২০টি উদ্ভিদের নাম ও বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। এতদ্ব্যতীত চিকিৎসকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত কতকগুলি ভেষজের বর্ণনাও ইহাতে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই সব উদ্ভিদ্দের শ্রেণীবিভাগ করিবার কোন চেষ্টা তিনি করেন নাই। কৃষিকার্য, ফল, সবজি ও ফুলের বাগান তৈয়ারীর সুবিধার জন্য এই সব কাজের উপযোগী বিভিন্ন উদ্ভিদের একপ্রকার শ্রেণীবিভাগ তিনি করিয়াছিলেন।

মার্কাস্ টেরেন্টিয়াস্ ভারো (খ্রীঃ পূঃ ১১৬-২৭)

রোমকদের অভ্যুত্থানের প্রথম যুগে কৃষিবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধে মূল্যবান গ্রন্থরাজির প্রণেতা হিসাবে ক্যাটোর পর মার্কাস্ টেরেন্টিয়াস্ ভারোর নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। তিনি বিখ্যাত ল্যাটিনভাষাবিদ্ ষ্টিলোর শিষ্য ছিলেন। ভারো গ্রীক সাহিত্য ও বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ছিলেন; তাঁহার রচনায় প্লেটোর প্রভাব বর্তমান। তবে সাধারণভাবে স্টোইক দর্শনই তাঁহার অধিকাংশ রচনার মূল ভিত্তি।

ভারোর লিখিত গ্রন্থরাজির মধ্যে এপর্যন্ত মাত্র দুইখানি গ্রন্থ *Res rusticae* ও *De lingua latina* সংরক্ষিত আছে। *Res rusticae* তাঁহার বৃদ্ধবয়সের রচনা। কৃষিবিদ্যা, কৃষিকার্যে প্রয়োজনীয় গবাদি পশু, মৌমাছি, মৎস্য ও কয়েক প্রকার বন্যজন্তুর কথা এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহার নিজস্ব পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার কিছু কিছু ফল লিপিবদ্ধ হইলেও বেশীর ভাগ উপকরণই অন্যের গ্রন্থ ও পর্যবেক্ষণ হইতে গৃহীত। *Res rusticae*-তে মৌমাছিদের জীবনযাত্রার এক চমৎকার বর্ণনা আছে। বৈজ্ঞানিক তথ্যের দিক হইতে নূতনত্ব অবশ্য কিছুই নাই; *Historia animalium*-এ মৌমাছি সম্বন্ধে অ্যারিষ্টটলের আলোচনা অপেক্ষা ভারোর আলোচনা নিকৃষ্ট, কিন্তু ভাষার মাধুর্যে ভারোর বর্ণনা অনেক বেশী সুন্দর হইয়াছিল। মৌমাছিদের জীবনচরিত ভার্জিলের কবিমানসকেও আকৃষ্ট করিয়াছিল। ভারোর বর্ণনা অবলম্বনে রচিত মৌমাছি সম্বন্ধে ভার্জিলের কবিতা ল্যাটিন সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি ইতালীতে সেই সময়ে ম্যালেরিয়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। এই রোগের সঠিক কারণ নির্ণয় করিতে না পারিলেও কীট-পতঙ্গেরা যে এই ব্যাধির সংক্রমণের জন্য দায়ী, প্রাচীন রোমকরা এইরূপ বিশ্বাস করিত। এই সম্বন্ধে ভারোর এক মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন, "গৃহাদি নির্মাণ করিবার সময় জলাভূমির সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিবে।...কারণ জলাভূমি শুকাইবার সময় অসংখ্য অদৃশ্য পোকার সৃষ্টি হয়; এই পোকারা মুখের মধ্য দিয়া বা নাসারন্ধ্রপথে নিশ্বাসের সঙ্গে দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সাংঘাতিক রোগ সৃষ্টি করে।"

আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ল্যাটিন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারোর গ্রন্থগুলির প্রতি মনোযোগী হন। ১৩২৩ খ্রীষ্টাব্দে ভেরোনার জনৈক অজ্ঞাতনামা পণ্ডিত ভারোর গ্রন্থগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। পরবর্তী ল্যাটিন লেখক ও বিজ্ঞানীরা ভারোর রচনার সহিত ক্যাটো, কলিউমেলা ও প্যালডিয়াসের কৃষিবিদ্যাবিষয়ক রচনাবলী একত্রিত করিয়া *Scriptores rei rusticae* শীর্ষক কৃষিবিদ্যার এক বিরাট সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রেণেশাঁর সময় এই গ্রন্থ বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। ১৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে *rei rusticae*-র প্রথম খণ্ড ভেনিস হইতে প্রকাশিত হয়।

প্লিনি (খ্রীঃ অঃ ২৩-৭৯)

প্লিনিয়াস্ সিকান্দাস্ বা সংক্ষেপে প্লিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রোমক বিশ্বকোষ-প্রণেতা। ৩৭ খণ্ডে সমাপ্ত তাঁহার *Naturalis Historia* (প্রকৃতির ইতিহাস) বিশ্বকোষ-প্রণয়নের ইতিহাসে একক প্রচেষ্টার সম্ভবতঃ অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের উপর রচিত দুই সহস্রাধিক গ্রন্থ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্লিনি এই বিশ্বকোষ প্রণয়ন করেন। বলা বাহুল্য, ইহা তাঁহার বহু বৎসরের কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও একাগ্র সাধনার ফল। সকল প্রকার প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনা গ্রন্থের উদ্দেশ্য হইলেও বিশ্বকোষের ৩৭টি খণ্ডের মধ্যে ১৬ খণ্ডের আলোচ্য বিষয়বস্তুই হইল কৃষিবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা ও সাধারণভাবে জীববিদ্যা। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও জীববিদ্যার প্রাধান্যের জন্য প্লিনির *Naturalis Historia* রোমকদের আমল হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র মধ্যযুগে এমন কি প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত জীববিদ্যা সংক্রান্ত উন্নততর গবেষণার প্রধান প্রেরণা যোগাইয়াছিল। অধ্যাপক হাওয়ার্ড রীড্ লিখিয়াছেন ঃ—

> "It had a profound influence on the students of biological problems from the time of the Roman Empire through the middle ages and almost to the dawn of the 19th century."*

সংক্ষিপ্ত জীবনীঃ ২৩ খ্রীষ্টাব্দে কোমো নামক স্থানে প্লিনির জন্ম হয়। তাঁহার কর্মময় জীবন নিরবচ্ছিন্ন লেখনীর কার্যে ও নানাবিধ তথ্য-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে ব্যাপক পর্যটনের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি গ্রীস, মিশর ও আফ্রিকা মহাদেশের বহুস্থানে ভ্রমণ করেন। ঐতিহাসিকগণ প্লিনির অসাধারণ শ্রমশীলতা ও অধ্যবসায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। *Naturalis Historia*-র রচয়িতার পক্ষে ইহা অবশ্য অপরিহার্য গুণ। প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার অপরিসীম ঔৎসুক্য ছিল এবং তাঁহার জীবনান্তের কারণও এই ঔৎসুক্য। ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বিসুবিয়াস্ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত পর্যবেক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া বিসুবিয়াসের নিকটবর্তী হইবার ফলে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। কথিত আছে, তিনি সমুদ্রপথে মিসেনাম বা আধুনিক মিসেনোর নিকট দিয়া যাইবার সময় জাহাজ হইতে বিসুবিয়াসের অগ্ন্যুদ্‌গিরণ দেখিতে পাইয়া জাহাজ পম্পাই-এর তীরে ভিড়াইতে আদেশ দেন। বন্ধুদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি উপকূলে অবতরণ করেন এবং তাঁহার সেক্রেটারীকে অগ্ন্যুদ্‌গিরণের প্রত্যক্ষ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিতে বলেন। দেখিতে দেখিতে অগ্ন্যুদ্‌গিরণের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পাইল ভূকম্পন সুরু হইল এবং তীরবর্তী সমুদ্র আলোড়িত হইয়া মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি করিল। চতুর্দিকে পলায়মান ভয়ার্ত নরনারীর কোলাহল। প্লিনি তখনও শান্ত ও নির্বিকার চিত্তে তাঁহার পর্যবেক্ষণের ফল সেক্রেটারীকে বলিয়া চলিয়াছেন। এই বর্ণনা তিনি শেষ করিতে পারেন নাই। বিসুবিয়াসের ভস্মে তাঁহার নশ্বর দেহ সমাধিস্থ হইল।

প্লিনির বিশ্বকোষ Naturalis Historia ঃ *Naturalis Historia*-তে তাঁহার সময় পর্যন্ত অর্জিত সকল প্রকার বিদ্যার কথাই প্লিনি আলোচনা করিয়াছেন। জ্যোতিষের আলোচনার দ্বারা এই বিশ্বকোষের সূচনা। সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ও ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে সর্বপ্রকার তথ্য ও প্রচলিত মতবাদ বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। রহস্যময় জ্যোতিষ্কলোকের আলোচনার পর তিনি পৃথিবীর উৎপত্তি ও গঠন-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন;

* Howard S. Reed, *A Short History of the Plant Sciences*, Chronica Botanica Company, 1942; p. 41.

তারপর পৃথিবী হইতে ভূগোল ও ভূগোল হইতে প্রাণিবিদ্যার অবতারণা করিয়াছেন। নানাবিধ জীবজন্তু, মৎস্য, কীট-পতঙ্গ ও পক্ষী এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। প্রাণিবৃত্তান্তের পর তিনি উদ্ভিদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। এই আলোচনা অতি বিশদ ও বিস্তৃত। এক বৃক্ষ সম্বন্ধেই তিনি চারি খণ্ড গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কৃষি সম্বন্ধে তিনখানি ও ভেষজ সম্বন্ধে নয়খানি গ্রন্থ। বিশ্বকোষের শেষের কয়েকটি খণ্ড খনিজ পদার্থ, ধাতু-নিষ্কাশন পদ্ধতি, রসায়ন ও প্রাচীন চিত্রকলা ও স্থাপত্যের আলোচনায় সমৃদ্ধ।

এক ব্যক্তির পক্ষে, তিনি যত বড় পণ্ডিতই হউন, বৈজ্ঞানিক তথ্য ও মতবাদ সর্বদা অক্ষুণ্ণ ও অবিকৃত রাখিয়া সম্পূর্ণ ত্রুটীহীনভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমগ্র বিভাগের এইরূপ বিশদ আলোচনা সম্ভবপর নহে। এরূপ ক্ষেত্রে ত্রুটী-বিচ্যুতি, অসংলগ্নতা ও স্থানে স্থানে বৈজ্ঞানিক সত্যের অপলাপ ঘটা বিচিত্র নহে। প্লিনির 'প্রকৃতির ইতিহাসে' এইরূপ বহু ত্রুটী-বিচ্যুতি, অসংলগ্নতা, আলোচনার দৈন্য ও বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সত্যের বিকৃতি ঘটিয়াছে। পরবর্তীকালে বহু পণ্ডিত এই সকল ত্রুটী-বিচ্যুতির সমালোচনা করিয়াছেন। বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত ও সমালোচক লিত্রে এই বিশ্বকোষের বহু প্রশংসা করিয়াও অবশেষে মন্তব্য করিয়াছেন যে, সমগ্র রচনায় প্রকৃত বৈজ্ঞানিক অন্তদৃষ্টির একান্ত অভাব। পক্ষান্তরে ফরাসী প্রাণিবিদ্ বুফোঁ এই বিশ্বকোষের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াই শুধু ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার মতে প্লিনি সমগ্র বিষয়ের আলোচনায় এক বৃহৎ ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন। এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই বিজ্ঞানের পথ প্রশস্ত হয়। রচনার মধ্য দিয়া চিন্তাধারার যে স্বাধীনতা ও নিভীকতা প্রকাশ পাইয়াছে বুফোঁ তাহারও উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, এই নিভীকতা ও স্বাধীনতাই দর্শনের উৎস। বুফোঁর এই উক্তি অনেকাংশে সত্য। *Naturalis Historia* বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের নীরস বর্ণনামাত্র নহে। বহু বিষয়ে প্লিনি তাঁহার নিজের মত আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রাচীন মতবাদের সহিত নিজের বিশ্বাসের সংঘর্ষ যেখানে বাধিয়াছে সুকৌশলে রসিকতাচ্ছলে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার একটি উদাহরণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্লিনি লিখিয়াছেনঃ

"মানুষের মধ্যে প্রকৃতির অসম্পূর্ণতার যে পরিচয় আমরা পাই তাহার এক বিশেষ সান্ত্বনা এই যে, স্বয়ং ঈশ্বরও সব কিছু করিতে পারেন না। যেমন, ইচ্ছা করিলেও তিনি আত্মহত্যা করিতে পারেন না; আমাদের নশ্বর জীবনের নানা বিড়ম্বনা হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় স্বরূপ ইহা মানুষের প্রতি ঈশ্বরের সর্বোৎকৃষ্ট দান। তারপর তিনি নশ্বর মানুষকে অমর করিতে পারেন না; মৃতকে সঞ্জীবিত করিতে পারেন না; যে একবার জীবন ধারণ করিয়াছে তিনি এমন করিতে পারেন না যেন সে কখনও জীবন ধারণ করে নাই......। অতীতের উপর একমাত্র বিস্মৃতি আনা ছাড়া তাঁহার আর কোন ক্ষমতা নাই, এবং অপরাধ গ্রহণ না করিলে ঈশ্বরের সহিত মানুষের স্বজাতীয়তার এইরূপ ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত আমি আরও দিতে পারি, যেমন, দশের দ্বিগুণ কুড়ি হইবে না তাঁহার পক্ষে এইরূপ করা অসাধ্য, ইত্যাদি।" (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭)।*

প্লিনির বিশ্বকোষের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি মানুষকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার সমগ্র আলোচনার ধারা নির্ধারণ করিয়াছেন। মানুষই (ঈশ্বর বা কোন দেবতা নহেন) সমস্ত জ্ঞানের আবিষ্কর্তা, এই চরম সত্য তিনি সর্বদা সম্মুখে রাখিয়াছেন। 'প্রকৃতির ইতিহাসের' অর্থ যে প্রাকৃতিক বস্তুনিচয় সম্বন্ধে মানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ধারাবাহিক ইতিহাস, এই সত্য উপলব্ধি তাঁহার বিশ্বকোষে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান। তাই ধাতুর কথা বলিতে গিয়া তিনি মুদ্রা, অঙ্গুরীয়, সরকারী কার্যে ব্যবহৃত

* B. Farrington, *Greek Science*, **Part II, p. 136**-এ প্রদত্ত ইংরেজী তর্জমার বঙ্গানুবাদ।

নানাপ্রকার শীলমোহর প্রভৃতির আলোচনা অবতারণা করিয়াছেন। প্রাণীদের বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়া প্রাণিদেহ হইতে প্রাপ্ত বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক কয়েকটি ঔষধের আলোচনায় তিনি বক্তব্য শেষ করিয়াছেন। প্লিনির পূর্বে কোন কোন গ্রীক বিজ্ঞানী কর্তৃক রচিত প্রকৃতির ইতিহাসেও এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর আভাস পাওয়া যায়। থিওফ্রেস্টাস্ উদ্ভিদ্ ও রসায়নের ইতিহাস রচনা প্রসঙ্গে নানাবিধ শিল্পে কাষ্ঠ ও প্রস্তরের ব্যবহারের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু বিষয়টিকে প্লিনি যেরূপ গুরুত্ব দিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্বে আর কাহারও রচনায় এরূপ পরিলক্ষিত হয় না।

৭৯ হইতে ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্লিনির *Naturalis Historia*-র মাত্র অল্প কয়েকটি পাণ্ডুলিপি সারা ইউরোপে সংরক্ষিত ছিল। মধ্যযুগে প্লিনির রচনাবলীর প্রতি বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে *Historia*-র প্রচার ও চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং সেই সময় ইহার অনেকগুলি প্রতিলিপি সংকলিত হয়। *Historia*-র এইরূপ প্রায় ২০০টি প্রতিলিপি পৃথিবীর বিভিন্ন গ্রন্থাগারে এপর্যন্ত সংরক্ষিত আছে। বিশ্বকোষ প্রণেতাদের সামনে প্লিনি এক অতি উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। বার্থোলোমিউস্, অ্যাংলিকাস্, কনরাড্ প্রমুখ পরবর্তীকালের বিখ্যাত বিশ্বকোষ প্রণেতাগণ প্লিনির আদর্শ অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।

পেন্ডানিওস্ ডিওস্কোরিডিস্ (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী)

প্রাচীন উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানীদের মধ্যে থিওফ্রেস্টাসের পরেই পেন্ডানিওস্ ডিওস্কোরিডিসের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। খ্রীষ্টীয় নবম, দশম ও একাদশ শতাব্দীতে আরব্য উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানীদের এবং মধ্যযুগে ইউরোপীয় উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানীদের মধ্যে ডিওস্কোরিডিসের গ্রন্থাবলী বিশেষ সমাদর লাভ করে। এইরূপ সমাদর ও জনপ্রিয়তা থিওফ্রেস্টাস্‌ও লাভ করিতে পারেন নাই, যদিও বিজ্ঞানী হিসাবে থিওফ্রেস্টাস্ ডিওস্কোরিডিস্ অপেক্ষা অনেক বেশী প্রতিভাবান ছিলেন।

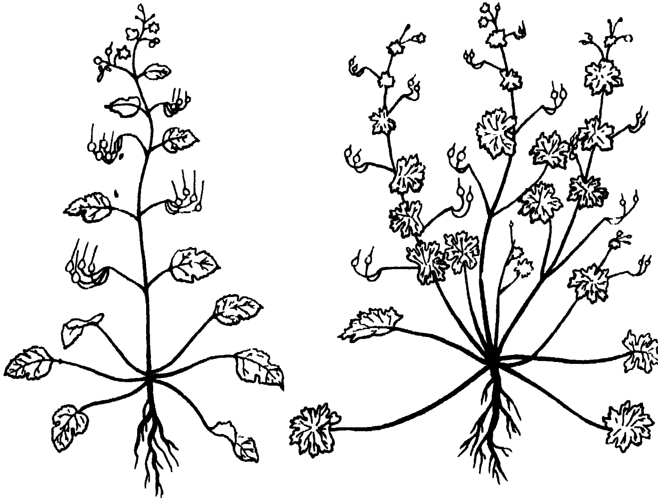
আনাজার্বোসের অধিবাসী ডিওস্কোরিডিস্ ছিলেন সিসিলীয় গ্রীক। তাঁহার জন্ম বা মৃত্যু সন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না; তবে তিনি যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন এইরূপ অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। নীরোর সময়ে রোমক সৈন্যবিভাগে তিনি চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সামরিক বিভাগে কাজ করিবার জন্য তাঁহার দেশভ্রমণের ব্যাপক সুযোগ ঘটিয়াছিল। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে তিনি দীর্ঘকাল গবেষণা করেন এবং নানা রোগে উপকারী বহু উদ্ভিদের গুণাগুণ আবিষ্কার করেন। ভেষজ ও বনৌষধি সংক্রান্ত গবেষণার জন্যই তাঁহার প্রসিদ্ধি।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা : ঔষধ হিসাবে উদ্ভিদের গুণ পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করিতে গিয়া উদ্ভিদের অঙ্গসংস্থান (morphology) সম্বন্ধেও ডিওস্কোরিডিস্ মূল্যবান গবেষণা করিয়াছেন। তিনি উদ্ভিদের মূল, কাণ্ড ও পাতার বহিরাকৃতির ও গঠন-বৈচিত্র্যের নিখুঁত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন; প্রায় ৬০০ বিভিন্ন উদ্ভিদ্ তাঁহার এই বর্ণনার অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি উদ্ভিদের স্থানীয় নাম ব্যবহার করিয়াছেন; সেই সঙ্গে অনেক উদ্ভিদের আবার ল্যাটিন, পিউনিক, মিশরীয়, ডেসিয়ান ও গলিক প্রতিশব্দও প্রদত্ত হইয়াছে।

বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে উদ্ভিদ্‌দের শ্রেণীবিভাগ ব্যাপারে তিনি বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই। মোটামুটিভাবে (১) সুবাসিত, (২) রন্ধনের উপযোগী ও (৩) রোগের ঔষধরূপে ব্যবহার্য, এই তিন শ্রেণীর উদ্ভিদের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। পুষ্পের আকৃতিগত প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া তিনি উদ্ভিদ্‌দের তিন পর্যায়ে সাজাইয়াছিলেন: (১) ছত্রপুষ্পী (ধন্যাক-গোত্র) বা আমবেলিফেরী (umbelliferous) উদ্ভিদ্, (২) শিম্বী বা মটরশুঁটি জাতীয় (leguminous) উদ্ভিদ্; এবং (৩) ওষ্ঠাকার তুলসী-গোত্র বা ল্যাবিয়েটী

(labiateae) উদ্ভিদ্। ডিওস্কোরিডিসের পূর্বে উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানিগণ সমগ্র উদ্ভিদ্-জগতকে বৃক্ষ, গুল্ম ও বীরুৎ এই তিন প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন। এই শ্রেণী-বিভাগই অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত, কারণ সুবাসিত (aromatic) উদ্ভিদ্ বৃক্ষ, গুল্ম অথবা বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের যে কোন একটির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। রন্ধনের উপযোগী (culinary) ও ওষধি-ধর্মা উদ্ভিদের পক্ষেও এই যুক্তি প্রযোজ্য। ডিওস্কোরিডিস্ তাঁহার শ্রেণী-বিভাগের দুর্বলতার কথা অবগত ছিলেন এবং পূর্বগামী উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানীদের উপরিউক্ত শ্রেণী-বিভাগের কথাও জানিতেন। যে কোন কারণেই হউক, শ্রেণী-বিভাগের গুরুত্ব তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই।

ডিওস্কোরিডিস্-প্রণীত ঔষধি-সম্বন্ধীয় গ্রন্থে নানাবিধ উদ্ভিদের সচিত্র বর্ণনা আছে। উদ্ভিদের এই চিত্রগুলি অতি নিপুণ হস্তের আঁকা। সুপ্রাচীন মিশরীয় ও অ্যাসিরীয়দের প্রাধান্যের কালে সমাধি-ফলকে অথবা প্রাসাদ-গাত্রে কয়েকপ্রকার উদ্ভিদের চিত্র খোদিত বা অঙ্কিত দেখা যায় বটে, কিন্তু যতদূর জানা যায়, ইহাই সম্ভবতঃ বনৌষধির সর্বপ্রথম সচিত্র গ্রন্থ। মধ্যযুগে এই গ্রন্থ বনৌষধির প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হইত। ডিওস্কোরিডিসে বর্ণিত অথবা চিত্রিত উদ্ভিদের সহিত না মেলা পর্যন্ত কোন ওষধিকে অকৃত্রিম বলিয়া গণ্য করা হইত না।



১০৪। ডিওস্কোরিডিস্-অঙ্কিত দুইটি উদ্ভিদ্—*Erodium melachoides* ও *Geranium molle;* জুলিয়ানা অ্যানিসিয়ার পাণ্ডুলিপিতে প্রদত্ত।

ডিওস্কোরিডিস্ গ্রীক ভাষায় লিখিতেন। পরে ল্যাটিন ভাষায় তাঁহার গ্রন্থগুলি অনূদিত হয়। এই ল্যাটিন তর্জমার কল্যাণেই তাঁহার গ্রন্থের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও প্রসারলাভ সম্ভবপর হইয়াছিল। বাইজান্‌টাইন সম্রাট ফ্লেভিয়াস্ অ্যানিসিয়াস্ অলিব্রায়াসের বিদুষী কন্যা রাজকুমারী অ্যানিসিয়া জুলিয়ানা (মৃত্যু ৫২৭ খৃষ্টাব্দ) ষষ্ঠ শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় ডিওস্কোরিডিসের ওষধি-সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী অনুবাদ করেন। অনেকের মতে ইহাই ল্যাটিন ভাষায় ডিওস্কোরিডিসের সর্বপ্রথম তর্জমা। দশম শতাব্দীতে (৯৪৯) স্পেনে খলিফা তৃতীয় আবদার রহমানের রাজত্বকালে বাইজান্‌টাইন সম্রাট সপ্তম কন্‌স্তান্তাইন নিকোলাস্ নামক এক পাদরীর মারফত করডোভায় ডিওস্কোরিডিসের বনৌষধির গ্রন্থ উপহার-স্বরূপ

প্রেরণ করেন। এই গ্রন্থ স্পেনের মুসলমানদের উদ্ভিদ্‌বিদ্যার চর্চায় বিশেষভাবে উৎসাহিত করে এবং অনতিকালের মধ্যেই ডিওস্কোরিডিস্‌ আরবী ভাষায় অনূদিত হয়। আরবী ভাষায় এই গ্রন্থের চমৎকার অনুবাদ ও চিত্রগুলির নিখুঁত নকল মুসলমান বিজ্ঞানীদের অপূর্ব ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের পরিচায়ক। ডিওস্কোরিডিসের এই আরবী তর্জমা এককালে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থাগারেই এক অতি মূল্যবান সংগ্রহরূপে পরিগণিত হইত।

রসায়নঃ রসায়নশাস্ত্রেও ডিওস্কোরিডিস্‌ অল্পবিস্তর গবেষণা করেন। তিনি যেসব যৌগিক পদার্থের প্রস্তুতপ্রণালী বর্ণনা করেন তন্মধ্যে হিঙ্গুল (cinnabar) হইতে পারদ নিষ্কাশন, টার্টার (tartar) বা সুরাকিট্ট হইতে যবক্ষার প্রস্তুত ইত্যাদি কয়েকটি প্রণালী উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থের উল্লেখও তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয়, রসায়নেও ডিওস্কোরিডিসের যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল।

৭·৪। চিকিৎসা-বিজ্ঞান—অ্যাস্‌ল্‌পিয়াডিস্‌, ওর্ফিডিয়াস্‌, সেল্‌সাস্‌ ও গ্যালেন

রোমক চিকিৎসা-বিজ্ঞান গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ মাত্র। গ্রীক সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে রোমকদের নিজস্ব চিকিৎসাবিদ্যা বলিয়া যাহা ছিল তাহা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং ইহাতে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির নামগন্ধও ছিল না। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সমগ্র রোমক আমলে ল্যাটিনভাষী জাতিদের মধ্যে একজনও খ্যাতনামা চিকিৎসক বা চিকিৎসা-বিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেন নাই। অ্যাস্‌ল্‌পিয়াডিস্‌, ওর্ফিডিয়াস্‌, সেল্‌সাস্‌, গ্যালেন প্রমুখ যে কয়েকজন প্রথিতযশা চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর নাম রোমক আমলে পাওয়া যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহারা ছিলেন গ্রীক। তবে চিকিৎসাবিদ্যায় ব্যক্তিগতভাবে রোমক প্রতিভার নিদর্শন না থাকিলেও অন্যভাবে রোমকেরা এই বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিল। রোমকেরাই ইউরোপে প্রথম হাসপাতাল ব্যবস্থার উদ্ভাবক। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থারও প্রথম প্রবর্তক রোমক জাতি। এই হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার মধ্য দিয়া রোমকরা চিকিৎসাবিদ্যায় যুগান্তর আনিয়াছিল। চিকিৎসাবিদ্যার বিবর্তনের ইতিহাসে রোমকদের এই অবদান বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ। রোমক জাতির সংগঠন ক্ষমতার ইহা একটি অকাট্য নিদর্শন।

অ্যাস্‌ল্‌পিয়াডিস্‌ (মৃত্যু খ্রীঃ পূঃ ৪০)

বিথিনিয়ার গ্রীক চিকিৎসক অ্যাস্‌ল্‌পিয়াডিসের সময় হইতে রোমে চিকিৎসাবিদ্যার আলোচনা ও অধ্যাপনার সূত্রপাত হয়। অ্যাস্‌ল্‌পিয়াডিস্‌ রোমক কবি ও দার্শনিক লুক্রেটিয়াসের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহার মত এপিকিউরীয় দর্শন বিশ্বাস করিতেন। ইরাসিস্‌ট্রেটাসের অনুকরণে তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় আণবিক মতবাদ প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করেন। রোমে চিকিৎসাবিদ্যা নিয়মিতভাবে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তিনি এক বিদ্যাপীঠ স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেও এই বিদ্যাপীঠ বহুদিন সক্রিয় ছিল।

অ্যাস্‌ল্‌পিয়াডিস্‌ শুধু সুচিকিৎসকই ছিলেন না, সুশিক্ষকও ছিলেন। নানা দেশ হইতে শিক্ষার্থীরা তাঁহার নিকট চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন ও অভ্যাস করিতে আসিত। এই শিষ্যবর্গ পরে কয়েকটি সমিতি ও চতুষ্পাঠী স্থাপন করে। সমিতি বা চতুষ্পাঠীসমূহে চিকিৎসা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আলোচনা ও তর্কের ব্যবস্থা করা হইত। প্রায় অল্পকালের মধ্যেই এই আলোচনা-চক্রগুলি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠে। সম্রাট অগাস্টাসের রাজত্বের (খ্রীঃ পূঃ ২৭-খ্রীঃ অঃ ১৪) শেষের দিকে অথবা সম্রাট টিবেরিয়াসের রাজত্বের (১৪-৩৭) সময় এই সমিতিগুলি মিলিত হইয়া রোমের এস্‌কুইলিন পাহাড়ের উপর একটি নাতিবৃহৎ সভাগৃহ নির্মাণ করে। এই সভাগৃহই রোমক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে Schola

medicorum নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। স্থাপিত হইবার অল্পকালের মধ্যেই Schola medicorum রোমক সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থসাহায্য লাভ করে এবং তাহার ফলে এইখানে নিয়মিতভাবে চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যাপনা ও চর্চা সম্ভবপর হয়। প্রথম প্রথম সভাগৃহের অধ্যাপকেরা ছাত্রদের বেতন হইতেই নিজেদের পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন। সম্রাট ভেস্‌পাসিয়ান (৭০-৯) সর্বপ্রথম রাজকোষ হইতে এইসব অধ্যাপকদের মাসহারার বন্দোবস্ত করেন এবং পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থাই স্থায়ী হইয়া দাঁড়ায়।

এইরূপে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রোম চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যয়ন ও চর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। অল্পকালের মধ্যে ইতালীর অন্যান্য সহর রোমের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া চিকিৎসাবিদ্যার এইরূপ আলোচনা-চক্র বা সমিতি স্থাপন করে। ক্রমে ইতালীর বাহিরে মার্সেই, বর্দো, আর্ল, নিম্‌, লিয়োঁ, সারাগোসা প্রভৃতি স্থানে এই ধরনের শিক্ষাকেন্দ্র ও আলোচনা-চক্র গড়িয়া উঠে। এইসব কেন্দ্রে প্রধানতঃ ব্যবহারিক চিকিৎসাবিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া হইত। সৈন্যবাহিনীতে চিকিৎসক হিসাবে যোগদানে অভিলাষী ব্যক্তিরা এই কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা ও অভ্যাস করিতে আসিত এবং সেই দিক দিয়া এই প্রতিষ্ঠানগুলি সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনীর এক বিরাট প্রয়োজন মিটাইতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষণার দিক হইতে এই ধরনের কেন্দ্র অবশ্য ফলপ্রসূ হয় নাই।

ওফিডিয়াস্‌

সিসিলীয় গ্রীক টাইটাস্‌ ওফিডিয়াস্‌ ছিলেন অ্যাস্‌ল্‌পিয়াডিসের ছাত্র। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা সম্বন্ধে ফারিংটন লিখিয়াছেন—'Aufidius, however, had genius of a rare quality।'* তাঁহার প্রতিভার কথা বহুদিন পর্যন্ত ঐতিহাসিকদের নিকট অজ্ঞাত ছিল। বিখ্যাত রোমক চিকিৎসক ও গ্রন্থকার সেল্‌সাসের গ্রন্থাবলী বিচার ও সমালোচনা করিতে যাইয়া দেখা গিয়াছে যে, সেল্‌সাস্‌ নিজেই তাঁহার রচনা ও গ্রন্থাবলীর জন্য বহুলাংশে ওফিডিয়াসের নিকট ঋণী। ওফিডিয়াস্‌ সুচিকিৎসক ছিলেন; তিনি রোগ অপেক্ষা রোগীর অবস্থা বিশেষ মনোযোগের সহিত অনুধাবন করিতেন। প্রত্যেক রোগীর ক্ষেত্রে চিকিৎসা-ব্যবস্থা যে স্বতন্ত্র হওয়া উচিত এবং চিকিৎসা-ব্যাপারে সার্বজনীনতা যে বিশেষ ক্ষতিকর, এই মত তিনি দৃঢ়ভাবে প্রচার করিতেন। রোগীর পথ্য ও তাহার যথাযথ প্রয়োগের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন,—'উপযুক্ত সময়ে রোগীকে খাদ্য দিতে পারিলে ইহা অপেক্ষা উত্তম ঔষধ আর হয় না। অনেক প্রাচীন চিকিৎসকের মতে পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ দিবসের পূর্বে রোগীকে পথ্য দেওয়া উচিত নয়। অ্যাস্‌ল্‌পিয়াডিস্‌ রোগীকে তিন দিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ অনাহারে রাখিয়া চতুর্থ দিন তাহার পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন।......এই সব কোন নিয়মই সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নহে। প্রয়োজনমত প্রথম, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দিনে পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। আবার প্রয়োজনমত চতুর্থ বা পঞ্চম দিবস পর্যন্ত পথ্য বন্ধ রাখাও যাইতে পারে।......পথ্য কখন দিতে হইবে তাহা নির্ভর করিবে রোগের স্বরূপ, দেহের অবস্থা, আবহাওয়ার অবস্থা, রোগীর বয়স ও ঋতু প্রভৃতির উপর।' ওফিডিয়াসের আর একটি মত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। চিকিৎসকের খুব ঘন ঘন রোগীকে পরীক্ষা ও তত্ত্বাবধান করা উচিত। এই জন্য একাধিক চিকিৎসকের উপর রোগীর চিকিৎসার ভার অর্পণ করা অনুচিত।

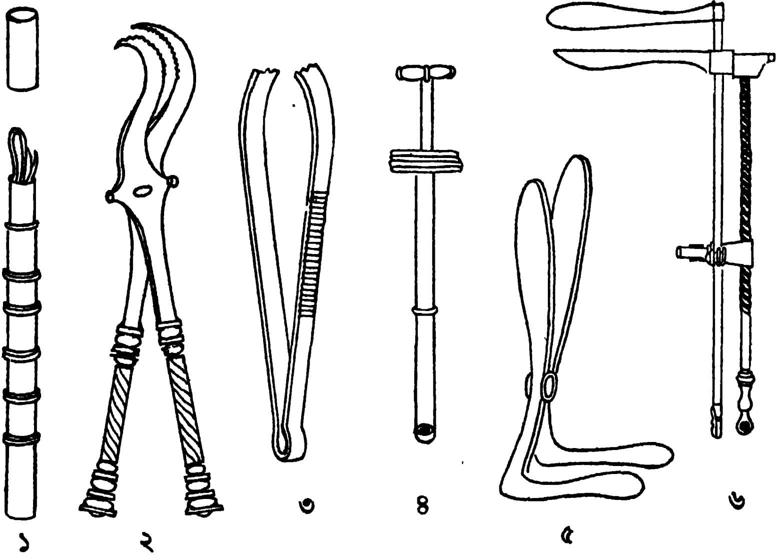
সেল্‌সাস্‌ (খ্রীঃ অঃ প্রথম শতাব্দী)

সেল্‌সাস্‌ খ্রীঃ অঃ প্রথম শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের

* B. Farrington, *Greek Science*, Part II; Pelican, p. 128.

গ্রন্থকার। টিবেরিয়াসের রাজত্বকালে চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যা সম্বন্ধে ল্যাটিন ভাষায় তিনি এক বিরাট গ্রন্থ *De re medica* রচনা করেন (আনুমানিক ৩০ খ্রীষ্টাব্দ)। এই গ্রন্থের প্রথম অংশে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। সেল্‌সাসের সময় পর্যন্ত প্রাচীন গ্রীক ও গ্রেকো-রোমক চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাস জানিবার পক্ষে ইহাই একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ। গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশে নানাবিধ রোগ, তাহাদের কারণ, পথ্য ও ঔষধ ও সর্বশেষে শল্যচিকিৎসা সম্বন্ধে নানা তথ্যের সমাবেশ ও আলোচনা করা হইয়াছে।

De re medica সেল্‌সাসের মৌলিক রচনা নহে; ইহা প্রায় পুরাপুরি পূর্ববর্তী গ্রীক চিকিৎসকদের গ্রন্থ ও রচনাবলী হইতে গৃহীত। এই সংগ্রহের কাজে, কাহারও কাহারও মতে, তিনি ওফিডিয়াসের কাছে ঋণী; অবশ্য তিনি ওফিডিয়াসের নাম কদাচিৎ উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষার প্রাঞ্জলতা ও রচনামাধুর্যের জন্য প্রাচীন গ্রন্থকারদের মধ্যে সেল্‌সাস্ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। মুদ্রণ আবিষ্কৃত হইলে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে *De re medica*-ই প্রথম মুদ্রিত হয় ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে।



১০৫। পম্পাই-এ প্রাপ্ত রোমক আমলের শল্য-চিকিৎসার যন্ত্রপাতি। (১) ধারাল ছুরি, চামচ প্রভৃতি রাখিবার উপযোগী ছোট পকেট-কেস্; (২) দন্ত উৎপাটনের জন্য সাঁড়াশি; (৩) সূক্ষ্ম দন্ত-বিশিষ্ট সাঁড়াশি; (৪) উদরে অথবা অণ্ডকোষাদির গহ্বরে জল সঞ্চিত হইলে তাহা নিষ্কাশন করিবার চুঙ্গী (Trocar ও Cannula); (৫) দেহের রন্ধ্র-স্থান প্রসারণ ও পরীক্ষার জন্য স্পেকুলাম-যন্ত্র; (৬) পরীক্ষার সুবিধার্থ ক্ষতস্থান সম্প্রসারণ-যন্ত্র।

De re medica-র শল্য-চিকিৎসা সংক্রান্ত আলোচনাগুলি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। বহু দুরূহ অস্ত্রোপচার ক্রিয়ার বিশদ বর্ণনা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ গলগণ্ডের অস্ত্রোপচার, টনসিল অস্ত্রোপচার, মুখের অভ্যন্তরস্থ বা মুখমণ্ডলের বিকৃতি দূর করিবার উদ্দেশ্যে অস্ত্রোপচার, অর্থাৎ

আধুনিক ভাষায় প্লাস্টিক সার্জারি, অস্ত্রোপচারের সাহায্যে নাসারন্ধ্রের ঝিল্লী বহিষ্কার করা ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। দন্তরোগ ও দন্ত সম্বন্ধীয় শল্য-চিকিৎসারও আলোচনা আছে। তাঁহার সময়ে শল্য-চিকিৎসায় কি ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইত সেল্‌সাস্‌ তাহার বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন। এই সব যন্ত্রপাতির কিছু কিছু নমুনা পম্পাই-এর ধ্বংসস্তূপ খনন করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আবিষ্কার করিয়াছেন; চিত্রে এইরূপ কয়েকটি নমুনা প্রদর্শিত হইল।

গ্যালেন (১৩০-২০০)

প্রাচীন চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মধ্যে হিপোক্রেটিসের পরেই পার্গামামের অধিবাসী গ্যালেনের আসন। জ্যোতিষ ও ভূগোলের ইতিহাসে ক্লডিয়াস্‌ টলেমীর যে স্থান, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে ক্লডিয়াস্‌ গ্যালেনও অনুরূপ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। এই দুই প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর গবেষণার ধারায়ও প্রচুর মিল আছে। কোপার্নিকাস্‌, টাইকো ব্রাহে, কেপ্‌লার প্রভৃতি রেণেশাঁয় বিজ্ঞানীরা যেমন টলেমীর জ্যোতিষের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা এই বিদ্যার অন্তর্নিহিত ভুল-ভ্রান্তি সম্বন্ধে অবহিত হইয়া জ্যোতিষ ও ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে নূতন পরিকল্পনার সন্ধান দিলেন, ভেসালিয়াস্‌, হার্ভি প্রমুখ রেণেশাঁয় চিকিৎসাবিজ্ঞানীরাও তেমনি গ্যালেনের অ্যানাটমি ও শারীরবৃত্তের নানা ভুল-ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি প্রদর্শন করিয়া সমগ্র শারীরবৃত্তের রূপ ও ধারা বদলাইয়া দিয়াছিলেন। টলেমী ও গ্যালেন উভয়েরই কর্মময় জীবন খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে নিবদ্ধ। উভয়েই নিজ নিজ শাস্ত্র সম্বন্ধে পূর্ববর্তী বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও মতবাদ স্বীয় গবেষণা, দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারার কষ্টিপাথরে বিচার করিয়া সেই সেই শাস্ত্রের অপূর্ব সমন্বয় সাধনের দ্বারা যে মতবাদ প্রচার করেন, পরবর্তী প্রায় দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে আর কোন বিজ্ঞানী তাহা খণ্ডন করিতে সমর্থ হন নাই। এই দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে প্রত্যেকেরই ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছিল যে, জ্যোতিষে টলেমী এবং শারীরবৃত্ত ও অ্যানাটমিতে গ্যালেন যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাই হইল শেষ কথা।

সংক্ষিপ্ত জীবনী: ১৩০ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়া মাইনরের পার্গামামে গ্যালেনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন স্থপতি ও গণিতজ্ঞ। অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। স্মার্ণা, কোরিন্থ, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি স্থানে তিনি এই বিদ্যা অতীব যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত আয়ত্ত করেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থানকালে তিনি একবার একটি নরকঙ্কাল পরীক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। মানবদেহের আভ্যন্তরীণ কাঠামোর সহিত ইহাই তাঁহার প্রথম ও শেষ প্রত্যক্ষ পরিচয়; কারণ নরদেহ ব্যবচ্ছেদ তাঁহার সময়ে নিষিদ্ধ ছিল। হিরোফিলাস্‌ ও ইরাসিস্‌ট্রেটাসের আমলে আলেকজান্দ্রিয়াতে নরদেহ ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল। খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতেও এইরূপ ব্যবচ্ছেদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সম্বন্ধে জনমত ক্রমশঃ কঠিন ও তীব্র হওয়ায় নরদেহ ব্যবচ্ছেদ ধীরে ধীরে নিষিদ্ধ হইয়া যায়। এই জন্য অ্যানাটমি ও শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে গ্যালেন যে মতবাদ পোষণ ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রধানতঃ প্রাণিদেহ ব্যবচ্ছেদের অভিজ্ঞতাপ্রসূত।

কর্মজীবনের প্রারম্ভে গ্যালেন পার্গামামে গ্ল্যাডিয়েটর বা মল্লযোদ্ধাদের শল্য-চিকিৎসকের পদে চারি বৎসর অতিবাহিত করেন। তখনকার দিনে প্রদেশের উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রেই ভাগ্যান্বেষণের জন্য রোমে আসিয়া বসবাস করিত। গ্যালেনও রোমে আসিয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং অনতিকালের মধ্যে রোমের শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসকরূপে পরিগণিত হন। সম্রাট মার্কাস্‌ অরেলিয়াস্‌ গ্যালেনের পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসা-ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রাজচিকিৎসকের পদে নিযুক্ত করেন। জার্মানদের বিরুদ্ধে এক অভিযানে গ্যালেন মার্কাসের সঙ্গী হইয়াছিলেন। রাজচিকিৎসকের গুরু দায়িত্ব ও অবসরহীন

জীবনের মধ্যেই তিনি সময় করিয়া গবেষণা করিয়াছেন, প্রাণিদেহ ব্যবচ্ছেদ এবং বিশ্বকোষের মত গ্রন্থরাজিও রচনা করিয়া গিয়াছেন।

গ্যালেনের রচনার মধ্যে এপর্যন্ত একশতটি গ্রন্থ সংরক্ষিত হইয়াছে। ১৮২১-৩১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কুন গ্যালেনের সমগ্র রচনাবলী সংকলিত করিয়া প্রকাশ করেন। কুড়িটি বৃহৎ খণ্ডে এই সংকলন সমাপ্ত। যে সব রচনা ও গ্রন্থ নিঃসন্দেহে গ্যালেনের লেখনীপ্রসূত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, কেবলমাত্র তাহাই এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে গ্যালেন ইহা অপেক্ষা যে অনেক বেশী লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

তাঁহার গবেষণাকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে : (১) শারীরস্থান বা অ্যানাটমি সংক্রান্ত ও (২) শারীরবৃত্ত সংক্রান্ত গবেষণা।

শারীরস্থান : অ্যানাটমি সম্বন্ধীয় গবেষণার মধ্যে প্রথমে অস্থির কথা ধরা যাক। আলেকজান্দ্রিয়ায় নরকংকাল পরীক্ষা করিবার পর হইতে মানবদেহের অস্থি-সংস্থান সম্বন্ধে তাঁহার কৌতূহল প্রথম জাগ্রত হয়। অস্থিগুলি তিনি দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করেন—(১) অভ্যন্তরে বরাবর নলবিশিষ্ট লম্বা অস্থি ও (২) নলবিহীন চ্যাপ্টা অস্থি। তিনি ২৪টি কশেরুকা বা ভার্টিব্রা চিহ্নিত করিয়া সেগুলির এক নির্ভুল বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন; পঞ্জরাস্থি, উরঃফলক, কণ্ঠাস্থি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্থির বর্ণনাও তিনি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে সন্ধি ও সন্ধি-বন্ধনীগুলি দুই প্রকার—গতিবিশিষ্ট ও গতিহীন। এইসব অস্থি ও সন্ধির তিনি যে নামকরণ করেন, অধিকাংশক্ষেত্রে এখনও সেই সব নামই প্রচলিত আছে। *On the Bones* নামক পুস্তকে অস্থির কথা আলোচিত হইয়াছে।

মাংসপেশীর বর্ণনায় ও শ্রেণী-বিভাগে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এই বিষয়ে তিনিই সকলের অগ্রণী। মাংসপেশীর গবেষণা সম্পর্কে গ্যালেন *Macacus inuus* নামে একজাতীয় বানরের দেহ ব্যবচ্ছেদ করেন। এই বানরের সহিত মানুষের দেহের অনেক বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে; সুতরাং *Macacus* বানরের দেহ-ব্যবচ্ছেদ হইতে মাংসপেশী সম্বন্ধে যে সব তথ্য জানা যাইবে তাহা যে মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে, এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া গ্যালেন এই জাতীয় বানরকে তাঁহার গবেষণার কাজে বাছিয়া লন। এই বিষয়ে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি যে কিরূপ নির্ভুল ছিল তাহা চিত্রে প্রদত্ত মানুষ ও *Macacus* বানরের হাতের পাতার মাংসপেশীগুলির সাদৃশ্য হইতেই প্রমাণিত হইবে। প্রাণিদেহব্যবচ্ছেদের অভিজ্ঞতা হইতে মানবদেহের মাংসপেশীর গঠন-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া গ্যালেন অনেক ক্ষেত্রেই পাঠককে সতর্ক করিয়াছেন যে, তাঁহার এই বর্ণনা মানুষের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য হইবে না।

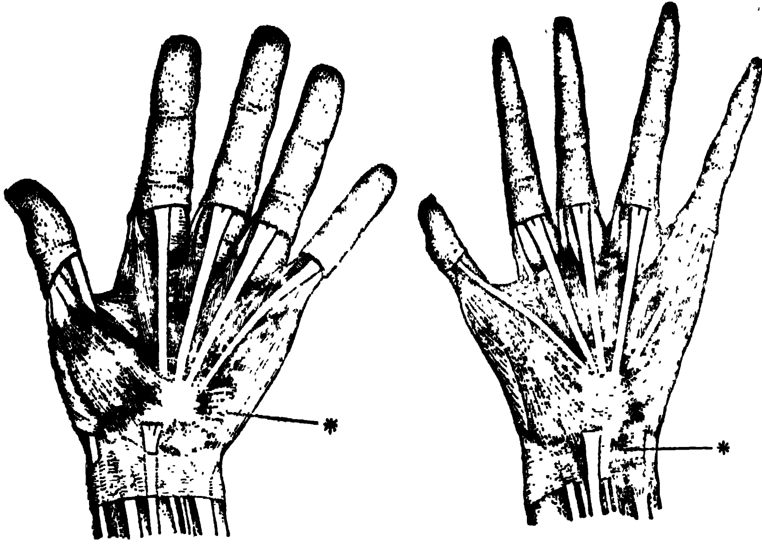
গ্যালেন মস্তিষ্ক ও রক্তবহা নাড়ীসমূহের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। অবশ্য অস্থি ও মাংসপেশী সংক্রান্ত গবেষণা ও বর্ণনার তুলনায় মস্তিষ্ক ও নাড়ীসমূহের বর্ণনা তাঁহার অনেক নিকৃষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, গ্যালেনের এইরূপ গবেষণার ফলে অ্যানাটমি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। নরদেহ ব্যবচ্ছেদের সুযোগ পাইলে তাঁহার রচনায় মাঝে মাঝে যে দৈন্য ও অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তাহা হয়ত সংশোধিত হইতে পারিত। কিন্তু অনিবার্য কারণে তাহা সম্ভব হয় নাই। গ্যালেনের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়াই ষোড়শ শতাব্দীতে ভেসালিয়াস্ (১৫১৪-৬৪) নরদেহ ব্যবচ্ছেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে গ্যালেনের ত্রুটী-বিচ্যুতি প্রথম ধরিতে সমর্থ হন।

নার্ভ-তন্ত্র সম্বন্ধে গ্যালেনের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মেরুরজ্জু বা সুষুম্নাকাণ্ড সম্বন্ধে কয়েকটি পরীক্ষার দ্বারা তিনি লক্ষ্য করেন যে, প্রথম ও দ্বিতীয় কশেরুকার মধ্যবর্তী মেরুরজ্জুতে আঘাত লাগিলে শ্বাসরোধ ঘটে এবং ষষ্ঠ কশেরুকা ও তার নিম্নবর্তী রজ্জু আঘাতপ্রাপ্ত হইলে বক্ষদেশের মাংসপেশীসমূহ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়। আরও নিম্নদেশে সংঘটিত হইলে এই আঘাত মূত্রাশয়, অন্ত্র ও নিম্নদিকের প্রত্যঙ্গ-



ক্লডিয়াস্ গ্যালেন (১৩০-২০০)

সমূহে পক্ষাঘাতের কারণ হয়। এইভাবে প্রায় সমগ্র মেরুরজ্জুর জৈবক্রিয়ার বিষয় তিনি বিশদভাবে ও অতীব দক্ষতার সহিত গবেষণা ও বর্ণনা করেন।



১০৬। মানুষ ও *Macacus* বানরের হাতের পাতার মাংসপেশীর ছবি।

শারীরবৃত্ত ঃ গ্যালেন কর্তৃক প্রস্তাবিত বিখ্যাত শারীরবৃত্ত এইবার আলোচনা করিব। শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ দেড় হাজার বৎসর পর্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে চিকিৎসা-জগতে আধিপত্য করিয়াছে। এই মতবাদ আংশিকভাবে পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ও আংশিকভাবে প্রচলিত সৃষ্টিতত্ত্ব ও দার্শনিক মতবাদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া রচিত। গ্যালেনের বহু পূর্ব হইতে জীবজগতকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছিল—উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ। উদ্ভিদের ধর্ম বৃদ্ধি, প্রাণীর ধর্ম বৃদ্ধি ও গতি এবং মানুষের ধর্ম বৃদ্ধি, গতি ও মননশক্তি। স্টোইক দার্শনিকেরা প্রচার করিতেন যে, কস্‌মস্‌-জাত নিউমা (pneuma) বা বায়ু উপরিউক্ত তিন প্রকার জৈবধর্মের জন্য দায়ী; এই নিউমাই জীবনীশক্তির মূল উৎস। নিউমার যে রূপান্তরের ফলে জৈবধর্মের বৃদ্ধি সম্ভব হয় তাহার নাম Natural Spirit বা স্বাভাবিক শক্তি। নিউমার আর এক রূপান্তরের ফলে প্রাণীরা গতিশীল হয়। রূপান্তরিত সেই নিউমার নাম Vital Spirit বা জীবনী শক্তি। নিউমা আবার Animal Spirit বা চিৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হইলে সেই চিৎ শক্তির প্রভাবে জীবেরা মননশক্তির অধিকারী হয়।

জৈবধর্ম সম্বন্ধে স্টোইকদের এই নিউমাবাদে গ্যালেন বিশ্বাসী ছিলেন। এই মতবাদের সহিত দেহের আভ্যন্তরীণ গঠন-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানের সামঞ্জস্য ঘটাইয়া গ্যালেন সুকৌশলে এক অতি মৌলিক পরিকল্পনা দাঁড় করাইলেন। পরিকল্পনাটি হইতেছে এইরূপ। দেহাভ্যন্তরস্থ পরিপাকতন্ত্র, যকৃৎ, শ্বাসতন্ত্র, নার্ভতন্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন তন্ত্রের জৈবক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য হইল নিউমাকে স্বাভাবিক শক্তি, জীবনী শক্তি ও চিৎ শক্তিতে পরিণত করা। যকৃতে এই নিউমা স্বাভাবিক শক্তিরূপে, হৃৎপিণ্ডে জীবনী শক্তিরূপে এবং মস্তিষ্কে চিৎ শক্তিরূপে বিরাজ করে। বিভিন্ন পর্যায়ে রক্ত এই ত্রিবিধ শক্তি অর্জন করিয়া এবং দেহের সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়া মানুষের বৃদ্ধি, পুষ্টি, গতি ও মননশীলতা

সম্ভব করিয়া থাকে। খাদ্যের সারবস্তু অন্ত্র হইতে যকৃতে প্রবেশ করিয়া তথায় প্রথমতঃ রক্তে পরিণত হয় (১০৭নং চিত্র)। এই রক্ত আবার যকৃৎস্থিত স্বাভাবিক শক্তির সংস্পর্শে আসিয়া দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধিসাধন করিবার গুণ অর্জন করে। যকৃতে উৎপন্ন রক্তের কিয়দংশ এইবার হৃৎপিণ্ডের অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণ নিলয়ে প্রবেশ করে এবং এইখানে তাহার

১০৭। গ্যালেনের প্রস্তাবিত শোণিত-সঞ্চালন ও শারীরবৃত্ত সম্বন্ধীয় ক্রিয়া পদ্ধতি।

দূষিত পদার্থ ফুস্‌ফুসীয় ধমনীপথে ত্যাগ করিয়া শোধিত হয়। রক্তের দূষিত পদার্থ ফুস্‌ফুসীয় ধমনী হইতে ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া পরে শ্বাসনালীপথে প্রশ্বাসের সঙ্গে বাহিরে নির্গত হয়। এইভাবে শোধিত হইবার পর শিরাগুলির মধ্যে রক্ত ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়। শিরার রক্তের সবটুকুই শিরার মধ্যে থাকিয়া যায় না; ইহার এক ক্ষুদ্র অংশ হৃৎপিণ্ডের দুই নিলয়ের অন্তর্বর্তী সেপ্‌টাম মাংসপেশীর অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অদৃশ্য ছিদ্রপথে দক্ষিণ নিলয় হইতে বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। হৃৎপিণ্ডের এই বাম নিলয়ে জীবনী শক্তিরূপে নিউমা বিদ্যমান। নিশ্বাসের সহিত গৃহীত বায়ু বা নিউমা শ্বাসনালী হইতে ফুস্‌ফুস্‌ ও ফুস্‌ফুসীয় শিরার মধ্য দিয়া হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয়ে প্রবেশ করিয়া সেইখানে জীবনী শক্তিতে পর্যবসিত হয়। রক্ত দক্ষিণ নিলয় হইতে বাম নিলয়ে প্রবেশ করিবার পর Vital Spirit

বা জীবনী শক্তির স্পর্শে নূতন গুণের অধিকারী হইলে জীবনী শক্তিসম্পন্ন উৎকৃষ্ট রক্ত ধমনীর মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া বিভিন্ন দেহাংশকে ক্রিয়াশীল রাখে। ধমনীতে প্রবাহিত রক্তের কিয়দংশ আবার মহাধমনী-পথে মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া মস্তিষ্কস্থ চিৎ শক্তি অর্জন করে। মস্তিষ্কে রক্তকে চিৎ শক্তির গুণ অর্জন করিতে রেট্ মিরাবাইল (rete mirabile) নামে একপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবহা নালীর জাল বিশেষভাবে সাহায্য করে। চিৎ শক্তিসম্পন্ন এই সর্বোৎকৃষ্ট রক্ত নার্ভের মধ্যস্থতায় দেহের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতি ও অনুভূতির সৃষ্টি করে।

এইভাবে গ্যালেন জৈবক্রিয়ার এক অতি সুন্দর ও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এই ব্যাখ্যা অ্যানাটমি ও শারীরবৃত্ত সংক্রান্ত পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ বহু তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তদুপরি এই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গ্যালেন যে দর্শনের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার সত্যতা ও অকাট্যতা যুগে যুগে বহু জ্ঞানী ও চিন্তাশীল মনীষী স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং পরবর্তী বহু শতাব্দী যাবৎ তাঁহার এই ব্যাখ্যা নিখুঁত ও অভ্রান্ত বলিয়া যে ব্যাপক সমর্থন লাভ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি! অবশ্য আজ আমরা জানি এই ব্যাখ্যা ভুল; ইহা ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা মৌলিক দোষ-ত্রুটীতে পরিপূর্ণ। যেমন, সেপ্টাম্ ভেদ করিয়া শিরা হইতে ধমনীতে রক্ত-প্রবাহের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল; কারণ সেপ্টাম্ হৃৎপিণ্ডস্থ দুই নিলয়ের মধ্যে এক কঠিন ও অভেদ্য প্রাচীর বিশেষ। Rete mirabile নালীগুলির সাহায্যে মস্তিষ্কে রক্তের চিৎ শক্তি অর্জনের পরিকল্পনা ভ্রান্ত; কারণ এই নালীগুলি মানুষের মস্তিষ্কে থাকে না, গ্যালেন ইহাদের দেখিয়াছিলেন রোমন্থনকারী গবাদি পশুর মস্তিষ্কে। তারপর তিন প্রকার রক্তের কথা উল্লেখ এবং ইহাদের পার্থক্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া তিনি রক্ত-সঞ্চালনের প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটনে এক বিরাট বাধা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন। এই জন্য অনেক ঐতিহাসিকের মতে তিনি শারীরবৃত্তে উপকার অপেক্ষা অপকারই করিয়া গিয়াছেন বেশী। তাঁহার সহজ সরল ব্যাখ্যার আকর্ষণ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকে বহুদিন এই পরিকল্পনার মারাত্মক ত্রুটী-বিচ্যুতির দিক হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল। প্রায় দেড় হাজার বৎসর পরে ইংরেজ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্ভি (১৫৭৮-১৬৫৭) যুগান্তকারী রক্ত-সংবহন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গ্যালেনের সমগ্র পরিকল্পনা ধূলিসাৎ করিয়া দেন এবং সমগ্র শারীরবৃত্তের বনিয়াদ সম্পূর্ণ নূতনরূপে গড়িয়া তোলেন। ফারিংটনের ভাষায়—

> "Even then it was Galen who had triumphed over Galen, Galen the observer who had triumphed over Galen the philosopher, for it was Galen's technique Harvey had learned at Padua."*

গ্যালেনের রচনায় ও ভাবধারায় হিপোক্রেটীয় নীতি ও আদর্শের অনেক ছাপ আছে। হিপোক্রেটিসের উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু হিপোক্রেটীয় সংগ্রহের মধ্যে এই রচনাবলীর প্রথম প্রণেতার যে সুমহান ছবি, আদর্শবাদী যে এক মহাপুরুষের চরিত্র আমাদের মানসপটে ভাসিয়া উঠে, গ্যালেনের রচনা পাঠে তাহা হয় না। তৎপরিবর্তে এক অতি পরিশ্রমী, কর্মঠ, সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ বৈষয়িক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর চরিত্রের কথা গ্যালেনের রচনা আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়। শুধু তাহাই নহে, গ্যালেন ছিলেন অতিমাত্রায় ধর্মভীরু। প্রাণীদের গঠন-বৈচিত্র্যের মধ্যে তিনি সর্বদা ঈশ্বরের অভিপ্রায় দেখিতে পাইতেন। উদ্দেশ্য-হীনভাবে ঈশ্বর যে কোন কিছুই সৃষ্টি করেন নাই, অ্যারিস্টট্ল্-প্রবর্তিত এই মতবাদে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন।

গ্যালেন কোন চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন নাই। তাঁহার অনুগামী শিষ্যের

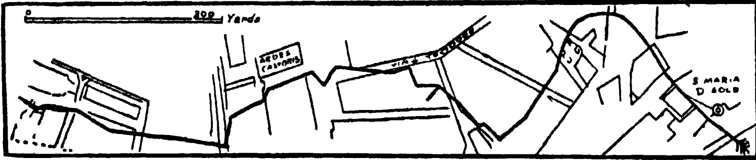
---

* *Greek Science,* Part II; p. 160.

সংখ্যাও খুব বেশী ছিল বলিয়া মনে হয় না। ২০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা প্রায় সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হইয়া যায়। প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের তিনিই শেষ প্রদীপ; ইহা নির্বাপিত হইলে ইউরোপ খণ্ডে এই বিজ্ঞানের উপর বহু শতাব্দীর জন্য অন্ধকার নামিয়া আসে।

রোমকদের জনস্বাস্থ্য ও হাসপাতাল ব্যবস্থা

ব্যক্তিগত গবেষণার দিক হইতে রোমকরা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য কোন কৃতিত্বের পরিচয় না দিলেও পূর্তবিদ্যাবিশারদ রোমকজাতি তাহাদের অপূর্ব সংগঠন-দক্ষতা বলে পরোক্ষভাবে চিকিৎসা-ব্যবস্থার যে প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিল তাহা অনস্বীকার্য। জনস্বাস্থ্য ও হাসপাতাল ব্যবস্থার তাহারাই প্রথম উদ্ভাবক। নাগরিকদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্মরণ রাখিয়া রোমক পূর্তবিদ্যাবিশারদেরা নগর, গৃহাদি ও রাস্তাঘাট নির্মাণ, কূপ খনন প্রভৃতি কার্যের পরিকল্পনা রচনা করিত। স্বাস্থ্য-প্রীতি রোমকদের একরূপ জাতীয় বিশেষত্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে টারকুইনদের সময়েই রোমে ময়লা জল নিকাশের জন্য মাটির নীচে নর্দমার ব্যবস্থা ছিল। ভূগর্ভস্থ এইরূপ নর্দমার ল্যাটিন নাম cloacae। ক্লোসিয়ের প্রধান শাখাটি অদ্যাপি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোমের প্রধান ক্লোসিয়ের একটি নক্সা চিত্রে দেখানো হইল। অ্যাকুইডাক্ট বা পরিবাহের সাহায্যে সমগ্র রোমে পানীয় সরবরাহের ব্যবস্থা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। পরিবাহের সাহায্যে প্রত্যহ তিন শত মিলিয়ন গ্যালন জল রোমে সরবরাহ করা হইত। এইরূপ ১৪টি পরিবাহের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি এই প্রাচীন ব্যবস্থার সাক্ষ্য দিয়া থাকে। ফ্রণ্টিনাস্ (৪০-১০৩) *De aquis urbis Romae* নামক গ্রন্থে এই সব পরিবাহের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।



১০৮। রোমের প্রধান ক্লোসিয়ের নক্সা।

মৃতদেহ কবরস্থ করা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা, জল সরবরাহ প্রভৃতি ব্যাপারে রোমক রাষ্ট্রপতিরা বহু প্রাচীনকাল হইতেই নানাবিধ আইন প্রণয়ন করেন। মুমূর্ষু গর্ভবতী নারীর শিশুর জীবনরক্ষার্থ অস্ত্রোপচারের সাহায্যে গর্ভ উন্মুক্ত করিবার বিধান রোমক আইনে বহু প্রাচীনকাল হইতে দৃষ্ট হয়। অনেকের বিশ্বাস জুলিয়াস্ সিজার এইভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহার স্মারক হিসাবে এই অস্ত্রোপচারের নাম আজও সিজারীয় অস্ত্রোপচার নামে পরিচিত।

জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের যে মহান দায়িত্ব আছে রোমক রাষ্ট্রপতিদের এ বিষয়ে বিশেষ অবহিত দেখা যায়। রোমক সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন হইতেই সরকারী চিকিৎসক নিয়োগের উল্লেখ পাওয়া যায়। রোমক সরকারী চিকিৎসকদের বলা হইত আর্কিয়াত্রি (archiatri)। প্রথমে অবশ্য কেবল উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের চিকিৎসার জন্য সরকারী চিকিৎসক নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল; পরে এই ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করিয়া জনসাধারণকেও সরকারী চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। আনুমানিক ১৬০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট এণ্টোনিনাস্ এক আইন প্রণয়নের দ্বারা বিধিবদ্ধ করেন যে, সরকারী চিকিৎসকদের দরিদ্র জনসাধারণের চিকিৎসা করা কর্তব্য। সম্রাট জাস্টিনিয়ান ধনীর চিকিৎসা অপেক্ষা দরিদ্রের চিকিৎসায় অধিকতর যত্নবান ও মনোযোগী হইতে সরকারী চিকিৎসকদের নির্দেশ দেন।

পৌর-প্রতিষ্ঠান হইতে এই সব চিকিৎসকের বেতন দেওয়া হইত। সহরের গুরুত্ব ও লোক-সংখ্যার অনুপাতে চিকিৎসকদের সংখ্যা নির্ধারিত হইত; যেমন প্রাদেশিক রাজধানী প্রভৃতি বড় বড় সহরে ১০ জন আর্কিয়াত্রির বন্দোবস্ত থাকিত, আদালত আছে এইরূপ সহরে ৭ জন এবং ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র সহরগুলিতে ৫ জন করিয়া আর্কিয়াত্রি থাকিত। আর্কিয়াত্রিদের আয়কর দিতে হইত না।

সামরিক বিভাগে স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুচিকিৎসার ব্যাপারেও রোমকরা অগ্রণী ছিল। আলেকজান্দার তাঁহার সৈন্যবাহিনীতে চিকিৎসক, ইঞ্জিনীয়র প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করিতেন। কিন্তু রোমকদের ব্যবস্থা ছিল অনেক বেশী প্রণালীবদ্ধ। একদল চিকিৎসক ও এই কার্যের উপযোগী সহকারী বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক রোমক সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত থাকিত। রোমকদের সামরিক সাফল্যের জন্য এই ব্যবস্থা বড় কম দায়ী নহে। বেসামরিক ও সামরিক চিকিৎসা-ব্যবস্থা প্রচলন সত্ত্বেও সাধারণভাবে রোমক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মৌলিকতা ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দানে অক্ষমতার এক যুক্তিসঙ্গত কারণ এই যে, চিকিৎসাশাস্ত্রের ব্যবহারিক দিকটাই তাহারা বিচার করিয়াছে বেশী। কিন্তু এই শাস্ত্রে নূতনতর জ্ঞানের সন্ধান দেওয়া ও সেই উদ্দেশ্যে গবেষণাকার্যে আত্মনিয়োগ করিবার প্রয়োজনীয়তা রোমকরা কদাপি উপলব্ধি করে নাই বা করিবার চেষ্টাও করে নাই। যে কোন কারণেই হউক আমরা দেখি, সকল প্রকার তত্ত্বীয় জ্ঞানের প্রতিই রোমকজাতি একান্তভাবে বিরূপ ও উদাসীন। অথচ ব্যবহারিক ও ফলিত বিদ্যার্জনে তাহাদের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের অন্ত নাই।

ঠিক একই কারণে হাসপাতাল স্থাপনের ব্যাপারেও আমরা রোমকদের আশ্চর্য সংগঠন-শক্তির পরিচয় পাই। গ্রীকদের হাসপাতাল বলিয়া কিছু ছিল না। চিকিৎসা তাহাদের কাছে নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল। এস্‌কুলাপিয়াসের মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচীন গ্রীসের কোন কোন স্থানে অবশ্য ছোট বড় চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল; তবে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য ঠিক হাসপাতাল এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে বলা চলে না। সাধারণতন্ত্রের যুগে রোমকদেরও হাসপাতাল বলিয়া কিছু ছিল না। এই সাধারণতন্ত্রে বহু ক্রীতদাসের বাস ছিল; কিন্তু অসুস্থ বা রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িলে দৈবের উপর নির্ভর করা ছাড়া এই দুর্ভাগাদের কোন গত্যন্তর ছিল না। গ্রীকদের অনুকরণে সাধারণতন্ত্রী রোমকেরা টিবের দ্বীপে এস্‌কুলাপিয়াসের এক মন্দির নির্মাণ করে। কাজের অযোগ্য অসুস্থ ও রোগগ্রস্ত ক্রীতদাসদের চিকিৎসার দায়িত্ব ও হাঙ্গামা এড়াইবার জন্য টিবের দ্বীপের এই মন্দিরে একরূপ আজীবন নির্বাসন দেওয়া হইত। অবশ্য এই দ্বীপে নির্বাসিত হইবার অনতিকালের মধ্যেই অধিকাংশ হতভাগ্য ক্রীতদাসের জীবনান্ত হইত। খৃষ্টীয় ৪১-৫৪ অব্দের মধ্যে সম্রাট ক্লডিয়াস এক আদেশ জারি করিয়া এইরূপ রোগগ্রস্ত ক্রীতদাসদের স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। সুস্থ হইয়া উঠিলে ইহাদের ভূতপূর্ব প্রভুর নিকট ক্রীতদাসরূপে ফিরিয়া যাইবার আর বাধ্যবাধকতা থাকিত না। যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই এই মন্দির রচিত হউক না কেন, কালক্রমে দরিদ্র, হতভাগ্য, আশ্রয়হীন ক্রীতদাসদের ইহাই একমাত্র আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। অধ্যাপক সিঙ্গারের মতে এস্‌কুলাপিয়াসের মন্দিরকেই সর্বসাধারণের জন্য প্রথম হাসপাতাল হিসাবে মনে করা যাইতে পারে। *

ভেলিটুডিনারিয়া (Valetudinaria) বা একপ্রকার রুগ্নাগারের কথাও জানা যায়। এই রুগ্নাগারে ক্রীতদাস ও স্বাধীন ব্যক্তিরাও অসুস্থ হইলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিত। তারপর চিকিৎসকেরাও নিজেদের গৃহ এইরূপে নির্মাণ করাইত যাহাতে প্রয়োজনমত সাময়িক-ভাবে কয়েকজন রোগীকে সবসময়েই চিকিৎসার জন্য আশ্রয় দান করা যায়। আধুনিক কালের

---

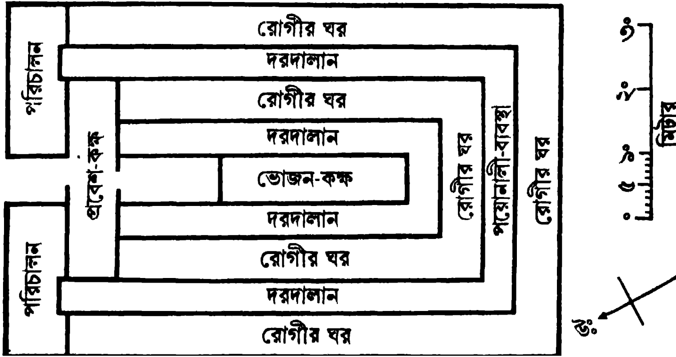
* Singer, *A Short History of Medicine;* p. 49.

নার্সিং হোমের সংগে তৎকালীন চিকিৎসকদের এই জাতীয় গৃহগুলি তুলনীয়। মৃত্তিকা খননে পম্পাই-এর ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করিয়া এই তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে।

বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা রোমক সৈন্যবিভাগের কর্তৃপক্ষেরাও সম্ভবতঃ বিশেষভাবে উপলব্ধি করে। প্রথমদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যরা অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িলে চিকিৎসার জন্য তাহাদের স্বীয় নগরে, সহরে বা জন্মস্থানে প্রেরণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। অনেক সময় রোগের গুরুত্ব অনুযায়ী সৈন্যদের মধ্যে কেহ কেহ স্বদেশে ফিরিবার পরিবর্তে নিকটবর্তী কোন স্থানের রুগ্নাগারে চিকিৎসার জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিত। ইহাতে সৈন্যদের জন্য বিশেষ ধরনের রুগ্নাগার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ

রোগীর ঘরের বিশদ নক্সা





১০৯। রোমক আমলের ধ্বংসপ্রাপ্ত সামরিক হাসপাতালের একটি নমুনা।

করিবার পরিকল্পনা সৈন্যবিভাগের কর্তৃপক্ষের মাথায় প্রথম আসে এবং কালক্রমে এইরূপ সামরিক রুগ্নাগার বা হাসপাতাল তাহারা অনুমোদন করেন। ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে রোমকদের সময়ে নির্মিত এই ধরনের সামরিক হাসপাতালের অনেক ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ডুসেলডর্ফের নিকট নোভেসিয়াম নামক স্থানে প্রাপ্ত ও আনুমানিক ১০০ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত এক সামরিক হাসপাতালের ধ্বংসাবশেষ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই হাসপাতালের একটি নক্সা চিত্রে প্রদর্শিত হইল। উত্তর দিকে হাসপাতালের প্রবেশ পথ; ইহার দুইপাশে পরিচালন কক্ষ বা অফিস ঘর। ইহার পরেই একটি বড় ঘর আগন্তুকদের বিশ্রাম ও অপেক্ষার জন্য। তারপরেই একটি ছোট দ্বার দিয়া ভোজনকক্ষে পৌঁছিবার ব্যবস্থা। হাসপাতালের তিন দিকে দুই সারি দরদালান এবং এই দরদালানের উভয় পার্শ্বে সারি সারি রোগীর ঘর। দক্ষিণ দিকে বাহিরের দরদালানের নীচ দিয়া পয়োনালীর ব্যবস্থা; এইখান দিয়া ময়লা নিকাশ হইত। সমগ্র নক্সায় আধুনিকতার ছাপ সুপরিস্ফুট এবং আধুনিক যুগের পূর্বে ইহা অপেক্ষা অধিকতর উন্নত ধরনের সামরিক হাসপাতাল-ব্যবস্থার আর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

৭·৫। পূর্তবিদ্যা ও স্থপতি-বিজ্ঞান—ভিট্রুভিয়াস্ ও ফ্রন্টিনাস্

পূর্তবিদ্যা ও স্থপতিবিজ্ঞানে রোমকদের অবদান প্রাচীন সভ্য জাতিদের মধ্যে অতুলনীয়। এই বিদ্যায় রোমক জাতির দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তির পার্শ্বে অপরাপর প্রাচীন জাতির প্রচেষ্টা

যে শুধু অকিঞ্চিৎকর তাহাই নহে, আধুনিককালে এই বিজ্ঞানের যুগান্তকারী উন্নতির পূর্বে আর কোন জাতি এই বিদ্যায় রোমকদের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। রোমকদের এই প্রতিভা সামরিক ও বেসামরিক পূর্তকার্যে সমভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাদের নির্মিত নগর-প্রাচীর, দুর্গ-পরিখা, বর্ত্ম, অ্যাকুইডাক্ট্ বা পরিবাহ, রঙ্গমঞ্চ, স্নানাগার, সেতু প্রভৃতির অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি এই অসামান্য প্রতিভার সাক্ষ্য দিতেছে। যুদ্ধে অথবা শান্তিতে প্রজার সুবিধার জন্য পৃথিবীর অল্প সাম্রাজ্যই এরূপ বিপুল ও ব্যাপক পূর্তকার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। দক্ষিণ ইউরোপে, পশ্চিম এসিয়ায় ও উত্তর আফ্রিকায় রোমকদের এইসব কীর্তির বহু দৃষ্টান্ত এখনও বিদ্যমান; হয়ত আরও দুই সহস্র বৎসর এইভাবে ইহারা রোমক পূর্তবিদ্যার গৌরব ঘোষণা করিয়া যাইবে।

রোমক পূর্তবিদ্যা ও স্থপতি-বিজ্ঞান প্রধানতঃ দুইজন বিজ্ঞানীর নিকট ঋণী। তাঁহারা হইলেন ভিট্রুভিয়াস্ ও সেক্সটাস্ জুলিয়াস্ ফ্রন্টিনাস্।

ভিট্রুভিয়াস্ (খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী)

ভিট্রুভিয়াস্ খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। অগাষ্টাস্ তখন রোমের সর্বময় কর্তা। তিনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *De architectura* অগাষ্টাসের নামে উৎসর্গ করেন। এই গ্রন্থে নিজের জীবনী সম্বন্ধে মাঝে মাঝে দুই একটি ঘটনার ও মন্তব্যের উল্লেখ হইতে জানা যায় যে, তিনি তখনকার দিনের শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তনে উচ্চ শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভিট্রুভিয়াসের রচনায় এই উচ্চ শিক্ষার ও রুচির ছাপ সুপরিস্ফুট। পূর্তবিদ্যা ও স্থপতিবিজ্ঞান তাঁহার গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইলেও *De architectura* সাধারণভাবে প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার এক অতি উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থও বটে।

De architectura দশ খণ্ডে সমাপ্ত পূর্তবিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীন গ্রন্থ। স্থাপত্য সংক্রান্ত সাধারণ তত্ত্ব, গৃহাদি নির্মাণের ক্রমবিকাশ, বিভিন্ন মাল-মসলার প্রয়োগ, আয়োনীয়, ডোরিক, কোরিন্থীয় প্রভৃতি বিবিধ পদ্ধতিতে মন্দির-নির্মাণ, জনসাধারণের উপযোগী স্নানাগার, রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতির নির্মাণ-কৌশল, নগর ও বন্দর পরিকল্পনা, জল সরবরাহ ব্যবস্থা, সূর্যঘড়ি, যন্ত্রবিদ্যা, সামরিক পূর্তবিদ্যা ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনায় এই গ্রন্থ সমৃদ্ধ। এইসব আলোচনার উপাদান প্রধানতঃ গ্রীক গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইলেও স্থাপত্য ও পূর্ত-বিদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে ভিট্রুভিয়াস্ স্বীয় ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ফলও যথেষ্ট বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপ দুরূহ বিষয়কে সহজ ও প্রণালীবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন স্থাপত্য ও পূর্তকার্যে নিযুক্ত উচ্চশ্রেণীর কারিগর ও ব্যবস্থাপকদের জন্য।

বহুদিন পর্যন্ত ব্যবহারিক স্থাপত্য ও পূর্তবিদ্যার ইহা এক আদর্শ গ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত ছিল। সমগ্র মধ্যযুগে ও রেনেশাঁর সময়ে ভিট্রুভিয়াস্ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত স্থাপত্যে ও পূর্তবিদ্যায় বিদ্যার্থীর শিক্ষা সম্পূর্ণ মনে করা হইত না এবং এই বিদ্যায় ভিট্রুভিয়াস্-প্রদত্ত সমাধানকে চূড়ান্ত জ্ঞান করা হইত। ব্রামান্তে, মিকেলাঞ্জেলো, পালাডিও, ভিগ্‌নোলা প্রমুখ বিখ্যাত প্রাচীন স্থপতিদের প্রত্যেকেরই প্রেরণা ছিল *De architectura*।

স্থাপত্য ও পূর্তবিদ্যা ছাড়া সাধারণভাবে প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কিত বহু মূল্যবান উপাদানের জন্যও এই গ্রন্থের একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় খণ্ডে আগুনের আবিষ্কার, ভাষার উৎপত্তি, আদিম মানুষের কথা, সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা পর্যালোচিত হইয়াছে। তাঁহার স্থাপত্যের ইতিহাসও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গল, স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি দেশের প্রাচীন গৃহ ও সৌধাদির নির্মাণ-কৌশল এবং পণ্টুসের

কোল্‌চিয়ান্‌দের পূর্তবিদ্যা সম্বন্ধে জানিবার পক্ষে ভিট্রুভিয়াসের গ্রন্থই সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ও প্রামাণিক।

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে গৃহাদি নির্মাণের কার্যে কি ধরনের কাষ্ঠ উপযোগী এবং কিরূপে কঠিন ও উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ প্রস্তুত করিতে হয় তাহার বর্ণনা আছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, বৃক্ষ কাটিবার সময় প্রথমেই ইহাকে সম্পূর্ণরূপে কাটা উচিত নহে; প্রথম পর্যায়ে বৃক্ষের গুঁড়ির মধ্য পর্যন্ত কাটিয়া এই অবস্থাতেই ইহাকে কিছুদিন রাখা কর্তব্য। ইহাতে বৃক্ষরস ও অন্যান্য অনাবশ্যক তরল পদার্থ নিষ্কাশিত হইয়া যায় এবং অভ্যন্তরে আবদ্ধ থাকিয়া কাষ্ঠের ক্ষতিসাধন করিতে পারে না। এইরূপে বৃক্ষরস ও তরল পদার্থ সম্পূর্ণরূপে নির্গত হইলে গুঁড়ির অবশিষ্ট অংশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। ইহা অবশ্য অতি সুপ্রাচীন পদ্ধতি; ভিট্রুভিয়াস্‌ সম্ভবতঃ থিওফ্রেস্‌টাসের গ্রন্থ হইতে এই জাতীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা : বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উপর ভিট্রুভিয়াস্‌ বরাবর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। *De architectura*-র নবম খণ্ডের উপক্রমণিকায় বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে আর্কিমিডিসের পরীক্ষা বিবৃত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে জলের পরিবর্তে পারদ ব্যবহার করিয়া আর্কিমিডিসের পরীক্ষাগুলি নূতন করিয়া সম্পাদন করিবার এক পরামর্শ তিনি প্রদান করিয়াছেন। তিনি নিজেও সম্ভবতঃ এজাতীয় পরীক্ষা করিয়া থাকিবেন। এক জায়গায় তিনি লিখিয়াছেন, পারদে একশত পাউণ্ড ওজনের একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ড সহজেই ভাসিয়া থাকিবে, কিন্তু স্বর্ণের এক অতি ক্ষুদ্র টুকরা সঙ্গে সঙ্গেই নিমজ্জিত হইবে।

মাঝে মাঝে আপাত পরীক্ষিত সত্যের অনেক অপব্যবহারও তিনি করিয়াছেন। পূর্বনির্ধারিত ধারণা ও মতবাদ সমর্থনের উদ্দেশ্যে তিনি অনেক ক্ষেত্রে ভ্রান্ত পরীক্ষার আশ্রয় লইয়াছেন। এই সম্পর্কে বায়ুপ্রবাহ সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ উল্লেখযোগ্য। বায়ু-প্রবাহের কারণ যে বায়ুর গতি, ইহা তিনি জানিতেন না; তাঁহার ধারণা ছিল, নূতন করিয়া বায়ুসৃষ্টির ফলে বায়ুপ্রবাহ ঘটিয়া থাকে। উত্তাপ ও আর্দ্রতা পরস্পরের সংস্পর্শে আসিলে অতিরিক্ত বায়ুসৃষ্টি হয় এবং তাহার ফলেই বাত্যার উদ্ভব হয়। ভিট্রুভিয়াস্‌ কর্তৃক এই ধরনের ভ্রমাত্মক মতবাদ পোষণের আরও দৃষ্টান্ত আছে। উত্তরদেশীয় লোকেদের কণ্ঠস্বর যে সাধারণতঃ গম্ভীর ও দক্ষিণ দেশীয় লোকেদের কণ্ঠস্বর কর্কশ ও তীক্ষ্ণ হইতে দেখা যায়, মানব-কণ্ঠস্বরের এইরূপ ভৌগোলিক প্রভেদের তিনি এক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করেন।

ফ্রণ্টিনাস্‌ (৪০-১০৩)

খ্রীষ্টাব্দ প্রথম শতকের শেষভাগে রোমক যোদ্ধা ও পূর্তবিদ্যাবিশারদ্‌ সেক্সটাস্‌ জুলিয়াস্‌ ফ্রণ্টিনাস্‌ রোমের জলসরবরাহ সম্বন্ধে *De aquis urbis Romae* নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। *De architectura*-র পরেই *De aquis* স্থপতিবিজ্ঞান ও পূর্তবিদ্যার সর্বোৎকৃষ্ট প্রাচীন গ্রন্থ। ফ্রণ্টিনাস্‌ ভেস্‌পাসিয়ানের শাসনকালে রোমের প্রিটর (praetor) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি ইংল্যাণ্ডের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং সিলুরেস ও অন্যান্য উপজাতিদের দমন করেন। ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এগ্রিকোলা ইংল্যাণ্ডের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলে তিনি রোমে প্রত্যাবর্তন করেন এবং বিবিধ সরকারী কার্যে কিছুদিন কাটাইবার পর ৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রোমের পরিবাহ-ব্যবস্থার প্রধান ব্যবস্থাপকের পদে নিযুক্ত হন। এইরূপ কর্মবহুল জীবনের অত্যল্প অবসরকালে তিনি অতি উৎকৃষ্ট যে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, *De aquis* তাহার অন্যতম। *De re militari* ও *Strategematicon libri iii* তাঁহার এইরূপ আরও দুইটি বিখ্যাত গ্রন্থ। এই দুইটিই সামরিক কলা-কৌশল সম্বন্ধে লিখিত; প্রথমোক্তটি এখন নিখোঁজ, দ্বিতীয়টি সংরক্ষিত আছে।

Strategematicon-এ গ্রীক ও রোমক রণকৌশলের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। ফ্রন্টিনাস্ নিজেও একজন সুদক্ষ যোদ্ধা ও সেনাপতি ছিলেন।

বিজ্ঞানের ইতিহাসে ফ্রন্টিনাস্ *De aquis urbis Romae*-এর রচয়িতা হিসাবে খ্যাত। পরিবাহ-ব্যবস্থার অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইবার পূর্বে জলসরবরাহ সংক্রান্ত পূর্তবিদ্যার বিশেষ কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল না। পদপ্রাপ্তির পর তিনি অতীব অধ্যবসায়ের সহিত এই বিদ্যা আয়ত্ত করিতে যত্নবান হন। অধীনস্থ কর্মচারীদের জিজ্ঞাসা ও পরামর্শ গ্রহণ না করিয়াই যাহাতে স্বাধীনভাবে প্রয়োজনমত সমগ্র ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে সক্ষম হন সেই উদ্দেশ্যে তিনি এই বিদ্যার্জনে ব্রতী হইয়াছিলেন। *Aquis urbis Romae* তাঁহার এই অধ্যয়ন ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ফল। ফ্রন্টিনাস্ লিখিয়াছেন,— "রোম স্থাপনার পর প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর রোমকরা টিবের নদীর জলসরবরাহেই সন্তুষ্ট ছিল। ধীরে ধীরে পরিবাহের সাহায্যে বহুদূর স্থান হইতে জলসরবরাহের সুবিধার কথা রোমকরা বুঝিতে পারিল; এখন আপ্পিয়ান, প্রাচীন আনিও, মার্সিয়া, টেপুলা, জুলিয়া, ভির্গো, অগাস্টা, ক্লডিয়া ও নূতন আনিওর পরিবাহের সাহায্যে রোমের জলসরবরাহ হইয়া থাকে।" এই সকল পরিবাহের দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা, জল থিতাইবার জন্য বৃহদাকার চৌবাচ্চা, বিভিন্ন পরিবাহের জলের গুণাগুণ তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই সব পরিবাহের সাহায্যে কি পরিমাণ জল সরবরাহ হয় ajutage বা স্বল্পছিদ্রবিশিষ্ট এক প্রকার নলের সাহায্যে তাহা মাপিবার পদ্ধতিও তিনি বর্ণনা করেন। জলসরবরাহে চুরি, জালিয়াতি, ফাঁকি প্রভৃতি দুর্নীতি প্রতিরোধকল্পে এই ajutage-এর ব্যবস্থা ছিল এবং কেবলমাত্র সরকারী ছাপ মারা ajutage গুলিই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু ইহা দ্বারা সব সময়েই যে চুরি ও জালিয়াতি বন্ধ হইত তাহা নহে এবং ফ্রন্টিনাস্‌কে এ সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত দেখা যায়।

পরিবাহের সাহায্যে জলসরবরাহ-ব্যবস্থা চালু হইবার ফলে রোমের জনসাধারণের বিশেষ স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটে। পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ হ্রাস করিতে সক্ষম হয়; সহরগুলি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন ভাব ধারণ করে। *De aquis*-এ ফ্রন্টিনাস্ এই জনস্বাস্থ্যোন্নতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

৭·৬। ভূগোল—স্ট্রাবো, মেলা ও টলেমী

বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় ভূগোলকে এক সুসম্বন্ধ বিজ্ঞান হিসাবে উন্নীত করিবার কৃতিত্ব প্রধানতঃ গ্রীকদের প্রাপ্য। প্রাচীন জাতিদের মধ্যে গ্রীকরা পৃথিবীর ভৌগোলিক জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিল। গ্রীকদের পূর্বে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এককালে ফিনিশীয়দের ব্যাপক বাণিজ্য ও গতিবিধি ছিল। এজন্য ফিনিশীয়দের কাছ হইতে পৃথিবীর ভৌগোলিক জ্ঞান-বৃদ্ধি স্বভাবতঃই আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু ফিনিশীয়রা এই জ্ঞান-বৃদ্ধিতে আশানুরূপ সাহায্য করিতে পারে নাই। ভূমধ্যসাগরীয় ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ সম্বন্ধে তাহাদের যে বিশেষ জ্ঞান ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বাণিজ্যিক স্বার্থের খাতিরে সেই জ্ঞান তাহারা যতদূর সম্ভব নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিল, অন্য জাতির মধ্যে তাহা প্রচার করিবার চেষ্টা করে নাই। পক্ষান্তরে বিভিন্ন দেশ ও জাতি সম্বন্ধে নানারূপ আজব গল্প বানাইয়া প্রকৃত তথ্য গোপন রাখিবারই চেষ্টা করিয়াছিল।

এই বিষয়ে ঔপনিবেশিক আয়োনীয় গ্রীকদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ভিন্নরূপ। তাহারা যখন ভূমধ্যসাগরের নানা দ্বীপে ও উপকূলবর্তী নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে নিজেদের পার্বত্য ও জঙ্গলভূমি পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, ভৌগোলিক জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য এই ব্যাপারে তাহাদের বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। তাই প্রথম হইতেই আয়োনীয়

গ্রীকদের আমরা ভূগোল-সচেতন দেখিতে পাই। নানা দেশ পর্যটনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সযত্নে সঞ্চিত করিয়া ধীরে ধীরে তাহারা এক অমূল্য বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করিয়াছিল। ভূগোলকে গাণিতিক বা জ্যোতিষীয়, প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক এই চারিটি প্রধান বিভাগে গ্রীকরাই প্রথম ভাগ করে এবং এই চারিটি বিভাগেই তাহাদের অবদান অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম মানচিত্র নির্মাতা অ্যানাক্সিমাণ্ডার জ্যোতিষীয় ভূগোলের স্থাপয়িতা; প্রাকৃতিক ভূগোলের গোড়াপত্তন করেন কবি ও দার্শনিক জেনোফোন; হিরোডোটাস্ রাজনৈতিক ভূগোলের এবং থুসিডাইড্স্ ঐতিহাসিক ভূগোলের প্রবর্তক। এই বিজ্ঞান আয়োনীয় গ্রীকদের হাতে এইভাবে জন্মলাভ করিয়া আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞানীদের হাতে চরম পরিণতি লাভ করে। ইরাটোস্থেনিস্, হিপার্কাস্ ও টলেমী জ্যোতিষীয় ভূগোলের যে উচ্চ মান নির্দেশ করেন বহু শতাব্দী পর্যন্ত কেহ তাহা অতিক্রম করিতে সক্ষম হয় নাই।

সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিজ্ঞতা স্বভাবতঃই ভৌগোলিক জ্ঞান-বৃদ্ধির অনুকূল। আলেকজান্দার ও তাঁহার অনুগামীদের সাম্রাজ্য গ্রীক ভৌগোলিকদের বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। ঠিক একই কারণে রোমকরাও ছিল কতকটা ভূগোল-সচেতন। তবে এই বিজ্ঞানের উন্নতিতে রোমকদের যতটা তৎপরতা দেখানো উচিত ছিল তাহারা সেইরূপ তৎপরতার পরিচয় দেয় নাই। একমাত্র রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ভূগোলে রোমকরা উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছে এবং সেই উৎসাহেরও মূল প্রেরণা ছিল সামরিক প্রয়োজন। সিসেরো, প্লিনি, সেনেকো, সিউটোনিয়াস্ ও ভিট্রুভিয়াসের রচনা, পিউটিংগার মানচিত্র ও পম্পোনিয়াস্ মেলার মানচিত্র এবং স্ট্রাবোর বিশ্ববিখ্যাত ভূগোল রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ভূগোল রচনায় রোমক প্রচেষ্টার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এই যুগে অবশ্য প্রাচীনকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভৌগোলিক ক্লডিয়াস্ টলেমীরও আমরা সাক্ষাৎ পাই। তবে সে প্রতিভা পরিপূর্ণভাবেই গ্রীক, আলেকজান্দ্রীয় আদর্শেই তাহার বিকাশ এবং তাঁহার অবদান সর্বতোভাবে গ্রীক প্রতিভারই আর একটি দৃষ্টান্ত।

জুলিয়াস্ সিজারের সাম্রাজ্য পরিদর্শন পরিকল্পনা

জুলিয়াস্ সিজার সাম্রাজ্য পরিদর্শন ও জরিপের যে বিরাট পরিকল্পনা রচনা করেন তাহার পর হইতেই রোমক ভৌগোলিকদের তৎপরতার সূত্রপাত। ইহার পূর্বে সুসম্বদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট উপায়ে ভূগোল রচনার কার্যে রোমকদের উৎসাহী দেখা যায় না। সিজারের পরিকল্পনা অনুযায়ী সাম্রাজ্যকে নানা প্রদেশে ও জেলায় ভাগ করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল। সৈন্যবাহিনীর গতিবিধি ও বাণিজ্যের জন্য নিখুঁত ও উন্নত ধরনের মানচিত্র রচনা অপরিহার্য হইয়া পড়িল। সিজার নিজে এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত দেখিয়া যাইতে পারেন নাই; ইহার ভার আসিয়া পড়ে অগাস্টাসের উপর এবং তাঁহার সুযোগ্য জামাতা ভিপ্সানিয়াস্ এগ্রিপ্পার (মৃত্যু খ্রীঃ পূঃ ১২) তত্ত্বাবধানে এই কাজ সুরু হয়। দীর্ঘ ৩০ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার পর খ্রীঃ পূঃ ২০ অব্দে এই পরিদর্শন কার্য শেষ হয়। এগ্রিপ্পা এই প্রসঙ্গে কতকগুলি মানচিত্র তৈয়ারী করিয়াছিলেন। মানচিত্রগুলি এখন নিখোঁজ; প্লিনি, মার্সেনিলাস্ (৩২৫-৯২) প্রমুখ লেখকদের কল্যাণে এগ্রিপ্পার এই সব মানচিত্র বিস্মৃতির হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

পিউটিংগার মানচিত্র ঃ পরিদর্শনের কার্যে নিযুক্ত পরিদর্শকদের বলা হইত 'agrimensore'। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া এবং সৈন্যবাহিনী ও শাসকবর্গের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় রোমক এগ্রিমেনসোরেরা বিপুল তথ্য সংগ্রহ করে। এই সব তথ্য একত্রিত করিয়া রোমকরা অতি বৃহৎ যে সব মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিল তাহা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের দপ্তরের বিরাট প্রকোষ্ঠে টাঙানো থাকিত। ষোড়শ শতাব্দীতে পিউটিংগার নামে এক বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি এইরূপ কতকগুলি মানচিত্র সম্পাদনার পর প্রকাশ করেন; তাঁহার নামানুসারে ইহাদের পিউটিংগার মানচিত্র নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। পিউটিংগার

মানচিত্রে সৈন্যবাহিনীর চলাচলের উপযোগী প্রধান প্রধান রাস্তাঘাট দেখানো আছে; প্রতিদিন কতদূর রাস্তা অতিক্রম করা সম্ভবপর দাগ কাটিয়া তাহাও নির্দিষ্ট হইয়াছে। তারপর রাস্তা চিহ্নিত করিবার জন্য এবং কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান হইতে দূরত্ব বুঝাইবার উদ্দেশ্যে প্রধান প্রধান রাস্তার উপর নানারূপ স্মারক-স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছিল। স্মারক-স্তম্ভের গায়ে দূরত্ব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য খোদাই করা থাকিত। যেমন অতুন হইতে রোম যাইবার পথে ওৎসিয়োদূরাম্ (অধুনা 'ওক্সের'), বোনোনিয়া (অধুনা 'বোলোনা') ও মিউটিনা (অধুনা 'মোদেনা') প্রভৃতি স্থানে এইরূপ স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছিল। কালসহকারে ইহাদের অধিকাংশই এখন নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। স্তম্ভ ছাড়া দূরত্ব-জ্ঞাপক প্রস্তরখণ্ডেরও ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। বেলজিয়াম, লুক্সেম্বুর্গ, ভ্যালেন্সিয়া প্রভৃতি স্থানে এই ধরনের প্রস্তরখণ্ডের অস্তিত্ব উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে উইল্ট্শায়ারে প্রাপ্ত রোমক আমলের একটি পিতলের থালার চারিধারে ইংল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত কতকগুলি স্থানের নাম অঙ্কিত দেখা যায়।

মানচিত্র ছাড়া পর্যটকদের সুবিধার জন্য তখনকার দিনে এক ধরনের গাইড বই প্রচলিত ছিল। ইহাতে পথ-ঘাটের নাম, পথের ধারে অবস্থিত বিভিন্ন গ্রাম ও নগরের নাম, তাহাদের দূরত্ব ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবন্ধ থাকিত। এমন কি সমগ্র রোমক সাম্রাজ্যের রাস্তা-ঘাটের খুঁটিনাটি বিবরণ লিপিবন্ধ করিয়া এইরূপ গাইড বইও রচিত হইয়াছিল। ল্যাটিন ভাষায় এজাতীয় গাইড বইকে বলা হইত *itineraria adnotata*। খৃষ্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত *Itinerarium Antonini* এইরূপ একটি জনপ্রিয় গাইড বই। পথ সম্বন্ধে সর্বপ্রকার তথ্য একত্রিত করিয়া তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে আর এক ধরনের পুস্তকের কথাও জানা যায়। বোর্দো হইতে জেরুজালেমে যাইবার উপায় সম্বন্ধে ৩৩৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত *Itinerarium Burdigalense* পুস্তকটি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।*

এই ত গেল রোমক আমলে সাধারণভাবে ভৌগোলিক জ্ঞানের কথা। এই সময় অল্প কয়েকজন প্রথিতযশা ভৌগোলিকদের কার্যাবলী সম্বন্ধে যাহা জানা যায় সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। স্ট্রাবো, পম্পোনিয়াস্ মেলা ও ক্লডিয়াস্ টলেমী রোমক আমলের অন্যতম বিশিষ্ট ভৌগোলিক। তন্মধ্যে টলেমীকে শুধু রোমক আমলের কেন সমগ্র প্রাচীনকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভৌগোলিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

স্ট্রাবো (জন্ম—খৃঃ পূঃ ৬৩ অব্দ)

এসিয়া মাইনরে পণ্টুসের অন্তর্গত আমাসিয়ার অধিবাসী স্ট্রাবো জাতিতে গ্রীক। তাঁহার *Geography* প্রাচীনকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভৌগোলিক গ্রন্থ,—'the most important work in that science which antiquity has left us'।† আশ্চর্যের বিষয় এই যে, স্ট্রাবোর ভূগোল রোমকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। এমন কি প্লিনিও এই পুস্তকের কথা জানিতেন না। পুস্তকটি প্রথম প্রকাশিত হয় পণ্টুস হইতে। সম্ভবতঃ এই কারণে রোমকদের মধ্যে গ্রন্থটির প্রচার ঘটে নাই। কন্স্তান্তিনোপ্ল্ স্থাপিত হইবার পর হইতে স্ট্রাবোর পুস্তকের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং ইহাও জানা যায় যে, বাইজান্টিয়ামে তাঁহার পুস্তক সর্বশ্রেষ্ঠ ভূগোলের গ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত হইত। রেনেশাঁর সময় বাইজান্টিয়াম্ হইতে পশ্চিম ইউরোপে স্ট্রাবোর খ্যাতি বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়ে।

স্ট্রাবোর ভূগোল ঃ সতেরো খণ্ডে *Geography* রচিত। প্রথম দুই খণ্ড উপক্রমণিকা-

* Charles Singer, ***From Magic to Science***, Ernest Benn, 1928; p. 44.

† ***Encyclopaedia Britannica;*** 'Strabo' শীর্ষক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

স্বরূপ; ভূগোলের গোড়ার কথা এই দুই খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে। পরবর্তী আট খণ্ডের বিষয়বস্তু ইউরোপীয় ভূগোল,—স্পেন ও গলের (ফ্রান্স) উপর দুই খণ্ড, ইতালী ও সিসিলির উপর দুই খণ্ড, উত্তর ও পূর্ব ইউরোপের উপর এক খণ্ড এবং গ্রীস ও গ্রীক-প্রভাবিত দেশ সম্বন্ধে তিন খণ্ড। একাদশ খণ্ডে এসিয়ার ও দূরপ্রাচ্যের ভূগোল আলোচিত হইয়াছে। দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খণ্ডে এসিয়া মাইনর, পঞ্চদশ খণ্ডে পারস্য ও ভারতবর্ষ, ষোড়শ খণ্ডে অ্যাসিরিয়া, ব্যাবিলনিয়া, সিরিয়া ও আরব দেশ এবং সপ্তদশ খণ্ডে মিশর ও আফ্রিকার ভূগোল বর্ণিত হইয়াছে। সমগ্র প্রাচীন গোলার্ধের ইহা এক সম্পূর্ণ ও বিশদ ভূগোল। এই গ্রন্থ রচনায় তিনি ইরাটোস্থেনিসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন; গ্রন্থের তথ্য ও উপাদানও প্রধানতঃ পূর্ববর্তী গ্রীক ভৌগোলিকদের নিকট হইতে গৃহীত বটে, তবে রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ভূগোলের ইহা একটি সম্পূর্ণ রূপ। তাঁহার পূর্বে এইরূপ ব্যাপক ও বিশদভাবে ভূগোল রচনার কার্যে আর কেহ প্রবৃত্ত হয় নাই। হোমারের প্রতি স্ট্রাবোর অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল; কিন্তু হিরোডোটাস্‌কে তিনি বিশেষ কোন উচ্চ স্থান দেন নাই। তাঁহার মতে হিরোডোটাসের রচনা অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট।

স্ট্রাবোর ভূগোল রচনার একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহা কেবল বিভিন্ন মহাদেশ, দেশ, প্রদেশ প্রভৃতির নীরস প্রাকৃতিক বা রাজনৈতিক সীমানা-নির্দেশ নহে। ভৌগোলিক সংস্থানের সহিত জাতির ভাগ্য কিরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সভ্যতা বিকাশের সহিত ভূগোলের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, এই জাতীয় প্রশ্ন তিনি বহুস্থানে আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইউরোপীয় ভূগোলের সহিত ইউরোপীয় জাতিদের অভ্যুত্থান ও পতনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

"ইউরোপীয় ভূখণ্ডের বাসোপযোগী অঞ্চলসমূহের মধ্যে পার্বত্য হিমাঞ্চলের অধিবাসীরা স্বাভাবিক কারণেই এক অতি দুঃসহ ও হতভাগ্য জীবন যাপনে বাধ্য। উপযুক্ত শাসনকর্তার অধীনে এইসব অঞ্চলের দরিদ্র ও দুর্বৃত্ত জাতিরা তস্করবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সভ্য হইয়াছে। গ্রীকরাই তাহার এক দৃষ্টান্ত। তাহাদের বাসভূমি পার্বত্য অঞ্চল; কিন্তু রাজনীতি, উৎপাদন-বিদ্যা ও সভ্যজীবন যাপনের কৌশল আয়ত্ত করিবার ফলে গ্রীকরা খুব ভালভাবেই বসবাস করিয়াছে। পোতাশ্রয়বিহীন, শীতপ্রধান ও অধিকসংখ্যক লোকের বাসের অনুপযুক্ত পার্বত্য অঞ্চলের অসভ্য ও বর্বর জাতিরা রোমকদের অধীনে ও অন্যান্য সভ্যজাতির সংস্পর্শে আসিয়া সভ্য হইয়াছে। ইউরোপের সমতল ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলসমূহে একান্ত স্বাভাবিক কারণেই সভ্যতার বিকাশ সহজ হইয়াছে; প্রকৃতির অযাচিত অনুগ্রহে ও আশীর্বাদে সব কিছুই সেখানে শান্তিপ্রিয়। পক্ষান্তরে প্রকৃতির আশীর্বাদ হইতে বঞ্চিত দেশের অধিবাসীরা স্বভাবতঃই সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয়। এই দুই প্রকার দেশই পরস্পর পরস্পর হইতে নানারূপ উপকার ও সাহায্য পাইতে পারে; কৃষি, শিল্পসম্ভার ও চরিত্র-গঠন প্রথমোক্ত দেশের বৈশিষ্ট্য, শেষোক্ত দেশ সাহায্য করিবে সাহসী সৈনিক ও যোদ্ধা সরবরাহ করিয়া। যেখানেই এই দুই প্রকার দেশের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের ও সাহায্য বিনিময়ের অভাব সেখানেই নানারূপে ক্ষতির আশঙ্কা প্রবল। কিন্তু এইরূপ বিপদ হইতে ইউরোপকে রক্ষা করিবার জন্য প্রকৃতি আপনা হইতেই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। ইউরোপের প্রায় সর্বত্রই সমতলভূমি ও পার্বত্য অঞ্চলের বৈচিত্র্য বিদ্যমান। সুতরাং সর্বত্রই আমরা দেখি কৃষিজীবী শান্তিপ্রিয় জাতির পাশে যুদ্ধপ্রিয় জাতির বাস। শুধু তাহাই নহে, শান্তিপ্রিয় জাতিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় সমগ্র-ভাবে তাহাদেরই প্রভুত্ব বিরাজ করিতেছে। এই সভ্যতার প্রসার-কার্যে একে একে গ্রীক, ম্যাসিডোনীয় ও রোমকরা নেতৃত্ব করিয়াছে। এই সব কারণে শান্তি ও যুদ্ধের জন্য ইউরোপ বিশেষভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ।...... তাহার (ইউরোপের) আর একটি সুবিধা এই যে, সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ফল ও সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ধাতু এই মহাদেশে উৎপন্ন হয় এবং বিদেশ হইতে যেসব পণ্য তাহাকে আমদানি করিতে হয় তাহা মসলা, মহার্ঘ প্রস্তর ও মণি-

মুক্তা প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় বিলাস-সামগ্রী। তারপর গৃহপালিত পশুর সংখ্যাও যথেষ্ট, সে তুলনায় বন্য জন্তু দুষ্প্রাপ্য। ইহাই এই মহাদেশের সাধারণ বর্ণনা।" (দ্বিতীয় খণ্ড)

স্ট্রাবোর ভূগোলের সর্বত্র এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী বিদ্যমান। তাঁহার ভূগোলের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় মনুষ্যজাতি। মনুষ্যজাতির আশা-আকাঙ্খা, পতনোভ্যুত্থান, এক কথায় তাহার বিচিত্র ইতিহাস, পৃথিবীর নদ-নদী, গিরি-উপত্যকা, জঙ্গল, সমতল উর্বর ভূমি, মরুভূমি, জলবায়ু প্রভৃতি নৈসর্গিক কারণে কিভাবে প্রভাবিত হইয়াছে, স্ট্রাবো সেই কথা অতীব দরদের সহিত তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থে লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন।

পম্পোনিয়াস্ মেলা

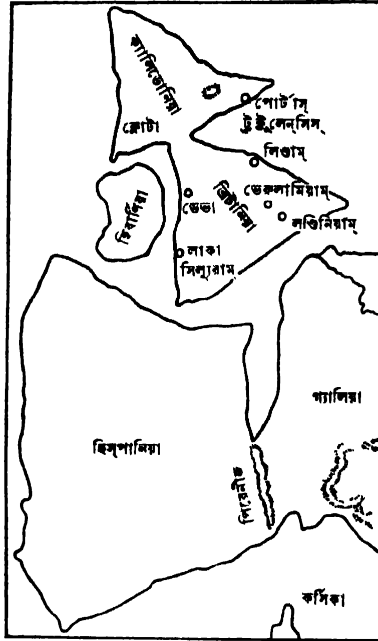
পম্পোনিয়াস্ মেলার জন্মভূমি স্পেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে তিনি জীবিত ছিলেন। সাধারণভাবে সমগ্র পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিয়াছেন। সর্বসাধারণের মধ্যে ভৌগোলিক জ্ঞান যাহাতে প্রসার লাভ করিতে পারে, তাঁহার রচনার ইহাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। মেলার অধিকাংশ তথ্য গ্রীক ভূগোল হইতে গৃহীত; ইরাটোস্থেনিসের নিকট তিনি বিশেষভাবে ঋণী। তিনি প্রথমেই ধরিয়া লইয়াছেন যে, পৃথিবী একটি গোলক

১১০। পৃথিবীর মানচিত্র—পম্পোনিয়াস্ মেলা।

এবং ইহার ভূভাগ চতুর্দিকে মহাসমুদ্র-পরিবেষ্টিত। পৃথিবীর উপরিভাগকে তিনি পাঁচটি বিশিষ্ট মণ্ডলে ভাগ করেন। মধ্যবর্তী মণ্ডল সূর্যতাপে বিদগ্ধ এবং বাসের অযোগ্য; অসম্ভব শৈত্যের জন্য উত্তর ও দক্ষিণের প্রান্তবর্তী মণ্ডল দুইটিও বাসের অনুপযুক্ত; গ্রীষ্মমণ্ডল ও হিমমণ্ডলের অন্তর্বর্তী নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল দুইটি কেবল বাসের উপযোগী এবং এই দুই অঞ্চলেই পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্যের বাস। পৃথিবীর যে গোলার্ধে আমাদের বাস তাহা মহাসমুদ্র-পরিবেষ্টিত। এই মহাসমুদ্র হইতে চারিটি প্রধান সাগর বা উপসাগর ভূখণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে; উত্তরে ক্যাস্পিয়ান সাগর, দক্ষিণে পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগর এবং পশ্চিমে ভূমধ্য সাগর এইরূপ চারিটি সাগর। মেলার অঙ্কিত মানচিত্রের

একটি নমনা দেওয়া হইল; ইহা যে প্রধানতঃ ইরাটোস্থেনিসের মানচিত্র অবলম্বনে রচিত ২২৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত মানচিত্রের সহিত মেলার মানচিত্র তুলনা করিলেই তাহা অনায়াসে বুঝা যাইবে।

সাগরের কথা শেষ করিয়া মেলা ইউরোপ, আফ্রিকা ও এসিয়া মহাদেশের বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত এই তিন মহাদেশের সীমারেখা প্রণিধানযোগ্য। মেলার মতে ইউরোপ ও এসিয়ার সীমারেখা নির্দেশ করিতেছে তানে বা (অধুনা) ডন নদী, মেওটিস হ্রদ বা আজব সাগর এবং ইউক্সিন বা কৃষ্ণসাগর। আফ্রিকা ও এসিয়াকে বিভক্ত করিয়াছে নীলনদ। তারপর একা এসিয়ার আয়তনই ইউরোপ ও আফ্রিকার মিলিত আয়তনের সমান। ভূমধ্য-



১১১। পশ্চিম ইউরোপের মানচিত্র (ট্যাসিটাসের বর্ণনা অবলম্বনে)।

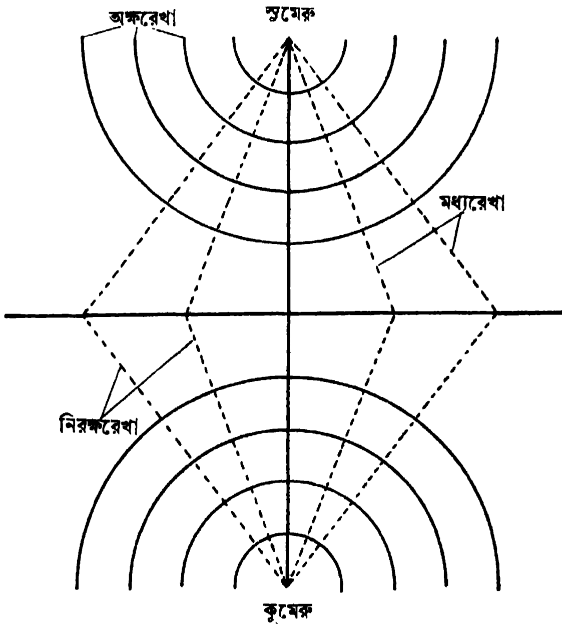
সাগরীয় অঞ্চল ও রোমক সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক সংস্থান তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু এই গন্ডীর বাহিরে যতই দূরে তিনি গিয়াছেন বর্ণনা ও তথ্যের দারিদ্র্য ততই প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে। এমন কি মধ্য ইউরোপের ভূগোলও তিনি সন্তোষজনক ও নির্ভুলভাবে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করেন নাই। এই ত্রুটী প্রায় প্রত্যেক রোমক লেখকদের মধ্যেই দেখা যায়। ট্যাসিটাস্ ও প্লিনির বিশ্বাস ছিল যে, স্পেন ইংল্যান্ডের পশ্চিমে এবং পিরেনীজ পর্বতশ্রেণী উত্তর-দক্ষিণে অবস্থিত।

ক্লডিয়াস্ টলেমী

গ্রীক জ্যোতিষ ও গণিতের আলোচনা প্রসঙ্গে ক্লডিয়াস্ টলেমীর সহিত পূর্বেই আমাদের পরিচয় ঘটিয়াছে। জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রের মত ভূগোলে, বিশেষতঃ গাণিতিক ভূগোলে, তিনি অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। ভৌগোলিক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি জ্যোতির্বিদ্ হিসাবে তাঁহার খ্যাতি অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। *Almagest* পরবর্তী কালের

জ্যোতিষীয় গবেষণা ও চিন্তাধারাকে যেরূপ প্রভাবিত করিয়াছিল, সেইরূপ পরবর্তী কালের ভূগোল-বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল তাঁহার *Guide to Geography*। ভূগোলকে বিজ্ঞানের ছাঁচে ঢালিয়া সাজাইবার প্রধান কৃতিত্ব টলেমীর।

অক্ষাংশ ও দেশান্তরের সাহায্যে মানচিত্র রচনা: অক্ষাংশ ও দেশান্তরের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের যে কোন স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ করিয়া মানচিত্র রচনা করা টলেমীর ভূগোলের বিশেষত্ব। টলেমীর তিন শত বৎসর পূর্বে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ হিপার্কাস্ অবশ্য এই পদ্ধতিতে ভূগোল আলোচনা ও মানচিত্র প্রস্তুত করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেরই অক্ষাংশ ও দেশান্তর জানা না থাকায় হিপার্কাসের পরামর্শমত মানচিত্র রচনা সম্ভবপর হয় নাই। টলেমীর কিছু পূর্বে মেরিনাস্ অব্ টায়ার নামে এক উৎসাহী ভৌগোলিক হিপার্কাসের পদ্ধতি অনুসারে মানচিত্র রচনায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন। অক্ষাংশ ও দেশান্তর জানা না থাকিবার অসুবিধা মেরিনাস্ও ভোগ করেন; তদুপরি এই দুই মাপ নির্ণয় করিবার ভাল কোন উপায়ও তাঁহার সময়ে জানা ছিল না। সুতরাং পর্যটকের ভ্রমণ-কাহিনী. পথ-ঘাটের বিবরণ প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের অক্ষাংশ ও দেশান্তর একরূপ অনুমান করিয়া লন এবং সেই অনুমান অনুসারে হিপার্কাসের পদ্ধতিতে পৃথিবীর মানচিত্র রচনা করেন। এই ধৈর্য ও প্রচেষ্টা রীতিমত



১১২। নিরক্ষরেখা, অক্ষরেখা ও মধ্যরেখার সাহায্যে মানচিত্রাঙ্কন পদ্ধতি—টলেমী।

প্রশংসার যোগ্য। দুঃখের বিষয় মেরিনাসের নিজস্ব রচনা ও গ্রন্থাবলীর সমস্তই অবলুপ্ত হইয়াছে; তাঁহার এই প্রচেষ্টার কথা জানা যায় টলেমীর লেখা হইতে। তারপর টলেমী নিজেও হিপার্কাস্ ও মেরিনাসের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া ভৌগোলিক গবেষণায় ব্রতী হইয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন, টলেমীর ভূগোল মেরিনাসের আরব্ধ গবেষণার সম্প্রসারণ মাত্র।

তিনি নিজেও বহু স্থানে মেরিনাসের কথা উল্লেখ করিয়া এই ভৌগোলিকের প্রতি তাঁহার নিজের ঋণের কথা অকপটেই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই কথা সত্য নহে যে, টলেমীর ভূগোল মেরিনাসের প্রচেষ্টার সম্প্রসারণ মাত্র। তিনি পূর্ববর্তীদের অসম্পূর্ণ ও অসংলগ্ন কাজকে সম্পূর্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছিলেন। অক্ষাংশ ও দেশান্তরের সাহায্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পৃথিবীর এবং পৃথক ও বিশদভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া ভূগোলকে তিনি সঠিক পথে পরিচালনা করিয়াছিলেন।

টলেমী নিরক্ষরেখা ও নিরক্ষরেখার সমান্তরালভাবে অঙ্কিত অনেকগুলি অক্ষরেখার পরিকল্পনা করেন। এই সব অক্ষরেখার একটি গিয়াছে উত্তরে থিউলের মধ্য দিয়া, একটি রোড্‌স্‌ দ্বীপের কাছ দিয়া, একটি মেরোর উপর দিয়া ইত্যাদি। নিরক্ষরেখাকে তিনি আবার ৩৬০ ভাগে (৩৬০° ডিগ্রীতে) বিভক্ত করেন। নিরক্ষরেখাকে (equator) লম্বভাবে ছেদ করিয়া সুমেরু ও কুমেরুর মধ্য দিয়া পৃথিবীকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে, এইরূপ কতকগুলি বৃত্ত বা মধ্যরেখা (meridian) তিনি কল্পনা করেন। দেশান্তর নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে যে মধ্যরেখাটি ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের নিকট দিয়া গিয়াছে তাহাকে তিনি প্রথম মধ্যরেখা ধরিয়া



১১৩। অক্ষাংশ ও দেশান্তর অবলম্বনে অঙ্কিত গ্রেট বৃটেনের মানচিত্র—টলেমী।

লন। এইখানে আর একটি প্রশ্ন আছে। পৃথিবীর উপরিভাগ সমতল নহে, ইহা গোলাকার। অথচ মানচিত্র আঁকিতে হইবে একটি সমতল কাগজ বা অনুরূপ কোন বস্তুর উপর। সুতরাং একটি গোলকের উপর অক্ষরেখা, মধ্যরেখা প্রভৃতি যেভাবে টানা যায়, সমতল কোন বস্তুর উপর তাহা টানিতে হইলে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। টলেমী-প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে মানচিত্রের মধ্যস্থলে পূর্ব হইতে পশ্চিমে একটি সরল রেখা আঁকিয়া তাহার দ্বারা নিরক্ষরেখা বুঝানো হইত। তারপর সুমেরু অথবা কুমেরুকে কেন্দ্র করিয়া অঙ্কিত বৃত্তাংশের সাহায্যে অক্ষরেখা এবং সুমেরু বা কুমেরু হইতে নিরক্ষরেখার উপর প্রক্ষিপ্ত সরল রেখার

দ্বারা মধ্যরেখা নির্দিষ্ট হইত (১১২নং চিত্র)। এইভাবে নিরক্ষরেখা, অক্ষরেখা ও মধ্যরেখার এক জটিল কাঠামো প্রস্তুত করিয়া টলেমী পৃথিবীর মানচিত্র রচনায় প্রবৃত্ত হন।

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের অক্ষাংশ ও দেশান্তর সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্যের একান্ত অভাব মেরিনাসের মত টলেমীর প্রচেষ্টাকেও বিশেষভাবে ব্যাহত করিয়াছিল। বাধ্য হইয়া টলেমীকেও তাই পর্যটকদের ভ্রমণ কাহিনী ও পথ-বৃত্তান্তের উপর নির্ভর করিতে হয়, ফলে একই কারণে তাঁহার পক্ষেও নির্ভরযোগ্য মানচিত্র রচনা করা একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর তিনি আর একটি মারাত্মক ভুল করিয়া বসেন পৃথিবীর পরিধির মান নির্ধারণ ব্যাপারে। ইরাটোস্থেনিস্ পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করিয়াছিলেন ২৫০,০০০ ষ্টাডিয়া; পোসিডোনিয়াস্ ইহা নির্ণয় করেন ১৮০,০০০ ষ্টাডিয়াতে। যে কোন কারণেই হউক টলেমী পোসিডোনিয়াস কর্তৃক নির্ণীত পৃথিবীর পরিধির ভুল মাপ ১৮০,০০০ ষ্টাডিয়া (বা ১৮,০০০ ভৌগোলিক মাইল) গ্রহণ করেন। ইহাতে এক এক ডিগ্রী অক্ষাংশের বা দেশান্তরের দূরত্ব দাঁড়াইল ৫০০ ষ্টাডিয়া; আসলে ডিগ্রী প্রতি এই দূরত্ব ৬০০ ষ্টাডিয়া। এইরূপে পৃথিবীর পরিধির ক্ষুদ্রতর মান গ্রহণ করিবার ফলে মানচিত্রে পৃথিবীর এক স্থান হইতে অন্য স্থানের দূরত্ব নির্দেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল হইল। এই ভুলের জন্য এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অক্ষাংশ ও দেশান্তরের প্রকৃত মাপ জানা না থাকায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করা সত্ত্বেও টলেমীর মানচিত্র স্থানে স্থানে এক অতি অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে। উপরিউক্ত পদ্ধতি এবং টলেমী-প্রদত্ত অক্ষাংশ ও দেশান্তর অবলম্বন করিয়া গ্রেট বৃটেনের মানচিত্র অংকন করিলে তাহার কিরূপ চেহারা হইবে ১১৩নং চিত্রে তাহা দ্রষ্টব্য। স্কটল্যাণ্ড ইংল্যাণ্ডের মাথার উপর সোজাভাবে অবস্থান করিবার পরিবর্তে পূর্বদিকে সম্পূর্ণ হেলিয়া রহিয়াছে; অর্থাৎ স্কটল্যাণ্ডের অক্ষ ইংল্যাণ্ডের অক্ষের সহিত সমান্তরালভাবে থাকিবার পরিবর্তে একটি সমকোণ উৎপন্ন করিয়াছে।

উত্তর ও দক্ষিণে এবং পূর্ব ও পশ্চিমে পৃথিবীর স্থলভাগের বিস্তৃতি টলেমী নির্ধারণ করেন। পূর্ববর্তী গ্রীক ভৌগোলিকদের অনুমান ও অভিজ্ঞতা যাচাই করিয়া তিনি থিউলকে পৃথিবীর ভূখণ্ডের সর্বোত্তর সীমা মনে করেন। স্কটল্যাণ্ডের কিছু উত্তর-পূর্বে আধুনিক জেটল্যাণ্ড দ্বীপকে প্রাচীনকালে থিউল বলা হইত। এই থিউলের অক্ষাংশ টলেমীর হিসাবে ৬৩° ডিগ্রী এবং ইহার সহিত অধুনা নির্ণীত অক্ষাংশের পার্থক্য খুব বেশী নহে। সেইরূপ দক্ষিণে স্থলভাগের সর্বশেষ সীমারেখা তিনি টানেন ইথিওপিয়ার (আফ্রিকা) আগিসিম্বা নামক স্থানে; বিষুবরেখা হইতে ধরিলে আগিসিম্বার অক্ষাংশ প্রায় ১৭° ডিগ্রী। সুতরাং থিউল হইতে আগিসিম্বার দূরত্ব হইতেছে ৮০° ডিগ্রী বা ৪০,০০০ ষ্টাডিয়া (৪,০০০ মাইল)। উত্তর-দক্ষিণে ইহাই স্থলভাগের ব্যাপ্তি। পূর্ব ও পশ্চিমে ভূখণ্ডের ব্যাপ্তি নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে টলেমী ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জকে পশ্চিমের সর্বশেষ সীমা এবং চীনদেশের অন্তর্গত সেরি নামক স্থানকে দূরপ্রাচ্যের শেষ সীমা মনে করেন। মেরিনাস্ ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ হইতে সেরির দূরত্ব ৯১,২৮০ ষ্টাডিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন; টলেমীর গণনা অনুযায়ী এই দূরত্ব হইল ৭০,৯০০ ষ্টাডিয়া (৭০৯০ মাইল)। মোটামুটিভাবে পৃথিবীর স্থলভাগের বিস্তৃতি দৈর্ঘ্যে ৭,০০০ মাইল ও প্রস্থে ৪,০০০ মাইল, টলেমীর সময় ভৌগোলিকদের এইরূপ ধারণা ছিল।

হোমারের কাল হইতে গ্রীক ভৌগোলিকদের এইরূপ এক ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, পৃথিবীর স্থলভাগ চতুর্দিকে মহাসমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। হিরোডোটাস্, ইরাটোস্থেনিস্, পম্পোনিয়াস্ মেলা প্রমুখ প্রায় প্রত্যেক ভৌগোলিকই সসাগরা পৃথিবীর পরিকল্পনায় আস্থাবান ছিলেন। একমাত্র হিপার্কাস্ এরূপ মতবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সময় পর্যন্ত জ্ঞাত ভূখণ্ডের সীমার বাহিরেও অপরিচিত ভূখণ্ডের অস্তিত্ব সম্ভবপর। টলেমী হিপার্কাসের এই উক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি এক জায়গায়

লিখিয়াছেন, ইউরোপের পূর্বাঞ্চল ক্রমাগত উত্তরদিকে প্রসারিত, এসিয়া মহাদেশ উত্তরে, পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে বেপরোয়াভাবে বিস্তৃত হইয়া কোথায় যে শেষ হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে এবং আফ্রিকাও অনির্দিষ্টভাবে দক্ষিণে, দক্ষিণ-পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পূর্বে প্রসারিত। দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্বে আফ্রিকার এই বিস্তৃতি অনুমান করিবার ফলে টলেমীর মানচিত্রে এই মহাদেশের একাংশ দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়াকে প্রায় স্পর্শ করিবার কথা। সে ক্ষেত্রে ভারত মহাসাগর একটি বিরাট হ্রদে পর্যবসিত হইয়া পড়ে এবং আফ্রিকা ও এসিয়ার, তটরেখা এক অতি অদ্ভুত আকার ধারণ করে। তারপর পূর্বদিকে এসিয়ার বিরাট বিস্তৃতি অনুমান করিবার ফলে টলেমীর গণনায় অতলান্তিক মহাসাগরের প্রস্থ দাঁড়ায় মাত্র ৫০° ডিগ্রী বা ২,৫০০ মাইল। অতলান্তিক মহাসাগরের এইরূপ স্বল্প বিস্তৃতির অনুমান স্মরণ করিয়াই কলম্বাসের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে, এই মহাসাগর দুরতিক্রমণীয় নহে এবং ইহা অতিক্রম করিতে পারিলেই চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি আশ্চর্য দেশে পৌঁছানো যাইবে।

> "It must be noticed that Ptolemy's extension of Asia eastwards, so as to diminish by 50° of longitude the interval between easternmost Asia and westernmost Europe, fostered Columbus' belief that it was possible to reach the former from the latter by direct navigation, crossing the Atlantic."
> —*Encyclopaedia Britannica.*

টলেমী আগাগোড়া গণিত ও জ্যোতিষের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহার ভূগোল রচনা করিয়াছেন। তাই *Guide to Geography*-তে বিভিন্ন দেশের বর্ণনা, তাহার জলবায়ু, প্রাকৃতিক সম্পদ, জাতি-পরিচয় প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিতান্তই খাপছাড়াভাবে আলোচিত দেখা যায়। এই ব্যাপারে তিনি স্ট্রাবোর ঠিক বিপরীত। নদী-সম্পদ, পাহাড় ও পর্বতমালার সংস্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে স্ট্রাবো সর্বদা সজাগ ও সচেতন; তাঁহার মতে এই প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈচিত্র্যই দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে টলেমী এই বিষয়ে একেবারে উদাসীন। গল দেশের ভূগোল আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলির কথা তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন; এমন কি রাইন নদীর বড় বড় উপনদীর একটির কথাও তিনি উল্লেখ করেন নাই।

এই সব ত্রুটী-বিচ্যুতি সত্ত্বেও টলেমী প্রাচীনকালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠ ভৌগোলিক। আট খণ্ডে সমাপ্ত বিরাট গ্রন্থে তিনি প্রাচীন ভৌগোলিক জ্ঞানের এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন, ভূগোলকে বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই ভূগোল পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ল্যাটিন ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেন ম'পেলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার গিয়াকোমো এঞ্জেলো। ১৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইহা সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয় বোলোনা হইতে। কলম্বাস এই মুদ্রিত ল্যাটিন সংস্করণেরই এক খণ্ড অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

৭·৭। ল্যাটিন ইউরোপে অন্ধকার যুগের কয়েকজন বিজ্ঞানী ও দার্শনিক

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে গ্যালেন ও টলেমীর পর একমাত্র গণিত ছাড়া বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগে গবেষণা ইউরোপে দেখা যায় না। এই সময়ের জ্ঞান-চর্চা প্রাচীন পুঁথিপত্রের নানাবিধ টীকা ও ব্যাখ্যা রচনার মধ্যেই প্রধানতঃ নিবদ্ধ থাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কয়েকজন দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর দার্শনিকের প্রচেষ্টা ব্যতীত এ যুগে লিপিবদ্ধ করিবার মত কিছুই নাই। তথাপি ইউরোপে অন্ধকার যুগে চারিদিকে জ্ঞান-চর্চায় নিদারুণ অবহেলার মধ্যে দর্শন ও বিজ্ঞান আলোচনার দ্বারা বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে যেটুকু উৎসাহ সৃষ্টি করিতে

তাঁহারা প্রয়াস পাইয়াছিলেন, ক্ষুদ্র হইলেও তাহার মূল্য বড় কম নহে। দুর্যোগের রাত্রিতে নির্বাণোন্মুখ দুর্বল দীপশিখাকে তাঁহারাই ত শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন।

ক্যালসিডিয়াস্ (চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগ)

নিও-প্লেটোনিজ্‌মকে মধ্যযুগে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার মূলে ক্যালসিডিয়াসের প্রয়াস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ল্যাটিন ভাষায় প্লেটোর *Timaeus* গ্রন্থের এক ভাষ্য তিনি প্রস্তুত করেন। দ্বিতীয় শতাব্দীতে অ্যাপিউলিয়াস্ কর্তৃক অনূদিত *Timaeus*-এর এক সংস্করণের উপর ভিত্তি করিয়াই এই ভাষ্য প্রধানতঃ রচিত। এই ভাষ্যের গুরুত্ব এই যে, মধ্যযুগে প্রায় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বিদ্বৎসমাজে প্লেটোর পরিচয় ঘটিয়াছিল একমাত্র ক্যালসিডিয়াসের ভাষ্যের মাধ্যমে। জ্যোতিষ সম্বন্ধেও তাঁহার কিছু ব্যুৎপত্তি ছিল।

ম্যাক্রোবিয়াস্ (৩৯৫-৪২৩)

নিও-প্লেটোনিষ্ট ম্যাক্রোবিয়াসের খ্যাতি প্রধানতঃ দুইখানি গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত—*Saturnalia* ও সিসেরো কর্তৃক রচিত *Somnium Scipionis* উপর একখানি টীকা। নিও-প্লেটোনিজ্‌মের আলোচনা মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও ইহাতে প্রসঙ্গত পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, ভূগোল ও গণিত সম্বন্ধীয় নানা বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ম্যাক্রোবিয়াসের সময়ে সাধারণ শিক্ষিত সমাজের ব্যক্তিগণ কি ধরনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান শিক্ষা ও অর্জন করিতেন, এই পুস্তক দুইটি তাহার এক উদাহরণ।

মার্সেলাস্ এম্পিরিকাস্

বর্দো-নিবাসী মার্সেলাস্ এম্পিরিকাস্ চিকিৎসাবিদ্ ও ভেষজবিদ্ ছিলেন। চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁহার *De medicamentis* ভেষজ ও চিকিৎসাবিদ্যার বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক তথ্যেরও যেমন কিছু কিছু সমাবেশ আছে তেমনি টোট্‌কা, হাতুড়ে চিকিৎসা ও অনুরূপ কুসংস্কারজনিত চিকিৎসা-প্রণালীর বর্ণনার প্রাচুর্যেরও অভাব নাই। দ্রব্যগুণ সংক্রান্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বহু উদ্ভিদের উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রোক্লাস্ (৪১০-৪৮৫)

নিও-প্লেটোনিক দার্শনিক প্রোক্লাস্ গণিতে ও জ্যোতিষে পারদর্শী ছিলেন। ইউক্লিডের *Elements*-এর উপর তিনি এক বিশদ টীকা রচনা করেন; এই টীকা প্রসঙ্গে তিনি এমন অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের সমাবেশ করেন যাহা গ্রীক জ্যামিতির ইতিহাস বুঝিবার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ঐতিহাসিক তথ্য এক্ষণে লুপ্ত ইউডিমাস্ ও জেমিনাসের গ্রন্থ হইতে গৃহীত। বক্ররেখার নানা জ্যামিতিক প্রশ্ন লইয়া স্বাধীনভাবে তাঁহার কতকগুলি গবেষণারও উল্লেখ পাওয়া যায়। তারপর হিপার্কাস্ ও টলেমীর জ্যোতিষের তিনি এক মনোজ্ঞ উপক্রমণিকা লেখেন। এই উপক্রমণিকার বিশেষত্ব এই যে, জলঘড়ির সাহায্যে সূর্যের আপাত ব্যাস নির্ধারণ করিবার এক পদ্ধতি, সূর্যের বলয়-গ্রাসের উল্লেখ এবং আরও কতকগুলি নূতন বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, প্রোক্লাস্ শুধু একজন টীকাকারই ছিলেন না, তাঁহার চিন্তারও যথেষ্ট মৌলিকতা ছিল।

মার্টিয়ানাস্ ক্যাপেলা (আনুমানিক ৪৭০ খ্রীষ্টাব্দ)

প্রোক্লাসের সমসাময়িক মার্টিয়ানাস্ ক্যাপেলা কার্থেজের গৌরব। আনুমানিক ৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত তাঁহার *Satyricon* বা *De nuptiis Philologiae et Mercurii*

et de septem artibus liberalibus libri novem বিশ্বকোষের সহিত তুলনীয়। *গ্রন্থটি গদ্যে ও পদ্যে রচিত। নবম খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থের ১ম ও ২য় খণ্ড রূপকাকারে লিখিত উপক্রমণিকা বিশেষ। পরবর্তী সাত খণ্ডে যথাক্রমে ব্যাকরণ, ন্যায়, অলঙ্কার, জ্যামিতি ও ভূগোল, পাটীগণিত, জ্যোতিষ এবং সংগীত ও কাব্য আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ৮ম খণ্ডের জ্যোতিষীয় আলোচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে এক অসম্পূর্ণ সূর্যকেন্দ্রীয়* বিশ্বপরিকল্পনার আভাস পাওয়া যায়। এই পরিকল্পনা সত্ত্বেও তাঁহার ব্রহ্মাণ্ড-চিত্র নিও-প্লেটোনিক দর্শনের ছাঁচেই গড়া। ক্যাপেলাসিডিয়াস্ ও ম্যাক্রোবিয়াসের মত ক্যাপেলার রচনাও মধ্যযুগে ব্যাপকভাবে পঠিত ও অধীত হইত।

ইসিডোর অব সেভিল (আনুমানিক ৫৬০-৬৩৬)

প্রাথমিক যুগের খ্রীষ্টান পণ্ডিতদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন এরূপ কাহারও নাম যদি করিতে হয়, তাহা হইলে ইসিডোরের নামই সর্বাগ্রে করা উচিত। স্পেনের সেভিলে অথবা কার্তাজেনায় তাঁহার জন্ম হয় এবং আনুমানিক ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি সেভিলের বিশপের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ *Etymologiarum sive Originum libri xx* মধ্যযুগীয় বিশ্বকোষের আদর্শেই রচিত বটে, কিন্তু ইহার আলোচনায় বৈজ্ঞানিক বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ বিশেষ লক্ষণীয়। পাটীগণিত, সংগীত, জ্যামিতি ও জ্যোতিষ এই চারিটি বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী ও মতবাদ খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের দ্বারা পরিচালিত হইলেও মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক বিষয়কে ধর্মতত্ত্ব হইতে পৃথক করিয়া বিচার করিবার একটা চেষ্টা ইসিডোরের মধ্যে দেখা যায়।* বিজ্ঞানের দিক হইতে *Originum*-এর মূল্য অবশ্য কিছুই নাই, তথাপি সমসাময়িক কালের বৈজ্ঞানিক অনগ্রসরতার কথা বিচার করিলে ইসিডোরের এই বিজ্ঞান-প্রীতিটুকুই যথেষ্ট বলিয়া মনে হইবে। ইসিডোরের আর একটি গ্রন্থ *De natura rerum* জ্যোতিষ, আবহতত্ত্ব ও ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব লইয়া লিখিত। মধ্যযুগে এই পুস্তকটির বিশেষ জনপ্রিয়তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

ষ্টিফানাস্ (৬১০-৬৪১)

সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে এই নামে দুইজন ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। একজনের জন্মস্থান আলেকজান্দ্রিয়া ও আর একজনের এথেন্স্; উভয়েরই কর্মস্থল ছিল কন্স্তান্তিনোপল্। আলেকজান্দ্রিয়া-নিবাসী ষ্টিফানাস্ ছিলেন দার্শনিক, গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্। অ্যারিস্টট্লের উপর তাঁহার এক টীকা আছে। জ্যোতিষ সম্বন্ধেও তিনি একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কিমিয়া সম্বন্ধেও তাঁহার একটি গ্রন্থের কথা জানা যায়। এথেন্স-নিবাসী ষ্টিফানাস্ ছিলেন চিকিৎসাবিদ্। হিপোক্রেটিস্ ও গ্যালেনের উপর কয়েকটি টীকা এবং জ্বর মূত্রাশয়ের পীড়া সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ তাঁহার রচনা বলিয়া অনুমিত হয়। তবে জ্যোতির্বিদ্ ও চিকিৎসক ষ্টিফানাস্ দুই ব্যক্তি না একই ব্যক্তি ছিলেন সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ এখনও ঠিক করিয়া কিছু বলিতে পারেন নাই।

ক্যালিনিকাস্ (আনুমানিক ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দ)

ক্যালিনিকাস্ সম্বন্ধে বিজ্ঞানের ঐতিহাসিকদের কৌতূহলের প্রধান কারণ তিনিই নাকি তথাকথিত 'গ্রীক আগুনে'র আবিষ্কর্তা। কথিত আছে যে, ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আরবরা

* "Poor as the Origines are, they reveal a genuine interest in science. independently from theology."—Sarton, *Introduction to the History of Science*, Vol. I; p. 471.

কনস্তান্তিনোপল্ অবরোধ করিলে বাইজান্টাইনরা এই 'গ্রীক আগুন' নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের জাহাজগুলিকে বিনষ্ট ও পলাইয়া যাইতে বাধ্য করে। বাইজান্টাইন ঐতিহাসিকদের মতে ক্যালিনিকাসই 'গ্রীক আগুনে'র আবিষ্কর্তা। সার্টন লিখিয়াছেন, এই 'গ্রীক আগুন' সম্ভবতঃ কলিচুন (Quicklime), ন্যাপথা, পীচ্ ও গন্ধকের মিশ্রণ। এই মিশ্রণে শোরা ছিল কিনা তাহা জানা যায় না। জলের নীচেও এই মিশ্রণ অগ্নিকাণ্ড ঘটাইতে পারে।

বীড (৬৭৩-৭৩৫)

ইংরেজ ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ্ বীড বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা ঐতিহাসিক হিসাবেই সুপরিচিত। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের তিনি জনক এবং মধ্যযুগীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যেও বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞানেও তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন এবং এই বিষয়ে তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল নিঃসংশয়ে ইসিডোরের পাণ্ডিত্য অপেক্ষা উন্নততর। ইহার অন্যতম কারণ প্লিনির *Historia Naturalis*-এর সহিত তাঁহার পরিচয়। এতদ্ব্যতীত বীড গ্রীক ও হিব্রু ভাষা জানিতেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ *De natura rerum* কতকটা প্লিনির গ্রন্থের অনুকরণে প্রণীত। *De temporum ratione* নামক আর একটি গ্রন্থে তিনি জোয়ার-ভাঁটার কথা লিখিয়াছেন; ইহাতে বন্দর স্থাপনের পরিকল্পনা সম্বন্ধেও অনেক পরামর্শ আছে। জোয়ার-ভাঁটার সম্বন্ধে তিনি প্লিনির মত সমর্থন করিতেন। পাটীগণিত সম্বন্ধেও তাঁহার কয়েকখানি পুস্তক আছে।

অ্যাল্কুইন্ (৭৩৫-৮০৪)

ইউরোপে অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন আর একজন ইংরেজ। অ্যাল্কুইনের জন্ম ইয়র্কে আনুমানিক ৭৩৫ খৃষ্টাব্দে। বীডের আদর্শে তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ধর্মতাত্ত্বিক ও শিক্ষাব্রতী অ্যাল্কুইনের প্রধান কীর্তি সম্রাট শার্লেমাইনের পৃষ্ঠপোষকতায় পশ্চিম ইউরোপে নূতন করিয়া শিক্ষার আদর্শের প্রতিষ্ঠা। সাধারণ অজ্ঞতা ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখিয়া শার্লেমাইন বিশেষ বিচলিত হইয়াছিলেন এবং এই বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য তিনি এক শিক্ষা-সংস্কার-পরিকল্পনা প্রণয়নের সংকল্প গ্রহণ করেন। সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি অ্যাল্কুইনের উপর এই ভার অর্পিত হয়। অ্যাল্কুইন্ প্রত্যেক ধর্ম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলিবার প্রস্তাব করেন। এতদ্ব্যতীত রাজপ্রাসাদের মধ্যেই তিনি এক গ্রন্থাগার, শিক্ষাগৃহ ও একপ্রকার বিদ্যাপীঠ বা একাডেমী স্থাপন করেন। শার্লেমাইন 'De litteris colendis' নামে যে বিখ্যাত শিক্ষাসনদ জারি করেন, তাহাতে অ্যাল্কুইনের প্রভাব বিদ্যমান। ইউরোপীয় মধ্যযুগে বিদ্যোৎসাহিতার পুনর্জন্মের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা এবং ইতিহাসে এই প্রয়াস 'ক্যারোলিঙ্গীয় পুনর্জন্ম' নামে খ্যাত। তবে এই বিদ্যোৎসাহিতা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই; শার্লেমাইনের মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ইহা আবার সাধারণ অজ্ঞতায় ডুবিয়া গিয়াছিল।

অ্যাল্কুইন্ নিজে অধিকাংশ পুস্তক লিখিয়াছেন ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন সম্বন্ধে এবং কয়েকটি পুস্তক ব্যাকরণ ও পাটীগণিত সম্বন্ধে। তাঁহার পাটীগণিতে নানারূপ জটিল সমস্যার নির্দেশ থাকিত। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ১০০ বস্তা শস্য ১০০টি পরিবারের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল যে, প্রত্যেক পুরুষ ৩ বস্তা, প্রত্যেক স্ত্রী ২ বস্তা এবং প্রত্যেক শিশু অর্ধ বস্তা শস্য পাইল; সর্বসমেত কতজন পুরুষ, স্ত্রী ও শিশু এই পরিবারগুলিতে ছিল?

বীড ও অ্যাল্কুইনের পর রাবানাস্ মৌরাস্ (৭৭৬-৮৫৬) ইউরোপে এই নূতন বিদ্যোৎসাহিতা কিছুদিন বজায় রাখেন। তাঁহার স্থাপিত ফুল্ডার বিদ্যাপীঠ সেই সময়ে এক বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।

লিওন অব থেসালোনিকা (খ্রীষ্টাব্দ নবম শতাব্দী)

নবম শতাব্দীতে বাইজান্টাইন দার্শনিক লিওন অব থেসালোনিকার নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি থেসালোনিকার আর্কবিশপ ও কনস্তান্তিনোপলের রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। নানারূপ যান্ত্রিক কৌশল আবিষ্কারের জন্য তিনি খ্যাত। তাঁহার আবিষ্কারের মধ্যে অটোম্যাটা প্রধান। আলোক-সংকেত দ্বারা একপ্রকার বার্তাপ্রেরণ-ব্যবস্থা (optical telegraph) তিনি উদ্ভাবন করেন। গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষ ও ভাগ্যগণনা সম্বন্ধে তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সাত খণ্ডে সমাপ্ত চিকিৎসাশাস্ত্রের এক বিশ্বকোষ তাঁহার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। অস্ত্রচিকিৎসা সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বিশদ আলোচনা আছে। বাইজান্টাইনে বিদ্যোৎসাহিতা সৃষ্টি করিতে তিনি বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছিলেন এবং বাইজান্টাইন্ রেণেশাঁর সঙ্গে তাঁহার নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাইজান্টাইনে বিদ্যোৎসাহিতার এই নবজন্মের কালে প্রাচীন গ্রীক পুঁথিপত্র কিছুটা রক্ষা হইয়াছিল। এই সময়েই আর্কিমিডিসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি পুনরাবিষ্কৃত হয়।

এরিগেনা (খ্রীষ্টাব্দ নবম শতাব্দী)

নবম শতাব্দীর আর একজন খ্রীষ্টান পণ্ডিতের কথা উল্লেখ করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। এরিগেনা বা জন স্কোটাস্ (৮০০-৮৭৭) ছিলেন মধ্যযুগের এক বিশিষ্ট ও প্রতিভাবান দার্শনিক, সার্টনের মতে "One of the most original philosophers of the Middle Ages"। পণ্ডিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর অপেক্ষা স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তির উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। গ্রীক ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং গ্রীক হইতে ল্যাটিনে কয়েকটি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। ক্যাল্‌সিডিয়াসের গ্রন্থপাঠে তিনি প্লেটো সম্বন্ধে অবগত হন। জ্যোতিষীয় জ্ঞান ও ধারণার জন্যও তিনি প্রধানতঃ ক্যাল্‌সিডিয়াস্ ও ক্যাপেলার গ্রন্থাবলীর নিকট ঋণী। হেরাক্লিডিস্ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া বুধ ও শুক্রকে পরিক্রমণরত পরিকল্পনা করিয়াছিলেন; এরিগেনা মনে করেন যে, বৃহস্পতি ও মঙ্গলও সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া বৃত্তপথে আবর্তিত হইয়া থাকে। তাঁহার বৈজ্ঞানিক রচনা অপেক্ষা ধর্মদর্শন সম্বন্ধীয় রচনাই প্রধান। ৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত *De divisione naturae* তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় প্রকৃতির একতা; এই একতা ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত এবং ঈশ্বরেই তাহার শেষ।

অষ্টম অধ্যায়

৮·১। প্রাচীন বিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি ও ইউরোপে অন্ধকার যুগের সূচনা

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মাইলেটাসের থালেসের সময় হইতে সুরু করিয়া খ্রীষ্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ও পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে আলেকজান্দ্রিয়ার প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও প্রাচীনকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদুষী মহিলা হাইপেসিয়ার কাল পর্যন্ত এক হাজার বৎসরের গ্রীক ও গ্রেকো-রোমক বিজ্ঞানের ইতিহাস মোটামুটি বিশদভাবেই পর্যালোচিত হইয়াছে। গণিত, জ্যোতিষ ও ভূগোল, উদ্ভিদ্, প্রাণী ও জীববিদ্যা, চিকিৎসা ও ভেষজবিজ্ঞান, পদার্থ-বিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা, স্থাপত্য ও পূর্তবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় জাতিরা এই এক হাজার বৎসরের সাধনায় যে কি অপূর্ব অবদান রাখিয়া গিয়াছিল ও কিরূপ আশ্চর্য উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছিল, এই আলোচনা হইতে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। এই সময়ের মধ্যে জ্যামিতি, গণিত ও বীজগণিতের ভিত্তি পাকা হইয়াছিল; গ্রীক জ্যোতিষীয় মতবাদ এক্ষণে পরিত্যক্ত হইলেও হিপার্কাস্ ও টলেমীর হাতে সীমায়িত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার গণ্ডীর মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যার চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল; চিকিৎসা-বিজ্ঞান, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও জীববিদ্যার ভিত্তিস্থাপনা ও কাঠামোরচনা করেন হিপোক্রেটিস্, অ্যারিস্টট্‌ল্, থিওফ্রেস্‌টাস্ ও গ্যালেনের মত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানিগণ। ইরাটোস্থেনিস্, স্ট্রাবো ও টলেমীর হাতে আধুনিক ভূগোলের উৎপত্তি।

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এই এক হাজার বৎসরের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞানের উৎস সন্ধান করিতে হইলে এই গ্রীক ও গ্রেকো-রোমক বিজ্ঞানের মধ্যে তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে; কারণ, আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত এই প্রাচীন বিজ্ঞানের সম্পর্ক অভেদ্য। প্রাচীন বিজ্ঞানের জের টানিয়াই আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ভেসালিয়াস্, হার্ভি, কোপার্নিকাস্, প্যারাসেল্‌সাস্ প্রমুখ বিজ্ঞানিগণ গভীরভাবে প্রাচীন বিজ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই আধুনিক বিজ্ঞানের সন্ধান দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রেণেশাঁর এক অন্যতম কারণ ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে প্রাচীন গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পুঁথিপত্রের প্রতি প্রীতি ও অনুরাগের পুনর্জন্ম। এই পুঁথিপত্র ঘাঁটিয়া এবং ইহাদের মধ্যে প্রাচীন মনীষীদের আশ্চর্য ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া ইউরোপ আবার নূতন উদ্যমে বিজ্ঞান-সাধনায় উদ্বুদ্ধ হয়। হিপার্কাস্ ও টলেমী যেখানে শেষ করিয়াছিলেন ঠিক তাহার পর হইতেই কোপার্নিকাস্ তাঁহার জ্যোতিষীয় গবেষণা সুরু করেন। ভেসালিয়াস্ ও হার্ভির গবেষণা যুগান্তকারী হইলেও একদিক দিয়া বিচার করিলে তাহা যে গ্যালেনের গবেষণারই সম্প্রসারণ একথা অনস্বীকার্য। এইভাবে বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগেই দেখা যাইবে, প্রাচীন বিজ্ঞানীরা যেখানে আসিয়া শেষ করিয়াছিলেন তাহার অব্যবহিত পর হইতেই আধুনিক বিজ্ঞানের যাত্রা সুরু হইয়াছিল।

কিন্তু এই শেষ ও সুরু সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে নাই। দুই-এর মাঝখানে আমরা দেখিতে পাই এক হাজার হইতে বার শত বৎসরের দীর্ঘ ব্যবধান। গৌরবময় অতীত গ্রীক ও গ্রেকো-রোমক সভ্যতা হইতে আধুনিক সভ্যতাকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে এক অতলস্পর্শী অন্ধকারময় যুগ। এই যুগের অন্ধকার ইউরোপীয় মনের অন্ধকার। এক দুর্জ্ঞেয় অবসন্নতা ও বৈক্লব্য তাহার মনকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। উন্নততর সর্বপ্রকার স্বাধীন চিন্তাশক্তি, মননশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তি তাহার অন্তর্হিত হইল। মনের গতি হারাইয়া সম্মুখের পরিবর্তে পশ্চাতে সে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। নূতন জ্ঞানের ও তথ্যের সন্ধান দেওয়া দূরে থাকুক, সর্বপ্রকার জ্ঞানার্জনে এযুগে ইউরোপকে আমরা দেখি একান্তভাবে নিস্পৃহ ও নিষ্ক্রিয়। চিন্তা-জগতে ইউরোপ সহসা অন্ধকারে যেন পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে।

প্রাচীন বিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি ও ইউরোপীয় অন্ধকার যুগের ব্যাপ্তি

ঠিক কোন সময় হইতে ইউরোপে এই অন্ধকার যুগের সূচনা এবং কালের বিস্তৃতিতে ইহার ব্যাপ্তি কতদূর সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ ও বিতর্কের অবকাশ আছে। থালেসের কাল হইতে গ্রীক বিজ্ঞানের যে অগ্রগতির ধারা আমরা এ পর্যন্ত আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে মাঝে মাঝে নানা ছেদ পড়িলেও ও গুরুতর বিপর্যয় উপস্থিত হইলেও খ্রীষ্টাব্দ দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত এই প্রাচীন বিজ্ঞানের সক্রিয়তা ও সৃজনীশক্তি আমরা একরূপ অব্যাহত দেখিতে পাই। বিজ্ঞানের দিক হইতে এই দ্বিতীয় শতাব্দীকে ইতিহাসের পাতায় চিরকালের জন্য উজ্জ্বল ও ভাস্বর করিয়া রাখিয়াছে দুইজন ক্ষণজন্মা বিজ্ঞানীর প্রতিভা। টলেমী আলেকজান্দ্রিয়ায় গবেষণা করেন আনুমানিক খ্রীষ্টাব্দ ১২৭ হইতে ১৫১ পর্যন্ত এবং গ্যালেনের মৃত্যু হয় ২০০ খ্রীষ্টাব্দে। এই দুই বিজ্ঞানীই প্রাচীন বিজ্ঞানের সর্বশেষ সমন্বয়-সাধনকর্তা, সর্বশেষ উজ্জ্বল প্রদীপ। সুতরাং সৃজনী শক্তির দিক হইতে প্রাচীন বিজ্ঞানের পরিসমাপ্তির সীমারেখা যদি কোথাও টানিতে হয় তবে গ্যালেনের মৃত্যু বৎসর ২০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই তাহা টানা উচিত। তবে দ্বিতীয় শতকের শেষভাগে বা তৃতীয় শতকের প্রথমভাগে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সাধারণভাবে রুদ্ধ হইলেও গাণিতিক গবেষণাকে আমরা আরও কিছুদিন সক্রিয় দেখিতে পাই। ডায়োফ্যাণ্টাস্, প্যাপাস্, থিওন অব আলেকজান্দ্রিয়া ও হাইপেসিয়ার গাণিতিক গবেষণার কাল খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দী। বলবিদ্যাবিশারদ হীরোও সম্ভবতঃ এই সময়ে জীবিত ছিলেন। ৩৯০ খ্রীষ্টাব্দে আর্কবিশপ থিয়োফিলাস্ আলেকজান্দ্রিয়ার প্রায় সাত শত বৎসরের পুরাতন ও প্রাচীন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগারের একাংশ ধ্বংস করিয়া গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূলে কুঠারাঘাত করেন। ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে হাইপেসিয়া উন্মত্ত খ্রীষ্টান পাদ্রীদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হন। এই তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দী আবার টেরটুলিয়ান, ল্যাক্টাণ্টিয়াস্, সেণ্ট অ্যাম্ব্রোজ, সেণ্ট জেরোম প্রমুখ খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের প্রচারকাল ও সর্বপ্রকার গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তীব্র বিরুদ্ধতার ও জেহাদের কাল। এই সব বিচার করিয়া অনেক ঐতিহাসিক চতুর্থ শতকের শেষভাগে বা পঞ্চম শতকের প্রথমভাগে প্রাচীন বিজ্ঞানের অবনতির সর্বশেষ সীমারেখা নির্দেশ করিবার অধিকতর পক্ষপাতী।* তাঁহাদের মতে পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতেই ইউরোপীয় অন্ধকার যুগের সূচনা।

এই অন্ধকার যুগের পরিসমাপ্তি কোথায়? চিন্তা-জগতের এই সর্বগ্রাসী নিকষ-কালো অন্ধকার শতাব্দীর পর শতাব্দী কি সমভাবেই বর্তমান ছিল? মাঝে মাঝে আলোকরেখা এই জড়তা ও আচ্ছন্নতার ঘোর কাটাইবার কি কোনরূপ ইঙ্গিতই দেয় নাই? কবে, কোথায় ও কেমন করিয়া এই দীর্ঘ রাত্রির অবসান ঘটিল, অরুণোদয়ে নূতন আলোর ঝলকানিতে তাহার চিত্তলোক ঝলমল করিয়া উঠিল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার উন্মোচন করিবার হারানো চাবিকাঠি ইউরোপ আবার খুঁজিয়া পাইল?

এই অন্ধকার হঠাৎ একদিনে কিছু আর অপসৃত হয় নাই। ইহা যেমন ধীরে ধীরে আসিয়াছিল তেমনি কাটিয়াও গিয়াছিল ধীরে ধীরে। ঠিক কখন এই অন্ধকার যুগের অবসান হইল, নূতন জ্ঞানান্বেষণে ইউরোপীয় জাতিরা আবার পশ্চাতের পরিবর্তে সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করিল এবং প্রাকৃতিক ঘটনার বিচার-বিশ্লেষণে আর্ষ-প্রয়োগের বদলে স্বকীয় ও বৈপ্লবিক মনোভাবের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ষোড়শ শতাব্দীর কোন এক সময়ে, সম্ভবতঃ শেষের দিকে, মধ্যযুগীয় মনোভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে একথা আজ সাধারণভাবে স্বীকৃত। তবে ইহারই মধ্যে বিশেষ কোন বৎসরের নাম যদি

* F. S. Marvin কর্তৃক সম্পাদিত *Science and Civilization* গ্রন্থে চার্লস্ সিঙ্গারের প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য, Oxford University Press, 1923; p. 113-5.

করিতেই হয়, ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দকেই মধ্যযুগের শেষ বৎসর হিসাবে অভিহিত করা উচিত। এই বৎসর কোপার্নিকাসের বৈপ্লবিক জ্যোতিষীয় গ্রন্থ *De Revolutionibus Orbium Coelestium* ও শারীরস্থান সম্বন্ধে ভেসালিয়াসের ততোধিক বৈপ্লবিক গ্রন্থ *De Fabrica Corporis Humani* প্রকাশিত হয়। প্রথমোক্ত গ্রন্থে টলেমী কর্তৃক রূপায়িত প্রাচীন জ্যোতিষের বনিয়াদ টলাইবার ব্যবস্থা হয়, দ্বিতীয়টিতে গ্যালেন-প্রস্তাবিত দেহতত্ত্ব ও জৈবক্রিয়াতত্ত্ব ভুল প্রতিপন্ন করিয়া এক সম্পূর্ণ নূতন শারীরবৃত্ত প্রতিষ্ঠিত করিবার ইঙ্গিত দেখা যায়। এই দুই গ্রন্থেরই মূল কথা এক; প্রাচীন বিজ্ঞান নির্ভুল ও শাশ্বত জ্ঞান ও সত্যের সন্ধান দিয়াছে ইহা স্বীকার্য নহে; সেই বিজ্ঞানের বহু ত্রুটী-বিচ্যুতি আছে এবং পরীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা উন্নততর ও অধিকতর নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক মতবাদে পৌঁছানো সম্ভবপর। এক কথায় এই দুই গ্রন্থের মধ্য দিয়া প্রথম প্রকাশ্যভাবে প্রাচীন বৈজ্ঞানিক মতবাদের বিরুদ্ধতা করা হইয়াছে এবং ইহা অপেক্ষা উন্নততর মতবাদের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইহার পূর্বে এক হাজার বৎসরের মধ্যে টলেমীর জ্যোতিষ অথবা গ্যালেনের শারীরবৃত্তে সন্দেহ প্রকাশ করিবার চিন্তা পর্যন্ত কেহ করে নাই। প্রত্যেকের নিশ্চিত ধারণা হইয়াছিল, প্রাচীন বিজ্ঞানিগণের গবেষণা ও মতবাদ অভ্রান্ত; তাঁহারা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, সেই বিষয়ে তাহাই শেষ কথা। মাঝে মাঝে দু' একজনের মনে যে আদৌ কোন সন্দেহ জাগে নাই তাহা নহে, তবে ঋষিবাক্য প্রতিবাদ করিবার মত সাহস বা স্পর্ধা কাহারও হয় নাই। কোপার্নিকাস্‌ও নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার *De Revolutionibus Orbium Coelestium* ছাপাইবার অনুমতি দেন নাই। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর এই পাণ্ডুলিপির কথা তিনি বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে *Commentariolus* নামে এক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সংক্ষেপে তাঁহার মতবাদ ব্যক্ত করিয়া অল্প কয়েকজন বন্ধুর মধ্যে তাহা গোপনে প্রচার করেন। ইহার প্রায় ৩০ বৎসর পরে বন্ধুদের সনির্বন্ধ অনুরোধে কোপার্নিকাস্ যখন তাঁহার মূল গ্রন্থ প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হন, তখন তাঁহার বয়স ৭০। প্রাচীন বৈজ্ঞানিক মতবাদের বিরুদ্ধতা করিবার বিপদ ও গুরুত্ব সম্বন্ধে ভেসালিয়াস্‌ও সচেতন ছিলেন। তিনি *De Fabrica*তে লিখিয়াছেন: "অল্প কিছুদিন আগেও গ্যালেন হইতে একচুল এদিক-ওদিক হইতে আমি সাহসী হইতাম না। কিন্তু হৃৎপিণ্ডে অবস্থিত সেপ্‌টাম পর্দা হৃৎপিণ্ডের অবশিষ্ট অংশের মতই পুরু ও ঘন-সন্নিবিষ্ট। আমি একেবারেই বুঝিতেছি না কিরূপে অতীব ক্ষুদ্রতম কণিকার পক্ষেও সেপ্‌টাম ভেদ করিয়া দক্ষিণ নিলয় হইতে বাম নিলয়ে প্রবেশ করা সম্ভবপর।" দীর্ঘকালব্যাপী বৈজ্ঞানিক পরীক্ষালব্ধ বিশ্বাস অতি নির্ভীকভাবে তিনি প্রকাশ করিলেন। তেরশ বৎসর ধরিয়া ইউরোপে ঠিক এই জিনিসটিরই অভাব ছিল।

কোপার্নিকাস্ ও ভেসালিয়াসের উপরিউক্ত বৈপ্লবিক গ্রন্থ দুইখানি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য লোকে রাতারাতি টলেমী ও গ্যালেনের বৈজ্ঞানিক মতবাদ ত্যাগ করিয়া কোপার্নিকাস্ ও ভেসালিয়াস্-প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিক মতবাদ গ্রহণ করে নাই। অধিকাংশ লোকই প্রথমে এই মতবাদ উপেক্ষা করিয়াছে, তাহা লইয়া ব্যঙ্গ ও উপহাস করিয়াছে এবং কেহ কেহ অধার্মিক ও অশাস্ত্রীয় বলিয়া কটাক্ষ বা ভীতি প্রদর্শন করিয়াছে। কিন্তু ধীরে ধীরে এই মতবাদ চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, ইহার অকাট্য যুক্তি ও সত্যতা সকল প্রকার অবৈজ্ঞানিক প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধতার উপর জয়ী হইল, এবং প্রাচীন বিজ্ঞানের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। এইজন্যই ইউরোপীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দকে মধ্যযুগ ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের সীমা-নির্দেশক হিসাবে মনে করা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একথাও সত্য যে, ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এক হাজার বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার দিক হইতে সম্পূর্ণ ও সমানভাবে

নিশ্চেষ্টতার যুগ ছিল না। ইহার মধ্যে জ্ঞান-চর্চার ও জ্ঞানান্বেষণের অনেক ইতর বিশেষ ঘটিয়াছে। তবে খ্রীষ্টাব্দ পঞ্চম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের প্রায় সর্বত্রই জ্ঞান-চর্চা একরূপ স্থগিত ছিল; অজ্ঞতা এবং তাহা অপেক্ষাও মারাত্মক, অজ্ঞতা দূর করিবার অনিচ্ছা ছিল সাধারণ ও ব্যাপক। এই পাঁচশত বৎসরই প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণযুগ। একাদশ শতাব্দী হইতে আবার জ্ঞান-চর্চার ও বিদ্যোৎসাহিতার কিছু কিছু আভাস আমরা দেখিতে পাই। গেরবের্ট, আদেলার্দ, রবার্ট অব্ চেষ্টার, জেরার্ড্ অব্ ক্রেমোনা, মাইকেল স্কট, আলেকজান্দার অব্ নেকাম প্রমুখ পণ্ডিতগণ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর বিদ্যোৎসাহিতার ও জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার প্রধান প্রতিভূ। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ইউরোপীয় মননশীলতা নিঃসন্দেহে ক্রমাগত নিম্নগামী; একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে এই অবনতির গতি রুদ্ধ; ইউরোপীয় মন জ্ঞানার্জনে উৎসুক; তাহার চিন্তাশক্তি ঊর্ধ্বমুখী। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রজার বেকনের আবির্ভাবের পর হইতে এই বিদ্যোৎসাহিতা অধিকতর প্রবল আকার ধারণ করে, জ্ঞানের মূল্য বাড়িতে থাকে, জ্ঞানী ব্যক্তি সমাজে ও রাজদরবারে সমাদৃত হইতে আরম্ভ করেন। এই যুগের লোক প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আকণ্ঠ সম্ভ্রমশীল; প্রাচীন পুঁথিপত্রে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে যাঁহার যতবেশী অধিকার তিনি ততবেশী জ্ঞানী ও পণ্ডিত। এই পাণ্ডিত্য-প্রীতি ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য।

গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় লিখিত প্রাচীন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলির বহুল প্রচার ঘটে পঞ্চদশ শতাব্দীতে। খ্রীষ্টানদের তীব্র বিরুদ্ধতার ফলে এক সময় গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান বিধর্মীর জ্ঞান-বিজ্ঞান হিসাবে ব্যাপকভাবে অবজ্ঞাত ও পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বিদ্যোৎসাহিতা ও জ্ঞান-চর্চার স্বাস্থ্যকর পরিবেশ আবার ফিরিয়া আসিলে প্রথমেই চেষ্টা হইল বিজ্ঞানের উৎস সন্ধানের। সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ পড়িল মূল গ্রীক পাণ্ডুলিপির; সুরু হইল এক বিরাট ও ব্যাপক অনুসন্ধান পর্বের। এইরূপ মনোযোগ ও ধৈর্যের সহিত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে গ্রীক-বিজ্ঞান ইতিপূর্বে বা পরে আর অধীত হয় নাই। বিদ্যাচর্চা এক নূতন প্রেরণা ও উদ্দীপনা লাভ করিল।

তাহা হইলে মধ্যযুগের অবসান-কাল হিসাবে একাদশ, ত্রয়োদশ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীকে অভিহিত করিলে ক্ষতি কি? অনেক ঐতিহাসিক একাদশ শতাব্দীকে বাদ দিলেও অন্ততঃ ত্রয়োদশ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ও দৃষ্টিভঙ্গীর জন্মসময় বলিয়া নির্দেশ করিবার পক্ষপাতী। আর একদল ঐতিহাসিক এই মতের বিরোধী এই কারণে যে, নবম শতাব্দীর শেষভাগে অন্ধকার যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাধারা ঊর্ধ্বমুখী হইলেও এবং বিজ্ঞান-চর্চার ও বিদ্যোৎসাহিতার একটা স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হইলেও ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা একান্তই প্রাচীনাশ্রয়ী। আয়োনিয়ার, এথেন্সের অথবা আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ববিশ্রুত গ্রীক বিজ্ঞানিগণের বিশ্বাস, মতবাদ ও পর্যবেক্ষণের ফল অভ্রান্ত ধরিয়া লইয়া এই বিজ্ঞানের মহিমা কীর্তনে একাদশ হইতে পঞ্চদশ শতকের অধিকাংশ পণ্ডিতদেরই আমরা তন্ময় দেখি। তাঁহাদের মন অতীতের সহিত বাঁধা। এই বন্ধন ছিন্ন করিয়া নির্ভীকভাবে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার অবস্থা তখনও আসে নাই এবং ইহা আসে নাই বলিয়াই মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার ও দৃষ্টিভঙ্গীরও অবসান তখন পর্যন্ত ঘটে নাই। এই মতের অন্যতম সমর্থক ডাঃ চার্লস্ সিঙ্গার তাই লিখিয়াছেন ঃ

"Yet to make the great division at any such date as 1000, 1200 or 1400 would be an error, because, with very few exceptions, the point of view of the eleventh-century encyclopaedist, of the thirteenth-century scholastic, and of the fifteenth-century scholar was formally and essentially an

effort to return to the past. It was the literature and language of antiquity, the antiquity of the fathers, of the philosophers, or of the poets, that these men sought more or less vainly to revive."

"....It is true that, despite the errors of philosophical interpretation, scientific elements are not wholly wanting in scholastic writings. Yet in that age the infinity of the knowable universe was passionately denied, originality of view was furtively hidden under the cloak of authority, and knowledge—so the knowers claimed—was always based on the wisdom of antiquity. Imitation rather than origination was the characteristic mental attitude also of the most enthusiastic scholar of the fifteenth century." ('The Dark Ages and the Dawn' in *Science and Civilization* edited by F. S. Marvin.)

কোপার্নিকাস্ ও ভেসালিয়াস্ এই মধ্যযুগীয় মানসিক অবস্থা কাটাইয়া অতীতের পরিবর্তে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে পারিয়াছিলেন। টলেমী ও গ্যালেনের নিকট তাঁহাদের ঋণ অপূরণীয়। কিন্তু এই দুই প্রাচীন গুরুকে তাঁহারা নকল বা অনুকরণ করেন নাই। স্বাধীনভাবে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও মননশক্তির দ্বারা যে সত্যে তাঁহারা উপনীত হইলেন বহুদিনের প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাসের সহিত তাহার মিল রক্ষা হয় নাই বলিয়া তাঁহারা পিছ-পা হন নাই। স্বাধীনভাবে মুক্তকণ্ঠে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও সত্য উপলব্ধি ব্যক্ত করিলেন। যে প্রকার মনোভাব বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এইরূপ স্বাধীন চিন্তাধারা সম্ভবপর করিল তাহাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনোভাব। *De Revolutionibus* ও *De Fabrica* এই প্রকার মনোভাবের প্রথম লিপিবদ্ধ প্রমাণ। কোপার্নিকাস্ ও ভেসালিয়াসের কাল ষোড়শ শতাব্দীতে তাই বিজ্ঞানের মধ্যযুগের শেষ ও আধুনিক যুগের সুরু।

এই তো গেল মধ্যযুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার স্তরবিন্যাস। এখন প্রশ্ন হইল, চিন্তাজগতে হঠাৎ এইরূপ শৈথিল্য ও দারিদ্র্য উপস্থিত হইল কেন? তাহার উদ্ভাবনী ও সৃজনী প্রতিভার বিকাশ এইভাবে অবরুদ্ধ হইল কেন? ইহা কি মনুষ্য মনের আবর্তনশীল স্বাভাবিক বৈক্লব্য ও অবসন্নতা; না ইহার সহিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও তৎকালীন ধর্মব্যবস্থার কোন প্রত্যক্ষ যোগ আছে? এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকের মতে, বিজ্ঞানের প্রগতি বা অগ্রগতির উপর রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার কোনরূপ প্রভাব নাই। মানুষের দুর্জ্ঞেয় কৌতূহলপ্রিয়তা হইতে বিজ্ঞানের জন্ম ও ক্রমোন্নতি। এই কৌতূহলপ্রিয়তা কোনরূপ বাঁধাধরা নিয়মকানুন বা সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাভেদের বশবর্তী নহে। এই কৌতূহলপ্রিয়তার অভাব বা আধিক্য অনির্ণেয় ও অনির্দিষ্ট। এইরূপ মতে বিশ্বাসী ঐতিহাসিকের সংখ্যা অবশ্য ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। মানুষের কর্মধারা ও চিন্তাধারার উপর রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার, প্রচলিত জীবনাদর্শের ও ধর্মবিশ্বাসের যে অনিবার্য প্রভাব বর্তমান, তাহার জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা সাহিত্য ও সাধারণভাবে সভ্যতার বিকাশ এই অবস্থা, জীবনাদর্শ ও ধর্মবিশ্বাসের সহিত যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, বিজ্ঞানের অধিকসংখ্যক ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত এখন এই মতে বিশ্বাসী। কৃষ্ণযুগে ইউরোপে বিজ্ঞানের এই অবনতির জন্য দায়ী ইউরোপের তদানীন্তন রাজনৈতিক বিপর্যয় ও অশান্তি, অচল সামাজিক অবস্থা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধ ধর্মবিশ্বাস। প্রাথমিক অবস্থায় খ্রীষ্টধর্ম মোটেই প্রগতিবাদী ছিল না; জীবন ও বিশ্বচরাচর সম্বন্ধে যে বিশ্বাস ও দর্শন প্রাথমিক যুগের খ্রীষ্টান পাণ্ডারা

প্রচার করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল তাহার সহিত বিজ্ঞানের বিরোধ মৌলিক। এই বিশ্বাস ও দর্শন প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের কণ্ঠরোধ করিয়াছিল।

৮·২। গ্রেকো-রোমক বিজ্ঞানের অধঃপতনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং রোগ, মহামারী ও লোকক্ষয়জনিত কারণ

পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের সঙ্গে সঙ্গেই ইউরোপীয় সভ্যতার এই সংকট দেখা দেয়। তবে বহু পূর্বেই এই সংকটের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। অনেকের মতে গ্রীক নগর-রাষ্ট্রসমূহের পতনের পর হইতেই প্রাচীন বিজ্ঞানের পতনের সূত্রপাত। অর্থাৎ আলেকজান্দারের সাম্রাজ্য বিস্তার ইহার এক কারণ। কিন্তু আলেকজান্দারের সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক বিজ্ঞানের অন্যত্র প্রসার, বিশেষতঃ আলেকজান্দ্রিয়ায় নূতনরূপে গ্রীক বিজ্ঞানের আত্মপ্রকাশের ব্যাপার বিশ্লেষণ করিলে উপরিউক্ত মতবাদ স্বীকার্য বলিয়া মনে হয় না। এই অধঃপতনের প্রকৃত সূত্রপাত ঘটে রোমক সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করিবার পর হইতে। রোমকরা গ্রীক সাম্রাজ্য বা 'ম্যাগ্না গ্রেসিয়া' অধিকার করিয়া গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানও আত্মসাৎ করিল। রোমক কর্তৃক এই জ্ঞানভাণ্ডার আত্মসাতে কোন ক্ষতি ছিল না, যদি সেই সঙ্গে তাহা পূর্ণ ও বৃদ্ধি করিবার যথাযোগ্য প্রচেষ্টা থাকিত। রোমক সাম্রাজ্যে গ্রীক বিজ্ঞান ছিল একরূপ শোভা ও মর্যাদা স্বরূপ। শুধু জ্ঞানের জন্যই যে জ্ঞান-চর্চার একটা মস্তবড় প্রয়োজন ও সার্থকতা আছে, রোমকেরা কোনদিনই ইহা ভালভাবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। তাই রোমক সাম্রাজ্যের পরাক্রম যতদিন অপ্রতিহত ছিল গ্রীক বিজ্ঞানের শোভাও ততদিন কোনরূপে টিঁকিয়াছিল। এই পরাক্রম তিরোহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানেরও পাট উঠিয়া গেল। দেখা গেল, রোমক সাম্রাজ্য জ্ঞানভাণ্ডারকে উজাড় করিয়া একেবারে নিঃস্ব রাখিয়া গিয়াছে। জে. সি. মরিসন্ তাঁহার *The Service of Man* গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ

> "The barbarous Roman soldier who killed Archimedes absorbed in a problem, is but an instance and a type of what Rome had done always and everywhere by Greek art, civilization and science. The Empire lived upon and consumed the capital of preceding ages, which it did not replace. Population, production, knowledge, all declined and slowly died....."

খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় শতাব্দী হইতেই রোমক সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বর্বর জাতিদের আক্রমণ ও অভিযান সুরু হয়। ২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঙ্ক ও আলামান্নি নামে দুই জাতি রাইন নদের নিম্নদেশ ও আল্সাস্ অঞ্চল বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে গথ্রাও পূর্ব ইউরোপে ও কৃষ্ণ সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে তৎপর হইয়া উঠে এবং ২৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দানিয়ুব নদী অতিক্রম করিয়া রোমক সাম্রাজ্যের উপর হানা দেয়। ফ্রাঙ্ক, আলামান্নি ও গথ্দের এই জাতীয় আক্রমণ ও লুঠতরাজ সাময়িকভাবে প্রতিহত হইলেও চতুর্থ শতাব্দী হইতে ইহাদের আক্রমণের প্রকোপ আবার বৃদ্ধি পায়। চতুর্থ শতাব্দীতে ভ্যাণ্ডাল ও হূনদের অভ্যুত্থানে ও ধারাবাহিক আক্রমণে পশ্চিম রোমক সাম্রাজ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে গথ্নেতা আলারিক সরাসরি ইতালীর দক্ষিণ অভিমুখে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করিয়া ও রোমক বাহিনীকে বিধ্বস্ত করিয়া রোম অধিকার করিয়া লয়। রোমক সাম্রাজ্য ইতিপূর্বেই পশ্চিম ও পূর্ব সাম্রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব সাম্রাজ্যের রাজধানী হইল কন্স্তান্তিনোপল্। পশ্চিম সাম্রাজ্য সম্পূর্ণরূপে বর্বর জাতি কর্তৃক

বিধ্বস্ত হইলেও এই পূর্ব সাম্রাজ্য বহুদিন পর্যন্ত বর্বরদের আক্রমণ কোনরকমে প্রতিহত করিতে সক্ষম হয়। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতা ইতালীতে ও পশ্চিম ইউরোপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও এই পূর্ব সাম্রাজ্যকে আশ্রয় করিয়া কোনরকমে বাঁচিয়া রহিল। খ্রীষ্টাব্দ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা সুস্পষ্ট হইবে। দক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যান্ড বর্বর টিউটনিক, অ্যাংগল, স্যাক্সন্ ও জুট জাতি কর্তৃক অধিকৃত; হল্যান্ড, রাইন নদীর অধিকাংশ উপত্যকা ও প্রায় সমগ্র গলদেশ জুড়িয়া ফ্র্যাংকদের রাজত্ব; রোন্ নদী উপত্যকায় বুর্গুণ্ডীয় জাতিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। তারপর স্পেনে ভিসিগথ্রা, উত্তর-আফ্রিকায় ভ্যান্ডালরা এবং ইতালীতে, ডাল্মেসিয়ায় ও সার্বিয়ায় অস্ট্রোগথ্রা নিজ নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

তিন শত বৎসরের এইরূপ নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্রমান্বয় হস্ত-পরিবর্তনের ফলে সর্বপ্রকার জ্ঞান-চর্চা রুদ্ধ হইতে বাধ্য। এই তিন শত বৎসরে ইউরোপে শান্তি ও নিরাপত্তা বলিয়া কিছু ছিল না। মানুষের জীবন, ধন, সম্পত্তি সর্বদাই বিপদগ্রস্ত। ভবিষ্যতের আশা ও ভরসা প্রত্যেকের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে। তারপর বহুসংখ্যক লোক বাস্তুহারা হইয়া এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যের শরণাপন্ন হইয়াছে। সমগ্র ইউরোপ পরিণত হইয়াছে অসংখ্য হতভাগ্য উদ্বাস্তু নরনারীর শিবিরে। রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সংগে সংগে আসিয়াছে সমাজ-জীবনেও দারুণ বিশৃংখলা, অসন্তোষ ও ব্যাপক নৈরাশ্য।

অর্থনৈতিক কারণ

ঐতিহাসিক স্যার আর্চিবাল্ড্ অ্যালিসন এই সামাজিক বিশৃংখলার আর এক অন্যতম কারণ দর্শাইয়াছেন মুদ্রা-সংকোচনে।* রোমক সাম্রাজ্যের শেষের দিকে স্পেন ও গ্রীসের স্বর্ণ ও রৌপ্যখনিগুলির উৎপাদন ক্রমশঃ হ্রাস পায়। অগাস্টাসের সময় রাজকোষে মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য আনুমানিক মাত্র ৩৮০ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের স্বর্ণ মজুত ছিল। জাস্টিনিয়ানের সময় ইহা কমিয়া দাঁড়ায় মাত্র ৮০ মিলিয়ন পাউন্ড মূল্যের স্বর্ণে। মাঝে মাঝে মুদ্রাস্ফীতির চেষ্টা হইলেও সাধারণভাবে মুদ্রা-সংকোচন ঠেকানো যায় নাই। ফলে জিনিস-পত্রের দাম অসম্ভব পরিমাণ কমিয়া যায় এবং শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন আর লাভজনক হয় না। উৎপাদনকারীরা দেশে এই সব জিনিস প্রস্তুত করিবার পরিবর্তে বিদেশ হইতে তাহা আমদানি করা অধিকতর লাভজনক মনে করে; ইহাতে শিল্পের অবনতি ঘটে এবং চাষের অভাবে বহু জমি অনাবাদি পড়িয়া থাকে। তারপর যুদ্ধের খরচ মিটাইবার জন্য শাসনকর্তাদের কর বৃদ্ধি করিতে হয়; এই করবৃদ্ধি শেষে এক দুঃসহ বোঝার ন্যায় জনসাধারণের উপর চাপিয়া বসে। এই ভাবে রোমক সাম্রাজ্যের শেষের দিকে যে গুরুতর অর্থনৈতিক বিপর্যয় উপস্থিত হয়, সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করিতে তাহা বিশেষভাবে সহায়ক হইয়াছিল। সাম্প্রতিককালে এরূপ মুদ্রা-সংকোচনের ফলে ইংল্যান্ডে ১৮৭৩ হইতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এবং পুনর্বার ১৯২১ হইতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে যে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়াছিল, তাহাতে বহু একর জমি অনাবাদি হইয়া যায়।

রোগ, মহামারী ও লোকক্ষয়জনিত কারণ

রাজনৈতিক বিশৃংখলা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির অবনতি ও দুর্ভিক্ষের সুযোগে অস্বাস্থ্য, রোগ, মহামারী ও লোকক্ষয় ইউরোপের সর্বত্র মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। চতুর্দিকে মৃত্যু ও মৃত্যুভয়। প্লেগ রোগের আক্রমণে ইউরোপীয় সমাজ দ্রুত উৎসন্নের

* Sir Archibald Alison, *History of Europe,* Vol. I, Edinburgh & London, 1853; p. 31.

মুখে। এই প্লেগ পেরিক্লিসের সাধের ও সাজানো এথেন্সকে প্রায় ধ্বংস করিয়াছিল। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে এই মহামারীর উগ্র মারীরূপ আবার আমরা দেখিতে পাই। ৪৫২ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ইতালীতে এই রোগের প্রাদুর্ভাবে অ্যাটিলার সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি রুদ্ধ হয়। সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের রাজত্বকালের শেষভাগে (৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ) এই মহামারীর প্রকোপ আবার বৃদ্ধি পাইলে ইতালীর সামরিক শক্তি একেবারে দুর্বল হইয়া পড়ে এবং লম্‌বার্ডস্‌দের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হয়। ৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দের প্লেগে কন্‌স্তান্তিনোপলে দৈনিক গড়ে দশ হাজার নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের প্লেগে রোম প্রায় উজাড় হইয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে ৬৬৪, ৬৭২, ৬৭৮ ও ৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ বিশ বৎসরের মধ্যে চারিবার প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এই তো গেল প্লেগের উপদ্রব। ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের উপদ্রবও বড় কম ছিল না। শাসন-ব্যবস্থার শৈথিল্যের সঙ্গে সঙ্গে নগর ও সহরগুলির জলনিষ্কাশনের ব্যবস্থা ধীরে ধীরে খারাপ হইতে থাকে, এবং সহরের চারি পাশে জলাভূমি ও জঙ্গল বৃদ্ধি পাইয়া সেগুলি ম্যালেরিয়া রোগের উর্বর কেন্দ্রে পরিণত হয়। এইভাবে মহামারীর প্রাদুর্ভাবে ব্যাপক লোকক্ষয় প্রাচীন ইউরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থা বিনষ্ট ও উৎসন্নের পথে অগ্রসর করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল।

৮·৩। বিজ্ঞানের অধোগতিতে দাস-প্রথার প্রভাব

প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িবার আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল। এই কারণ দাস-প্রথার বৃদ্ধি ও প্রসার। দাস-প্রথার মাত্রাধিক্য হেতু শুধু রোমক সাম্রাজ্যেরই বনিয়াদ যে ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল তাহা নহে, সমগ্র প্রাচীনকালে এই প্রথা ছিল বিজ্ঞানের অগ্রগতির প্রধান প্রতিবন্ধক। দাস-প্রথার জন্য প্রাচীনকালে যান্ত্রিক উন্নতি ও শিল্পোন্নতি বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছিল এবং যন্ত্রশক্তি-প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইতে পারে নাই। হাতে-কলমে কাজ করা স্বাধীন নাগরিকের পক্ষে হেয় ও মর্যাদাহানিকর, এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল থাকায় বিজ্ঞানে পরীক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। আমরা ইতিপূর্বেই একবার এই প্রসঙ্গের কিছু আলোচনা করিয়াছি। গ্রেকো-রোমক সভ্যতার এবং সেই সঙ্গে গ্রেকো-রোমক বিজ্ঞানের পতনের এক প্রধান কারণ যে মানবতা-বিরুদ্ধ এই উগ্র দাস-প্রথা, ইহা সকল ঐতিহাসিকই এখন একবাক্যে স্বীকার করেন। এজন্য প্রাচীনকালে দাস-প্রথার স্বরূপ, প্রকৃতি ও বিস্তৃতি এবং এই প্রথার সহিত বিজ্ঞানের সম্পর্ক সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনার প্রয়োজন।

আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার উৎপত্তির পর হইতে, অর্থাৎ গত দেড় শত বৎসরের মধ্যে দাস-প্রথা সাধারণভাবে নিন্দনীয়, মানবতা-বিরুদ্ধ ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী এইরূপ বিবেচিত হইয়াছে। বর্তমান কালের পরিপ্রেক্ষিতে দাস-প্রথার বিরুদ্ধে এইরূপ মনোভাব একান্তই যুক্তিসংগত ও ন্যায্য। কিন্তু এই দেড় শত বৎসরের পূর্বে অতীতে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পর্যন্ত দাস-প্রথা সম্বন্ধে আজিকার এই বিরুদ্ধ মনোভাব আদৌ সাধারণ ও সর্বজনগ্রাহ্য ছিল না। অনিবার্য অর্থনৈতিক কারণে দাস-প্রথার উদ্ভব; মানব-সভ্যতার বিবর্তনে এই প্রথা একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছে; এই বিপুল দাসশক্তি শৃঙ্খলিত ও নিয়োজিত হইতে না পারিলে মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীক অথবা রোমক ইত্যাদি কোন প্রাচীন সভ্যতারই বিকাশ যে ঘটিতে পারিত না, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। যে উৎপাদন-ব্যবস্থা একমাত্র মানুষের পেশীশক্তির উপর নির্ভরশীল, সেই উৎপাদন-ব্যবস্থায় ক্রীতদাস অবিকল যন্ত্ররূপে পরিগণিত হইতে বাধ্য। আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় সাফল্যের মূলমন্ত্র যন্ত্রের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব: প্রাচীনকালে ক্রীতদাসের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও অধিকার সেইরূপ অপরিহার্য বিবেচিত

হইয়াছিল। বস্তুতঃ ক্রীতদাসকে গণ্য করা হইত একটি দ্রব্য বা জিনিস হিসাবে, মানুষ হিসাবে নয়। রোমক আইনে ক্রীতদাস *res* পর্যায়ভুক্ত। এই *res* কথাটির অর্থ 'দ্রব্য'।

ক্রীতদাস যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইলেও তাহার সহিত কলের যন্ত্রের প্রভেদ আছে। স্বাধীন গ্রীক বা রোমক নাগরিকের মতই ক্রীতদাসও মানুষ। প্রাচীন দাস-প্রথায় এই মানবতার স্থান লইয়া অনেক মতভেদ ও বিরোধ ঘটিয়াছে। এই মানবতা যতক্ষণ গ্রাহ্য ও স্বীকৃত এবং সেই আদর্শে ক্রীতদাসের প্রতি আচরণ ও ব্যবহার যতক্ষণ নিয়ন্ত্রিত ততক্ষণ দাস-প্রথা সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহায়ক। কিন্তু যখনই এই মানবতা অগ্রাহ্য হইয়াছে দাস-প্রথার নির্মম অসদ্ব্যবহার ঘটিয়াছে, তখনই এই প্রথা সমাজ ও রাষ্ট্রের ভয়ংকর সমস্যার কারণ হইয়া বিপর্যয় ঘটাইয়াছে।

গ্রীক সমাজ-ব্যবস্থা দাস-প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও গ্রীক রাজনৈতিক প্রাধান্যের কালে ইহা নির্মম আকার ধারণ করে নাই। ক্রীতদাসদের প্রতি উদার মনোভাবই ছিল এই প্রথার বিশেষত্ব। এথেন্সের ক্রীতদাসদের জীবন-যাপন ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সুযোগ দেখা যায়। তারপর একশ্রেণীর ক্রীতদাসের কথা আমরা অবগত হই যাহাদের অন্যের কাজে ভাড়া খাটানো হইত। ইহার বিনিময়ে ক্রীতদাসের নিকট হইতে দৈনিক কিছুটা লভ্যাংশ প্রভুর প্রাপ্য হইত। এইরূপ পরিশ্রমের ব্যাপারে ক্রীতদাসের কিছুটা স্বাধীনতা ছিল। সে নগরের ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি নানা ব্যাপারে কায়িক পরিশ্রমের কার্যে ইচ্ছামত নিয়োজিত হইতে পারিত। ক্রীতদাসদের সাধারণতঃ বয়নশিল্পে নিয়োজিত দেখা যায়। নানাবিধ কুটীর শিল্পে, দোকান-পাট পরিচালনা ও হাট-বাজারের কার্যে অনেকে বাহাল হইত। এমন কি এক সময় এথেন্স পুলিশের কার্যে থ্রেস দেশীয় বহু ক্রীতদাস নিয়োগ করিয়াছিল। রোমক ব্যবস্থায় পুলিশ বিভাগে ক্রীতদাসের নিয়োগ অচিন্তনীয়; ক্রীতদাস-পুলিশ কর্তৃক স্বাধীন নাগরিকের গ্রেপ্তারের কল্পনা পর্যন্ত অসম্ভব ছিল। তারপর গ্রীক পুরোহিতরা ক্রীতদাসের জীবন হইতে নরনারীকে অব্যাহতি দিবার এক চমৎকার উপায় বাহির করিয়াছিল। ক্রীতদাস তাহার ধন-সম্পত্তি দেবতার নামে উৎসর্গ করিয়া স্বাধীন হইতে পারিত এবং এইরূপ ক্রীতদাসরা যে স্বাধীন হইয়াছে সেই মর্মে কর্তৃপক্ষ হইতে এক ছাড়পত্র দেওয়া হইত।

আলেকজান্দ্রীয় ও রোমক সাম্রাজ্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে দাস-প্রথাও প্রসার লাভ ও ধীরে ধীরে নির্মম আকার ধারণ করে। প্রথম যুগের রোমকরা প্রধানতঃ কৃষিজীবী ছিল। এই রোমক কৃষকরাই তরবারির জোরে একের পর এক রাজ্য জয় করিয়া সাম্রাজ্য গড়িয়াছিল। সাম্রাজ্য করায়ত্ত হইলে কৃষিকার্যের পরিবর্তে যুদ্ধ-বিগ্রহের ও শাসন-পরিচালনার কাজ অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়। তখন কৃষকের অভাবে একাদিক্রমে বহু মাস এমন কি বহু বৎসর পর্যন্ত চাষের জমি অনাবাদি পড়িয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় স্বাভাবিক কারণেই রোমকরা বন্দী সৈন্যদের ও অধিকৃত দেশের হতভাগ্য অধিবাসীদের ক্রীতদাসরূপে চাষের কাজে বাহাল করে। চাষের কাজে নিয়োজিত ক্রীতদাসদের বলা হইত *latifundia*। এইভাবে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যের অধিকাংশ কৃষিকার্যের ভার বিদেশী ক্রীতদাসদের হাতে ন্যস্ত হয়। কিন্তু ভূমির মালিকানা-স্বত্ব কেন্দ্রীভূত থাকে এই অল্প সংখ্যক খাস রোমক নাগরিকদের হাতে। তারপর সাম্রাজ্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এবং যুদ্ধে বা অন্যান্য কারণে বহু ভূমিদার নাগরিকের মৃত্যু ঘটিলে এই সব জমি অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। সেই সুযোগে বিত্ত ও প্রতিপত্তিশালী ভূমিদাররা তাহা ক্রয় করিয়া বা অবৈধ উপায়ে দখল করিয়া সম্পত্তি বৃদ্ধি করে। ইহাতে এক এক জন রোমক নাগরিক প্রভূত ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়। কথিত আছে, কোন কোন ভূমিদারদের ভূসম্পত্তির এলাকা এক সময় রোমক সাম্রাজ্যের এক একটি প্রদেশকেও নাকি ছাড়াইয়া গিয়াছিল। এক এক জন ভুঁইয়া বহু সহস্র ক্রীতদাসের মালিক ছিল। রোমক সাম্রাজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতদাসের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি

*এক অভূতপূর্ব ঘটনা। খৃীঃ পূঃ ২৫০ হইতে ১৫০ অব্দের মধ্যে ক্রীতদাসদের সংখ্যা এরূপ বৃদ্ধি পায় যে, সমগ্র লোকসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশই ছিল ক্রীতদাস। ডেলসের হাটে এই সময় দৈনিক দশ সহস্র ক্রীতদাস বেচা-কেনা হইত বলিয়া জানা যায়।**

ক্রীতদাসদের প্রতি রোমক প্রভুদের আচরণ কিরূপ নির্মম ও নিষ্ঠুর ছিল ক্যাটোর রচনায় তাহার অনেক প্রমাণ আছে। ক্যাটো নিজেও অতি নিষ্ঠুর মনিব ছিলেন। ক্রীতদাস পাচক খাদ্যদ্রব্য বিস্বাদ করিয়া ফেলিলে তাহার এই অমার্জনীয় রন্ধন-ত্রুটীর জন্য অথবা পরিবেশন-কালে কোন ক্রীতদাস খাবারের থালা, গ্লাস ইত্যাদি উল্টাইয়া ফেলিলে তাহার এই অসাবধানতার জন্য শাস্তিস্বরূপ ক্যাটো বেত্রাঘাতের আদেশ দিতেন। কৃষিকার্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থে ক্যাটো ক্রীতদাস-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আরও অনেক কথা লিখিয়াছেন। যেমন, ক্রীতদাসের খাদ্যের পরিমাণ তাহাদের কাজের পরিমাণের উপর নির্ভর করিবে। বৎসরে যে সময়ে কৃষির কাজ সর্বাপেক্ষা শ্রমসাধ্য, ক্রীতদাসের সেই সময়ে অধিক খাদ্যের বরাদ্দ করিতে হইবে, অল্প খাটুনির সময় অল্প বরাদ্দ। বাগান ও ক্ষেত খামারের মালিকদের পুরাতন জিনিস মাঝে মাঝে নিলামে বিক্রয় করা সম্পর্কে ক্যাটোর পরামর্শ হইলঃ—

> "The plantation owner should auction off old work-oxen, blemished cattle, the wool, the skins, the worn-out iron tools, the aged and diseased slaves and everything else that he does not need."†

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ক্যাটোর চোখে ক্রীতদাস একটি প্রয়োজনীয় যন্ত্রমাত্র। যতক্ষণ সে কাজের উপযোগী থাকিবে ততক্ষণ তাহার মূল্য, অকেজো হইলেই তাহাকে নিলামে বিক্রয় করা কর্তব্য। সিসেরোর মত পণ্ডিত ও দরদী লেখকও ক্রীতদাসের উপর নিষ্ঠুর আচরণের সমর্থক ছিলেন। *On Duty* পুস্তকে ঝড়ের সময় জাহাজ হাল্‌কা করিবার উদ্দেশ্যে প্রিয় অশ্বটিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা উচিত না ক্রীতদাসদের নিক্ষেপ করা উচিত, এই সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার অভিমত হইল, ক্রীতদাসদেরই প্রথমে নিক্ষেপ করা উচিত। দুর্ভিক্ষের সময় রুগ্ন ও জীর্ণ ক্রীতদাসদের হয় বিক্রয় করা উচিত নয় খাইতে না দিয়া মরিতে দেওয়া উচিত, ক্যাটোর এই মত সিসেরো সমর্থন করিতেন। পিণ্ডার, হোরেস প্রমুখ বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি এইরূপ নির্দয় আচরণের সমর্থক ছিলেন। এই শেষোক্ত লেখকগণ স্বাধীন রোমক যুবকদের সুবিধার জন্য ক্রীতদাসীদের গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিবার পরামর্শ দেন।§ বলা বাহুল্য, এইরূপ উক্তি বা লেখা এই সব খ্যাতনামা লেখকের কেবলমাত্র ব্যক্তিগত মতামত নহে। ইহা তৎকালীন রোমক শাসকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচায়ক। রোমক সমাজে ক্রীতদাসের হীন, নিষ্ফল ও অবহেলিত জীবনের ইহা অভ্রান্ত ইঙ্গিত।

ক্রীতদাস সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, কোন ক্রীতদাস নিজের বা নিজেদের এই দুঃসহ ও হীন জীবনযাত্রার কথা বর্ণনা করিয়া উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ রচনা করে নাই বা অন্য কোন স্মারকলিপি রাখিয়া যায় নাই। দাস-জীবন সম্বন্ধে সামান্য যেটুকু সাহিত্য পাওয়া যায় তাহা প্রধানতঃ স্বাধীন রোমক লেখকদের দ্বারাই রচিত। অথচ সংখ্যায় বিপুল এই ক্রীতদাস বাহিনীর মধ্যে বুদ্ধিমান, বিত্তবান অথবা শিক্ষিত লোকের অভাব ছিল না। এইরূপ অক্ষমতার কারণ উদ্দেশ্যহীন ও অর্থহীন দাস-জীবনের স্বাভাবিক ঔদাসীন্য ও নিরুৎসাহিতা। এই উদ্দেশ্যহীন ও অর্থহীন ব্যর্থ জীবন সম্বন্ধে যে কিছু লিখিবার থাকিতে পারে ক্রীতদাসের মনে ইহা উদয় হয় না। তাহার একমাত্র লক্ষ্য এই বিড়ম্বিত জীবন হইতে

* J. G. Crowther, *The Social Relations of Science;* p. 109.

† Prof. William Linn Westermann, 'Ancient Slavery', *Scientific American* June 1949.

§ Crowther, *loc. cit*, p. 115.

মুক্তিলাভ, দাস-জীবনের বদলে স্বাধীন নাগরিকের জীবনের আস্বাদ গ্রহণ। দাস-তৎপরতা এই দিকে পূর্ণভাবে বিকশিত। অর্থের বিনিময়ে সর্বস্বান্ত হইয়াও স্বাধীন জীবন লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বহু ক্রীতদাসের অদ্ভুত তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ক্রীতদাস-নির্ভর রোমক সমাজের এই অন্তর্নিহিত দৈন্য, অসঙ্গতি ও ধূমায়মান অসন্তোষের বাহুই একদিন রোমক সভ্যতাকে ধ্বংস করিল। যে সাম্রাজ্যের এক-চতুর্থাংশ লোক স্বাধীন ও তিন-চতুর্থাংশ ক্রীতদাস, তাহার মেয়াদ বেশীদিন হইতে পারে না। ইহা ভিতর হইতেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, বাহিরের আঘাতেও বিপর্যস্ত হয়। ফ্রাঙ্ক, গথ্ ও ভ্যাণ্ডালদের আক্রমণে রোমক সাম্রাজ্যের সাধারণ অধিবাসীরা স্বস্তির নিঃশ্বাসই ফেলিয়াছিল। কোথাও তাহারা বর্বরদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া বাধা দিবার চেষ্টা করে নাই। রোমক উত্তর-আফ্রিকা আক্রমণ করিবার সময় ভ্যাণ্ডালরা সংখ্যায় ৮০ হাজারের বেশী ছিল না; তথাপি উত্তর-আফ্রিকার বিরাট ভূখণ্ড একরূপ বিনাবাধায় ভ্যাণ্ডালদের পদানত হইল। ইহা শুধু একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। সাম্রাজ্যের পতনের শেষ দিকে সর্বত্রই এইরূপ ঘটিয়াছিল।

এই দাসপ্রথা যদি প্রাচীন ইউরোপীয় সভ্যতার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল, এই প্রথার জগদ্দল পাষাণভারে বিজ্ঞানেরও অপমৃত্যু ঘটিয়াছিল। বিজ্ঞান শুধু বিলাস ও প্রাচুর্যের মধ্যে প্রতিপালিত অবসরভোগী মুষ্টিমেয় একদল বিত্তশালী সম্প্রদায়ের শোভা বা পরগাছা রূপে বাঁচিতে পারে না। জ্ঞানের এক স্বাভাবিক সামাজিক প্রয়োজনও উপলব্ধ হওয়া চাই। সেই প্রয়োজন জীবনযুদ্ধে মনুষ্য সমাজকে সাহায্য করিবার প্রয়োজন; সমগ্রভাবে সমাজের প্রত্যেক নরনারীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানকল্পে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রয়োগের প্রয়োজন। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োগের প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে তখনই উঠে যখন সর্বসাধারণের সহজ জীবনযাত্রা, শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণ সমাজের লক্ষ্য। কারণ একমাত্র এইরূপ সমাজেই শ্রম-লাঘবের প্রশ্ন উঠে। প্রশ্ন উঠে অল্পায়াসে অধিক পরিমাণ উৎপাদনের। প্রশ্ন উঠে বিশ্রামের ও সুশিক্ষার। এক দিক দিয়া দেখিলে এই শ্রম-লাঘব ও অল্পায়াসে অধিক পরিমাণ উৎপাদন-প্রচেষ্টা হইতেই বিজ্ঞান-চর্চার অনুপ্রেরণা আসিয়া থাকে।

কিন্তু গ্রেকো-রোমক আমলের ক্রীতদাস-নির্ভর সমাজের উদ্দেশ্য ছিল সর্বসাধারণের কল্যাণ নহে, মুষ্টিমেয় ঊর্ধ্বতন অভিজাত সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন। এক-চতুর্থাংশ লোকের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তিন-চতুর্থাংশ ক্রীতদাসের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম যথেষ্ট। এই অমানুষিক কায়িক পরিশ্রম ও পেশীশক্তির ব্যয়ে যে সম্পদ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার অতি সামান্য অংশই নিয়োজিত হইয়াছে ক্রীতদাসদের গ্রাসাচ্ছাদনে আর অবশিষ্ট বেশীর ভাগই নিয়োজিত হইয়াছে এই এক-চতুর্থাংশ ঊর্ধ্বতন অভিজাত সম্প্রদায়ের ভরণ পোষণ, বিলাস ব্যাসন ও অপব্যয়ের কার্যে। এই ব্যবস্থা কাল সহকারে এমনি কায়েমী হইয়া পড়িয়াছিল যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় প্রত্যেকের নিশ্চিত ধারণা হয়, ক্রীতদাস-নির্ভর সভ্যতাই একমাত্র উন্নত ও শাশ্বত সভ্যতা। এই ধারণার ফলে মনুষ্য পেশীশক্তির পরিবর্তে যন্ত্রশক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা একেবারেই দেখা দেয় নাই। তবে ক্রীতদাসদের মধ্যে হয়ত এইরূপ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু এরূপ সমাজ-ব্যবস্থায় তাহাও সম্ভবপর হয় নাই। দাসজীবনের নিস্ফলতা ও অক্ষমতা এক সংক্রামক নিশ্চেষ্টতা ও উদ্যমহীনতার সৃষ্টি করে। সহস্র বৎসর ধরিয়া ক্রীতদাসশ্রেণী খনির কার্য করিয়া আসিয়াছে, ইহার বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে তিক্ত জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু এত দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও খনির উৎপাদন কার্যে এতটুকু যান্ত্রিক উন্নতি তাহারা সাধন করিতে পারে নাই। * অথচ সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্তনের

* "The art of mining appears to have made almost no technical progress during the whole of antiquity, that is, from the date of the earliest traces recorded to the fall of the Roman Empire."—Neuburger, *Technical Arts & Sciences of the Ancients,* London, 1930.

ও সমাজে মানবতার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবার অত্যল্পকালের মধ্যেই যে এইরূপ উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছিল, ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত এগ্রিকোলার *De re metallica* তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই সব তথ্য বিচার করিলে ইহাই মনে হয় যে, প্রাচীনকালে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পথে অগ্রসর হইবার পরিবর্তে ন্যায় ও তর্কের পথে বিজ্ঞানের অগ্রসর হইবার এবং পরবর্তীকালে এই অগ্রগতিও সম্যকরূপে রুদ্ধ হইবার এক প্রধান কারণ সমাজ-ব্যবস্থায় দাস-প্রথার ব্যাপক প্রবর্তন। সমাজের সেবায়, সর্বমানবের কল্যাণে বিজ্ঞান যখনই পরিপূর্ণভাবে নিয়োজিত হইবার অনুপ্রেরণা লাভে বঞ্চিত হইয়াছে তখনই তাহার অগ্রগতিতে কোন না কোন প্রকার ছেদ পড়িয়াছে। ফারিংটন লিখিয়াছেন:—

> "This mischivous seperation of the logic from the practice of science was the result of the universal cleavage of society into freeman and slave. This was not good either for practice or for theory. As Francis Bacon put it, surveying according to the knowledge of his day the same facts that we have here surveyed, if you make a vestal origin of science, you must not expect her to bear fruit. The fruits of a general improvement in the material conditions of life and of a general emancipation of society from superstition were not such as could be produced by such a reverend maid as ancient science became in its decline."—*Greek Science*, II, p. 165.

৮·৪। প্রাচীন বিজ্ঞানের পতনে তৎকালীন দার্শনিক মতবাদ ও খ্রীষ্টধর্মের দায়িত্ব

প্রাচীন বিজ্ঞানের পতনের ব্যাপারে গ্রীক দর্শনের ক্রমিক অবনতি, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপের পরিবর্তে শুদ্ধ চিন্তা, মায়াবাদ ও ভাববাদের আধিক্য, অলৌকিক ও ভৌতিক শক্তিতে ক্রমবর্ধমান বিশ্বাস এবং সর্বশেষে প্রথম অবস্থার খ্রীষ্টধর্ম এবং সমাজ ও জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই ধর্মের বিধান ও নির্দেশ বড় কম দায়ী নহে। ব্যষ্টির ও সমষ্টির জীবনের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য, ইহার উৎপত্তি ও পরিণতি, পার্থিব ও নৈসর্গিক পরিবেশের সহিত ইহার সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্য প্রভৃতি বিষয়ে মানুষ বিভিন্ন যুগে কতকগুলি চরম সত্যের সন্ধান দিবার, কতকগুলি অমোঘ সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার চেষ্টা করিয়াছে। দর্শন ও ধর্মের মধ্য দিয়া তাহার এই প্রয়াস অভিব্যক্ত। তাই দর্শন ও ধর্ম ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে যে মত ও দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি করে, সর্বপ্রকার জ্ঞান-চর্চার উপর সেই মত ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব অনিবার্য। শুধু তাহাই নহে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই মত ও দৃষ্টি-ভঙ্গী জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার গতি ও দিক নির্ধারণ করিয়া থাকে। জ্ঞান-চর্চা সাধারণতঃ এই প্রচলিত দার্শনিক মতবাদ ও ধর্মমতের সহিত সামঞ্জস্য ও সমন্বয় রক্ষা করিয়া চলে। মাঝে মাঝে অবশ্য এই সামঞ্জস্য ও সমন্বয় রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে। নূতন মনীষার আবির্ভাবে নূতন জ্ঞানালোক সম্পাতে প্রচলিত দার্শনিক মতবাদের সহিত নূতন জ্ঞানের বিরোধ ও সংঘাত ঘটে। সেই বিরোধ তীব্রতর হইয়া নূতন জ্ঞানের জয়লাভ ঘটিলে, সেই জ্ঞানের সহিত খাপ খাওয়াইয়া দর্শনের ধারা আবার পরিবর্তিত ও প্রবাহিত হয়। এই পরিবর্তিত দর্শন তখন ভবিষ্যৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার পথ আবার নূতন করিয়া বাঁধিয়া দেয়।

চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী হইতে সুরু করিয়া প্রায় পাঁচ শত বৎসর ইউরোপে জ্ঞান ও বিজ্ঞান

চর্চার গতি রুদ্ধ হইবার মূলে তৎকালীন দার্শনিক মতবাদ ও খ্রীষ্টধর্মের সুদূরপ্রসারী প্রভাব যে বিদ্যমান ছিল, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই সময়কার দর্শনের মধ্যে আমরা যে মধ্যযুগীয় মনোভাবের প্রকাশ দেখিতে পাই এবং প্রাথমিক যুগের খ্রীষ্টধর্মের কাঠামো, তাহার বিশ্বাস, নীতিবোধ ইত্যাদি গড়িবার পশ্চাতে যে দৃষ্টিভঙ্গীর সাক্ষাৎ পাই, তাহার পর্যালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে, কি হেতু এই মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার অনুকূল হয় নাই, কি ভাবে দর্শন ক্রমে ক্রমে ধর্মের নিকট দাসখত লিখাইল এবং কেন ইউরোপীয় চিন্তাজগতে নিষ্ক্রিয়তা আধিপত্য বিস্তার করিল।

আমরা দেখিয়াছি পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে দৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে নানা তথ্য ও জ্ঞান আহরণ করিয়া সেই তথ্যসমূহের রীতিনীতি হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়াসের ফলে প্রাচীন গ্রীক দর্শনের উদ্ভব হইয়াছিল। গ্রীক দর্শনের স্রষ্টা আয়োনীয় দার্শনিকগণ বিজ্ঞান ও দর্শনকে পৃথক করিয়া দেখেন নাই। সক্রেটিস ও প্লেটোর হাতে পড়িয়া গ্রীক দর্শন এক সম্পূর্ণ নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। শুধু পর্যবেক্ষণের দ্বারা প্রকৃতির রহস্যের কিনারা যে সম্ভবপর নয় এবং প্রকৃত সত্য উপলব্ধি যে একমাত্র মননশক্তি ও শুদ্ধ আত্মিক শক্তির উপর নির্ভর করে, প্লেটোর এই ধারণা বিজ্ঞান-নির্ভর দর্শনের পরিবর্তে এক ভাববাদী, অতি-প্রাকৃত তত্ত্বীয় দর্শনের সৃষ্টি করে। এই দর্শনে মানুষের মন ও চৈতন্যই সর্বস্ব; এই মন ও চৈতন্যের দ্বারা উপলব্ধ সত্তাই একমাত্র শাশ্বত সত্য। এইরূপ দর্শনের অনিবার্য ফল এই যে, ইহা হইতে বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানুষের ইতিহাস সম্বন্ধে এক মনগড়া স্বয়ংসম্পূর্ণ মতবাদের উদ্ভব ঘটে। এই মনগড়া স্বয়ংসম্পূর্ণ মতবাদকে অভ্রান্ত সত্য জ্ঞান করিয়া দার্শনিকগণ তখন অগ্রসর হন দৃশ্যমান নানা তথ্যের কারণ নির্দেশ করিতে। যে সকল তথ্যকে এই মতবাদের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায়, তাহারাই হইল প্রকৃত তথ্য, আসল সত্য; যে সকল তথ্যের সহিত এইরূপ সামঞ্জস্য ও সংহতি রক্ষা সম্ভবপর হয় না তাহারা চৈতন্য-অগ্রাহ্য অসত্য, সুতরাং তাৎপর্যবিহীন। এইরূপ দর্শনের প্রধান বিপদ এই যে, প্রকৃতি সম্বন্ধে নির্ভুল ও সংস্কারমুক্ত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার আদর্শের ইহা সম্পূর্ণ পরিপন্থী; সুতরাং বিজ্ঞানের অগ্রগতিরও ইহা প্রতিকূল। সেজন্য যখনই প্লেটোর দর্শন প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তখনই বিজ্ঞানের অপমৃত্যু আমরা দেখিয়াছি।

অ্যারিস্টট্‌ল্‌ ও তাঁহার পেরিপ্যাটেটিক্‌ বিদ্যাপীঠের দর্শনে পর্যবেক্ষণের আদর্শ এই ভাবে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। জ্যোতিষে ও পদার্থবিদ্যায় প্লেটোর প্রভাব তিনি সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে না পারিলেও, জীববিদ্যায় তিনি পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের আদর্শ পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহার সুযোগ্য সহকর্মী থিওফ্রেস্‌টাস্‌ ও স্ট্রাটো এই আদর্শ আরও ব্যাপক-ভাবে প্রচার করেন। আলেকজান্দ্রীয় বিজ্ঞানের উজ্জ্বল ইতিহাসের অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, মিউজিয়ামের প্রথম অধ্যক্ষের নির্বাচন-কালে তাহারা প্লেটোর একাডেমীর দ্বারস্থ না হইয়া অ্যারিস্টট্‌লের পেরিপ্যাটেটিক্‌ বিদ্যাপীঠের দ্বারস্থ হইয়াছিল এবং বিখ্যাত পদার্থবিদ্‌ স্ট্রাটোকে এই পদে নিয়োগ করিয়াছিল। তথাপি অ্যারিস্টট্‌লের প্রধান কৃতিত্ব ন্যায়শাস্ত্রে। পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতিষে এই ন্যায়শাস্ত্রের অবতারণা করিয়া এবং সামগ্রী, সারবস্তু, আকৃতি, পরিমাণ, গুণ প্রভৃতি চৈতন্য-গ্রাহ্য কতকগুলি সহজ ধারণার ভিত্তিতে জ্যোতিষ ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ক সমস্যার মীমাংসাকল্পে তিনি যে সব মতবাদ উত্থাপন করেন তাহাতে অন্ততঃ এই দুই বিজ্ঞানের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্তই হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে মধ্যযুগীয় পণ্ডিতেরা অ্যারিস্টট্‌লের জীববিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের পরিবর্তে তাঁহার ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিষ ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের উপর রচিত কতকগুলি অসম্পূর্ণ ও বিকৃত টীকা অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পায়। বস্তুত অ্যারিস্টট্‌লের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলি অপেক্ষা তাঁহার অবৈজ্ঞানিক অধ্যাত্মবিদ্যার গ্রন্থগুলিই মধ্যযুগীয় মনোভাবের সহিত অধিকতর খাপ খাইয়াছিল।

স্টোইক ও এপিকিউরীয় দর্শনের বিষয়বস্তুতে বিজ্ঞানের প্রভাব সুস্পষ্ট হইলেও এই দুই দর্শনের কোনটাই ঠিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। এপিকিউরাস্‌ তাঁহার

দর্শন রচনায় ডিমোক্রিটাস্ প্রস্তাবিত আণবিক তত্ত্বের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন ঠিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে উৎসাহিত বা অনুপ্রাণিত করিবার উদ্দেশ্যে নহে। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এপিকিউরাস্ নিজে তেমন কোন উৎসাহই প্রকাশ করেন নাই। এপিকিউরাসের প্রত্যয় হয় যে, ধর্মজনিত ভীতিই মানুষের যত অশান্তি, যত দুঃখের কারণ। ধর্মজনিত এই ভীতির হাত হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে দার্শনিক মতবাদ রচনায় তিনি বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।* সেইরূপ স্টোইক দর্শনে হেরাক্লিটাসের বিজ্ঞান, অ্যারিস্টটলের ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি নানা জ্ঞানের সমন্বয় ঘটানো হইলেও এই দর্শনের কেন্দ্রীয় সত্য হইল মানুষের ইচ্ছাশক্তি। মুখ্যতঃ মানুষের জীবন ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে ইহা এক প্রকার নীতিদর্শন মাত্র। এই কার্যে প্রয়োজনমত প্রাকৃতিক জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান ও অধ্যাত্মজ্ঞান ব্যবহৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক জগৎ বা তত্ত্বীয় জ্ঞান সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানার্জন স্টোইক দর্শনের লক্ষ্য নহে। এই নীতিবাদী দর্শন একান্তই বাস্তবধর্মী এবং এই কারণেই অতিমাত্রায় ব্যবহারিক রোমক জাতির চিত্ত ইহা অতি সহজে জয় করিতে পারিয়াছিল। বিজ্ঞানের মুখোসপরা এই দুই দর্শন বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে অনেক ঐতিহাসিকের মনে ভ্রান্তির উদ্রেক করিয়াছে; কিন্তু আসলে ইহাদের কোনটাই বিজ্ঞানের অগ্রগতির অনুকূল হয় নাই। মানুষের ক্ষুদ্র জীবনযাত্রার নৈতিক মান, ধর্মজাত ভীতি, অশান্তি প্রভৃতি তুচ্ছ ব্যাপারে আলোচনা নিবদ্ধ রাখায় বৃহত্তর জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই দুইটি দর্শন কোন প্রকার অনুপ্রেরণার কারণ হইতে পারে নাই। আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা উদ্ভাবনের কার্যে স্টোইক দর্শনের প্রভাব বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সাধারণভাবে বিজ্ঞানের প্রতি এই দর্শন বিতৃষ্ণারই সঞ্চার করিয়াছিল। রোমকদের মধ্যে বিজ্ঞান-চর্চায় নিরুৎসাহিতার অন্যতম কারণ হিসাবে অনেকে স্টোইক দর্শনের উল্লেখ করিয়া থাকেন।

প্লেটোনিজ্‌ম্ বা প্লেটোনিক দর্শনের প্রতিপত্তি মাঝে মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বী দর্শন বা দর্শনসমূহের অভ্যুত্থানে ক্ষুণ্ণ হইলেও ইহার প্রভাব কখনই সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় নাই। ঘুরিয়া ফিরিয়া প্লেটোনিজ্‌ম্ মানুষের মনে বাসা বাঁধিয়াছে, সাবেক রূপে না হইলেও অন্ততঃ পরিবর্তিত রূপে। কিন্তু প্রথম যুগের সে উচ্চ মান প্লেটোনিজম্ আর ফিরিয়া পায় নাই; পরবর্তীকালে এই দর্শনের যে অভিব্যক্তি দেখা যায়, তাহা নিঃসংশয়ে নিম্নস্তরের। প্লোটিনাস্ (২০৪-২৭০) প্লেটোত্তর প্লেটোনিক দার্শনিকদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। তাঁহার সৃষ্ট নিও-প্লেটোনিজ্‌ম্ গ্রীক দর্শনের ইতিহাসে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা। প্রজ্ঞা ও শুদ্ধবুদ্ধির ভিত্তিতে প্লেটো যে যুক্তিবাদী দর্শন রচনা করিয়াছিলেন, প্লোটিনাস তাহার মধ্যে আবার আমদানি করিলেন মরমীবাদ। তাঁহার শিষ্য পোরফিরি (মৃত্যু ৩০০ খ্রীঃ অঃ) ও আয়াম্‌ব্লিকাস্ (মৃত্যু ৩৩০ খ্রীঃ অঃ) নিও-প্লেটোনিজ্‌ম্‌কে ক্রমশঃ অধিকতর মরমীবাদী করিয়া তোলেন। ফলে প্লেটোর মূল দর্শনে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার যেটুকু সমর্থন ছিল, প্রকৃতি সম্বন্ধীয় গবেষণার যেটুকু উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহারও অবসান ঘটিল। মরমীবাদে সমাচ্ছন্ন অতি-প্রাকৃত এক আনন্দলোকের সন্ধান দিবার জন্য এই নিও-প্লেটোনিজ্‌মের চেলারা ব্যগ্র হইয়া পড়িল। এই সুযোগে নানাপ্রকার যাদুবিদ্যায় ও ভৌতিককাণ্ডে, অদৃষ্টে ও দৈবে বিশ্বাস এই দর্শনের অঙ্গীভূত হইল। অলৌকিক যাদুবিদ্যার পথেই যে পরমাশ্চর্য দৈবশক্তির সাক্ষাৎ মিলে, আত্মিক কল্যাণের জন্য দেবতা, দেবদূত ও শয়তান প্রত্যেকেরই যে প্রয়োজন আছে, এইরূপ ধারণা নিও-প্লেটোনিস্টরা সগর্বে

* "The attitude of Epicurus to science is particularly well marked. He took no interest in it whatever as such, but he used it as an instrument to free men from the religious fear to which he attributed human happiness." —J. Burnet, article on 'Philosophy', *The Legacy of Greece*, ed. R. W, Livingstone; p. 91.

প্রচার করিতে লাগিল। অর্থাৎ দর্শনের নামে যত প্রকার কুসংস্কার, যাদুবিদ্যা ও ভোজবাজিতে বিশ্বাস, পরমার্থের সন্ধানে সন্ন্যাস জীবন যাপনের উন্মাদনা প্রভৃতি নানারকমের ভণ্ডামি ও বুজরুকি একে একে মাথা-চাড়া দিয়া উঠিল।

এইরূপ মরমীবাদের ঢেউ ইউরোপীয় সমাজ-জীবনের সর্বত্র সে সময়ে প্রবাহিত। মানুষের দুঃখ, কষ্ট, অভাব, অভিযোগ, অনিশ্চয়তা ও অশান্তির সুযোগ লইয়া এই সব মরমীবাদীরা ব্যাপক পসার জমাইয়া বসিল। অর্ফিজ্‌ম্‌, মিথ্রাইজ্‌ম্‌, মানিকেইজ্‌ম্‌ ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। রোমক শাসকগোষ্ঠীর আনুগত্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিবার জন্য এই সব মরমীবাদী দর্শন বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছিল। রোমক সাম্রাজ্যের প্রধান ধর্মের পদমর্যাদা লাভ করিবার জন্য মিথ্রাইজ্‌ম্‌ এক সময় খ্রীষ্টধর্মের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। প্রাচীন পারস্যের জরথুস্ত্রের ধর্ম হইতে মিথ্রাইজ্‌মের উদ্ভব। মিথ্রাস্‌ (সংস্কৃত-'মিত্র') মানে আলোকদেবতা বা সূর্যদেবতা। এই সম্পর্কিত পবিত্র ধর্মোপাখ্যানে মিথ্রাস্‌ কর্তৃক একটি বৃষকে হত্যা করিবার গল্প আছে; সেই বৃষ হইতে নিঃসৃত শোণিতধারা জীবনবীজ অংকুরিত করিতেছে। আত্মার অবিনশ্বরতা, জন্মান্তরবাদ, নানাপ্রকার অনুষ্ঠান, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ক্রিয়াকলাপ, আদিম প্রকৃতি পূজা, চিত্তাকর্ষক রূপক ও পৌরাণিক উপাখ্যানের মধ্য দিয়া মরমীবাদ প্রচার করা ছিল এই সব বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব।*

রোমক সাম্রাজ্যের আমলে, বিশেষতঃ তাহার পতনের কালে, দর্শনের কিরূপ অবনতি ঘটিয়াছিল এবং তাহা কতদূর নিম্নস্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছিল, উপরিউক্ত আলোচনা হইতে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। যাদুবিদ্যা, দৈবশক্তি ও মন্ত্র-তন্ত্রে বিশ্বাসী অদৃষ্টবাদী সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার প্রস্রবণ আপনা হইতেই শুকাইয়া গেল। কিরূপে তাহার দিন কাটিবে, অদৃষ্টের লিখন কি, পরজন্ম তাহার কেমন হইবে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব কিনা, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কিভাবে পাওয়া যায়—এই সমস্তই তখন মানুষের প্রধান সমস্যা। এই ধরনের সমস্যার সমাধান বিজ্ঞানের আওতার বাহিরে; সুতরাং বিজ্ঞান-চর্চা নিষ্ফল প্রয়াস ও সময়ের অপব্যবহার বলিয়া পরিগণিত হইল।

খ্রীষ্টধর্মের জন্ম এইরূপ মরমীবাদী আবহাওয়া ও পরিবেশের মধ্যে। যীশুখ্রীষ্ট পৃথিবীতে এক স্বর্গরাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। এই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য তিনি সকলকে আহ্বান করিলেন এক সত্যনিষ্ঠ জীবন যাপন করিতে, ধন-দৌলত প্রভৃতির মায়া ত্যাগ করিতে। মিথ্যাচরণ, হঠকারিতা ও প্রবঞ্চনার তিনি তীব্র নিন্দা করিলেন। এমন কি ধন-বৈষম্য লোপ করিবার জন্য তাঁহার উপদেশ হইল, প্রত্যেক নরনারী স্বর্গরাজ্যের প্রজা, তাহার সমস্ত ধনসম্পত্তির মালিক স্বয়ং ঈশ্বর। বলা বাহুল্য, সমাজ-সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক আন্দোলন। খ্রীষ্টধর্মের আন্দোলন যদি শুধু এই নীতিবাক্য ও আদর্শবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত, তবে ইহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত। গ্যালিলি, নাজারেথ্‌ বা জুডিয়ার অল্পসংখ্যক ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্যে আর একটি নগণ্য ধর্ম হিসাবে এক কোণে পড়িয়া থাকিত।

এক বিশ্বধর্মরূপে প্রচার করিয়া সেণ্ট পল খ্রীষ্টধর্মকে এই বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিলেন। ইহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করিবার জন্য অনুষ্ঠান, উপাসনা, যাদুবিদ্যা, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের পরিকল্পনা প্রভৃতির প্রবর্তন করিতে হইল; সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য এক জীবনাদর্শ ও দর্শন তৈয়ারী করিয়া লইতে হইল। এই কার্যে খ্রীষ্টধর্ম মিথ্রাইজ্‌ম্‌, সেরাপিস্‌-আইসিস্‌ ধর্ম, স্টোইক দর্শন, নিও-প্লেটোনিজ্‌ম্‌ প্রভৃতি নানা ধর্ম ও দার্শনিক মতবাদের নিকট ঋণী। খ্রীষ্টধর্মের মূল উপদেশের সহিত যথাসম্ভব সংগতি

* Legge, *Forerunners and Rivals of Christianity.*
B. Malinowski, *Foundations of Faith and Morals, Oxford.*

রক্ষা করিয়া প্রয়োজনমত বাছিয়া বাছিয়া এই সব অনুষ্ঠান ও মরমীবাদ কৌশলে গ্রথিত করা হইয়াছে। ওরিগেন (১৮৫-২৫৪) গ্রীক দর্শন হইতে নানা মত ও তথ্যের সমাবেশ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিলেন যে, খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস সুপ্রাচীন দর্শন ও জ্ঞান হইতে উদ্ভূত। লোগোস (Logos) বা বিশ্বাত্মা বা ব্রহ্মাণ্ডের নিত্যতা, আত্মার পূর্বাপর অস্তিত্ব প্রভৃতি গ্রীক অধ্যাত্মবাদের ভিত্তিতে তিনি প্রচার করিলেন যে, ঈশ্বর অপরিবর্তনশীল। খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের এইরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের বিশেষ সুবিধা করিয়া দেয়। সেণ্ট অগাষ্টিন (৩৫৪-৪৩০) এই দার্শনিক ভিত্তি আরও সুদৃঢ়রূপে রচনা করেন। তিনি প্রথমে মানিকেইজ্‌মে ও নিও-প্লেটোনিজ্‌মে বিশ্বাসী ছিলেন এবং পরে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি নানা শাস্ত্রে, বিশেষতঃ প্লেটোনিক দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে তিনি সমগ্র জ্ঞানের এক সমন্বয় সাধন করেন। তাঁহার চেষ্টায় খ্রীষ্টধর্ম এক অধ্যাত্ম দর্শনে রূপায়িত হইল। সেণ্ট অগাষ্টিন মরমীবাদেও বিশ্বাসী ছিলেন; ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি মরমীবাদের ও যাদুবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন। যাদুবিদ্যায় সেণ্ট জেরোম্, সেণ্ট গ্রেগরি প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ধর্মযাজকগণ অত্যাশ্চর্য ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রমাণ দিবার জন্য অতি জঘন্য ও হীন যাদুবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন।

সুতরাং মরমীবাদ-কবলিত প্রথম যুগের খ্রীষ্টধর্ম অন্যান্য মরমীবাদী দর্শনের মতই পর্যবেক্ষণমূলক বিজ্ঞানের তাৎপর্য বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। এই অবস্থায় একমাত্র ধর্মবিষয়ক জ্ঞান ছাড়া অন্য সকল প্রকার জ্ঞানই যে উপেক্ষিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য কি? তারপর খ্রীষ্টধর্মের মূলমন্ত্র হইল বিশ্বাস, অর্থাৎ ধর্মযাজকগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত খ্রীষ্টধর্মের মহিমায় বিশ্বাস। যে ধর্ম বা দর্শনের প্রধান শিক্ষা বিশ্বাস সেখানে স্বাধীন চিন্তার স্থান নাই, যুক্তিতর্কের অবকাশ নাই, শুধু জ্ঞানের জন্য জ্ঞানান্বেষণ নিষ্প্রয়োজন। গ্রীক বিজ্ঞানের যেটুকু এই ধর্ম-বিশ্বাসের সমর্থক কেবল সেইটুকু অংশই গৃহীত হইল; আর অবশিষ্ট অংশ বিধর্মীদের অলস মস্তিষ্কের আবর্জনা ও জঞ্জাল হিসাবে পরিত্যক্ত হইল। এই সম্পর্কে সেণ্ট বেসিলের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য ঃ—

> "Upon the essence of the heavens we are contented with what Isaiah says...... In the same way, as concerns the earth, let us resolve not to torment ourselves by trying to find out its essence...... At all events let us prefer the simplicity of faith to the demonstrations of reason."*

চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণার আর একটি প্রধান আপত্তি এই যে, এই সব জ্যোতিষ্ক সম্বলিত ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের সৃষ্টি। ঈশ্বর এই ব্রহ্মাণ্ডের অনেক ঊর্ধ্বে। সুতরাং গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি ব্যাপারে চিন্তা নিবদ্ধ থাকিলে ঈশ্বরচিন্তায় বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা, এমন কি ঈশ্বরের প্রতি ঔদাসীন্য বৃদ্ধিও বিচিত্র নয়। অতএব ধর্মশাস্ত্রের বহির্ভূত অন্য সকল প্রকার শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও গবেষণা পরিত্যক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সেণ্ট অগাষ্টিন, এই মত তীব্র ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন এই বলিয়া যে,

> "Those imposters the mathematicians (*i. e.* astrologers) ....who use no sacrifice, nor pray to any spirit for their

* Homilus, I, VIII and X.
Lynn Thorndike, *History of Magic and Experimental Science*, Vol. I; p. 485.

divinations, which arts christian and true piety consistently rejects and condemns."*

প্রাচীন ইউরোপীয় বিজ্ঞান মুখ্যতঃ বিধর্মী গ্রীক প্রতিভার সৃষ্টি, এই কারণেও প্রথম যুগের খ্রীষ্টানরা গ্রীক বিজ্ঞানের তীব্র বিরোধিতা করিয়াছে। তথাপি গ্রীক বিজ্ঞানকে পুরাপুরি বাদ দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। খ্রীষ্টীয় দর্শনের বনিয়াদ গড়িতে গিয়া সৃষ্টিতত্ত্ব, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবী, পৃথিবীর তরু, লতা, মনুষ্য ও প্রাণিজীবন সম্বন্ধে কিছু না কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল। যে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মনুষ্য জীবন একান্তভাবে নির্ভরশীল, তাহাকে বাদ দিয়া মানুষের উপযোগী কোন ধর্মমত বা দর্শন গঠন করা সম্ভবপর নয়। তাই বাইবেলের প্রারম্ভেই সৃষ্টি-রহস্যের অবতারণা আমরা দেখি। বাইবেলে বর্ণিত এই সৃষ্টি-রহস্যের বহু ব্যাখ্যা ও সমালোচনা পরবর্তী খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ রচনা করিয়াছেন এবং এই ব্যাখ্যা ও সমালোচনা হইতে *Hexaemeron* নামে এক সমগ্র খ্রীষ্টীয় বিজ্ঞানই রচিত হইয়াছে। *Hexaemeron*-এ বিজ্ঞানের প্রতি প্রাথমিক যুগের খ্রীষ্টানদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত। সুতরাং বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাথমিক খ্রীষ্টধর্ম কিরূপ মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে হইলে *Hexaemeron*-এ উল্লিখিত কয়েকটি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন।

হিপোলাইটাস্, ওরিগেন, বেসিল, অ্যাম্ব্রোজ প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ধর্মযাজক সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া *Hexaemeron* রচনা করেন। তন্মধ্যে বেসিলের গ্রন্থই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করে। প্রথমে ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনা ও তাহার আধ্যাত্মিক গুরুত্বের কথা ধরা যাক। গ্রীক দার্শনিকগণ একটি মাত্র স্বর্গের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু বেসিল একাধিক স্বর্গের অস্তিত্ব প্রচার করিলেন। তাঁহার যুক্তি হইল, গ্রহদের জন্য এককেন্দ্রীয় সাতটি গোলকের পরিকল্পনা যদি গ্রাহ্য হইয়া থাকে, তবে বহু স্বর্গের পরিকল্পনাও যুক্তিসংগত। বাইবেলের এক স্থানে আছে, 'স্বর্গের নীচে যত জল আছে, তাহা সব এক স্থানে একত্রিত হোক।' বেসিল এ সম্বন্ধে মন্তব্য করিলেন, এই উক্তি শুধু সমুদ্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, হ্রদ বা ভূভাগ দ্বারা আবদ্ধ অন্য প্রকার জলরাশির ক্ষেত্রে নহে। তাহা হইলে ক্যাস্পিয়ান সাগরের বেলায় কি হইবে? এই আপত্তি কাটাইবার জন্য তিনি বলিলেন, অনেক ভৌগোলিকের বর্ণনা ও অভিমত হইতে জানা যায়, ক্যাস্পিয়ান সাগর চতুর্দিকের মহাসাগরের সহিত সংযুক্ত; সুতরাং এই সাগর মহাসাগরেরই এক অংশ মাত্র! প্রাণীদের প্রকৃতি ও ব্যবহার সম্বন্ধে বেসিল অতি অদ্ভুত সব মন্তব্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। প্রাণীদের প্রকৃতি ও স্বভাব আলোচনায় তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের দৃষ্টান্ত হইতে মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রয়োজনীয় নীতি ও উপদেশ আহরণ করা। যেমন, একপ্রকার সামুদ্রিক শল্লকী ঝড়ের পূর্বাভাস জানায়; ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি কয়েক ধরনের জন্তু সহজ প্রবৃত্তির দ্বারা বিপদের সংকেত বুঝিয়া থাকে। শালিখ পাখি হেমলক বিষ উদরস্থ করিয়াও যে জীবিত থাকে তাহার কারণ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিষক্রিয়া সুরু হইবার পূর্বেই সে এই বিষ হজম করিতে পারে, ইত্যাদি। কোন কোন পক্ষীর স্বতঃজননের কথা বেসিল উল্লেখ করেন। অর্থাৎ পুং-পক্ষীর সাহায্য ব্যতীতই স্ত্রী-পক্ষী ডিম পাড়িতে পারে। কুমারী মেরী কর্তৃক যীশুখ্রীষ্টের জন্মদান বৃত্তান্তের ইহা একপ্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। হ্যালসিয়ন বা মাছরাঙাজাতের একপ্রকার পক্ষী উত্তরায়ণের পূর্বে সমুদ্রে দারুণ ঝড় ও বাত্যা সত্ত্বেও ডিম পাড়িয়া তা দিতে পারে। ইহা ঈশ্বরের করুণার এক প্রকাশ; দয়াপরবশ হইয়া এই অসহায় পক্ষীর সুবিধার জন্য তিনি সাত দিন সমুদ্রকে শান্ত রাখেন।† *Hexaemeron*-এ বর্ণিত এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যায়।

---

* *Singer, From Magic to Science,* p. 84.

† "God in His munificence grants another seven days to this tiny animal. All sailors know this and call these days halcyon days."

Hexaemeron ছাড়া এই সময়ে আর একটি পুস্তক প্রচলিত ছিল। তাহার নাম *Physiologus*। এই গ্রন্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক মতদ্বৈধ আছে। কেহ বলেন, ওরিগেন এই গ্রন্থের প্রণেতা; কাহারও মতে বহু লোকের রচনা ও মত একত্রিত করিয়া সংকলিত ইহা একটি বিশ্বকোষ বিশেষ। যাহা হউক, প্রকৃতি ও প্রাণিবৃত্তান্ত সম্বন্ধে লিখিত এই গ্রন্থের লক্ষ্য পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ বৈজ্ঞানিক সত্যের নির্দেশ ও ব্যাখ্যা নহে। খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত নানারূপ রূপক ও উপাখ্যানের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদানই ছিল এই গ্রন্থের লক্ষ্য। সেই দিক দিয়া এই গ্রন্থ *Hexaemeron*-এরই পর্যায়ভুক্ত। একটি উদাহরণের দ্বারা *Physiologus*-এর বিষয়বস্তুর স্বরূপ পরিষ্কার বুঝা যাইবে। ইহাতে এক জায়গায় বলা হইয়াছে, সিংহী মৃত শাবক প্রসব করে; কিন্তু তৃতীয় দিবসে সিংহ এই শাবকের চক্ষুর উপর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলে সেই নিঃশ্বাসের স্পর্শে মৃত সিংহশাবক প্রাণলাভ করে। জুডার সিংহ যীশুখ্রীষ্টের সমাধি হইতে পুনরুত্থানের উপাখ্যান বুঝাইবার পক্ষে মৃত সিংহশাবকের জীবন লাভের ব্যাপার ও ব্যাখ্যা বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

খ্রীষ্টধর্মের প্রথম দিকে ধর্মযাজকেরা কোন্ দৃষ্টিকোণ হইতে বৈজ্ঞানিক চর্চার তাৎপর্য বিচার করিত, উপরিউক্ত আলোচনা হইতে তাহা মোটামুটি বুঝা যাইবে। ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতা প্রমাণ করিতে অথবা ধর্মগ্রন্থের নানা রূপক, উপদেশ ও মন্তব্য প্রাকৃতিক দৃষ্টান্তের দ্বারা সহজবোধ্য করিবার জন্য যে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা, তাহাদের এইরূপ ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ সেই কার্যেও নানা বাধা ও অসুবিধা উপস্থিত হইল। গ্রীক বিজ্ঞানের ও দর্শনের যুক্তিবাদের সহিত পদে পদে খ্রীষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের সংঘাত দেখা দিল। ইহার ফলে খ্রীষ্টানরা ক্রমশঃ তীব্র গ্রীকবিদ্বেষী হইয়া উঠিল। ৩৯০ খ্রীষ্টাব্দে বিশপ থিয়োফিলাস্ কর্তৃক আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের এক অংশ ধ্বংস করা এই বর্ধমান বিদ্বেষের এক পরিণতি। ইহার অনতিকাল পরে বিদুষী গণিতজ্ঞা হাইপেসিয়াকে নির্মমভাবে হত্যা করিবার পশ্চাতেও এই খ্রীষ্টীয় বিদ্বেষ ও উন্মত্ততা বিদ্যমান। অজ্ঞতা যখন ব্যাপকভাবে গুণ বলিয়া পরিগণিত ও প্রশংসিত হয়, জ্ঞানের তখন বড় শোচনীয় অবস্থা। পলাইয়া বাঁচা ছাড়া তখন আর গত্যন্তর থাকে না। হইলও তাহাই। খ্রীষ্টানদের এই ব্যাপক আক্রমণের ভয়ে বহু গ্রীক পণ্ডিত আলেকজান্দ্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া এথেন্সে প্লেটোর একাডেমীর দ্বারস্থ হইল। এথেন্সে গ্রীক দর্শন, শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যের কিছু আদর তখনও বর্তমান। যাদুবিদ্যার আধিক্য, কুসংস্কার ইত্যাদি দ্বারা এই শিক্ষা নানাভাবে দুষ্ট ও পতিত হইলেও প্রোক্লাস (৪১০-৪৮৫) প্রমুখ কয়েকজন দার্শনিকের প্রভাব তখন পর্যন্ত একেবারে যায় নাই। তবে এথেন্সের বিদ্যাপীঠের দিনও সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। চতুর্দিকে খ্রীষ্টধর্মের প্লাবনের মধ্যে গ্রীক শিক্ষা, সংস্কৃতি ও দর্শনের এই ক্ষুদ্র বালুচরটি কতদিন আর নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবে? সম্রাট জাষ্টিনিয়ান এক আদেশ জারি করিয়া এথেন্সের বিদ্যাপীঠের দ্বার চিরদিনের জন্য বন্ধ করিয়া দিলেন (৫২৯) এবং সেই সঙ্গে সর্বপ্রকার গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রচার ও অধ্যয়ন আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ হইল।

গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই দারুণ দুর্গতি ও দুর্দশার দিনে চতুর্দিকে বর্বরতা ও অজ্ঞতার তাণ্ডব লীলার মধ্যে বাইজান্টাইন্ সাম্রাজ্য ও তাহার রাজধানী কন্স্তান্তিনোপল গ্রীক সভ্যতার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক স্তিমিত আলোক কোন রকমে প্রজ্বলিত রাখে। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোম্যান তুর্কদের কাছে কনস্তান্তিনোপলের পতন পর্যন্ত আটশত কি নয়শত বৎসর গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও সংস্কৃতি বাইজান্টাইন্ সাম্রাজ্যে বন্ধ জলাশয়ের ন্যায় কোন রকমে টিকিয়া থাকে। ইহাতে জ্ঞানের সম্প্রসারণ বা বৃদ্ধি ঘটে নাই বটে, কিন্তু প্রাচীন জ্ঞান নিশ্চিত ও সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়।

কনস্তান্তিনোপলের পতনে গ্রীক পণ্ডিতগণ পলাইয়া পশ্চিম ইউরোপের উর্বর মৃত্তিকায় গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সুরু করিলে ইউরোপে কিভাবে জ্ঞানের পুনর্জন্ম ঘটে, সে আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে।

ইউরোপে মধ্যযুগের ব্যাপ্তি এবং এই যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শোচনীয় পতনের মোটামুটি কতকগুলি কারণ বর্ণিত হইল। পাশ্চাত্ত্য যখন অজ্ঞতার এইরূপ নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন প্রাচ্য তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত। ভারতবর্ষে, মহাচীনে ও ঐশ্লামিক মধ্যপ্রাচ্যে, এক কথায় সমগ্র এসিয়ায় তখন এক অখণ্ড জ্ঞানরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত। বসুবন্ধু, ঈশ্বরকৃষ্ণ, দিঙ্নাগ, বুদ্ধঘোষ, জিনগুপ্ত প্রমুখ ভারতীয় বৌদ্ধ দার্শনিকগণ সমগ্র এসিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারে তৎপর; আর্যভট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, মহাবীর প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্গণ এই সময়ে ভারতীয় গাণিতিক ও জ্যোতিষীয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বাগ্ভট, মাধবকর ও বৃন্দ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন।

এই সময়ে চীন মহাদেশেও আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। গণিত ও জ্যোতিষে চিন্ লো-চি, হো চেন-তিয়েন, সু চুং-চি, সিয়া-হু উং, চেন-লুয়ান, চ্যাং চিউ-চিয়েন, ওয়াং সিয়াও-তুং, চু তান্, লি সুন্-ফেং, আই-সিং প্রমুখ চৈনিক গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্দের নাম বিখ্যাত; ফাহিয়ান, হুয়েন সাং, ওয়াং হুয়ান্-সে, ইৎ সিং প্রমুখ পর্যটক ও ভৌগোলিকগণ বিচিত্র প্রাচ্য দেশসমূহের বিভিন্ন জাতি, তাহাদের ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করিয়া অপূর্ব ভ্রমণ-কাহিনী ও ভৌগোলিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। চতুর্থ শতাব্দীতে চীনে তথাকথিত 'ভারতীয় কালি' বা 'ভুসা কালি' আবিষ্কৃত হয়। এই সব আবিষ্কার দেশ হইতে দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়া পরিশেষে ইউরোপে আসিয়া পেঁৗছে। সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের রাজত্বকালে কয়েকজন নেষ্টোরীয় খ্রীষ্টান পাদ্রী গোপনে চীন হইতে রেশমের গুটি পোকার ডিম ইউরোপে আনিয়া প্রথমে গ্রীসে ও পরে ইউরোপের অন্যত্র রেশমের চাষ প্রবর্তন করেন।

সিরিয়া, মেসোপোটেমিয়া ও পারস্যেও জ্ঞান-চর্চার এক প্রবল উৎসাহ এই সময় দেখা যায়। কন্স্তান্তিনোপল্ হইতে বিতাড়িত নেষ্টোরীয় খ্রীষ্টান পাদ্রীরা এবং খ্রীষ্টধর্মের আরও কয়েকটি শাখা, যেমন মনোফিজাইট্রা, মধ্যপ্রাচ্যে জ্ঞান-চর্চার পথ উন্মুক্ত রাখে। এডেসা, নিসিবিস ও জুণ্ডিশাহ্পুরের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কেন্দ্রগুলি এই সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করে। মনোফিজাইট্ সার্জিয়াস্ রাসায়েন ও সেভেরাস্ সেবখ্ত্-এর নাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আরব্য বৈজ্ঞানিক প্রতিভার বিকাশ বিজ্ঞানের ইতিহাসে আর একটি বিস্ময়কর ঘটনা। এসিয়ার এই আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক তৎপরতার কালে ইউরোপে আয়াম্ব্লিকাস্, ক্যাল্সিডিয়াস্ ম্যাক্রোবিয়াস্, ক্যাপেল্লা, বোয়েথিয়াস্, ক্যাসিওডোরাস্, ইসিডোর অব্ সেভিল, বীড, অ্যালকুইন প্রমুখ যে অল্প কয়েকজন দার্শনিক ও বিজ্ঞানীর নাম পাওয়া যায় তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক তৎপরতা একান্তই নিকৃষ্ট শ্রেণীর। সপ্তম শতাব্দীতে সমগ্রভাবে পৃথিবীর বিজ্ঞান-চর্চার নমুনা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে অধ্যাপক সার্টন তাই লিখিয়াছেনঃ

"Another striking fact is the almost complete absence of Latin writings. Outside of a few Barbarian codes, I had nothing to mention except Isidore's "Etymologies", and that was not very much.

"But if we look toward the east, what a contrast! ...... The intellectual life of Islam has not yet begun; but its eclosion is being slowly prepared. In the meanwhile, the

last Pahlawi chronicle appears. For India, I named only three men, but two of these were very great: Dharmakirti, Brahmagupta, Vagbhata. In Tibet, the great king Song-tsen Gam-po and his collaborator Sambhota. In China, a tremendous array: Shan tao, Tao Hsuan, K'uei-chi, T'ai Tsung, Wang Hsiao T'ung, Ch'u-tan, Fu Jen-chun, P'ei-chu, Li-t'ai, Hsuan Tsang, Ch'ao Yuan-fang, Fang Hsuan-ling, Yao Chien, Li Po-yao, Ling-hu Te-fen, Wei Cheng, Li Yen-shou, Ching Po, Lu Fa-yen, Hsuan Ying. In Korea, Ekwan and Kwanroku. Finally in Japan, Shotoku and Minabuchi Shoan.

"If we consider separately the main branches of science, we find that important additions to knowledge were made in mathematics by Brahmagupta; in geography, by Hsuan Tsang; and finally in medicine, by Paulos Aegeneta and Vagbhata. Of the outstanding names, one is Greek, one is Chinese, and two are Hindu. It is clear that the main cultural progress is now being made in the East."*

এসিয়ার বৈজ্ঞানিক তৎপরতার ইতিহাস আমরা পরবর্তী খণ্ডে আলোচনা করিব। গ্রীক প্রতিভা বিকাশ লাভের পূর্বে ও সমসময়ে বৈদিক ভারতবর্ষ ও চীন গণিত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসাবিদ্যায় যে কিরূপ আশ্চর্য প্রতিভা ও স্বকীয়তার পরিচয় দিয়াছিল, তাহা বর্তমান খণ্ডে আলোচনা করিয়াছি। এই দুই প্রাচীন সভ্যজাতির সৃজনী প্রতিভার এইখানেই শেষ নহে; ইহা খ্রীষ্টীয় শতক আরম্ভ হইবার পর বহু শত বৎসর পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। তাহাদের প্রচেষ্টায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে উন্নতি সাধিত হয় তাহার কাছে পরবর্তীকালে ইউরোপের ঋণ বড় কম নহে।

* G. Sarton, *Introduction to the History of Science,* Vol. I, p. 463.

গ্রন্থপঞ্জী

তারকা চিহ্নিত গ্রন্থগুলি আলোচনা প্রসঙ্গে ফুট-নোট হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

ABETTI, Giorgio, *The History of Astronomy*, translated from the Italian by Betty Burr Abetti, Henry Schuman, New York, 1952.

* ALISON, Sir Archibald, *History of Europe*, Edinburgh and London, 1853.

ALLBUTT, Sir T. C., *Greek Medicine in Rome*, London, 1921.

ARBER, Agnes, *Herbals*, Cambridge, 1912.

* ARISTOTLE, *De Caelo*,

BAILEY, Cyril (ed). *The Legacy of Rome*, Oxford, 1924.

* BELL, E. T., *The Development of Mathematics*, New York, 1940.

* BERNAL, J. D., *The Social Function of Science*, London, 1944.

BERNAL, J. D., *Science in History*, Watts, 1954.

* BERRY, A., *A Short History of Astronomy*, London, 1898.

* BERTHELOT, M., *Introduction a l'etude de la chimie des anciens et du moyen age*, Paris, 1889.

BRAIDWOOD, R. J., *Prehistoric Men*, Chicago Natural History Museum, No 37.

* BREASTED, J. H., *The Edwin Smith Surgical Papyrus*, in 2 Vols., Chicago, 1930.

* BRENNAND, W., *Hindu Astronomy*, Chas. Straker & Sons, London, 1896.

* BURGESS, E., *Surya Siddhanta*, (English translation), Calcutta University, 1935.

* BURNET, J., *Early Greek Philosophy*.

BURTT, E., *The Metaphysical Foundations of Modern Science*, Kegan Paul, 1932.

BURY, J. B., *The Idea of Progress—an inquiry into its origin and growth*, MacMillan, London, 1920.

BUTTERFIELD, H., *The Origins of Modern Science*, London, 1949.

* CASTIGLIONI, Arturo, *A History of Medicine*, Alfred A. Knopf, Inc., 1947.

* CAJORI, F., *A History of Mathematics*, MacMillan, 1926.

CHILDE, V. Gordon, *The Dawn of European Civilization*, Kegan Paul, London, 1925.

* CHILDE, V. Gordon, *Man Makes Himself*, Watts, 1936.

CHILDE, V. Gordon, *What Happened in History*, Penguine Books, London, 1942.

CHILDE, V. Gordon, *Progress and Archaeology*, Watts, London, 1944.

* CROWTHER, J. G., *The Social Relations of Science,* MacMillan, London, 1941.
* DAMPIER, Sir. W. C., *A History of Science,* Cambridge, 1948.
DASGUPTA, S. N., *History of Indian Philosophy,* in 4 Vols., Cambridge, 1922-29.
DATTA, B., *The Science of Sulba—a study in early Hindu geometry,* Calcutta University, 1932.
* DATTA, B. & SINGHA, A. N., *History of Hindu Mathematics,* in 2 Vols., Lahore, 1935.
* DAVIS, Tenny L., 'The Chinese Beginnings of Alchemy,' *Endeavour,* October, 1943.
* DELAMBRE, J. B. J., *Histoire de l'Astronomie Ancienne,* in 2 Vols., Paris, 1817.
DICKINSON, G. L., *Plato and His Dialogues,* Pelican, London.
* DIRINGER, David, *The Alphabet,* Hutchinson, 1947.
* DOIG, Peter, *A Concise History of Astronomy,* Chapman and Hall, 1950.
DRACHMANN, A. G., *Ktesibios, Philon and Heron—a study in ancient pneumatics,* Copenhagen, 1948.
DREYER, J. L. E., *History of the Planetary Systems from Thales to Kepler,* Cambridge, 1906.
* DUBS, Homer H., 'The Beginnings of Alchemy,' *ISIS,* Vol. 38, 1947.
DUHEM, P., *Le System du Monde,* Paris, 1913-17.
* EASTON, Stewart C., *Roger Bacon and His Search for a Universal Science,* Oxford, 1952.
* ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA, 14th edition, 1947.
FARBER, Eduard, *The Evolution of Chemistry—a history of its ideas, methods, and materials,* Ronald Press, New York, 1952.
* FARRINGTON, B., *Science in Antiquity,* Home Service Library, London, 1936.
* FARRINGTON, B., *Greek Science,* Part I & II, Pelican, 1949.
FIELD, Henry, *Prehistoric Men,* Field Museum of Natural History, Chicago, No. 31, 1933.
FORBES, R. J., *Man the Maker—a history of technology and engineering,* Henry Schuman, 1950.
* GHOSH, Ekendra Nath, 'Studies in Rig-Vedic Deities—Astronomical and Meteorological,' *Jr. of the Asiatic Society of Bengal,* 1932.
* GIBBON, Edward, *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire,* in 12 Vols., London, 1790.
GLANVILLE, S. R. K. (ed), *The Legacy of Egypt,* Oxford, 1942.
* GOMPERZ, *Griechische Denker,*

* GOW, James, *A Short History of Greek Mathematics*, Cambridge, 1884.

GUNTHER, R., *Dioscorides—the Greek herbal of Dioscorides*, Oxford, 1934.

HAWKS, E. *Pioneers of Plant Study*, London, 1928.

* HEATH, Sir Thomas, *The Works of Archimedes*, Cambridge, 1897.

* HEATH, Sir Thomas, *Diophantus of Alexandria—a study in the history of Greek algebra*, Cambridge, 1910.

* HEATH, Sir Thomas, *Aristarchus of Samos*, Oxford, 1913.

HEATH, Sir Thomas, *History of Greek Mathematics*, Oxford, 1921.

HEATH, Sir Thomas, *Greek Astronomy*, London, 1932.

* HOERNLE, A. R. Rudolf, *Studies in the Medicine of Ancient India*, Part I, Oxford, 1907.

HORT, Sir, Arthur, *Theophrastus*, Heinmann, London, Putnam, New York, 1916.

* HUNTER, G. R., *The Script of Harappa and Mohenjodaro and its connection with other scripts*, London, 1934.

* JEANS, Sir James, *The Growth of Physical Science*, Cambridge, 1947.

KAYE, G. R. *Indian Mathematics*, Calcutta and Simla, 1915.

* LEGGE, *Forerunners and Rivals of Christianity*.

* LIVINGSTONE, R. W. (ed.), *The Legacy of Greece*, Oxford, 1922.

LOCY, W. A., *Biology and its Makers*, Henry Holt and Co., New York, 1949.

LUBBOCK, Sir John (Lord Avebury), *Prehistoric Times—as illustrated by ancient remains and the manners and customs of modern savages*, London, 1900.

* MAJUMDAR, R. C. and PUSALKER, A.D. (ed.) *The History and Culture of the Indian People*, Vol. I, *Vedic Age*, George Allen & Unwin, 1953.

* MAJUMDAR, R. C., 'Scientific Achievements of the Ancient Hindus : Chronological and Sociological Background,' paper read at the symposium on History of Science in South Asia, New Delhi, 1950.

* MALINOWSKI, B., *Magic, Science and Religion*, Boston, 1948.

* MALINOWSKI, B., *Foundations of Faith and Morals*, Oxford.

* MANITUS (ed.), *Gemini Elementa Astronomiae*, Leipzig, 1898.

MARSH, J. E., *The Origin and Growth of Chemical Science*, London, 1928.

* MARVIN, F. S. (ed.), *Science and Civilization*, Oxford, 1923.

* MASPERO, G., *The Dawn of Civilization*, 1910.

MEYER, E. V., *A History of Chemistry*, MacMillan, 1906.

MOON, R. O., *Hippocrates and His Successors*, London, 1823.

MOORHOUSE, A. C., *The Triumph of the Alphabet—a history of writing*, Henry Schuman, New York, 1953.

* MUKHOPADHYAYA, Girindra Nath, *The Surgical Instruments of the Hindus*, in 3 Vols., Calcutta University, 1913.

MUKHOPADHYAYA, Girindra Nath, *History of Indian Medicine*, in 3 Vols., Calcutta.

MUNRO, H. A. J., *Lucretius, Text, Notes and Translation*, in 3 Vols., London, 1905-1910.

* NEUBURGER, Albert, *The Technical Arts and Sciences of the Ancients*, (Translated by H. L. Brose), London, 1930.

NEUGEBAUER, Otto, *The Exact Sciences in Antiquity*, Copenhagen, 1951.

* O'LEARY, Lacy, *How Greek Science Passed to the Arabs*, London, 1948,

OSBORN, H. F., *Men of the Old Stone Age*, 3rd. ed., London, 1921.

OSIRIS, *Studies on the History of Mathematics and the History of Science*, 11 Vols., published, Saint Catherine Press, Bruges, Belgium, 1936-54.

* PARTINGTON, J, R., *A Short History of Chemistry*, MacMillan, London, 1948.

* PARTINGTON, J. R., *Origins and Development of Applied Chemistry*, MacMillan, 1935.

PETRIE, Sir Flinders, *Wisdom of the Egyptians*, London, 1940.

* PIGGOTT, Stuart, *Prehistoric India*, Penguine, 1950.

* PLUTARCH, *Life of Marcellus*.

* RAMAKRISHNA Centenary Committee, *The Cultural Heritage of India*, in 3 Vols., Calcutta.

* RANDALL, H. J., *The Creative Centuries*, London, 1945.

* RANDHAWA, M. S., 'Role of Domesticated Animals in Indian History,' *Science & Culture*, Vol. 12, 1, 1946.

RAY, Sir P. C., *History of Hindu Chemistry*, in 2 Vols., Calcutta, 1902-9.

* REED, Howard S., *A Short History of Plant Sciences*, Chronica Botanica Co., 1942.

RENOU Louis & FILLIOZAT Jean, *L'Inde Classique—Manuel des etudes Indiennes*, Paris, 1953.

REYMOND, Arnold, *Science in Greco-Roman Antiquity*, Methuen & Co., 1927.

RICKARD, T. A., *Man and Metals*, in 2 Vols., New York, 1932.

* ROSS, W. D., *Aristotle*, Methuen & Co., London, 1923.

* SAHA, M. N., *The Reform of the Indian Calendar*, a pamphlet; also *Science & Culture*, Vol. 18, 2, Calcutta, 1952.

SANTILLANA, George de, 'Greek Astronomy,' *Scientific American*, April, 1949.

SARKAR, B. K., *Hindu Achievements in Exact Sciences*, London, 1918.

* SARTON, George, *Introduction to the History of Science*, in 3 Vols., 5 Parts, Baltimore, 1927-48.

SARTON, George, *History of Science & the new Humanism*, Cambridge, 1937.

SARTON, George, *A Guide to the History of Science, Chronica* Botanica Company, 1952.

SARTON, George, *A History of Science—Ancient science through the golden age of Greece*, Oxford, 1953.

* SCHIAPARELLI, G. V., 'Le sfere omocentriche di Eudosso, di Callippo e di Aristotele,' *Pubblicazione del R. Osservatorio di Brera*, Milan, 1875.

SEAL, B. N., *The Positive Sciences of the Ancient Hindus*, Longmans, Green & Co., London, 1915.

* SEDGWICK, W. T. & TYLER, H. W., *A Short History of Science*, MacMillan, 1918.

* SHUKLA, Kirpa Shankar, 'Chronology of Hindu Achievements in Astronomy', paper read at the symposium on History of Science in South Asia, New Delhi, 1950.

SINGER, Charles, *Studies in the History and Method of Science*, in 2 Vols., Oxford, 1917 & 1921.

* SINGER, Charles, *From Magic to Science*, London, 1928.

* SINGER, Charles, *A Short History of Medicine*, Oxford, 1928.

SINGER, Charles, *A Short History of Biology*, Oxford, 1931.

SINGER, Charles, *A Short History of Science*, Oxford, 1941.

* SINHJEE, Sir Bhagvat, *A Short History of Aryan Medical Science*, MacMillan, 1896.

SMITH, D. E., *History of Mathematics*, in 2 Vols., Boston, 1923-25.

* SMITH, D. E. and KARPINSKY, L. C., *The Hindu Arabic Numerals*, Boston and London, 1911.

* TANNERY, P., *Pour l'histoire de la science hellene—de Thales a Empedocle, Paris*, 1887; revised by A. Dies, 1930.

TANNERY, P., *Recherches sur l'histoire de l'astronomie ancienne*, Paris, 1893.

TARN, W. W., *Hellenistic Civilization*, London, 1927.

TAYLOR, F. Sherwood, *A Short History of Science*, London, 1939.

TAYLOR, F. Sherwood, *The Alchemists—Founders of Modern Chemistry*, Cleveland Press, New York, 1949.

THOMSON, J. O., *History of Ancient Geography*, Cambridge, 1948.

* THORNDIKE, Lynn, *A History of Magic and Experimental Science*, in 6 Vols., New York, 1923-41.

USHER, A. P., *A History of Mechanical Inventions*, New York 1929.

* VITRUVIUS, P., *De Architectura*, edited and translated by F. Granger, in 2 Vols,, 1931-34.

WAERDEN, B. L. Van der, *Science Awakening*, translated by Arnold Dresden, Noordhoff, Groningen, Holland, 1954.

* WESTERMANN, W. L., 'Ancient Slavery,' *Scientific American*, June, 1949.

WETHERED, H. N. *The Mind of the Ancient World*, London, 1937.

* WHITEHEAD, A. N., *Science and the Modern World*, Cambridge, 1927.

WIGHTMAN, W. P. D., *The Growth of Scientific Ideas*, Edinburgh and London, 1950.

ZIMMER, Henry R., *Hindu Medicine*, Baltimore, 1948.

নির্ঘণ্ট